ইসলামের অভ্যুদয় এবং বাংলাদেশ

(১২০৪-১৭৬০)

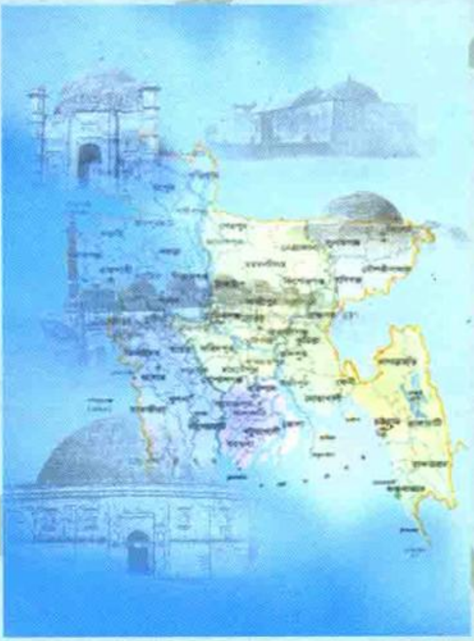

রিচার্ড এম. ইটন

ইসলামের অভ্যুদয় এবং বাংলাদেশ
(১২০৪–১৭৬০)

রিচার্ড এম. ইটন

হাসান শরীফ

অনূদিত

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামের অভ্যুদয় এবং বাংলাদেশ
রিচার্ড এম. ইটন
হাসান শরীফ অনূদিত
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩৮৪
ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৩৩৮
ইফাবা প্রকাশনা : ২৪৬৫
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭'০৯৫৪৯২
ISBN : 984-06-1232-8
জুন ২০০৮
আষাঢ় ১৪১৫
জমাদিউস সানি ১৪২৯

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

প্রুফ সংশোধন
মোহাম্মদ মোকসেদ

শব্দ সংযোজন
আর. এম. ডট. কম
২৩১ পূর্ব ধোলাইরপাড়, শ্যামপুর, ঢাকা ১২০৪

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১
মূল্য : ১২৫.০০ টাকা মাত্র

ISLAMER ABBHUDAY EBONG BANGLADESH [The Rise of Islam and the Bengal Frontier (1204-1760)]: Written in English by Richard M. Eaton, translated by Hasan Sharif into Bangla and published by Muhammad Shamsul Haque, Director, Translation and Compilation Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 9133394. June 2008
E-mail: islamicfoundationbd @ yahoo.com
Website: www.islamicfoundation.org.bd.
Price : Tk 125.00 : US Dollar : 4.00

প্রকাশকের কথা

পাশ্চাত্যের বেশির ভাগ ঐতিহাসিক-লেখকসহ অধিকাংশ মানুষেরই একটা অন্ধ ধারণা যে, মুসলমান মানেই সন্ত্রাসী, রক্তপিপাসু। তরবারির জোরেই তারা বিশ্বের নানা ধর্মের মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে। তবে এদের মধ্যে যাঁরা একটু চিন্তা-ভাবনা করেন, তাঁরা লক্ষ্য করলেন, ইসলামের সূতিকাগার আরবভূমি থেকে অনেক অনেক দূরে অবস্থিত বাংলাদেশ কেন এবং কিভাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে পরিণত হলো। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসকদের পরিচালিত আদমশুমারীতে তাদের তরবারিতত্ত্ব আরেক দফা বড় ধরনের হোঁচট খেল। আদমশুমারী রিপোর্টে দেখা গেল, এ উপমহাদেশের যেসব এলাকা মুসলিম সেনা অভিযানের মাধ্যমে করায়ত্ত হয়েছিল, সেসব এলাকার তুলনায় বাংলার এ শস্য শ্যামল ভূমিতে মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেশি। শুধু তাই নয়, এ বাংলার যে সমস্ত শহর-বন্দরে মুসলিম শাসকগণ অবস্থান করেছেন- যেমন মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ঢাকা, এগুলোর চেয়ে নিভৃত পল্লীতেই মুসলমানের সংখ্যা বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের অরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মি. রিচার্ড এম. ইটন বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ উপলক্ষে তিনি উভয় বাংলায় বার বার সফর করেন। এ উপমহাদেশের বিভিন্ন লাইব্রেরী, তথ্যশালা, ট্রেজারীর পুরাতন দলীল-দস্তাবেজ পর্যালোচনা করে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তরবারি তথা বল প্রয়োগের মাধ্যমে নয়; বরং একদিকে হিন্দুধর্মের কঠোর জাতিভেদ প্রথা, ধর্মীয় নির্যাতন-নিপীড়ন, অপরদিকে ইসলাম প্রচারকগণের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন এবং ব্যাপক দানশীলতা, উদার ও সহমর্মী মনোভাবই এতদঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাধিক্যের অন্যতম তথা একমাত্র কারণ। মি. রিচার্ড এম. ইটন তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভটি The Rise of Islam and the Bengal Frontier (1204-1760) শিরোনামে প্রকাশ করেছেন।

এ ধরনের একটি গবেষণাধর্মী ঐতিহাসিক পুস্তকের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুধাবন করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 'ইসলামের অভ্যুদয় এবং বাংলাদেশ' শিরোনামে পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ভাষান্তর করেছেন বিশিষ্ট লেখক, অনুবাদক ও সাংবাদিক জনাব হাসান শরীফ। অনূদিত পাণ্ডুলিপি

সম্পাদনা করেছেন সুপরিচিত ইসলামী চিন্তাবিদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সাবেক মহাপরিচালক সৈয়দ আশরাফ আলী এবং প্রুফ সংশোধন করেছেন জনাব মোহাম্মদ মোকসেদ।

পুস্তকটিকে সুন্দর ও নির্ভুল করে মুদ্রণের জন্য আমরা যথাযথ চেষ্টা করেছি। মুদ্রণজনিত প্রমাদ পরিহারে চেষ্টারও ত্রুটি করা হয়নি। এরপরেও কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের স্বার্থে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য সুধী পাঠক ও গবেষকদের প্রতি অনুরোধ রইল।

সুধী পাঠক মহল পুস্তকটি পাঠে কিঞ্চিৎ উপকৃত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে মনে করব। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন ॥

মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচি

অনুবাদকের কথা ৭
লেখকের কথা ১৩
সূচনা ১৬

প্রথম খণ্ড
সুলতানদের অধীনে বাংলা

১. তুর্কী বিজয়ের পূর্বে ২৫
২. রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রকাশ ৪৫
৩. বদ্বীপের প্রথমদিকের সূফী-দরবেশ ৯৯
৪. অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি ১২৭
৫. ইসলামে গণ-ধর্মান্তর: তত্ত্ব এবং প্রধান কাহিনী ১৪৭

দ্বিতীয় খণ্ড
মোগল শাসনে বাংলা

৬. মোগল শক্তির উত্থান ১৭৩
৭. মোগল সংস্কৃতি ও তার বিস্তৃতি ১৯৮
৮. ইসলাম এবং পূর্ববঙ্গের কৃষিব্যবস্থা ২৩৬
৯. পল্লী দৃশ্যপটে মসজিদ ও দরগা ২৭৪
১০. বাংলায় ইসলামের মূল বিস্তার ৩১৭
উপসংহার ৩৬১

পরিশিষ্ট ১

মুসলমান শাসনকালে (১২০৪-১৭৬০)
টাকশাল শহর ও খোদাইলিপির স্থান ৩৭৩

পরিশিষ্ট ২

বাংলার গুরুত্বপূর্ণ শাসকবৃন্দ (১২০৪–১৭৫৭) ৩৭৯

চিত্র

চিত্র ১ মুহাম্মদ বখতিয়ারের স্বর্ণমুদ্রা ৫৮
চিত্র ২ আলী মর্দানের রৌপ্যমুদ্রা ৫৯
চিত্র ৩ সুলতান ইলতুতমিশের রৌপ্যমুদ্রা ৫৯
চিত্র ৪ ছোট পান্ডুয়ার মিনার ৬০
চিত্র ৫ জাফর খানের মসজিদ, ত্রিবেনী ৬১
চিত্র ৬ আদিনা মসজিদ, ভিতর দিকের পশ্চিমের ওয়াল ৬৮
চিত্র ৭ পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, পশ্চিম দিকের বাইরের ওয়াল ৬৯
চিত্র ৮ তাক-ই-কিসরা ৭০
চিত্র ৯ পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদে রাজকীয় ব্যালকনি ৭১
চিত্র ১০ পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদে রাজকীয় দরজার উপরের লিনটেল ৭৩

চিত্র ১১ ১৪২১ সালে মুদ্রিত সুলতান জালালউদ্দিনের বিশালাকার স্মারক রৌপ্যমুদ্রা ৮৬
চিত্র ১২ পাণ্ডুয়ার একলাখী সমাধি সৌধ ৮৮
চিত্র ১৩ গৌড়ের লাত্তান মসজিদ ৮৯
চিত্র ১৪ গৌড়ের নগরদুর্গের দাখিল দরজা ১৩০
চিত্র ১৫ গৌড় নগরদুর্গের বিধ্বস্ত, দাখিল দরজা থেকে দেখা ১৩১
চিত্র ১৬ মনসা দেবীর প্রস্তর ভাস্কর্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর, নম্বর ৬৫৭ ১৪০
চিত্র ১৭ মনসা দেবীর প্রস্তর ভাস্কর্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর, নম্বর ৬৫৯ ১৪১
চিত্র ১৮ সম্রাট শাহজাহানের সম্মানে ধর্মীয় সম্মেলন ২০০
চিত্র ১৯ সাতগম্বুজ মসজিদ, ঢাকা ২১৩
চিত্র ২০ লালবাগ দুর্গ, ঢাকা ২১৪
চিত্র ২১ আতিয়া মসজিদ, টাঙ্গাইল (১৬০৯) ২১৫
চিত্র ২২ ১৭৫৯ সালে স্থাপিত ফটিকছড়ি থানার সুন্দরপুরের বাঁশের বেড়ার মসজিদ ২৮৯
চিত্র ২৩ ১৭২০ সালে স্থাপিত সাতকানিয়ার লোহাগড়ায় বাঁশের বেড়ার মসজিদ ২৯০
চিত্র ২৪ ১৭৬৬ সালে স্থাপিত হাটহাজারীর দাবনার বাঁশের বেড়ার মসজিদ ২৯১

মানচিত্র

মানচিত্র ১ প্রথম দিকের বাংলার সাংস্কৃতিক অঞ্চলসমূহ ২৬
মানচিত্র ২ মুসলিম শাসনের সম্প্রসারণ ১২০৪-১৭৬০
(ক) ১২০৪–১৩৪২: সুবেদার (গভর্নর) বলবনী শাসক
শামসউদ্দিন ফিরোজ এবং উত্তরসুরিবৃন্দের আমলে ৪৭
(খ) ১৩৪২–১৪৩৩: ইলিয়াস শাহী ও রাজা গণেশের
রাজবংশের আমলে ৪৮
(গ) ১৪৩৩–১৫৩৮: পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ইলিয়াস শাহী
আবিসিনীয় রাজা ও হোসেন শাহী অমলে ৪৯
(ঘ) ১৫৩৮–১৭৬০: আফগান ও মোগল আমলে ৫০
মানচিত্র ৩ ১৮৭২ সালে বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যার অবস্থান ১৫৬
মানচিত্র ৪ মোগল যুগে বাংলা ১৭৫
মানচিত্র ৫ বাংলার নদীসমূহের গতির পরিবর্তন ২৩৮-২৩৯
মানচিত্র ৬ সরকার চট্টগ্রামে মুসলমান প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্প্রসারণ ১৬৬৬-১৭৬০ ২৯২
মানচিত্র ৬ (চলমান) ২৯৩

টেবিল

টেবিল ১ ৯৪
টেবিল ২ ১১৫
টেবিল ৩ ২২৭
টেবিল ৪ ২৪১
টেবিল ৫ ২৪২
টেবিল ৬ ২৮৮
টেবিল ৭ ৩১১
টেবিল ৮ ৩১১
টেবিল ৯ ৩২৯

অনুবাদকের কথা

আশেপাশে কোন মুসলমান প্রাধান্যপূর্ণ দেশ না থাকা সত্ত্বেও ইসলামের সূতিকাগার আরব দুনিয়া থেকে অনেক দূরে অবস্থিত বাংলাদেশ কেন ব্যাপকভাবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ তা নিয়ে অনেকের মধ্যেই প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। অধিকন্তু এক সময়ে পুরো ভারতীয় উপমহাদেশই মুসলমান শাসনাধীনে থাকা সত্ত্বেও রাজধানী দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি এলাকায় মুসলমান প্রাধান্য সৃষ্টি হয়নি, অথচ প্রত্যন্ত একটি এলাকায় ইসলামের এভাবে বিকাশ কেন হয়েছে, তাও একটি বড় প্রশ্ন হিসেবে বিরাজ করছে। এমনকি বাংলায় মুসলমান শাসনযুগের প্রথম দিককার রাজধানীগুলোতে কেন মুসলমানরা তেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, তার জবাবও তেমনভাবে মেলেনি। তাছাড়া বাংলাভাষী হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা কেন, তাও একটা প্রশ্ন। এসব প্রশ্নের জবাবও দেওয়ার অনেক চেষ্টা চালানো হয়েছে। নানা সময়ে অনেক বিশেষজ্ঞ এ সম্পর্কে তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেছেন। সব বক্তব্যই যেমন পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হয়নি আবার সেগুলি একেবারে ভিত্তিহীনও নয়। কিন্তু তারপরও বেশ ফাঁক দেখা যায়। এই প্রেক্ষাপটেই বর্তমান গ্রন্থটির আত্মপ্রকাশ। লেখক সম্পূর্ণ নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে গ্রন্থটি সাজিয়েছেন, তা হয়তো নয়। কিন্তু সার্বিক পরিবেশনাটি অবশ্যই অভিনব।

লেখক বলতে চেয়েছেন, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আগে এখানকার মানুষ প্রচলিত কোন ধর্মেরই অনুসারী ছিল না। তারা হয়তো সর্বপ্রাণেশ্বরবাদ জাতীয় কোন কোন ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল, কিংবা ধর্মীয় রীতিনীতির সাথে সেভাবে পরিচিতও ছিল না। মুসলমানদের আগমনের আগে এই অঞ্চলে বৌদ্ধ, হিন্দু ধর্মাবলম্বী শাসকদের শাসন জারি ছিল। এসব শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় উল্লিখিত ধর্মসমূহের উপাসনাগৃহও নির্মিত হয়েছে। অনেক শাসক তাদের ধর্মমত প্রচারের জন্য নানা কর্মসূচিও গ্রহণ করেছিল। কিন্তু নানা কারণে তা সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি বা পৌছায়নি। এমনকি পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম, কামরূপ প্রভৃতি এলাকায়ও হিন্দু ধর্ম এবং বার্মায় বৌদ্ধ ধর্ম বিকশিত হলেও বর্তমানে বাংলাদেশ হিসেবে পরিচিত অঞ্চলটিতে হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্ম, কোন ধর্মই গণমানুষের কাছে পৌছেনি। ফলে গ্রন্থভিত্তিক ধর্মের গণ্ডির বাইরে থেকে যায় এখানকার মানুষ।

এমন এক প্রেক্ষাপটে কাকতালীয়ভাবে কয়েকটি ঘটনা ঘটে যায়। একদিকে প্রাকৃতিক কারণে এখানকার গুরুত্বপূর্ণ গঙ্গা নদীর প্রধান প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তিত

হয়ে যায়। ফলে বাংলার প্রাচীন নগরীগুলো বিরান হতে থাকে। অন্যদিকে নতুন নতুন উর্বরা জমির সৃষ্টি হতে থাকে। ঠিক এমন সময়েই বাংলায় মুসলমান শাসনামল শুরু হয়। ত্রয়োদশ শতকের শুরুতেই ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার বাংলা বিজয় করেন। তারপর সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায় বাংলা এবং ঢাকা হয় বাংলা সুবার রাজধানী। নতুন ভূমির উর্বরা মাটিতে যেমন প্রচুর ফসল ফলতো, তার সাথে তাল মিলিয়ে জনসংখ্যারও বৃদ্ধি ঘটে, তেমনি নতুন ধর্মবিশ্বাসের বিকাশের জন্যও সময়টি ছিল অত্যন্ত অনুকূল। ঠিক সে সময়ে যে ধর্মেই ডাক দেওয়া হতো, সাধারণ মানুষ তাই গ্রহণ করতো। এই সময়টাতেই প্রথমে তুর্কী, আফগান বা পাঠানরা আসে এবং তারপর মোগলদের আগমন ঘটে। আর তার ফলেই নতুন ভূমিতে ইসলামের বিকাশ ঘটে।

মোগলরা নিছক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকেই মনোযোগ দিয়েছিল। ধর্ম প্রচার ও প্রসারের কোনই ইচ্ছা বা পরিকল্পনা তাদের সাধারণভাবে ছিল না। বলপূর্বক ধর্মান্তরের কোন কিছু করার প্রশ্নই ছিল না। শাসকরা এদেশে ইসলাম প্রচার করেনি। তবে অর্থনৈতিক ভিত্তি সুসংহত করতে গিয়েই মোগলরা এমন কিছু করে যা পরবর্তীকালে এদেশের সাধারণ মানুষকে ইসলাম ধর্মের অনুসারী করে ফেলে। মোগল প্রশাসনের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের উচ্চবর্ণের সদস্যদের। পূর্ববঙ্গে সৃষ্ট নতুন ভূমিতে গড়ে উঠা জমিদারিগুলো সংগ্রহে তারাই সুবিধা পেতো বেশি। কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে এ সময়ে মুসলমান উদ্যোক্তা শ্রেণী আত্মপ্রকাশ করে। জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম অঞ্চলগুলোতে চাষাবাদের জমি প্রস্তুতের কাজে তারাই নেতৃত্ব দেয়। সাধারণভাবে তাঁরা প্রচলিত অর্থে কোন পীর-দরবেশ ছিলেন না। তাঁরাও তেমনভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচারে আগ্রহী ছিলেন না। অধিকন্তু তাঁরা স্থানীয় অধিবাসীদের ধর্মমতের বিরোধীও কোন কাজ করেননি। কিন্তু তবুও তাঁরা মুসলমান হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের জন্য মসজিদ, মাদরাসা, দরগা, খানকা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামের বিভিন্ন দিকগুলো সম্পর্কে স্থানীয় মানুষদের সচেতন বা অসচেতনভাবে অবহিত করতে থাকেন। এগুলোই পরোক্ষভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় মানুষ ইসলামকে তাদের নিজস্ব ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী কিছু মনে করেনি। বরং তারা এটাকে আগে থেকে সেখানে অনুসৃত নিজেদের ধর্মেরই একটি বিশেষ রূপ হিসেবে বিবেচনা করেছে এবং নিজেদের অজান্তেই এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে হাজি শরিয়তুল্লাহ'র ফরায়েজি আন্দোলনের মতো নানা সংস্কার আন্দোলনের ফলে তারা মুসলমান হিসেবে পরিচিতি দান করতে থাকে।

লেখক নিজের মত প্রতিষ্ঠায় প্রচলিত অনেক ধারণারই অপনোদন করেছেন। এই গ্রন্থে মুসলমান শাসকদের প্রলোভনে, হিন্দু ধর্মের বর্ণবাদী নীতির প্রতিবাদে,

জবরদস্তিমূলকভাবে চাপিয়ে দেওয়া ইত্যাদি প্রচলিত মতবাদের খণ্ডন করা হয়েছে। অধিকন্তু লেখক মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন অসার ভিত্তিহীন অভিযোগও বাতিল করে দিয়েছেন দৃঢ়ভাবে। মোগলদের শাসন প্রণালী সম্পর্কিত পশ্চিমা অভিযোগ ও দায়িত্বহীন মন্তব্যও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এখানে। তাছাড়া বলা হয়ে থাকে, বৃটিশদের বৈরী শাসনের ফলে এদেশের মুসলমানরা ঈমান, আকিদা ভুলে গিয়েছিল। ফরায়েজিসহ সংস্কার আন্দোলনগুলো তাদেরকে মূলে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু লেখক যুক্তি প্রদর্শন করেন, এদেশের মানুষ সেই অর্থে মুসলমান ছিল না। বরং ফরায়েজি প্রভৃতি আন্দোলনের মাধ্যমে এদেশে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম ধর্মের সূচনা হয়। তাছাড়া পূর্বকালের পীর-দরবেশ বলতে এখানকার সাধারণ ধারণা হচ্ছে, তারা জিহাদ করতো এবং কাফের বা বিধর্মীদের পাইকারিভাবে নিধন করতো, তাদের উপাসনাগুলো ধ্বংস করতো এবং বাকি সময় খানকায় কাটাতো। কিন্তু লেখক জোর দিয়ে বলেছেন, এদেশে যারা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সাথে প্রথমদিকে সংযুক্ত ছিলেন, তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত উদ্যমী ও সাহসী পুরুষ। তাঁরা নতুনকে জয় করার দুর্বার নেশায় ছিলেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমেই এদেশটি সুজলা, সুফলা বাংলাদেশ হতে পেরেছে। এমনকি তাঁদের অনেকে নিজেদের পীর বা ধর্মীয় নেতা হিসেবে পরিচিতিও দেননি। বরং তাঁর বংশধর এবং অনেক সময়ে যারা তাঁর নেতৃত্বে কাজ করেছিল, তাঁরাই তাঁকে পীর, দরবেশ বা এ জাতীয় সম্মানে ভূষিত করেছে। তাঁরা এখানকার মানুষের দৈনন্দিন পার্থিব সমস্যাবলী সমাধানের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছিলেন।

লেখক দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, মুসলমান শাসকরা কখনোই হিন্দু বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর জবরদস্তি করেনি। মোগলসহ মুসলমান শাসকরা ছিল অত্যন্ত উদার, রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে গেছেন। তাঁদের ব্যক্তিগত ধর্মমত কখনো প্রজাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেননি। এমনকি কোন মন্দিরও ভাঙ্গেনি। যদি মন্দির ভাঙ্গার কোন ঘটনা ঘটে থাকে, তবে তা ছিল নিছক রাজনৈতিক, ধর্মীয় নয়। এক্ষেত্রে বাংলায় একটি মন্দির ভাঙ্গার আসল কারণ সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন লেখক।

মুসলমান শাসকদের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির প্রতিফলন পড়েছিল প্রশাসনের সর্বস্তরে। ফলে নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা, এমনকি জমিদারগণও, ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস যাই হোক না কেন, অন্য ধর্মের অনুসারীদের প্রতি সম্মান দেখাতেন এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশে সহায়তা করতেন। এ কারণেই পূর্ববঙ্গে জমিদার শ্রেণীর বড় অংশ হিন্দু হলেও মসজিদ ও দরগা প্রতিষ্ঠায় সমস্যা হয়নি। তাছাড়া সাম্প্রদায়িক সহাবস্থান ছিল দৃষ্টান্তমূলক। নিজ নিজ ধর্মে নিষ্ঠাবান অনুসারী থেকেও তাঁরা অন্য ধর্মের প্রতি কোন ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি।

তবে এটাও ঠিক এই পুস্তকটিই বাঙালি মুসলমানের উত্থানের চূড়ান্ত ইতিহাস নয়। বরং একে বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসের একটি দিকের ব্যাখ্যা হিসেবেও গ্রহণ করা যেতে পারে। এটি আরো আলোচনা-পর্যালোচনার একটি উৎস হতে পারে। আরো অনেক ধারণার একটি হিসেবেই একে বিবেচনা করা উচিত।

তাছাড়া এটাও মনে রাখতে হবে ইতিহাসের কোন স্থির রূপ নেই। প্রতিনিয়তই তা পাল্টাতে থাকে। সেই পাল্টানোই তার প্রাণের লক্ষণ। এজন্যই এখনো ইতিহাস চর্চা হচ্ছে। এক সময়ে যা ছিল সর্বজনস্বীকৃত ভাষ্য, পরবর্তীকালে তা মিথ্যা হতেও দেখা যায়। তাছাড়া বিশেষভাবে এদেশ ও দেশবাসী সম্পর্কে গৎবাঁধা ইতিহাস লেখার প্রবণতা দীর্ঘদিনের। যে তথ্য ও তত্ত্বগুলো বিরাজ করছে, সেগুলোকেই অকাট্য বিবেচনা করে তার উপর প্রলেপ লাগানোর প্রয়াস প্রায়ই দেখা যায়। 'ক'-এর পর 'খ' থাকলে তারপর 'গ' থাকবেই, তাই ধরে নেওয়া হয়। অথচ এক সময়ে ভিন্ন কিছুও যে থাকতে পারে, তা নিয়ে কিছু বলতে গেলেই বাঁধে হৈ চৈ। কিন্তু 'ক' এবং 'খ' -এর পর 'গ' ঘটনার আকস্মিকতায় কিংবা দৃষ্টিক্ষীণতায় বা কোন মতলববাজ বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য এনে থাকতে পারেন, তা বোঝার চেষ্টা অনেক সময়েই করা হয় না। তবে অতীতে করা হয়নি বলে তা আর করা হবে না, তা নয়।

আর এ কারণেও নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রেরণা জাগে। কোন্‌টা ভুল ইতিহাস এবং কোন্‌টা সত্যিকারের ইতিহাস তাও জানতে হবে। কোন কোনটাকে কঠিনভাবে ভুল হিসেবে উত্থাপন করাও যৌক্তিক নয়। কোন দরজাই বন্ধ করা উচিত নয়। অতীতে ঘটে যাওয়ার বিবরণই ইতিহাস। কিন্তু যাদের নিয়ে সেই ঘটনাগুলো বিবর্তিত হচ্ছে, তারা কেউই প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নেই। কিন্তু তাই বলে কেউই নিজের পছন্দমতো ছক অনুযায়ী অতীতের গল্প বানিয়ে তথ্যের টুকরাগুলোকে ইচ্ছেমতো সাজিয়ে নেওয়ার অধিকারও রাখেন না। আর সেক্ষেত্রে তা 'ইতিহাস' থাকে না। হয়ে যায় নিছক গালগল্প। ইতিহাস গায়ের জোরে রচনা করা যায় না। প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণের সঙ্গে অস্তিত্বশীল ঐতিহাসিক গবেষণার প্রামাণিক ভিত্তির সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। এই সম্পর্ক নির্মাণ একটি জরুরি কাজ। এই জরুরি কাজেরই একটি ভিত্তি হলো এই গ্রন্থটি।

অধিকন্তু এই পুস্তকটি পাঠের সময়ে মনে রাখতে হবে, একজন পশ্চিমা লেখক বাঙালি মুসলমানের ইতিহাস লিখেছেন। তিনি নিজে মুসলমান নন। তাই ইসলাম সম্পর্কে তার অনেক মন্তব্যের সাথে একমত হতে না পারাটাই স্বাভাবিক। তিনি নিজের ভাষাতেই বলেছেন, কয়েক শ্রেণীর পাঠকের কথা মনে রেখে তিনি এটি রচনা করেছেন। মধ্যপ্রাচ্য, উপমহাদেশ, বাঙালি সব স্থানের অধিবাসী এবং মুসলমানরা গ্রন্থটি নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠ করবে। সেই সাথে 'নিরপেক্ষ' লোকও তা পড়বে। সবাই যাতে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে লেখকের সেদিকে নজর ছিল নিঃসন্দেহে।

লেখক নিজেই তা বলেছেন এভাবে: এই পুস্তকটি লেখা হয়েছে বেশ কয়েক ধরনের লোকের কথা মনে রেখে। দক্ষিণ এশিয়ায় যারা মনে করেন উপমহাদেশে ইসলামের ইতিহাস মানে দুরন্তবেগে অবিমিশ্র 'বিদেশি' অনুপ্রবেশ, এই সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে কিভাবে এই ধর্মটি উপমহাদেশে ইরানী-তুর্কী সভ্যতাকে সাথে নিয়ে এসেও প্রাক-আধুনিক বাংলার সাংস্কৃতিক মানচিত্রে স্থানীয়তে পরিণত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের যারা ইসলামের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ভরকেন্দ্র হিসেবে নীল ও অক্ষু নদীর মধ্যবর্তী স্থানকে বোঝেন, এই গ্রন্থটিতে দেখানো হয়েছে, কিভাবে এবং কেন মধ্যযুগের শেষভাগে ইসলামী সভ্যতা মধ্যপ্রাচ্যের 'পশ্চাদভূমির' মতো বাংলার 'পরিমণ্ডলে' এতো গতিশীল ও সৃষ্টিশীল হলো। এতে আরো দেখানো হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের চেয়ে কেন এতো বেশি মুসলমান সেখানকার বাইরে বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাস করে। পরিশেষে, এই সমীক্ষায় পশ্চিমা পাঠকদের কাছে পৌছানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যারা মনে করেন, ইউরোপমুখী, ইউরোপ সাংস্কৃতিক বলয়ে একটি 'জঙ্গি' ধর্ম হিসেবে ইসলামের তাৎপর্যপূর্ণ সম্প্রসারণ-আরো অনেক কিছুর মতো একটি সাংঘর্ষিক বিষয়। আমি বলছি, ভারতেই ইসলামের সম্প্রসারণ অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ইউরোপীয়ান বা জুডিও-খ্রিস্টান বিশ্বের চেয়ে এখানেই তারা অনেক বেশি অপরিচিত বিষয়ের মুখোমুখী হয়েছিল। সেই মুখোমুখীতে তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল অনেক বেশি সৃষ্টিশীল, এবং অন্তত, বাংলায় ইসলামী ও স্থানীয় সংস্কৃতির মিলনে ব্যতিক্রমধর্মী এক জনসংখ্যা বিকাশের পথ করে: গঠিত হয় বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জাতিগত সম্প্রদায়। এই গ্রন্থটি সেই মোকাবেলা এবং তার অনন্যসাধারণ পরিণতি সংক্রান্ত।

বিশেষজ্ঞগণ বলে থাকেন, একটি গ্রন্থ (বিশেষ করে ইতিহাস বিষয়ক) তখনই সার্থক হয়, যদি তা পাঠকের মনে সে বিষয়টি জানার প্রতি আরো আগ্রহের সৃষ্টি করে, প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে শ্রেণীবিন্যাসে সাহায্য করে এবং সে সম্পর্কে তারা মনে মোটামুটি একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটি সেই লক্ষ্যেই রচিত।

এই গ্রন্থে আমি মোটামুটি শাব্দিক অনুবাদের উপরই জোর দিয়েছি। কোন রদবদল কিংবা আমার ব্যক্তিগত ধারণা প্রতিফলনেরও কোন প্রয়াস ছিল না। তবে কতটুকু সফল হয়েছি, তা পাঠকই বিচার করবেন। প্রচলিত ভাষায় কাজটি সম্পন্ন করার প্রয়াস চালিয়েছি। তারপরও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পাঠক তা ক্ষমা করবেন বলেই আশা করছি। মূল পাঠ অক্ষুণ্ন রেখে দু একটি জায়গায় বন্ধনীর ভেতর কিছু মন্তব্য জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

পুস্তকটি প্রকাশে এগিয়ে আসার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশকে অবশ্যই মোবারকবাদ জানাই। সেই সাথে প্রতিষ্ঠানটির অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের উপ-পরিচালক জনাব মুহাম্মদ আবদুল হক যেভাবে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে

আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ রেখেছেন, তা শুধু ধন্যবাদ জানিয়েই শেষ করা যায় না। তাছাড়া গ্রন্থটির ব্যাপারে আমাকে প্রথম অবহিত করেন কবি-সাংবাদিক জনাব আহমদ আখতার। তাকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি। দৈনিক সংগ্রামে আমার সহকর্মী জনাব মুহাম্মদ নুরুল হুদা অত্যন্ত কষ্ট করে গ্রন্থটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তাকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি। অধিকন্তু অনুবাদের এই কঠিন ও জটিল কাজটি যাতে সাবলীলভাবে সম্পন্ন করতে পারি, সে ব্যাপারে আমার সহধর্মিণী সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। সংসারের অনেক ঝামেলা থেকে অব্যাহতি দিয়ে আমাকে কাজটি অব্যাহত রাখার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাঁর এই আন্তরিক সহযোগিতার কারণেই দ্রুত কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর কাছেও আমি অপরিসীম কৃতজ্ঞ। এ ছাড়াও আরো অনেকে আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদেরকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি।

-হাসান শরীফ

লেখকের* কথা

বর্তমান সৃষ্টিকর্মটি প্রস্তুতির বিভিন্ন পর্বে গত দশকে বা তারও বেশি সময় ধরে যারা আমাকে মূল্যবান সহযোগিতা দিয়েছেন আমি তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ১৯৮০-র দশকের প্রথমদিকে নর্থ ক্যারোলিনার রিসার্চ ট্রায়াঙ্গেল পার্কে ন্যাশনাল হিউমেনিটিজের ফেলো থাকার সময়ে গ্রন্থটির ধারণা প্রথম দানা বেঁধে ওঠে। ১৯৮১ সালের শরৎকালে এবং ১৯৮২ সালের বসন্তকালে ঢাকাস্থ আমেরিকান কালচারাল সেন্টারের মাধ্যমে প্রাপ্ত আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ান স্টাডিজ এবং ফুলব্রাইট-হেইজ ট্রেনিং গ্র্যান্টের ফেলোশিপ আমাকে ভারত ও বাংলাদেশে মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানমূলক কাজ সম্পন্ন করার সুযোগ করে দেয়। ১৯৮৪ সালের শরৎকালে ইউনিভার্সিটি অব অরিজোনা হিউমেনিটিজের ফেলোশিপের ফলে আমি আরো গবেষণার জন্য ঢাকায় ফিরি এবং ১৯৮৫ সালের বসন্তে জেরুযালেমে ইনস্টিটিউট ফর এডভান্সড স্টাডিজের ফেলোশিপের মাধ্যমে আমি তথ্য বিশ্লেষণ শুরু করি। ১৯৮৭ সালের বসন্তে প্যারিসের ইকোল ডেজ হাউটস ইটিডেজ এন সায়েন্স সোসিয়েল-এ থাকার সময়ে আমি পাণ্ডুলিপি নিয়ে কাজ করার সুযোগ পাই এবং ১৯৮৮-৮৯ সালে ইউনিভার্সিটি অব অরিজোনা থেকে গবেষণার জন্য ছুটিতে থাকার সময়ে আমি লেখালেখির বড় অংশটি সম্পন্ন করি। আমার ভ্রমণে অর্থায়ন, আমার অন্যান্য ব্যবস্থা সহায়তা করা, এবং সাধারণভাবে আমার গবেষণার দরজা খুলে দেওয়ার জন্য আমি উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলোর তদানিন্তন পরিচালকবৃন্দ ও কর্মকর্তাদের বিশেষভাবে আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ান স্টাডিজের পি. আর মহেনডিরাত্তা ও তরুণ মিত্র, আমেরিকান সেন্টারের আহমেদ মোস্তফা, ন্যাশনাল হিউমেনিটিজ সেন্টারের উইলিয়াম বেনেট, ইনস্টিটিউট ফর এডভান্সড স্টাডিজের নেহেমিয়া লেভটজিয়ন, এবং ইকোল ডেজ হাউটস ইটিডেজ এন সায়েন্স সোসিয়েলের মার্ক গ্যাবোরিয়েউকে ধন্যবাদ জানাই।

অনেক গ্রন্থাগারিক ও স্টাফ প্রতিষ্ঠানগুলোতে থাকা গ্রন্থের প্রামাণ্য ভিত্তিতে আমাকে সরবরাহে উদার সহযোগিতা না করলে আমি কখনো এই প্রকল্পটি সম্পন্ন করতে পারতাম না। বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিচ্ছি বৃটিশ লাইব্রেরি ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, লন্ডন; বোলডিয়ান লাইব্রেরি, অক্সফোর্ড; বিবলিওথেক ন্যাশনাল, প্যারিস;

* লেখক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টাকসনের অরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক।

ন্যাশনাল আরকাইভ অব ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লী; আলিগড় মুসলিম লাইব্রেরি, খোদাবক্স অরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরি, পাটনা; ন্যাশনাল লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি, ও ওয়েস্ট বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট, কলকাতা; বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, রাজশাহী; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি ও বাংলা একাডেমী, ঢাকা; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর; এবং মুসলিম সাহিত্য সংসদ, সিলেটকে। আমার গবেষণার সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা কালেক্টরেটে সংরক্ষিত মোগল দলিলদস্তাবেজ পরীক্ষা করার সুযোগ প্রদানের জন্য আমি বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী জালালউদ্দিন আহমেদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

গ্রন্থটিতে ব্যবহৃত ছবিগুলো সরবরাহের জন্য আমি ক্যাথেরিন আসগর (চিত্র ৬) এবং স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন এবং তাদের ফটোগ্রাফার চার্লস র‍্যান্ডকে (চিত্র ১) ধন্যবাদ জানাই। আমার নিজস্ব ছবির জন্য অনুমতি প্রদানের জন্য আমি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতার জি. এস ফরিদকে (চিত্র ২, ৩, ১১), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের শামসুল হোসেনকে (চিত্র ১৬, ১৭), এবং চট্টগ্রাম জেলা কালেকটরেটের ওমর ফারুক ও এ. আর. খানকে ধন্যবাদ জানাই।

এই গ্রন্থের অনেক বিষয়বস্তু গ্রন্থটির বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমার উপস্থাপিত বক্তৃতাগুলোতে প্রথমে প্রকাশ করি। এগুলো হয়েছিল ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটিতে, পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, ওহিও স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে, অরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে, রাটজার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে, উটরেচট বিশ্ববিদ্যালয়ে, লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্যারিসের সেন্টার ডি'ইটুডেস ডি এন'ইনডে এট ডি এল'এশিয় দু সুদে, হেডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে, কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে, উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে, অস্টিনের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে, অরিজোনা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে, পমোনা কলেজ ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। যেসব সুবিজ্ঞ সহকর্মী সেইসব লেকচারে উপস্থিত ছিলেন এবং যারা উদারভাবে মন্তব্য করেছিলেন ও পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই গ্রন্থের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার যেসব সহকর্মীর সাথে মত বিনিময় করেছি, এবং যার ফলে আমি অনেক বেশী উপকৃত হয়েছি, তাদের সবার প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে উল্লেখ করছি উইল ব্যাটসন, এলাইন স্ক্যারি, পিটার বারটোসি, রালফ নিকোলাস, মোজাফফর আলম, শিরিন মুসভি, পল জ্যাকসন এস. জে. রজত রায়, গৌতম ভদ্র, জগদীশ নারায়ণ সরকার, এম. আর. তরফদার, সিরাজুল ইসলাম, পারভীন হাসান, কমলাকান্ত গুপ্ত, থেরেসে ব্লাচেট, ফ্রেঞ্চ ভট্টাচার্য, ডেল আইকেলম্যান, আন্দ্রে উইনক, অনুপম সেন, আবদুল করিম, জন ভল, ইউহান ফ্রেডম্যান, ডেভিড শুলমান, মার্ক গ্যাবোরিউ, সুশীল চৌধুরী, অসীম রায়, ম্যারিলিন ওয়াল্ডম্যান, টনি স্টুয়ার্ট, কার্ল আর্নেস্ট, পরলোকগত এস. এইচ. আসকারি,

পরলোকগত সুকুমার সেন ও পরলোকগত হিতেশরঞ্জন সন্যাল। আমার যেসব বন্ধু ও সহকর্মী পাণ্ডুলিপিটির খসড়া পুরোপুরি কিংবা আংশিকভাবে পড়েছে এবং মূল্যবান মন্তব্য ও পরামর্শ দিয়েছে, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এদের মধ্যে রয়েছেন মিমি ক্লাইম্যান, ক্যালি উইলিয়ামসন, নরম্যান ইউফি, মার্গারেট কেস, রফিউদ্দিন আহমেদ, ক্যারল স্যালোমন, ধর্ম কুমার ও বারবারা মেটকাফ। অবশ্য এই গবেষণায় যেসব ঘাটতি আছে, তার সব দায়দায়িত্ব আমার একার।

একাডেমিক বহির্ভূত পন্থায় আরো অসংখ্য বন্ধু আমাকে সহায়তা করেছেন এবং আমি তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এদের মধ্যে আমি আনন্দের সাথে উল্লেখ করছি অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট, বরিশালের ফাদার জি. এম টরানগেউ ও যোশেফ সরকার, তারা আমাকে ভাটির বঙ্গের ভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন; জিম ও নওমি নোভাক, যারা যখনই আমি ঢাকায় গিয়েছি, তখনই আমাকে আন্তরিক উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন; জ্যাঁ "ভ্যান" প্যাক্সটন, যিনি সাহসিকতার সাথে প্রতিলিপি করার মাধ্যমে আমার প্রথমদিকের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করেছেন; এবং ট্যাড পার্ক, যিনি একাধিকবার কম্পিউটারের নিদারুণ সংকটের সময়ে আমাকে উদ্ধার করেছেন। পরিশেষে, আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি ভক্ত বন্ধু পুস্পকে, যিনি আমার পায়ের কাছে গুটিয়ে ছিলেন, পরবর্তী অধ্যায়গুলো লিখতে বিশ্বস্ততা ও সহায়কভাবে সাহায্য করেছেন।

–রিচার্ড এম. ইটন

সূচনা

১২৪৩-৪৪ সালের কোন এক সময়ে, বাংলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় নগরী লক্ষ্ণৌতির বাসিন্দারা সেখানে চল্লিশ বছর আগে সংঘটিত নাটকীয় ঘটনাবলী সম্পর্কে সফররত জনৈক ঐতিহাসিককে অবহিত করেন। উক্ত ঐতিহাসিক অবগত হন, কয়েকশত তুর্কী অশ্বারোহী দ্রুতবেগে গাঙ্গেয় সমভূমি দিয়ে বঙ্গীয় বদ্বীপের দিকে অগ্রসর হন। মুহাম্মদ বখতিয়ার নামক এক দুঃসাহসী সেনাপতির নেতৃত্বাধীন তুর্কীরা শান্ত ও উদার হিন্দু রাজার শাসনাধীন বদ্বীপটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় অংশের দিকে ধাবিত হওয়ার আগে পার্শ্ববর্তী বিহারের অরক্ষিত বৌদ্ধ বিহারগুলোতে অভিযান পরিচালনা করে। অশ্ব ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে বখতিয়ার এবং তার লোকেরা রাজধানী নদীয়া পৌঁছে যায়। অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তারা সোজা রাজপ্রাসাদের দিকে ধাবিত হয় এবং সেখানে তারা অস্ত্র বের করে প্রহরীদের সাথে লড়াই করে। তখন মাত্র মধ্যাহ্নভোজে বসা হিন্দু রাজা আকস্মিক এই ঘটনায় পুরোপুরি হতবিহ্বল হয়ে পড়েন এবং খিড়কি দরজা দিয়ে তার কয়েকজন সভাসদকে নিয়ে রাজধানী পুরোপুরি ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে তার জঙ্গলাকীর্ণ পশ্চাৎভূমিতে পালিয়ে যান।[১]

এই অভ্যুত্থান পাঁচ শতাধিক বছর স্থায়ী এমন এক সূচনা করেছিল যাতে বাংলার অধিকাংশ এলাকা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী শাসকদের মাধ্যমে পরিচালিত হতো।

এই ঘটনা স্বতন্ত্রভাবে ব্যতিক্রম কিছু নয়, কারণ প্রায় একই সময় থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সার্বভৌম মুসলমান শাসকরা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রায় পুরোটাই শাসন করতেন। অবশ্য, ব্যতিক্রম হলো ভারতের অভ্যন্তরীণ প্রদেশগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র বাংলাতেই অঞ্চলটি মোটামুটিভাবে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের মোট আয়তনের

---

১. Maulana Minhaj-ud-Din Abu'l-'Umar-i- 'Usman, *Tabakat-i-Nasiri: A General History of the Muhammadan Dynasties of Asia, Including Hindustan* (810-1260), trans. HG Raverty (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1881; reprint, New Delhi: Oriental Books Reprint, 1970), 1 : 557-58. মিনহাজের এই বর্ণনা গুরুত্বপূর্ণ এই ঘটনাটির সর্বপ্রাচীন ভাষ্য। এই সম্ভাবনাও আছে যে, ইতিহাসবেত্তার কাছে তথ্য প্রদানকারীদের কেউ কেউ তাদের বর্ণনার প্রত্যক্ষদর্শীও ছিল; তাদের কেউ কেউ তাতে ভালমতো অংশগ্রহণও করে থাকতে পারে।

নদীয়াকে সম্ভবত নওদাহ'র সাথে চিহ্নিত করা হয়েছে, এই গ্রামটি রাজশাহী জেলার পশ্চিমে রোহানপুর রেলওয়ে স্টেশনের কয়েক মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। দেখুন, Abul Kalam Muhammad Zakariah, 'Muhammad Bakhtiyar's Conquest of Nudiah,' *Journal of the Varendra Research Museum* 6 (1980-81): 57-72.

সমান স্থানীয় বাসিন্দাদের অধিকাংশ সদস্য শাসক শ্রেণীর ধর্ম ইসলামকে গ্রহণ করেছিল। এটা ছিল চরম পরিণতিসূচক ও বিস্ময়কর ঘটনা হিসেবে প্রমাণিত, কারণ মুসলমান জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারতকে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টি করে। বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলো নিয়ে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অধীনে থাকে। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ১৫২ মিলিয়ন বাঙালির মধ্যে প্রায় ৯৩ মিলিয়ন ছিল মুসলমান এবং বাংলাদেশের মোট প্রায় ৯৬.৫ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে ৮১ মিলিয়ন বা ৮৩ শতাংশ মুসলমান; বাস্তবিকই, বাঙালিরা বর্তমানে আরবদের পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলমান জনগোষ্ঠী।[২] এই ঘটনাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? আরো নির্দিষ্ট করে বললে, বাংলায় এতো বিশাল সংখ্যক মুসলমানের আত্মপ্রকাশ ঘটলো কেন-ঐতিহাসিকভাবে মুসলমানদের বিকাশভূমি মধ্যপ্রাচ্য থেকে এতদূরে অবস্থানের পরও এবং ভারতের অন্য কোন অঞ্চল নয় কেন? আবার বাংলার মধ্যে পশ্চিমাংশের তুলনায় পূর্বাংশে কেন ইসলামীকরণের হার এতো বেশি ছিল? কে ধর্মান্তরিত করলো এবং কেন? কোন্ সময়ে? সমসাময়িক বাঙালিদের কাছে 'ধর্মান্তরকরণ' যদি হয়ে থাকে, বলতে কি মনে হয়েছে? এবং পরিশেষে, ত্রয়োদশ এবং অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে, বাংলার মুসলমানদের বিভিন্ন প্রজন্ম ও বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী কিভাবে ইসলামী সভ্যতাকে উপলব্ধি, ব্যাখ্যা এবং এমনকি নির্মাণ করেছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য বদ্বীপটির প্রাক-আধুনিক ইতিহাসের অনুসন্ধান করা হয়েছে যা বাংলার ব্যতিক্রমধর্মী সাংস্কৃতিক ভূগোলের বিবর্তনের উপর আলোকপাত করতে পারে।

বাংলার ঐতিহাসিক ঐতিহ্য শুধুমাত্র তার ইসলামকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করার মধ্যেই অভিনব হয়ে থাকেনি, বরং তার সীমান্তগত বৈশিষ্ট্যও একটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপার ছিল। অংশত, ত্রয়োদশ শতকে পূর্বদিকে-বাংলায় এবং বাংলার অভ্যন্তরে তুর্কীদের অভিযান ছিল ত্রয়োদশ শতকে মধ্য এশিয়ায় রাজনৈতিক আলোড়নের ফলে সৃষ্ট রূপান্তরের চূড়ান্ত পর্যায়। পশ্চিম এশিয়ায় মোঙ্গলদের হানা দেওয়ার কয়েক শতাব্দী আগে এবং পরে মধ্য এশিয়া ও ইরানী মালভূমিতে নও-মুসলমান তুর্কীরা মুহাম্মদ বখতিয়ারের মতো সেনানায়কদের জন্য দাস এবং স্বাধীন মানুষ উভয় হিসেবে, সার্বক্ষণিক সৈন্য যোগানোর জন্য প্রস্তুত ছিল। বাংলার উর্বরা বদ্বীপে প্রবেশের পর শুধুমাত্র ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা এসব মানুষের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিয়েছিল। উত্তর ও পূর্বে পর্বতমালা এবং দক্ষিণে সাগর দ্বারা ঘেরাও বাংলা ছিল মহাদেশব্যাপী তুর্কী-মোঙ্গল বিজয় অভিযান এবং অভিবাসনের শেষ গন্তব্য। সংক্ষেপে, এটা ছিল সীমান্ত এলাকা।

---

২. Richard V. Weekes, ed., *Muslim Peoples: A World Ethnographic Survey*, 2nd ed. (Westport, Conn: Greenwood Press, 1984), 1 : 137.

বাস্তবে, আমাদের আলোচ্য সময়ে বাংলায় একটি নয়, অনেকগুলো সীমান্ত ছিল এবং সবগুলোই স্বাভাবিকভাবে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে এগুচ্ছিল। এসবের একটি ছিল রাজনৈতিক সীমান্ত, যার অঞ্চলগুলো চিহ্নিত করেছিল তুর্কী ও তাদের উত্তরসুরিরা, বাংলার সুলতানগণ ও মোগল সাম্রাজ্যের গভর্নরগণ, টাকশালের মুদ্রা, সেনাছাউনিতে থাকা সৈন্যরা এবং সংগৃহীত রাজস্ব। দ্বিতীয়টি ছিল কৃষিজ সীমান্ত, যা বাংলার প্রাকৃতিক অবস্থা তথা বন থেকে কুঠার ও লাঙল হাতে মানুষের অভিযান পরিচালানার পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী ভিত্তিতে কৃষিতে নিয়োজিত সম্প্রদায়গুলোকে আলাদা রেখেছিল। তৃতীয়টি হলো ইসলামী সীমান্ত, যা ছিল মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্তকারী। প্রাকৃতিক অঞ্চলের মতো মানসিকভাবেও গতিশীল বৈশিষ্ট্য হিসেবে এই শেষটিই ১৯৪৭ সালে চূড়ান্ত পরিণতিসূচক হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত তিনটি সীমান্তের সবগুলোই বাংলা বদ্বীপে আরো প্রাচীন সাংস্কৃতিক সভ্যতার পূর্বগামী দীর্ঘমেয়াদী অগ্রযাত্রার উপর আরোপিত হয়। বৌদ্ধ মঠ সংগঠনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সাম্যবাদী কৃষিজ সমাজ কিংবা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের নেতৃত্বে পুরোহিততান্ত্রিক কৃষিজ সমাজ-যে বৈশিষ্ট্যই থাকুক না কেন, ১২০৪ সালে মুহাম্মদ বখতিয়ারের অভ্যুত্থানের কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই সাংস্কৃতিক সভ্যতা তার বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী অবয়বে গাঙ্গেয় সমভূমি ও বাংলার বদ্বীপে অগ্রসর হচ্ছিল।

বাংলায় মুসলিম শক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নতুন শাসক এবং তাদের উত্তরসুরিরা গুরুত্বপূর্ণ কৃষিজ স্বার্থসমূহের কেন্দ্রগুলো দখল বা জয় করায় রাজনৈতিক সীমান্ত সম্প্রসারিত হয়। অস্ত্রের জোরে জয় করা অধিকৃত দেশটি অপরিচিত হওয়ায় মুসলমান সৈন্য ও প্রশাসকরা সাধারণত বিজয়-পূর্বের নগর কেন্দ্রে বা তার কাছাকাছি স্থাপন করা সেনাছাউনিগুলোতেই থাকতো। এটা স্বাভাবিক যে, তারা বদ্বীপটির যেসব অংশে উন্নত কৃষিজ সম্প্রদায়ের মুখোমুখি হতো, সেখানে তারা নগরগুলোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে হাট-বাজার এবং রাজস্ব-প্রদানের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কৃষিতে সমৃদ্ধ পশ্চাৎভূমি নিয়ন্ত্রণ করতো। বাংলার তুর্কী বিজয়ীরা তাই প্রথমদিককার দিল্লী সালতানাতের বসতি স্থাপন নীতির অনুসরণ করতো, যা ব্রিটিশরাও উনবিংশ শতকে ভারত দখলের সময়ে ফৌজি নগরী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা করেছে। তবে সবচেয়ে বড় ভিন্ন প্রকৃতি ছিল বাংলার কৃষিজ সীমান্ত, যা বদ্বীপটির কৃষিজ ভূমিকে আদিম বন-জঙ্গল বা জলাভূমি থেকে তখনো বিভক্ত রেখেছিল, যা তখনও লাঙলের চাষাবাদ ও কৃষিজ সমাজের অপ্রবেশ্য ছিল বা সামান্য প্রবেশ্য ছিল। রাজনৈতিক সীমান্ত ছিল মানব-সৃষ্ট এবং দ্রুত চলমান, অন্যদিকে কৃষিজ সীমান্ত ছিল অনেক বেশি স্থিতিশীল, মন্থর-গতিসম্পন্ন প্রাকৃতিক এবং একই সাথে মানবশক্তির মাধ্যমে পরিবর্তিত। এসব প্রাকৃতিক শক্তির প্রধানগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলার নদীমালার ঐতিহাসিক গতিশীলতা, যার চ্যানেলগুলো ক্রমবর্ধমান হারে পূর্বদিকে স্থানান্তরের ফলে বদ্বীপটির উত্তর পশ্চিমাঞ্চল

ও পশ্চিমাঞ্চলকে দীর্ঘমেয়াদীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল : নতুন নদীব্যবস্থা নতুন ভূমিতে পৌঁছার সুযোগ সৃষ্টি করে এবং জমিগুলোকে উর্বরা করার জন্য প্রয়োজনীয় পলি জমা করে, ফলে এক সময়ে যে জমি ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা, তা এখন ধানক্ষেতে রূপান্তরিত হলো, এতে করে নতুন কৃষিজ সম্প্রদায় সৃষ্টির ভিত্তি সৃষ্টি হলো। প্রাকৃতিক শক্তিতে চালিত হলেও বাংলার কৃষিজ সীমান্তের গতিতে মানুষের হাত ছিল, কারণ নতুন ভূমিতে বসতি স্থাপন এবং তার নিয়ন্ত্রণ ছিল অত্যন্ত কষ্টকর কাজ।

তৃতীয় তথা সাংস্কৃতিক সীমান্ত আমাদের মতে, তুর্কী জয়ের প্রথমদিককার পারসি ইতিহাসের মতো গৎবাঁধা পক্ষপাতিত্বভাবে 'ইসলাম' ও 'কুফর' এই দুই পরস্পর মুখোমুখী শব্দ দিয়ে সংজ্ঞায়িত ঠিক করা নয়। এইসব শব্দ ব্যবহারের ফলে অনেক সময়ে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, বাংলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের উত্থান তুর্কী সমরশক্তির সম্প্রসারণের ফল বা সহজ কথায় তাদের তৎপরতার পরিণতি। অবশ্য, উল্লিখিত সূত্রসমূহে 'ইসলাম' ও 'কুফর' শব্দগুলোর মাধ্যমে সাধারণভাবে শাসক ও শাসিত তথা পারসিভাবাপন্ন তুর্কীদের মুসলমান বলেই ধরা হতো এবং বাঙালি প্রজারা অমুসলিম হিসেবে বিবেচিত হতো। মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির আক্রমণের পর কয়েক শতাব্দী পর বিজয় সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানদের সংখ্যা বিপুল সংখ্যক না হওয়ায় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সীমান্ত ভৌগোলিক সীমান্ত বেশ পার্থক্যসূচক ছিল।

তাই বাংলার প্রতিটি সীমান্ত নিজস্ব গতিতে পরিবর্তিত হয়েছিল: বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুসারী সম্প্রদায়গুলোর বৃদ্ধির ফলে সাংস্কৃতিক সীমান্ত, অস্ত্রের শক্তি ও মুসলিম শাসকের বৈধ কর্তৃত্বের স্পষ্টতা ও গ্রহণযোগ্যতার মাধ্যমে রাজনৈতিক সীমান্ত, নদীর গতিপথের পরিবর্তন ও ঔপনিবেশন এই দুই প্রক্রিয়ায় কৃষিজ সীমান্ত এবং মুসলিম ভাবাপন্ন আত্মত্যাগী জীবনের প্রতি স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোর ধীরে ধীরে আত্মস্থ হয়ে যাওয়ায় সৃষ্ট ইসলামী সীমান্ত। নিজস্ব নিয়মে গতিশীল থাকায় এসব সীমান্ত বিভিন্ন পন্থায় একটি অন্যটিকে অতিক্রম করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম ভাগে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার পর, যা পরবর্তী চারশত বছর বাংলায় তাদের শাসনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, তুর্কী শক্তি দ্রুতবেগে রাজস্ব-সমৃদ্ধ দক্ষিণ-পশ্চিমে ধাবিত হয়। সেখানে শাসকরা একটি বিস্তীর্ণ কৃষিজ সমাজের সম্মুখীন হয়, তুর্কীদের বিজয় চাষযোগ্য, ভূমিতে প্রত্যক্ষ সম্প্রসারণে না হয়ে স্থানীয় রাজস্ব কাঠামোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণে সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে পূর্ব ও দক্ষিণ এলাকায় ঘন বনাঞ্চলে খামার ভিত্তিক কৃষিকাজ তখনো তেমনভাবে বিকশিত ছিল না, সেখানে রাজনৈতিক ও কৃষিজ সীমান্ত এক হয়ে যায়। তাই তুর্কীদের আঞ্চলিক অগ্রাভিযান স্বাভাবিকভাবেই বনের প্রান্তে এসে থেমে যায়, বন যখন নিজে থেকেই পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন তা আবার শুরু হয়েছিল। তাই, পূর্বদিকে তুর্কীদের কর্তৃত্ব সম্প্রসারণ শুধুমাত্র স্থানীয় লোকদের নতুন একটি

রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একীভূত হওয়াই ছিল না, সেই সাথে জলাভূমি বা বনের ধানক্ষেতে রূপান্তরের বাহ্যিক পরিবর্তনও সাধিত হয়।

তাই, বদ্বীপের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, কৃষিজ এবং ইসলামী সীমারেখাগুলোর মিথষ্ক্রিয়া বাংলার ইতিহাসের অন্যতম বিষয়বস্তু সৃষ্টি করেছে এবং এটাই এই গবেষণার কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য বিষয়। বিষয়টি এই পুস্তকের কালানুক্রমিকভাবে বিভক্ত উভয় বিভাগে অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে ত্রয়োদশ শতকের প্রথমদিক থেকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইন্দো-ইসলামী সভ্যতার প্রতিষ্ঠা এবং তার বিবর্তন তুলে ধরা হয়েছে, এই যুগের অধিকাংশ সময় বাংলার স্বাধীন সুলতানদের দ্বারাই অঞ্চলটি শাসিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বেকার সময়ের বাংলার সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিত্রের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মধ্য এশিয়ার বিজয়ীরা রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যযুগীয় ইরানী-ইসলামী ধারণার অনুসারী হিসেবে কিভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বদ্বীপে বসবাসকারী প্রথম দিককার সূফী সাধকদের তৎপরতা এবং তারা কিভাবে বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় নিজস্বভাবে মোকাবেলা করেছিল তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সালতানাত আমলে পরিস্ফুটিত বদ্বীপটির মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়গুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভিত্তি মূল্যায়ন করা হয়েছে। যেহেতু এই আলোচনা সাধারণ মুসলিম সমাজের মূল বিশ্লেষণের জন্যই, তাই পঞ্চম অধ্যায়ে সাধারণভাবে মধ্যযুগের ভারতে এবং বিশেষভাবে বাংলায় ইসলামে 'ধর্মান্তরকরণ' সংক্রান্ত বর্তমান এবং অতীতের বিতর্কসমূহ, সামগ্রিকভাবে মধ্যযুগীয় ভারতের এবং বিশেষভাবে বাংলার, বর্ণনা এবং পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগে বাংলার মোগল সাম্রাজ্যে একীভূত হয়ে যাওয়ার সময় তথা ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিক থেকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

স্ববিরোধিতাপূর্ণ হলেও, এমন এক শাসনকালে বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আত্মপ্রকাশ করেছে, যখন বাঙালিদের ইসলামের ধর্মান্তরকরণের ব্যাপারে মোগল শাসনযন্ত্র কোন নীতি অনুসরণ করছিল না। এই আপাত অদ্ভুত বিষয়টি পুস্তকটির এই অংশে আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলায় মোগল কর্তৃত্বের উত্থান এবং তা সংহত করার বিষয়টির বর্ণনা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে তাদের শাসনের আদর্শগত ভিত্তি, মোগল রাজকীয় সংস্কৃতিতে বাঙালি সংস্কৃতি ও ইসলাম ধর্মের স্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পুস্তকটিতে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতকে প্রবেশ করার সময়ে দৃশ্যপট ক্রমবর্ধমান হারে স্থানীয় প্রকৃতি পেয়েছে, ফলে অষ্টাদশ শতকের মধ্য বা প্রথম দিককার ইতিহাসের ছাত্রদের

কাছে বহুল আলোচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও ঘটনাবলী-মুর্শিদ কুলী খান, আলীবর্দী খান, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থান, পলাশীর যুদ্ধ, কলকাতার 'অন্ধকূপ' ইত্যাদি সামান্য উল্লিখিত হয়েছে বা পুরোপুরি বাদ পড়েছে। এর বদলে মোগল রাজধানী দিল্লীর অবস্থার ক্রমাগত অবনতির সময়ে, প্রাদেশিক মোগল কর্মকর্তাগণ যেসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় তাদের কর্তৃত্ব ছড়িয়েছিল, তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

তাই দ্বিতীয় ভাগে সাম্রাজ্য পতনের সময়ে মোগল পরিমণ্ডলে রাজকীয় সম্প্রসারণ দ্বিতীয় স্ববিরোধী বিষয় হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে। যদিও এই অংশে প্রথম অংশের মতো সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের উপরই এবং বিশেষভাবে ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও মুসলিম সমাজের বৃদ্ধির উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে মোগল আমলে কৃষিজ প্রবৃদ্ধির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ের সাথে নবম অধ্যায়ে অঞ্চলটিতে মোগল কর্তৃত্ব ও ইসলামী মূল্যবোধ বিকাশে গ্রাম্য মসজিদ ও দরগাগুলোর ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে, উল্লিখিত দুই অধ্যায়ের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা হলেও দশম অধ্যায়ে প্রাক-আধুনিক বাংলায় ইসলামীকরণের ধর্মীয় মাত্রা বিশ্লেষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থটির কাল নির্ধারণের যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তাতে করে অনেকে যৌক্তিকভাবেই জানতে চাইতে পারেন, সাংস্কৃতিক সমীক্ষা কেন রাজনৈতিক সাল-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ, যে বছরে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা অঞ্চলে শীর্ষে পৌছেছিল, এসে শেষ হলো। একটা ব্যাপার হলো, ঐতিহাসিকরা তাদের উৎসের ব্যাপারে সব সময়ে কালানুক্রমিকতায় সীমাবদ্ধ থাকেন, আর বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থায় ইংরেজদের আকস্মিক অনুপ্রবেশের ফলে এই পুস্তকের শেষের দিকের অধ্যায়গুলোতে ব্যবহৃত ফরাসি দলিল দস্তাবেজের সমাপ্তি ঘটিয়েছে। এই সমীক্ষা ১৭৬০ সালে সমাপ্ত করার আরেকটি কারণ হলো মোগল রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহ উভয়ের বিকাশে সিদ্ধান্তসূচক ভূমিকা পালনকারী পৃষ্ঠপোষক ব্যবস্থার ধ্বংসের সময় ছিল সেটি। যদিও এসব অধ্যায়ের কিছু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে এবং এমনকি ঊনবিংশ শতকেও অব্যাহত ছিল, কিন্তু তাদের পেছনে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিদ্যমান রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা অবসানে ১৭৬০ সালটি ছিল একটি সুবিধাজনক সমাপ্তি বিন্দু।

এই পুস্তকটি লেখা হয়েছে বেশ কয়েক ধরনের লোকের কথা মনে রেখে। দক্ষিণ এশিয়ায় যারা মনে করেন উপমহাদেশে ইসলামের ইতিহাস মানে দুরন্তবেগে অবিমিশ্র 'বিদেশি' অনুপ্রবেশ, এই সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে কিভাবে এই ধর্মটি উপমহাদেশে ইরানী-তুর্কী সভ্যতাকে সাথে নিয়ে এসেও প্রাক-আধুনিক বাংলার সাংস্কৃতিক মানচিত্রে

স্থানীয়তে পরিণত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের যারা ইসলামের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ভরকেন্দ্র হিসেবে নীল ও অক্ষু নদীর মধ্যবর্তী স্থানকে বোঝেন, এই গ্রন্থটিতে দেখানো হয়েছে, কিভাবে এবং কেন মধ্যযুগের শেষভাবে ইসলামী সভ্যতা মধ্যপ্রাচ্যের 'পশ্চাৎভূমির' মতো বাংলার 'পরিমণ্ডলে' এতো গতিশীল ও সৃষ্টিশীল হলো। এতে আরো দেখানো হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের চেয়ে কেন এতো বেশি মুসলমান সেখানকার বাইরে বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাস করে। পরিশেষে, এই সমীক্ষায় পশ্চিমা পাঠকদের কাছে পৌছানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যারা মনে করেন, ইউরোপমুখী, ইউরোপে এর সাংস্কৃতিক বলয়ে একটি 'জঙ্গি' ধর্ম হিসেবে ইসলামের তাৎপর্যপূর্ণ সম্প্রসারণ-আরো অনেক কিছুর মতো একটি সাংঘর্ষিক বিষয়। আমি বলছি, ভারতেই ইসলামের সম্প্রসারণ অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ইউরোপীয়ান বা জুডিও-খ্রিস্টান বিশ্বের চেয়ে এখানেই তারা অনেক বেশি অপরিচিত বিষয়ের মুখোমুখী হয়েছিল। সেই মুখোমুখীতে তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল অনেক বেশি সৃষ্টিশীল, এবং অন্তত, বাংলায় ইসলামী ও স্থানীয় সংস্কৃতির মিলনে ব্যতিক্রমধর্মী এক জনসংখ্যা বিকাশের পথ করে গঠিত হয় বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জাতিগত সম্প্রদায়। এই গ্রন্থটি সেই মোকাবেলা এবং তার অনন্যসাধারণ পরিণতি সংক্রান্ত।

প্রথম খণ্ড

সুলতানদের অধীনে বাংলা

১ তুর্কী বিজয়ের পূর্বে

[পূর্ববাংলার সিলেট অঞ্চলটি] ছিল জনমানব বসতিপূর্ণ এলাকার বাইরে। সেখানে প্রকৃতি ও কৃত্রিমতার মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। অঞ্চলটি ছিল বন্য প্রাণী ও বিষাক্ত সরীসৃপে পরিপূর্ণ। পুরো এলাকাটি ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা।

——— লোকনাথ তাম্রলিপি (খ্রিস্টীয় ৭ম শতাব্দী)

প্রাগৈতিহাসিককালে বাংলা

বাহ্যিকভাবে বাংলা বদ্বীপটি সমতল, অপেক্ষাকৃত নীচু বন্যাপ্রবণ বিশাল অশ্বাখুরাকৃতির এবং বদ্বীপটির উন্মুক্ত দিকটি দক্ষিণে উপসাগরের দিকে মুখ করা। পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব প্রান্তগুলো বিচ্ছিন্ন পাহাড়শ্রেণী দিয়ে ঘেরাও করা, যেখান থেকে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি বৃহত্তম নদী—গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা প্রবাহিত হয়েছে। বদ্বীপটির সমতল মধ্যভাগ দিয়ে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হওয়ার সময় এসব নদী ও তাদের শাখা ও উপনদীগুলো অপরিমেয় বালি ও পলিমাটি বহন করে, হাজার বছর ধরে বয়ে আনা এসবই বদ্বীপটির ভূভাগ গঠন করেছে, দক্ষিণ প্রান্তকে আরো গভীর উপসাগরে ঠেলে দিয়েছে। ঐতিহাসিককাল থেকেই নদীগুলো যোগাযোগ ও পরিবহনের প্রাকৃতিক মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, সেই সাথে বাংলার বাহ্যিক ও প্রাচীন সাংস্কৃতিক উপঅঞ্চলসমূহ বরেন্দ্র, ভাগিরথি-হুগলি অববাহিকা, বঙ্গ, সমতট ও হরিকেল (দ্রষ্টব্য মানচিত্র ১) সৃষ্টি করেছে।[১]

---

১. বদ্বীপের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পদ্মা নদীর উত্তরে অবস্থিত বরেন্দ্র এলাকাটি বর্তমানের মালদহ,পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর ও রংপুর জেলাগুলো নিয়ে গঠিত। ভাগিরথি-হুগলি অববাহিকাটিতে অন্তর্ভুক্ত বেশ কয়েকটি প্রাচীন সাংস্কৃতিক উপ-অঞ্চল– সুহ্মা, বর্ধমান, রাঢ়া ও গৌড় —যা বর্তমানে মেদিনিপুর, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলা নামে পরিচিত। প্রাচীন বঙ্গ বা মধ্য বাংলার মধ্যকার এলাকাগুলো হচ্ছে বর্তমানকালের ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, বাকেরগঞ্জ, খুলনা, চব্বিশ পরগনা জেলাসমূহ। সমতটের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব বদ্বীপের মেঘনা নদীর পূর্বদিকের পাহাড়ি অঞ্চল তথা বর্তমানকালের কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম জেলাসমূহ। হরিকেল বলতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পশ্চাদভূমি তথা বর্তমানকালের মোমেনশাহী ও সিলেট জেলাসমূহ বোঝায়। বাংলার প্রাচীন উপ-অঞ্চলগুলোর জন্য দেখুন– Barrie M. Morrison, *Political Centers and Cultural Regions in Early Bengal* (Tucson: University of Arizona Press, 1970), esp.ch. 4. and Susan Huntington, *The 'Pala-Sena' Schools of Sculpture* (Leiden: Brill, 1984), 171. বাংলার ভৌগোলিক উপ-অঞ্চলসমূহের পর্যালোচনা সম্পর্কে দেখুন: OHK. Spate and ATA Learmonth, *India and Pakistan: A General and Regional Geography*, 3d ed. (London: Methuen, 1967), 571-73.

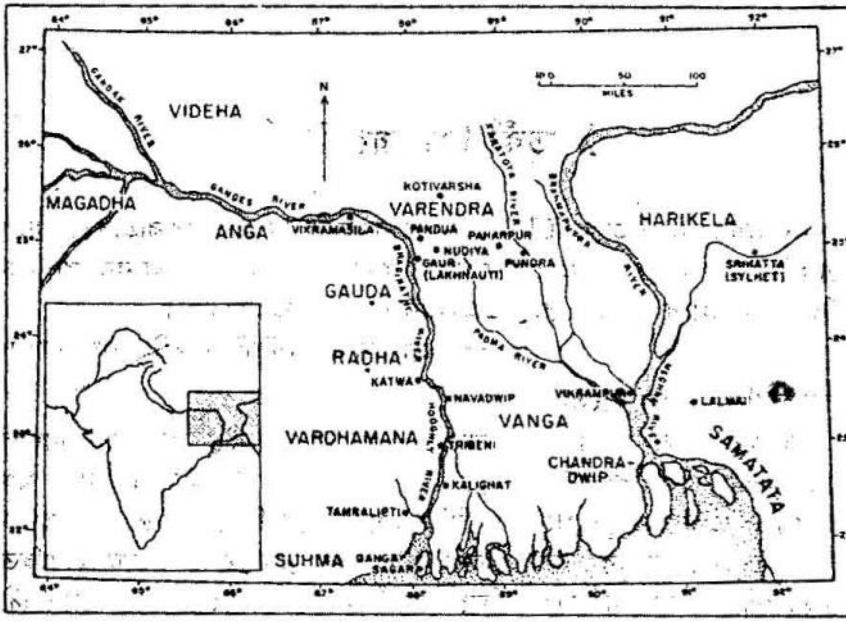

মানচিত্র ১। প্রথম দিকের বাংলার সাংস্কৃতিক অঞ্চলসমূহ

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী অশ্বারোহী বাহিনী যখন বদ্বীপটিতে প্রবেশ করে, তখন এখানে কোন সামাজিক শূন্যতা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের প্রাপ্ত খোদাইকৃত শিলালিপির সময়ের অনেক আগে থেকেই এখানে মানব বসতি ছিল। প্রাচীন উত্তরবঙ্গ, পুন্ড্র (বা পুন্ড্রনগর তথা 'পুণ্ড্রদের শহর') বর্তমানে বগুড়া জেলার মহাস্থান নামে পরিচিত, শেষদিকের বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত একটি অনার্য গোত্র থেকে পুণ্ড্র নামটি এসেছে।[২] একইভাবে, রাঢ় ও সুহমা জনসাধারণকে, যাদেরকে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের জৈন সাহিত্যে হিংস্র ও উগ্র গোত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে,[৩] বাংলার পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল তাদের নামেই নামকরণ করা হয়েছে, আর মধ্য ও পূর্বাঞ্চলীয় বাংলায় বাস করতো বঙ্গের মানুষ।[৪]

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দেই পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় ধান-চাষী মানববসতি ছিল। খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীতে এই এলাকার মানুষ সুশৃঙ্খল ও সারিবদ্ধভাবে নির্মিত বাড়িঘরে বসবাস করতো,

২. Aitareya Brahmana 7.6, cited in SK. Chatterji, *Origin and Development of the Bengali Language* (Calcutta: University of Calcutta Press, 1926), 1 : 62.

৩. These include the *Ayarama Sutta* and *Gaina Sutras*, cited in Chatterji, *Origin and Development*, 1 : 71.

৪. *Chatterji, Origin and Development*, 1 : 67.

সমাধিক্ষেত্র হিসেবে তারা বিশাল এলাকা ব্যবহার করতো, তামার অলংকার এবং কালো ও লাল বর্ণের চমৎকার মৃৎপাত্রাদি তৈরি করতো। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের প্রথমদিকে তারা সম্ভবত স্থানীয়ভাবে লোহার সাথে তামা গলিয়ে উন্নত অস্ত্র তৈরি করতো।[৫] তখনো তারা স্থায়িভাবে জমি তৈরি করে কৃষিকাজ প্রচলিত না থাকায় এসব লোক স্থানান্তর কৃষিকাজ করতো: জঙ্গল পুড়িয়ে জমি বের করতো, নিড়ানি দিয়ে মাটি প্রস্তুত করে ছিটিয়ে বা শাবল দিয়ে গর্ত করে ধান ও ক্ষুদ্র বজরা বীজ বপন করতো, পাথরের ফলা দিয়ে ফসল কাটতো, প্রত্নতাত্ত্বিক খননকৃত এলাকা থেকে উদ্ধার করা সামগ্রী থেকে যার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬] এসব সম্প্রদায় আধুনিক মুণ্ডা ভাষাভাষী অ্যাস্ট্রোএশিয়াটিক মূল ভাষা 'প্রোটো মুণ্ডা' ভাষায় কথা বলতো। অন্তত খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ সালে এ ভাষায় কথা বলতো বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। 'প্রোটো-মুন্ডা' ভাষাভাষীরা কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো, বিশেষ করে ধান, দু' বা তিন ধরনের বজরা, অন্তত তিন ধরনের শিম বা মটর ফলাতো বা অন্তত এগুলোর সাথে তাদের পরিচিতি ছিল।[৭]

খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ ও ৫ম শতাব্দীতে এক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। বদ্বীপটির ঠিক পশ্চিম দিকের গাঙ্গেয় সমতল ভূমিতে এই রূপান্তর বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে স্থায়ী পরিবর্তনের সূচনা করে, স্থানান্তরিত কৃষিকাজ ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকে, প্রথমে বাঁধহীন স্থায়ী জমিতে এবং পরে বাঁধ দেওয়া সেচযুক্ত জমিতে স্থায়িভাবে

---

৫. P.C. Das Gupta, *the Excavations at Pandu Rajar Dhibi*, (Calcutta: Directorate of Archaeology, West Bengal, 1964), 14, 18, 22, 24, 31. স্থানটি ভেদিয়া থেকে ছয় মাইল উত্তরে অজয় নদীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক রেকর্ডে দেখা যায়, মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি জুড়ে প্রাগৈতিহাসিক ধানচাষী সম্প্রদায়সমূহ বসবাস করতো। এলাহাবাদের দক্ষিণে বেলান উপত্যকায় খননকার্যে দেখা গেছে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম সহস্রাব্দের মাঝামাঝির মতো সময়েও সেখানকার মানুষ ধান (*Oryza sativa*) চাষ করতো, যা বিশ্বে ধান চাষের প্রাচীনতম জ্ঞাত প্রমাণ। G.R. Sharma and D. Mandal, *Excavations at Mahagara, 1977-78 (a Neolithic Settlement in the Belan Valley)*, vol. 6 of *Archaeology of the Vindhyas and the Ganga Valley*, ed. G.R. Sharma (Allahabad: University of Allahabad, 1980), 23, 27, 30.

৬. Ram Sharan Sharma, *Material Culture and Social Formations in Ancient India* (New Delhi: Macmillan India, 1983), 118.

৭. দেখুন, Arlene R.K. Zide and Norman H. Zide, "Proto-Munda Cultural Vocabulary: Evidence for Early Agriculture," in *Austroasiatic Studies*, ed. Philip N. Jenner, Laurence C. Thompson, and Stanley Starosta, pt. 2 (Honolulu: University Press of Hawaii, 1976), 1324. লেখকদ্বয় দেখিয়েছেন, সিদ্ধ নয় ও খোসাযুক্ত ধানের (Oryza sativa) মুণ্ডা পরিভাষাটির উদ্ভব হয়েছে ভাষাটির অস্ট্রোএশিয়াটিক শাখা 'মন-খমের' থেকে। তাঁরা এই সিদ্ধান্তও দেন যে, 'বাস্তবায়নসহ কৃষিজ প্রযুক্তি, যাতে পূর্ব থেকেই ধারণা করা হয় এ ধরনের শস্য ও শিম খাদ্য হিসেবে ব্যবহার ও সে সম্পর্কিত জ্ঞানলাভের বিষয়টি অন্তত একটি প্রোটো- অস্ট্রোএশিয়াটিক পরিভাষা থেকে এসেছে।

সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।[৮] মধ্যগাঙ্গেয় সমভূমিতে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পঞ্চাশ ইঞ্চিরও বেশি হওয়ায়, প্রায় মরু পাঞ্জাবের চেয়ে যা দ্বিগুণ,[৯] এক সময়ে পুরোপুরি জলাভূমি ও ঘন জঙ্গলে ঢাকা এসব এলাকায় স্থায়িভাবে ধানচাষের জন্য সেগুলো পরিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ কাজের জন্য পাথরের যন্ত্রপাতির চেয়ে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ সালের দিকে আবিষ্কৃত লোহার কুঠার বেশি কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়।[১০] প্রায় একই সময় মধ্যগাঙ্গেয় অঞ্চলে লাঙলের লোহার ফলারের প্রচলন শুরু হতে থাকে, এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শক্ত পাললিক ভূমিতে যা লাঙলের কাঠের ফলা অপেক্ষা ও ব্যাপক সম্প্রসারিত কৃষি উৎপাদনের দিক থেকে ছিল একটা বিরাট অগ্রগতি।[১১] ধানের চারা লাগানোর প্রযুক্তিও, যা ছিল আদিম ব্যবস্থা থেকে উন্নত চাষাবাদে উত্তরণের একটি সিদ্ধান্তসূচক পদক্ষেপ, খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ সালের দিকে গাঙ্গেয় অঞ্চলে সূচিত হয়।[১২]

বাংলায় প্রাথমিক ইন্দো-আর্য প্রভাব

এসব পরিবর্তনের সময়েই উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে ইন্দো-আর্য অভিবাসীদের অনুপ্রবেশ ঘটে, তারা তাদের সাথে করে সংস্কৃত পবিত্র সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডার নিয়ে এসেছিল। গাঙ্গেয় সমভূমিতে তাদের অভিবাসনের সময়কালেই নতুন ধরনের মৃৎশিল্প দেখা যায়। উভয় ধরনের উপাত্তেই দেখা যায়, ইন্দো-আর্য সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কেন্দ্রগুলো ধীরে ধীরে পূর্বদিকে স্থানান্তরিত হয়েছে: খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দী থেকে তাদের সভ্যতা পূর্ব পাঞ্জাব ও হরিয়ানা এলাকায় (কুরু), ১০ম থেকে ৮ম শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিমাঞ্চলীয় উত্তরপ্রদেশ (ইউপি) এলাকায় (পঞ্চাল), ৭ম থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পূর্বাঞ্চলীয় উত্তর প্রদেশ ও উত্তরাঞ্চলীয় বিহার এলাকায় (বিদেহ) বিকশিত হয়েছে।[১৩]

৮.Te-Tzu Chang, "The Impact of Rice on Human Civilization and Population Expansion," *Interdisciplinary Science Reviews* 12, no. 1 (1987): 65.

৯. Spate and Learmonth, *India and Pakistan*, 47.

১০. Romila Thapar, *From Lineage to State: Social Formations in the Mid-First Millennium BC in the Ganga Valley* (Bombay: Oxford University Press, 1984), 68. যদিও বন পরিষ্কারের জন্য আগুন ব্যবহৃত হতো, কিন্তু তবুও স্থায়ী কৃষিকাজ করার জন্য গাছের গুড়ি সরানোর দরকার হতো, তাই লোহার কুঠার ও কোদাল ছিল প্রয়োজনীয়। Sharma *Material Culture*, 92.

১১. Sharma *Material Culture*, 92-96.

১২. প্রাগুক্ত, ৯৬-৯৯।

১৩. Michael Witzel, "On the Localisation of Vedic Texts and School," in *India and the Ancient World: History, Trade and Culture before AD 650*, ed. Gilbert Pollet (Leuven: Department Orientalistiek, 1987), 173-213; and id., "Tracing the Vedic Dialects," in *Dialectes dans les litteratures Indo-Aryennes*, ed. Colette Caillat (Paris: College de France, Institut de civilisation indienne, 1989), 97-265.

এই অভিবাসন প্রক্রিয়ার শেষে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, তাতে একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অধীনে গঠিত পুরোহিততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা দেখা যায় এবং ধর্মাচারগত শুদ্ধতা ও দূষণের আদর্শের উপর টিকে থাকা এই ব্যবস্থায় ইন্দো-আর্যদের বিশুদ্ধ মর্যাদা ও কলংকিত অনার্যদের অপবিত্র 'বর্বর' (ম্লেচ্ছ) আখ্যায়িত করা হয়। এই কল্পনাপ্রসূত বৈশিষ্ট্য পশ্চিম থেকে আগত 'শুদ্ধ' ইন্দো-আর্যদের অগ্রাভিযানের পথে অবস্থানরত 'অশুদ্ধ' ম্লেচ্ছদের মধ্যে চলমান সাংস্কৃতিক সীমান্তের সৃষ্টি করে। শেষদিকের বৈদিক সাহিত্যে ইন্দো-আর্য রাজা এবং আগুনের বৈদিক দেবতা 'অগ্নি'র পূর্বদিকে গমনের যে কথা লিপিবদ্ধ আছে, তাতে এ বিভাজনের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়। এই কিংবদন্তিতে দেখা যায়, 'অগ্নি' দেবতা বিহারের গন্ধক নদী অতিক্রম করতে অস্বীকার করছে, কারণ বৈদিক মতে বলি দেওয়ার জন্য এর পূর্বাঞ্চলটি— পূর্ব বিহার ও বাংলা —ধর্মাচারগতভাবে অনুপযুক্ত।[১৪]

অন্যান্য সাহিত্যে ধর্মাচারের জন্য অপবিত্র হিসেবে বর্ণিত এসব এলাকা ভ্রমণকারী ইন্দো-আর্যদের পবিত্রতা অর্জনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।[১৫]

অবশ্য, ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ইন্দো-আর্য গ্রুপগুলো ধীরে ধীরে উঁচু, মধ্য এবং পরিশেষে নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এক্ষেত্রে তারা অতীতের মতো তাদের এবং তাদের বিবেচনায় ধর্মাচারগতভাবে অপবিত্র বিবেচিত গোত্রগুলোর মধ্যকার সীমান্তরেখা আরো পূর্বদিকে ঠেলে দেয়।[১৬] তবে এ সময় ইন্দো-আর্য এবং আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো পারস্পরিক সংস্পর্শে এসে ব্যাপকভাবে সাংস্কৃতিক বিনিময় করে।[১৭] উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইন্দো-আর্যদের প্রাথমিক যুগে প্রায়-মরুভূমি

---

১৪. Romila Thapar, "The Image of the Barbarian in Early India" *Comparative Studies and History* 13, no. 4 (October, 1971): 417. The text is the *Satapatha Bramana*.

১৫. These include the *Markandeya Purana and the Yajnavalkya Smrti*, 3. 292. Cited in Thapar, "Image", 417.

১৬. উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ঋগবেদে ইন্দো-আর্য দেশটির পূর্ব সীমান্ত ছিল যমুনা নদী; *পাইপালাড়া সংহিতায়* তা কাশি (বেনারস অঞ্চল); *সানাকিয়া সংহিতায়* তা অঙ্গ (পূর্ব বিহার); এবং *ঐতরীয় ব্রাহ্মণে* (৭.১৮) তা ছিল পুণ্ড্র বা উত্তর বঙ্গ, দেখুন Witzel "Localisation, " 176, 187.

১৭. বর্তমানে একটি ইন্দো-আর্য ভাষা হিসেবে আধুনিক বাংলার চারদিক দিয়ে ঘিরে আছে অস্ট্রোএশিয়াটিক, দ্রাবিড়, সিনো-তিব্বতীয় ভাষাগ্রুপগুলো। এতে ধারণা করা যায়, গত কয়েক সহস্রাব্দে বদ্বীপের সদরের অ-ইন্দো-আর্য ভাষাভাষীরা তাদের সাবেক ভাষাগত পরিচিতি হারিয়ে ফেলেছে, তবে যারা পার্বত্য এলাকায় বসবাস করছে তারা এখনো তা বহাল রেখেছে। অন্যদিকে, আধুনিক প্রমিত বাংলায় অ-ইন্দো-আর্য প্রভাব বহাল থাকায় বদ্বীপে ইন্দো-আর্য এবং অ-ইন্দো-আর্যদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এসব প্রভাবের মধ্যে রয়েছে জিহ্বা হঠাৎ বাঁকাতে হয় এমন ব্যঞ্জনধ্বনি, ব্যাকরণগত লিঙ্গের অনুপস্থিতি ও প্রাথমিক অক্ষরের উপর জোরদান। এম.এইচ ক্লেইম্যানের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, 'অ-বাঙালি উপজাতিসমূহের বংশধরগণ গত

পাঞ্জাবে তারা পিতৃতান্ত্রিক প্রধানদের মাধ্যমে পরিচালিত হতো এবং পশুপালনের সাথে গম ও যবের চাষ করতো। কিন্তু মধ্য গাঙ্গেয় অঞ্চলে তাদের উত্তরসূরিরা রাজ্যের মাধ্যমে সংগঠিত হয় এবং ধান চাষের উপর ভিত্তি করে গঠিত সমাজে এক কর্মবিমুখ জীবন গ্রহণ করে। অধিকন্তু মধ্য ও নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমির স্থানীয় অধিবাসীদের অপবিত্র 'ম্লেচ্ছ' বিবেচনা করা সত্ত্বেও ইন্দো-আর্য অভিবাসীরা এসব অঞ্চলে ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত কৃষিভিত্তিক সমাজে মিশে যায় এবং সাবেক বন-জঙ্গল কিংবা জলাভূমিতে ধানচাষ সম্প্রসারণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। দেখা যাচ্ছে, যে বৈদিক ধর্মগ্রন্থ ইতিপূর্বে বিদেহ (উত্তর বিহার) এলাকায় বসতি স্থাপন না করার আদর্শগত ব্যাখ্যা দিয়েছে— কারণ অগ্নিদেবতা স্থানটিকে বলি দেওয়ার জন্য ধর্মাচারগতভাবে অনুপযুক্ত মনে করেছে— সেটাই 'এখন' সেখানে বসতি স্থাপনের পক্ষে বাস্তব ব্যাখ্যা প্রদর্শন করছে: অর্থাৎ "ইতোপূর্বে অঞ্চলটি খুব বেশী জলমগ্ন থাকায় তা ছিল চাষবাসের অনুপযোগী।"[১৮] ইন্দো-আর্যদের যুথবদ্ধ কৃষিকাজকে গ্রহণ করার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় অস্ট্রোএশিয়াটিক থেকে উদ্ভূত লাঙলের মতো কৃষির সাথে সম্পর্কিত অনেক অনার্য শব্দ আত্মীকরণের ঘটনায়।[১৯]

খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ সালের মধ্যে দুটি সংস্কৃতির শাখা-প্রশাখাগুলোকে একটি একক প্রাধান্যপরম্পরা বিশিষ্ট সামাজিক ব্যবস্থায় রূপান্তরের জন্য একটি বৃহত্তর আদর্শগত কাঠামো তৈরি হয়। এটি পরিণত হয় পুরোহিততান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থায়।[২০] নতুন কর্মবিমুখ ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হওয়ার প্রক্রিয়ায় অভিবাসীরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাজনৈতিক ভূখণ্ড সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করে এবং সেই সাথে তাদের পূর্বের

কয়েক শতাব্দী অতীতের পর এখন বাংলা ভাষাভাষীদের বড় অংশে পরিণত হয়েছে। অন্য কথায়, বাংলা ভাষাভাষী সম্প্রদায়টির বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এখন একসময়ে পূর্ববঙ্গের অকৃষিজ ও সাংস্কৃতিকভাবে অসম্পৃক্ত সাবেক বা বর্তমান অধিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব করছে। দেখুন, M.H. Klaiman, Bengali. *in The World's Major Languages*, ed. Bernard Comrie (New York: Oxford University Press, 1990), 499, 511. See also Chatterji, *Origin and Development*, 1:79, 154; and F.B. Kuiper, "Sources of the Nahali Vocabulary," *in Studies in Comparative Austroasiatic Linguistics*, ed. Norman H. Zide (Hague: Mouton, 1966), 64. বদ্বীপ অঞ্চলে বাংলা ও অ-ইন্দো-আর্য ভাষার অবস্থানের বর্তমান অবস্থা মানচিত্রের মাধ্যমে দেখার জন্য দেখুন, Joseph E. Schewartzberg, ed. *A Historical Atlas of South Asia* (Chicago: University of Chicago Press, 1978), 100.

১৮. উদ্ধৃতি, Witzel "Localisation," 195

১৯. Colin P. Masica, "Aryan and Non-Aryan: Elements' in *North Indian Agriculture*," *in Aryan and Non-Aryan in India*, ed. Madhav M. Deshpande and Peter E. Hook (Ann Arbor: University of Michigan, 1979), 132.

২০. এটা বলা হচ্ছে না যে, বর্তমানের বর্ণব্যবস্থায় যে কোন সামঞ্জস্য এই প্রাথমিক সময়ে হঠাৎ করে আবির্ভূত হয়েছিল, যদিও সেই ব্যবস্থার আদর্শিক পূর্বর্তী অবস্থা সেই কাঠামোতে সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়েছিল।

গত পরিচিতিও লোপ পায়। পরিণামে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবর্তনের অবকাশ সৃষ্টি হয়, সাথে রাজতান্ত্রিক সরকার, মুদ্রা, পাণ্ডুলিপি, রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থা, স্থায়ী সেনাবাহিনী এবং খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ৫০০ ও ৩০০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে নগরসমূহ গড়ে উঠতে থাকে।[২১] প্রথমদিকে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সংঘটিত ঘটনাবলী মধ্য গাঙ্গেয় অঞ্চলে নব্য রাজন্যবর্গের মধ্যে কয়েক শতাব্দী স্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধের পথ সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত এভাবেই ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য, মৌর্যদের (৩২১-১৮১ খ্রিস্টপূর্ব) আত্মপ্রকাশ ঘটে।

এসব ঘটনা বাংলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়। প্রথমত মৌর্যদের রাজনৈতিক ঘাঁটি মগধ, বদ্বীপটির পশ্চিম সীমানা সংলগ্ন হওয়ায়, বাংলা নামক অঞ্চলটি ইন্দো-আর্য সভ্যতার পূর্বগামিতার বিচ্ছিন্ন অংশে পড়ে যায়। ফলে বাংলার গোত্রগুলো নিশ্চিতভাবেই মৌর্য সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের প্রেক্ষাপটে ইন্দো-আর্য সংস্কৃতির মুখোমুখী হয় এবং সম্ভবত মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থানের আগে কয়েকশত বছরের গোলযোগের সময় এ ঘটনা ঘটে। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকে ২০০ সালের সমগ্র উত্তর ভারতে পরিব্যাপ্ত ইন্দো-আর্য ভাষাভাষীদের প্রতিনিধিত্বকারী বিশেষ ধরনের মৃৎসামগ্রী এ সময় বাংলা বদ্বীপের পশ্চিম ভাগের বিভিন্ন স্থানেও দেখা যেতে শুরু করে।[২২] মৌর্য আমলেই বাংলায় বসবাসকারী শক্তিশালী অনার্য জনগোষ্ঠীর নামে সৃষ্ট পুণ্ড্র (বা পুণ্ড্রবর্ধন) মৌর্যদের সর্বপূর্ব এদেশের রাজধানীতে পরিণত হয়। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বেলে পাথরের উপর অশোক-ব্রাহ্মী লিপির একটি রাজকীয় আদেশ-উৎকীর্ণ লিপিমালা পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, সম্রাট এ অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের মাঝে খাদ্যশস্য বিতরণের জন্য গভর্নরকে নির্দেশ দিচ্ছেন।[২৩] এ থেকে বোঝা যায়, এ সময় অন্তত বরেন্দ্র অঞ্চলে নিড়ানি ও খুরপি দিয়ে ইতিপূর্বে প্রচলিত

---

২১. দেখুন, Thapar, From Lineage to State, Chs. 2 and 3. নতুন গড়ে উঠা নগর ও রাজ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে অঙ্গের চম্পা, কাশির রাজঘাট, মগধের রাজগির ও বাত্সের কৌসুম্বি। ধারণা করা যায়, নতুন নগরায়নের এলাকাগুলো হঠাৎ করেই আত্মপ্রকাশ করেছিল, কারণ সাবেক ইন্দো-আর্য গোত্রগুলোর সম্পদ ও ক্ষমতার প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হওয়ায় যুদ্ধ প্রয়াসে টিকে থাকতে পারে এমন কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ব্যবস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। See George Erdosy, "The Origin of Cities in the Ganges Valley," *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 28, no. 1 (February 1985): 96-103.

২২. Northern Black Polished ware চব্বিশ পরগনার চন্দ্রকেতুগর, মেদিনিপুরের তামলুক, মালদহের গৌড়, বগুড়ার মহাস্থানে, দিনাজপুরের খোদার পথের ভিটা ও সিতাকোটে পাওয়া গেছে। দেখুন, Clarence Maloney, "Bangladesh and Its People in Prehistory," *Journal of the Institute of Bangladesh Studies* 2 (1977): 17.

২৩. Ramaranjan Mukherji and Sachindra Kumar Maity, *Corpus of Bengal Inscriptions Bearing on History and Civilization of Bengal* (Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay, 1967), 39-40.

ইন্দো-আর্য সভ্যতা ও বদ্বীপ অঞ্চলটির পারস্পরিক সংযোগের সময় শুধুমাত্র একটি সাম্রাজ্যেরই উত্থান হয়নি, সেই সাথে বৌদ্ধবাদও আত্মপ্রকাশ করে, যা খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে সপ্তম কিংবা অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের সবচেয়ে প্রসারণশীল ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। ব্রাহ্মণদের সামাজিক বর্জন ও ধর্মাচারের শুদ্ধতার দাম্ভিকতাপূর্ণ ব্রাহ্মণ্যবাদী পুরোহিততন্ত্রের বিপরীতে বৌদ্ধ ধর্মের সাম্যবাদ ও সার্বজনীনতার মূল্যবোধ গোষ্ঠীগতভাবে বৈচিত্র্যময় জনসাধারণের কাছে বৌদ্ধদের কাছে ব্যাপক বিস্তৃত লেনদেনের সুযোগ করে দেয়। এই মূল্যবোধ মিশ্র সাংস্কৃতিক একটি বিশাল রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা সাম্রাজ্য গড়ার উপযোগী ছিল। ভারতের প্রথম মহাসম্রাট এবং মৌর্য রাজবংশের তৃতীয় শাসক অশোক (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩-২৩৬) ধর্মটিকে রাজকীয় মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে সাঁচির (মধ্যপ্রদেশ) মহাস্তূপের (মঠ) সমর্থকদের তালিকায় বাঙালিদের অন্তর্ভুক্তি দেখা গেলেও সেসময়ের আগে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অগ্রগতির ইতিবাচক কোন প্রমাণ এ যাবত পাওয়া যায়নি। নগরজনখণ্ডে (অন্ধ্রপ্রদেশ) প্রাপ্ত দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় খ্রিস্টাব্দের একটি লিপিতে বাংলাকে বৌদ্ধ ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে বর্ণনা করো হয়েছে[২৪] এবং ৪০৫-১১ খ্রিস্টাব্দে একজন চীনা তীর্থযাত্রী ভারতের পূর্বাঞ্চলের প্রধান সমুদ্রবন্দর হিসেবে বিবেচিত দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের তাম্রলিপ্তিতে (তামলুক) বাইশটি বৌদ্ধ মঠ দেখেন।[২৫]

পূর্ব ভারতে ব্যবসায়ী ও প্রশাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা সমৃদ্ধ রাজকীয় ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধবাদ অনার্য সমাজে তার মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বৌদ্ধদের চেয়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদেরকেই অন্তত ৫ম শতাব্দী থেকে ধর্মীয় বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও পূর্বাঞ্চলে 'অচ্ছুৎ' ভূখণ্ডে বাংলার আদিবাসীদের সাথে বসবাস করার উদ্যোগ নিতে দেখা যায়।[২৬] সম্ভবত কৃষিকাজে পারদর্শিতার কারণেই অনার্য সমাজে অভিবাসী ব্রাহ্মণদের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়, মগধে যুথবদ্ধ কৃষিব্যবস্থা প্রচলনের ব্যাপারে যে প্রযুক্তিগত ও সামাজিক পূর্বশর্ত সৃষ্টি হয়েছিল, মৌর্য যুগের আগে বদ্বীপটিতে তখনো তা দেখা দেয়নি।[২৭] এটি সম্পন্ন হয়েছিল দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ায়,

---

২৪. Gayatri Sen Majumder, *Buddism in Ancient Bengal* (Calcutta: Navana, 1983) 11.

২৫. R.C. Majumder, *History of Ancient Bengal* (Calcutta: G. Bharadwaj & Co. 1971), 522-23. See Schwartzberg, ed. *Historical Atlas*, 18, 19.

২৬. Puspa Niyogi, *Brahminic Settlements in Different Subdivisions of Ancient Bengal (Calcutta: R.K. Maitra*, 1967), 4, 19-20.

২৭. ডি.ডি কোসম্বি উল্লেখ করেন, ব্রাহ্মণ্য ধর্মাচারের সাথে ছিল "একটি ব্যবহারিক পঞ্জিকা, চলনসই আবহাওয়া বিজ্ঞান এবং কৃষি প্রযুক্তির সাবলীলভাবে করার মতো জ্ঞান, যা আদিম উপজাতি গোত্রগুলোর কাছে ছিল অজ্ঞাত এবং তারা শাবল বা নিড়ানির চেয়ে বেশি কিছু জানতো না।"D.D.

পঞ্চম শতাব্দীতে শুরু হলেও ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও তা সম্পন্ন হয়নি, এ সময়কালে স্থানীয় আদিবাসী চাষীরা ধান উৎপাদন ভিত্তিক সামাজিক বিন্যস্ত কৃষি সমাজের সাথে একীভূত হয়ে যায়।[২৮]

অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলায় আঞ্চলিক ভিত্তিক বিশাল রাজকীয় ব্যবস্থাদির অভ্যুদয় ঘটে, এগুলোর কোন কোনটি ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও অন্যগুলো ব্রাহ্মণবাদকে পুনর্জীবিত করে। এগুলোর মধ্যে প্রথম এবং সবচেয়ে বেশি স্থায়ী ছিল গোপাল নামের এক যোদ্ধা ও নিবেদিতপ্রাণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী প্রতিষ্ঠিত পাল সাম্রাজ্য (আনুমানিক ৭৫০-১১৬১)। বরেন্দ্র ও মগধে মূলকেন্দ্র বিশিষ্ট এ রাজবংশের প্রথমদিকের রাজারা তাদের আধিপত্য গাঙ্গেয় সমতল ভূমি ছাড়িয়েও অনেক দূর বিস্তার করেন, এমনকি তাদের শ্রেষ্ঠতম নৃপতি ধর্মপালের সময় (৭৭৫-৮১২) তা কনৌজ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়।[২৯] প্রায় একই সময়ে বাংলায় একটি আঞ্চলিক অর্থনীতি গড়ে উঠতে থাকে। ৮৫১ খ্রিস্টাব্দে আরব ভূগোলবিদ ইবনে খুরদাদবিহ লিখেন, পাল সাম্রাজ্যে প্রস্তুত সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্র তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, যার অতুলনীয় সৌন্দর্য ও মসৃণতার প্রশংসাও করেছেন।[৩০]

Kosambi, "The Basis of Ancient Indian History," *Journal of the American Oriental Society* 75, pt. 1 (1955): 36. See also ibid., pt. 4, 236n. কোসম্বিই প্রথম লক্ষ্য করেন, "প্রাচীন ভারতে প্রধান পরিবর্তন রাজবংশ গুলোর মধ্যে হয়নি বরং উপজাতীয় ভূমি, উপজাতীয় গোত্রগুলোকে স্থায়ী কৃষক বা সংঘবদ্ধ কারিগরে রূপান্তরের অগ্রগতির সাথে হয়েছিল। প্রাগুক্ত, ৩৮

২৮. প্রায় একই প্রক্রিয়া দেখা গিয়েছিল প্রতিবেশী আসামে। পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সময়ের খোদাইলিপি বিশ্লেষণ করে নয়নকোট লাহিড়ি বলেন, 'আসামে কৃষিজ অর্থনীতি ও বর্ণকাঠামোর নীতিমালার মধ্যে একটি অপ্রতিরোধ্য সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। ধান চাষাবাদের ব্যবস্থা গ্রহণের পর এই অঞ্চলের সকল গোত্রই কোন না কোন ধরনের বর্ণকাঠামোতে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। নিজস্ব গোত্রীয় পরিচিতি বিলীন এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী হিন্দু ছত্রছায়ায় অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়ায় ব্রাহ্মণরা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায়। পরিচিতি বিলীনের প্রক্রিয়ায় অন্যান্য আরো কিছুর মধ্যে ছিল গোত্রীয়ভাবে প্রচলিত উপাস্য পরিত্যাগ এবং চিরায়ত হিন্দু দেব-দেবীদের গ্রহণ।' দেখুন Nayanjot Lahiri, "Landholding and Pesantry in the Brahmaputra Valley c. 5th-13th century AD," *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 33, no. 2 (June 1990): 166.

২৯. যদিও আনুমানিক ৭৫০ থেকে আনুমানিক ৯৫০ পর্যন্ত অধিকাংশ পাল তাম্রলিপি আধুনিক বিহারের মগধ থেকে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু সাহিত্যিক উৎস রাজবংশটির আদিবাসভূমি হিসেবে বরেন্দ্রের কথা জানাচ্ছে, এখানেই পালরা দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কর্তৃত্ব প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছিল। Majumder. History of Ancient Bengal. 99, 159.

৩০. *Ahbar as-Sin wa l-Hind: Relations de la Chine et de l'Inde.* tran. *Jean Sauvaget* (Paris: Societe d'edition "Les Belles Lettres," (1948). 13.

এক শতাব্দী পরে আরেক আরব ভূগোলবিদ মাসুদি (মৃত্যু ৯৫৬) বাংলায় মুসলমানদের বসবাসের কথা উল্লেখ করেন।[৩১] বাংলায় মুসলমানদের বসবাসের এটাই প্রাচীনতম উল্লেখ। স্থানীয় বস্ত্র সামগ্রী বিদেশে রফতানিতে নিয়োজিত দৃশ্যত আরব ও পারসি দূরপাল্লার এসব ব্যবসায়ী পাল সাম্রাজ্যে নয়, বরং বদ্বীপের দক্ষিণ অংশ তথা সমতটে অবস্থিত আরেক বাঙালি বৌদ্ধ চন্দ্র সাম্রাজ্যে (আনুমানিক ৮২৫-১০৩৫) বসবাস করতো। চন্দ্র রাজারা যদিও শক্তির দিক থেকে পালদের তুলনায় দুর্বল ছিলেন এবং উক্ত বৃহৎ প্রতিবেশীর মতো সমগ্র ভারতে রাজত্ব কায়েমের অভিলাষ কখনো প্রকাশ করেনি, কিন্তু তবুও বদ্বীপের সবচেয়ে সক্রিয় সমুদ্রবন্দরগুলোর নিয়ন্ত্রণ লাভের সুবাদে তারা ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছিল। অধিকন্তু পালরা যখন বাণিজ্যিক বিনিময়ের জন্য 'কড়ি' ব্যবহার করতো,[৩২] তখন চন্দ্ররা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অধিকতর গ্রহণযোগ্য রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন করেছিল।[৩৩] পাল এবং সমতটের বিভিন্ন রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের রাজকীয় ধর্ম হিসেবে বৌদ্ধবাদ আন্তর্জাতিকভাবে প্রচারের সুবিধা লাভ করে এবং সমুদ্রপথে সমগ্র এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার দারুণ সুযোগ পায়।

ধর্মপাল নিজে ৬ষ্ঠ থেকে ১১শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে দুটি স্মারক মঠ-আশ্রম কমপ্লেক্স নির্মাণে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এ দুটির একটি হলো পূর্ব বিহারের বিক্রমশিলা, অপরটি রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর।[৩৪] একই সময়ে সমতটের রাজাদের

৩১. Mas'udi, *Les Prairies D'or [Muruj al-dhahab]*, trans. Barbier de Meynard and Pavet de Courteille, corrected by Charles Pellat (Paris: Societe asiatique, 1962), 1: 155. "Dans le royaume du Dharma [i.e., Pala], les transactions commercials see font avec des cauris *(wada')*, qui sont la monnaie du pays. On y trouve le bois d'aigle *(ud)*, l'or et l'argent; on y fabrique des etoffes dune finesse et dune delicatesse inegalees....... Les Indiens mangent sa [i.e., the elephant's] chair, et ils sont imites par les Musulmans qui habitent ce pays, parce quil est de la meme espece que les boeufs et les buffles."

৩২. Sauvaget, *Ahbar as-Sin wa l'Hind*, 13: Mas'udi, *Prairies* 1: 155.

৩৩. M.R. Tarafdar, "Trade and Society in Early Medieval Bengal," *Indian Historical Review* 4, no. 2 (January 1978): 277. এ. এইচ. দানি লিখেন, চন্দ্র মুদ্রা সম্পর্কে প্রমাণের ভিত্তি হলো ময়নামতিতে আবিষ্কৃত প্রায় ২০০-এর মতো পর্যাপ্ত রৌপ্য মুদ্রা, "যা সুস্পষ্টভাবে পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধ চন্দ্র শাসকদের সময়কালের, তাদের রাজধানী ছিল বিক্রমপুরে।" কোন কোন মুদ্রায় মুদ্রণের স্থান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে পার্টিকেরার কথা, এই নামের একটি গ্রাম এখানো কুমিল্লা জেলায় বিদ্যমান। দেখুন Dani, "Coins of the Chandra Kings of East Bengal," *Journal of the numismatic Society of India* 24 (1962): 141; Abdul Momin Chowdhury, *Dynastic History of Bengal, c. 750-1200 AD* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1967), 163 and n. 5. See also Bela Lahiri, "A Survey of the Pre-Muhammadan Coins of Bengal," *Journal of the Varendra Research Museum* 7 (1981-82): 77-84.

৩৪. Frederick M. Asher, *The Art of Eastern India, 300-800* (Minneapolis: University of Minneapolis Press, 1980), 91.

পৃষ্ঠপোষকতায় লালমাই-এর শালবন বিহার নির্মিত হয়।[৩৫] ৮ম শতাব্দী থেকে ভারতের পূর্বাঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রসমূহের অভ্যুদয়ের ফলে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিবেশী ভূখণ্ডগুলোতে বিশেষ করে তিব্বত, বার্মা, কম্বোডিয়া ও জাভায় বিস্তার লাভ করে। এসব এলাকায় বাংলা ও বিহারের মতো করেই মঠ নির্মিত হয়।[৩৬] একই সময়ে পালরা ঐতিহাসিক বৌদ্ধ ভূখণ্ড হিসেবে বিবেচিত মগধের নিয়ন্ত্রণ লাভ করায় বৌদ্ধ ধর্মের সর্বোচ্চ পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রাজবংশটির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।[৩৭]

পাল সাম্রাজ্যে মুসলমানদের বসবাস সম্পর্কিত মাসুদির মন্তব্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ দশম শতাব্দীর দিকে যখন বাংলার বস্ত্রসম্ভার ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক ছেয়ে ফেলেছিল, তখন বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ সম্প্রসারমান বৌদ্ধ রাষ্ট্র দুটি বদ্বীপ অঞ্চলে একটি অপরটিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস চালায়। আরব সাগর থেকে পূর্বদিকে সম্প্রসারণশীল একটি রাষ্ট্রে মুসলিম আরব কিংবা পারসিদের প্রাধান্য ছিল এবং বঙ্গোপসাগর থেকে পূর্বদিকে সম্প্রসারণশীল অপরটিতে বাঙালি বৌদ্ধদের প্রাধান্য ছিল।[৩৮] এই দুদেশের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলায় সর্বপ্রথম ইসলামী সভ্যতার উপস্থিতি ঘটে।

---

৩৫. Barrie M. Morrison, *Lalmai, A Cultural Center of Early Bengal: An Archaeological Report and Historical Analysis* (Seattle: University of Washington Press, 1974), 27. প্রাচীন সমতটে বৌদ্ধ সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন Puspa Niyogi, "Buddhism in the Mainamati-Lalmai Region (with Reference to the Land Grants of S.E. Bengal)," *Journal of the Varendra Reserch Museum* 7 (1981-82): 99-109.

৩৬. Haroun er Rashid, "Some Possible Influences from Bengal and Bihar of Early Ankor Art and Literature," *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh* 22, no. 1 (April, 1977): 9-19.

৩৭. উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ধর্মপালের পুত্র দেবপাল (৮১২-৫০) জাভা-সুমাত্রার শ্রীবিজয়ের বৌদ্ধ রাজার এক দূতকে স্বাগত জানান, তিনি পাল রাজাকে নালন্দায় একটি বৌদ্ধ বিহারকে স্থায়ী সম্পদ দান করতে অনুরোধ করেছিলেন। একইভাবে রামপালের আমলে (১০৭২-১১২৬) বার্মার পৌত্তলিক সম্রাট কিয়ানসিত্তা (মৃত্যু আনুমানিক ১১১২) বৌদ্ধ গয়ার বৌদ্ধ মন্দিরগুলোর পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য মগধে জাহাজযোগে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রত্ন পাঠিয়েছিলেন। Hirananada Shastri, "The Nalanda Copper-Plate of Devapaladeva," *Epographica Indica* 17 (1924): 311-17. Janice Stargardt, "Burma's Economic and Diplomatic Relations with India and China from Early Medieval Sources," *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 14, no. 1 (April 1971): 57.

৩৮. ভারত মহাসাগরে প্রথম শতাব্দীতে এবং বিশেষভাবে দশম শতাব্দীতে আরব বাণিজ্যিক ছিটমহলের অবস্থান জানার জন্য দেখুন Andre Wink, *Al-Hind: The Making of the Indo-Islamic World*, vol. 1: *Early Medieval India and the Expansion of Islam*, 7^{th}-11^{th} Centuries (Leiden: Brill, 1990), 65-86.

প্রাথমিক মধ্যযুগীয় হিন্দু সংস্কৃতির উত্থান

ইন্দো-বৌদ্ধ সভ্যতা এমনকি যখন সমুদ্রতীরবর্তী বিভিন্ন দেশে সম্পসারিত ও বিকশিত হচ্ছিল, তখন পূর্ব ভারতে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলো ধীরে ধীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছিল। যেহেতু বৌদ্ধরা তাদের প্রাত্যহিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির দায়িত্ব ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের উপর ন্যস্ত করেছিল, তাই ধর্মটির প্রাণকেন্দ্র অর্থাৎ বৌদ্ধ মঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো, সাধারণ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং টিকে থাকার জন্য রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার উপর সর্বনাশাভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এটা ঠিক যে, মুসলিম বিজয়ের সময় পর্যন্ত বেশ কিছু বাঙালি রাজবংশ বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত রেখেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেক বেশী জনপ্রিয় হয়ে পড়া ব্রাহ্মণ্যবাদ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকেই বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোর বদলে অনেক বেশি রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেতে থাকে।[৩৯] এমনকি প্রাথমিককালে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অত্যুৎসাহী পালরাও একাদশ শতাব্দীর দিকে নতুনভাবে সংস্কার করা ব্রাহ্মণদের দু'দেবতা— শিব ও বিষ্ণুর মতবাদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করতে থাকে।[৪০]

৩৯. বাংলা সফরকারী চীনা তীর্থযাত্রীদের উল্লিখিত মন্তব্যে জানা যাচ্ছে, সেখানে বৌদ্ধ আশ্রমের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং ব্রাহ্মণ মন্দিরের সংখ্যা বাড়ছে। ফা-হিয়েন পঞ্চম শতাব্দীতে লিখেন, তাম্রলিপ্তিতে পঞ্চাশটি আশ্রম আছে। দু শতাব্দী পর হুয়ান সাং সেখানে মাত্র দশটি আশ্রম এবং পঞ্চাশটি ব্রাহ্মণ মন্দির থাকার কথা লিখেন। ৬৮৫ সাল নাগাদ তাম্রলিপ্তিতে আশ্রমের সংখ্যা আরো কমে পাঁচ বা ছ'য়ে নেমে আসে, যা তীর্থযাত্রী আই-চিং উল্লেখ করেছেন। প্রায় একই ঘটনা ঘটেছিল উত্তরবঙ্গে (বরেন্দ্র), হুয়ান সাং সেখানে বিশটি আশ্রম ও একশতটি ব্রাহ্মণ মন্দির এবং দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় (সমতট), যেখানে তিনি ত্রিশটি আশ্রম ও একশতটি মন্দির দেখেছেন। আশ্রমের প্রতি রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা হ্রাস হয়তো খুব বেশি মাত্রায় ছিল না, অধিকন্তু, বাঙালি বৌদ্ধ জনসাধারণের মধ্যে আন্তরিকতা ও সহযোগিতার মনোভাব বিরাজমান ছিল। তবে তিব্বতীয় সন্ন্যাসী তারানাথ ১৬০৮ সালে লিখেন পূর্ব ভারতের বৌদ্ধবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে সুস্পষ্টভাবে বিষয়টি ছিল ধর্মটির প্রতি ব্যাপক জনসমর্থনের অনুপস্থিতি। বরং লেখক বৌদ্ধ ধর্মের ভাগ্যকে তার বড় বড় আশ্রমগুলোর সাথে একাকারভাবে চিহ্নিত করেছেন। তাই রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার সাধারণভাবে ধর্মটির জন্য মরণবাণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়। দেখুন *Chinese Accounts of India:L Transated from the Chinese of Hiuen Tsiang*, trans. Samuel Beal (Calcutta: Susil Gupta, 1958), 4: 403, 407, 408: *A Record of the Buddhist Religion as Practiced in India and the Malay Archipelago* (AD 671-695) by I-Ching, trans. j. Takakasu (Delhi: Munshiram Manoharlal, 1966 xxxiii; and Taranatha's History of Buddhism in India, ed. Debiprasad Chattapadhyaya (Calcutta: K.P. Bagchi & Co., 1980), xiii-xiv.

৪০. Huntington, *"Pala-Sena" Schoolls*, 179-201.একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতার অধিকাংশ শিল্প ছিল বিষয়বস্তুগতভাবে ব্রাহ্মণ্য, আর বৈষ্ণব ধারণা হ্রাস পেয়ে এক-তৃতীয়াংশে নেমে আসে। প্রাগুক্ত ১৫৫।

পরবর্তী দু'বাঙালি রাজবংশ বর্মণ (আনুমানিক ১০৭৫-১১৫০) ও বিশেষ করে মুসলিম বিজয়ের সময়ে সমগ্র বাংলায় প্রাধান্য বিস্তারকারী সেন (আনুমানিক ১০৯৭-১২২৩) শাসনামলে এটা আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সেনরাজাদের পূর্বপুরুষরা ছিল এক ক্ষত্রিয় গোত্র, তারা একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারত (কর্নাটক) থেকে এসে পালদের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করে ভাগিরথি-হুগলি এলাকায় বসবাস করতে থাকে। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পালদের ক্ষমতা কমতে থাকার প্রেক্ষাপটে, দ্বাদশ শতকের প্রথমদিকে তা পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়, সেনরা প্রথমে তাদের সাবেক প্রভুদের থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে, তারপর ভাগিরথি-হুগলি অঞ্চলে তাদের শক্তি সুসংহত করে এবং পরিশেষে পূর্বাঞ্চলীয় পশ্চাৎভূমিতে অভিযান চালিয়ে বর্মণদের তাদের রাজধানী বিক্রমপুর থেকে উৎখাত করে। অধিকন্তু সেনরা যেহেতু দক্ষিণ থেকে হিন্দু সংস্কৃতির (বিশেষ করে শিবত্ব) প্রতি প্রচণ্ড আনুগত্য নিয়ে এসেছিল, তাই বাংলায় তাদের সশস্ত্র বিজয়ের ফলে সর্বত্র রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪১] পরিণামে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব ভারতের সভ্যতা ও ক্ষমতার মূলকেন্দ্র বিহার থেকে বাংলায় স্থানান্তরিত হয় এবং সেই সাথে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা বৌদ্ধ ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মে পরিবর্তিত হয়। সে সময়কালের শিল্পীদের সৃষ্ট কর্মে এসব পরিবর্তনের বিষয়টি বিশেষভাবে দেখা যায়।[৪২]

এসব রাজনৈতিক ঘটনার পেছনে অনেক গভীরভাবে ধর্মীয় পরিবর্তন কাজ করতো, সমগ্র ভারতেই এই পরিবর্তনের ফলে মধ্যযুগে হিন্দু ধর্ম বিকশিত হয় এবং তা বৈদিক ও ব্রাহ্মণিক পূর্বসূরিদের থেকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত কাঠামো নির্মাণে সহায়ক হয়। রোনাল্ড ইন্ডেন বলেন, প্রাচীন বৈদিক বলিদান নীতিতে (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১০০০-আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০) দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পরিবর্তন সাধিত হয়।[৪৩] প্রথমটি ঘটে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে, যখন মৌর্য সম্রাট অশোক তার রাজকীয় ধর্ম হিসেবে বৌদ্ধবাদকে প্রতিষ্ঠা করেন। তখন বৌদ্ধরা বৈদিক বলিদান প্রথাকে হিংস্রতা ও স্বার্থান্বেষী গণ্য করে তার বদলে সাধারণ মানুষ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দান (উপহার প্রদান) কিংবা বৌদ্ধ শাসকরা বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহকে ভূমিদান করতো। এমতাবস্থায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা তাদের নিজস্ব পেশাগত তৎপরতা পুনর্বিন্যস্ত করে পশু বলিদানের রক্তাক্ত প্রথার পরিবর্তে অ-ব্রাহ্মণ গৃহস্বামীদের ঘরোয়া দৈনন্দিন অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা

৪১. H.C. Ray, *The Dynastic History of Northern India* (Early Medieval Period), 2d ed. (New Delhi: Munshiram Manoharlal. 1973). I: 354-58.
৪২. Huntington, *"Pala-Sena" Schoolls*, 179. 201.
৪৩. Ronald Inden, "The Ceremony of the Great Gift (Mahadana): Structure and Historical Context in Indian Ritual and Society," in Marc Gaborieau and Alice Thorner, *Asie du sud: Traditions et Changements* (Paris: Centre national de la recherche scientifique, 1979). 131-36.

করা শুরু করে। একই সময়ে তারাও খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতক থেকে বাংলায় গৃহস্বামী কিংবা স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিকট থেকে দান হিসেবে ভূমি পেত। বৈদিক বলির এই প্রথম রূপান্তর অবশ্য বৌদ্ধবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেনি। বাস্তবে ধর্ম দুটি শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে থাকে, বৌদ্ধ ধর্ম রাজকীয় কেন্দ্রে এবং হিন্দু ধর্ম আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে কাজ করতে থাকে।[৪৪] বৈদিক বলিদানের দ্বিতীয় রূপান্তর সংঘটিত হয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে যখন গোত্রপতি ও শাসকরা দেব-দেবীদের মূর্তির জন্য পৃথক পৃথক মন্দির নির্মাণ শুরু করে। বৈদিক ধর্মের মহাজাগতিক বলির প্রথা পরিবর্তন করে ইতিমধ্যেই ভিক্ষুদের উপহার-দান প্রথায় রূপান্তর করা হয়েছিল, এখন তা আবার রূপান্তরিত হয়ে নতুন অনুষ্ঠান 'মহাদান' (প্রচুর উপহার) নামে গৃহীত হয়, যাতে স্মারক মন্দিরে মূর্তি সমেত রক্ষকদেবতা রাখা হয়। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে এসব ধারণা সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে, যখন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পালরা ছাড়া, ভারতের সর্বত্র সর্বময় ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রাজবংশগুলো উত্তরে প্রতিহার, দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট এবং দক্ষিণে পাণ্ড ও পল্লভ— সবাই হিন্দু প্রতিমা পূজাভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। বৈদিক দেব-দেবীদের বদলে সাধারণভাবে কিংবা সম্মিলিতভাবে প্রত্যেক রাজবংশ এ সময় একটি নির্দিষ্ট দেবতার (সাধারণত বিষ্ণু বা শিব) পৃষ্ঠপোষকতা করতো, সেই দেবতাকেই রাজবংশটির মহাজাগতিক ঈশ্বর হিসেবে বোঝাতো, পৃথিবীতে যার প্রতিনিধি ছিলেন উপহারদাতা রাজা। এসব ধারা স্মারক স্তম্ভ এবং বৌদ্ধ স্তূপের মতো করে তৈরি মন্দিরের খোদাই চিত্রে দেখতে পাওয়া যায়, যা বৈদিক অগ্নি-দেবতার বেদী থেকে উদ্ভূত।[৪৫] ইতিমধ্যেই স্থানীয় পুরোহিত যারা শুধুমাত্র অ-ব্রাহ্মণদের প্রাত্যহিক ধর্মাচারের ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত ছিল, তারা আরো বৃহত্তর কিছু করার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে, এখন তারা আগের কাজগুলো করা ছাড়াও হিন্দু রাজসভার দৈনন্দিন ধর্মাচারের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে ফেলে এবং রাজাদের 'মহাদান' এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ধর্মাচারে পৌরোহিত্য করতে থাকে।

দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত লেখা তাম্রলিপিসমূহে দেখা যায়, কিভাবে এসব ধারণা বাংলার রাজসভাসমূহে প্রবেশ করেছিল। দশম শতাব্দী-পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশগুলোর-পাল, চন্দ্র, বর্মণ ও সেনলিপিতে প্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের বিস্তারিত তালিকায় কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের বিস্তৃতি এবং আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা দৃঢ়করণ প্রভৃতি দেখা যায়।[৪৬] অধিকন্তু এ সময় ভূমিদান রাজার

৪৪. Ibid, 133.

৪৫. Ibid, 134. See also Ronald Inden, "Hierarchies of Kings in Early Medieval India," *Contributions to Indian Sociology* 15, nos. 1-2 (1981): esp. 121-25.

৪৬. Swapna Bhattacharya, *Landschenkungen und staatliche Entwicklung*

বিশেষ অধিকারে পরিণত হয়, দানকৃত কৃষিজমির (অন্তত উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে) আর্থিক মূল্য জানা ও নির্দিষ্ট থাকতো, যা সমাজের অধিকতর কৃষিকরণের ইংগিত দেয়। সমতট ছাড়া অন্যত্র শুধুমাত্র ব্রাহ্মণরাই এসব দান পেত, আর তারা আগের মতো শুধুমাত্র ঘরোয়া ধর্মাচার সম্পন্ন করা ছাড়াও এখন রাজকীয় ধর্মাচার সম্পন্ন করার দায়িত্ব পেল।[৪৭] বস্তুত রাজসভার ধর্মাচারে পৌরোহিত্যকারী ব্রাহ্মণদের ভূমিদান রাজকর্তব্যে পরিণত হয়, রাষ্ট্রীয় আদর্শের বৈধতার জন্য এটি ছিল একটি প্রয়োজনীয় উপাদান।

এসব শতাব্দীতে মধ্যযুগীয় হিন্দু রাজত্বের মতাদর্শ বদ্বীপটিতে পুরোপুরি বিস্তৃত হয়। এটা সত্য যে, প্রথমদিককার সেন রাজারা বিজয়লব্ধ এলাকা দিয়ে নিজেদের ক্ষমতার অবস্থান মূল্যায়ন করতো।[৪৮] এদিক দিয়ে তারা তাদের উপর জয়ী দিল্লী সালতানাতের প্রথমদিকের তুর্কীদের থেকে সামান্যই ব্যতিক্রম ছিল। যদিও যে ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বের উপর সেনদের রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল তা তাদের মুসলিম বিজয়ীর আদর্শ থেকে মৌলিকভাবেই ভিন্ন ছিল। ইসলামী ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী, লৌকিক এবং অতিলৌকিকের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন; মানব বা অতিমানব কেউই একজন অপরজনের এলাকায় স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে না বা করে না। সেনদের ধারণায়, যাকে সাধারণভাবে মধ্যযুগীয় হিন্দু চিন্তাধারা বলা যেতে পারে, লৌকিক ও অতিলৌকিকের মধ্যকার সীমারেখা অস্পষ্ট, ধর্মকে অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট ভারতীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী মহাজগৎ, প্রকৃতি ও মানুষ-সমুন্নত করার জন্য রাজাই রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মাচারের ব্যবস্থা করে থাকে, তাই রাজার ধর্মাচারের মাধ্যমে দু এলাকার মধ্যে চলাচল সম্ভব। বিজয় সেনের (আনুমানিক ১০৯৫-১১৫৮) একটি লিপিতে দেখা যায়,

> 'তিনি কখনো বলিদানে ক্লান্ত হন না, বাধর্ক্যের কারণে তার এক পা খোঁড়া হয়ে গেলেও, ধর্মের শক্তিতে তিনি পৃথিবীর উপর দিয়ে চলাচল করতে পারেন, দ্রুত বলিদানের খুঁটিসমূহের সাহায্য নিতে পারেন। বলিদাতা (রাজা) স্বর্গের পাহাড়, মেরু থেকে তিনি দেবতাদের ডেকে এনে শত্রুদের নিপাত করেন। স্বর্গ ও মর্ত্যের অধিবাসীদের বিনিময় করতে পারেন। বিশাল দেবালয় (মন্দির) নির্মাণ ও বিরাট দীঘি খনন করে তিনি স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যকার ব্যবধান হ্রাস করেন এবং তাদের দেখতে একই রকম মনে হয়।[৪৯]

---

im fruhmittelaet erlichten Bengalen (Wiesbaden: Franz Steiner Verlag. 1985). 165.

৪৭. Morrison. *Political Centers*. 108.

৪৮. Nani Gopal Majumder. *Inscriptions of Bengal*. vol. 3 (Rajshahi: Varendra Research Society. 1929). 52-53.

৪৯. প্রাগুক্ত ৫৪

ধর্মাচারের মাধ্যমে 'স্বর্গ ও মর্ত্যের অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় করতে পারার ফলে রাজা প্রতীকীভাবে লৌকিক ও অতিলৌকিক ক্ষেত্রের মধ্যকার সীমারেখা বিলুপ্ত করতে পারেন।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতের অন্যান্য স্থানের হিন্দু রাজাদের মতো সেনরা মহাজগৎ এবং সেখানে তাদের নিজস্ব অবস্থান সম্পর্কিত ধারণা স্থাপত্য বিশেষ করে রাজকীয় স্মারকমন্দির নির্মাণের মাধ্যমে, প্রকাশ করেছেন। নিজস্ব পৃষ্ঠপোষক দেবতার মূর্তি সম্বলিত পাথরের স্মারকে মহাজাগতিক নির্দেশনামা লিখে এবং জাগতিক ক্ষেত্রে নিজেদেরকে এবং নিজেদের মন্দিরকে কেন্দ্রীয়ভাবে দেখানোর মাধ্যমে এসব রাজা মহাজাগতিক কাজে তাদের মহাপ্রভুর পৃষ্ঠপোষককে অনুকরণ করতো। বিজয় সেন তাই ঘোষণা করেন:

> [রাজা] একটি সুউচ্চ প্রদ্যুম্নেসবর অট্টালিকা নির্মাণ করলেন, যার বাহু ও স্তম্ভপীঠ এবং মূল কাঠামো অনেকগুলো মহলে বিভক্ত এবং মধ্য ও শীর্ষভাগ মহাসমুদ্রের মতো বিস্তৃত-(এটা) পূর্ব ও পশ্চিমের পর্বতমালার, যেখান থেকে সূর্য উঠে ও ডোবে মধ্যাহ্ন পর্বত, সেই ভবনের মূল স্তম্ভ যা ত্রিভুবন ও পর্বতমালার অবশিষ্টাংশ....। যদি সৃষ্টিকর্তা একটি কলস গড়তেন, যা পৃথিবীর চক্র সুমেরুর উপর ঘূর্ণায়মান এক তাল কর্দমের ন্যায় তবে সেটি এমন এক বস্তু যার সাথে তুলনীয় এই (মন্দিরের) শীর্ষদেশে তিনি (রাজা) যে স্বর্ণকলস স্থাপন করেছেন।[৫০]

সেন রাজারা তাদের পৃষ্ঠপোষক দেবতার সম্মানে 'মহাদান' অনুষ্ঠানের আয়োজন করেও তাদের রাজকীয় কর্তৃত্ব প্রদর্শন করতো, বাংলায় তুর্কী বিজয়ের সময়কালীন শেষ রাজা লক্ষণ সেনের পৃষ্ঠপোষক দেবতা ছিল বিষ্ণু। যদিও এই মহাদেবতাই 'মহাদান'-এর ধর্মাচার গ্রহণ করতো, কিন্তু অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতরাই কার্যত তা লাভ করতো।[৫১]

বাঙালি হিন্দু সভ্যতার বিকাশ

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে মহাজাগতিক প্রভু সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় দর্শন, স্মারকমন্দির এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা সবকিছুই সেনদের ধর্মীয় ও

---

৫০. দুর্ভাগ্যজনকভাবে রাজশাহী শহর থেকে প্রায় সাত মাইল উত্তর-পশ্চিমে গোদাগাড়িগামী সড়কের দেওপাড়ায় অবস্থিত এক সময়ের জাঁকজমকপূর্ণ স্থাপনাটির শুধুমাত্র সামান্য ভগ্নাংশ টিকে আছে। প্রাগুক্ত ৫৪-৫৫।

৫১. আমরা তাই পড়ি, লক্ষণসেন আবাদী, নিষ্কর জমি দান করলেন "সোনার ঘোড়া ও গাড়ি প্রদানের মহাদান অনুষ্ঠানের পারিশ্রমিক হিসেবে, এই শুভদিনে, যথাযথভাবে পানি স্পর্শ করে ও মহাদেব নারায়ণের (বিষ্ণু) নাম উচ্চারণের পর, আমার পিতামাতা ও আমার প্রশংসা ও খ্যাতির জন্য, যতদিন চাঁদ, সূর্য ও পৃথিবী টিকে থাকবে, *ভূমিচ্ছিদ্রের* (নিষ্কর অবস্থা) নীতিমালা অনুযায়ী, ঈশ্বরদেবশর্মমান, যিনি 'স্বর্ণঅশ্ব ও বাহনের মহাদানে' ছিলেন আচার্য (পুরোহিত)।" প্রাগুক্ত ১০৪।

রাজনৈতিক মতাদর্শের কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তবে এটা ঠিক নয় যে, বাংলা বদ্বীপের সকল অংশেই সে সময়ে প্রাথমিক ইন্দো-আর্য সভ্যতা এবং তার পরবর্তী হিন্দু শাখা-প্রশাখা সমানভাবে বিস্তৃত হয়েছিল। বরং প্রাপ্ত প্রমাণাদিতে এটাই দেখা যায়, উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম উপ-অঞ্চলেই ইন্দো-আর্য ও হিন্দু সভ্যতা অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে তুলনায় বাংলার পূর্বাঞ্চলে কৃষিকরণ এবং হিন্দুকরণ উভয়টিই অনেক কম হয়েছিল। প্রাক-ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভূমি ব্যবহার ও বসতি স্থাপনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই এর উদাহরণ পাওয়া যায়। বর্তমানে সিলেট নামে পরিচিত বদ্বীপটির দূরবর্তী পূর্ব প্রান্তে ৭ম শতাব্দীর একটি ভূমিদানের দলিলে এর প্রমাণ মেলে। এতে দানকৃত অংশটির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এভাবে, 'মানব বসতির বাইরে অবস্থিত এই স্থানে প্রকৃতি ও কৃত্রিমতার মধ্যে কোন্ পার্থক্য নেই, বন্য প্রাণী ও বিষাক্ত সরীসৃপে পূর্ণ এবং ঘন জঙ্গলে ঢাকা।'[৫২] এসব অকর্ষিত ভূমিতে উপনিবেশ গড়ে তোলা এবং চাষাবাদের আওতায় আনার জন্যই বিভিন্ন ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী ও বৌদ্ধ মঠগুলোকে দান করা হতো।[৫৩] আরেকটি লিপিতে দেখা যায়, দশম শতাব্দীতে চন্দ্ররাজা সিলেটে প্রায় এক হাজার বর্গমাইলের বিশাল এলাকা আটটি মঠের বাসিন্দাদের দান করেছেন, প্রায় ছয় হাজার ব্রাহ্মণও সেখানে বসতি স্থাপন করেছে।[৫৪]

কিন্তু পশ্চিমে অবস্থা ছিল ভিন্ন। ভাগিরথি-হুগলি অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের এককভাবেই সাধারণত ভূমিদান করা হতো এবং তা ছিল ছোট আকারের। নবম শতাব্দীর পর এলাকার রাজকীয় শক্তিগুলোর লক্ষ্য ছিল ইতোমধ্যেই চাষাবাদের আওতায় আসা ভূমিতে ব্রাহ্মণদের সমর্থন দেওয়া, নতুন বসতি স্থাপন নয়। এসব দানপত্রে চাষযোগ্য ভূমির পরিমাপ, রাজস্ব আয়ের ধরন এবং গ্রামবাসীদেরকে নগদে কর প্রদান ও দান গ্রাহকদের প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশদানের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।[৫৫] এ সমস্ত বিধি-বিধান থেকে বোঝা যায়, পূর্বাঞ্চলের দূরবর্তী ও অধিক জঙ্গলময় এলাকা থেকে ভাগিরথি-হুগলি অঞ্চলটি ছিল তুলনামূলক বেশি ঘন বসতিপূর্ণ, কৃষিকরণের মাত্রা ছিল অনেক বেশি এবং ধান চাষও হতো ব্যাপকভাবে।

নগরায়নের ধরনের ক্ষেত্রেও পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাত্ত ব্যবহার করে ব্যারি মরিসন প্রাচীন বাঙলার প্রধান ছয়টি রাজকীয় প্রাসাদের মোট এলাকার তুলনামূলক চিত্র তৈরি করেছেন।[৫৬]

---

৫২. উদ্ধৃতি, Niyogi, *Brahmanic Settlements*. 41.
৫৩. Bhattacharya, *Landschenkungen*. 168.
৫৪. Morrison. *Political Centers*. 98.
৫৫. Ibid. 17. 99. Bhattacharya. *Landschenkungen*. 168.
৫৬. Morrison. *Lalmai*. 124.

পুণ্ড্রনগর	২২,৫৫৫,০০০ বর্গফুট
পাণ্ডুয়া	১৩,১৮৬,৮০০ বর্গফুট
গৌড়	১০,০০০,০০০ বর্গফুট
কটিবর্ষ	২,৭০০,০০০ বর্গফুট
বিক্রমপুর	৮১০,০০০ বর্গফুট
দেবপর্বত (লালমাইতে)	৩৬০,০০০ বর্গফুট

এগুলোর বৃহত্তম চারটিই বরেন্দ্র বা উত্তর-পশ্চিম বাংলার নগরগুলোতে অবস্থিত, অন্যদিকে বিক্রমপুর ও দেবপর্বতের রাজকীয় প্রাসাদগুলো পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে (লালমাই-এ) অবস্থিত এবং এগুলো তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট (দ্রষ্টব্য মানচিত্র ১)। এ বিষয়টির মাধ্যমে বরেন্দ্র এলাকার রাজনৈতিক গুরুত্বও উপলব্ধি করা যায়, পার্শ্ববর্তী মগধ ও মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমির কেন্দ্রভূমিতে থাকায় এলাকাটি সব সময় ইন্দো-আর্য সভ্যতার কেন্দ্রভূমির নিয়ন্ত্রণের লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অধিকন্তু প্রাসাদের আকার সম্পর্কিত উপাত্ত বদ্বীপটির দক্ষিণ ও পূর্বদিকের চেয়ে উত্তর-পশ্চিমাংশের নগরায়নের পরিমাণ ও ঘন জনসংখ্যার বিষয়টি উপস্থাপন করে। বৃহত্তর নগরগুলোর উপস্থিতিও পেশাগত উপযোগিতা এবং সামাজিক বিন্যাসের প্রমাণ করে। প্রাচীন মগধের মতো বাংলাতেও নগরজীবনের অগ্রগতির সাথে সাথে ইন্দো-আর্য সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রের বিস্তার ঘটে।

বদ্বীপটির পূর্বাংশের তুলনায় পশ্চিমাংশে ইন্দো-আর্য সংস্কৃতির বৃহত্তর অনুপ্রবেশের অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তার একটি হলো জলবায়ু সংক্রান্ত স্থায়ী অবস্থা। গাঙ্গেয় সমভূমির যতই পূর্বদিকে যাওয়া হয়, মৌসুমী বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পায় এবং বদ্বীপটির অভ্যন্তরে পূর্বাঞ্চলে ক্রমাগত তা বাড়তেই থাকে। বর্তমানকালের পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ এলাকা নিয়ে গঠিত ভাগিরথি-হুগলি অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৫৫ ইঞ্চি, অথচ মধ্য ও পূর্ববঙ্গে এর পরিমাণ ৬০ থেকে ৯৫ ইঞ্চি, মেঘনার মোহনায় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০ থেকে ১২০ ইঞ্চি, পূর্বাঞ্চলীয় সিলেটে তা ১৫০ ইঞ্চি।[৫৭] জলবায়ুর এই ধরনটা প্রাচীনকালেও যদি একই রকম থেকে থাকতো, তবে সেসময়ে পূর্বদিকে যতই অগ্রসর হতো, শালবনসহ ঘন বন-জঙ্গলের ঘনত্ব ততই বাড়তো।[৫৮] লোহার সরঞ্জামের ব্যবহার সত্ত্বেও বদ্বীপটির পশ্চিমাংশের কম ঘন বনের তুলনায় এসব ঘন বন কাটার জন্য অনেক বেশি শ্রম ও সংগঠনের প্রয়োজন হতো।

৫৭. Spate and Learmonth, *India and Pakistan*. 575.

৫৮. Ibid. 63; Anil Rawat. "Life, Forests and Plant Sciences in Ancient India," in *Hisotry of Forestry in India*. ed. Ajay S. Rawat (new Delhi: Indus Publishing Co., 1991). 246.

বাংলায় আগত ও এর অভ্যন্তরে ব্রাহ্মণ অভিবাসীদের অবস্থাও ছিল বৈশিষ্ট্যসূচক। পশ্চিমবঙ্গ ছিল ভৌগোলিকভাবে উঁচু ও মধ্য গাঙ্গেয় এলাকা সংলগ্ন, অনেক আগে থেকেই ইন্দো-আর্য সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হিসেবে তার প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। তাই নবম শতাব্দীতে সেখান থেকে যখন জ্ঞানগত ও ধর্মাচারগতভাবে পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মণদের অধিকতর হারে বাংলায় অভিবাসন ঘটে, তখন বদ্বীপের পশ্চিমাংশেই তারা সর্বাধিক পরিমাণে উর্বরা জমি পেয়েছিল। অন্যদিকে অধিকতর পূর্বদিকে তথা আধুনিককালের কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে যারা ভূমি বন্দোবস্ত পেয়েছিল তারা ছিল স্থানীয় ব্রাহ্মণ কিংবা বদ্বীপের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আগত অভিবাসী।[৫৯] অর্থাৎ ধর্মীয় মর্যাদার ভিত্তিতে ভূমি বিভক্ত হয়েছিল, উচ্চতর পদবিধারী ব্রাহ্মণরা উত্তর ও পশ্চিমাংশে বসতি স্থাপন করেছিল, আর নিম্নতর পদবিধারীরা ক্রমান্বয়ে পূর্বদিকে অপেক্ষাকৃত কম বসতিপূর্ণ স্থানে গিয়েছিল।

পরিশেষে, বদ্বীপটির পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের আর্যকরণের পার্থক্য নির্ণীত হয় প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক তীর্থস্থানের মাধ্যমে, ব্রাহ্মণদের ঘোষিত ধর্মাচারগতভাবে বিশুদ্ধ গঙ্গানদীর সাথে সম্পর্ক রেখে। ইন্দো-আর্যদের বদ্বীপটিতে আগমনের সাথে সাথেই নদীটি মহাপবিত্রতা মর্যাদা লাভ করে,[৬০] এবং তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে নদীটির পাড়ে অসংখ্য তীর্থস্থান তৈরি করে। উদাহরণ হিসেবে নবদ্বীপ, কাটোয়া, ত্রিবেনী, কালীঘাট ও গঙ্গাসাগরের কথা উল্লেখ করা যায়। অন্যদিকে বদ্বীপটির পূর্বাঞ্চলের কথা উল্লেখ করে ভূগোলবিদ এস সি মজুমদার বলেন, 'ভাগিরথির ভাটিতে পদ্মা সংলগ্ন এ ধরনের কোন পবিত্র স্থান নেই, নদীটির তীরে নেই কোন তীর্থস্থান।[৬১] এর কারণ হলো প্রাক- ঐতিহাসিককাল থেকে বদ্বীপটিতে ব্রাহ্মণদের বসতি স্থাপনের মূল সময় পর্যন্ত গঙ্গার প্রধান স্রোতধারা বর্তমানে ভাগিরথি-হুগলি নামে পরিচিত শাখাটির মাধ্যমে বাংলার সর্বপশ্চিম ভাগের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতো। ষোড়শ শতাব্দী অর্থাৎ তুর্কী বিজয়ের দীর্ঘ দিন পর থেকে গঙ্গার প্রধান স্রোত পদ্মার মাধ্যমে প্রবাহিত হতে থাকে। ফলশ্রুতিতে নদীটির পবিত্রতা পশ্চিম বঙ্গের

৫৯. Bhattacharya, *Landschenkungen*, 167-68.

৬০. গঙ্গা ধর্মমতটি অত্যন্ত প্রাচীনকালের, এবং পানির সাথে জীবন, উর্বরতার সম্পর্ক ও দেবীর অস্তিত্ব সিন্ধু সভ্যতায়ও দেখা যায়। আমরা খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে রচিত অর্থশাস্ত্র (৪.৩) থেকে জানতে পারি, খরা থেকে পরিত্রাণের জন্য গঙ্গায় প্রার্থনা করা হতো। ষষ্ঠ শতক নাগাদ গঙ্গাদেবীর চিত্র গুপ্ত সাম্রাজ্যের (আনুমানিক ৩০০-৫৫০) মন্দিরগুলোতে রক্ষকদেবীর মর্যাদা পেয়েছিল। দেখুন *The Ganges in Myth and History* (Honolulu: University Press of Hawaii, 1978), 88.

৬১. S.C. Majumder, *Rivers of the Bengal Delta* (Calcutta: University of Calcutta Press, 1942), 66. See also Surinder Mohan Bhardwaj, *Hindu Places of Pilgrimage in India* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1973), 36-37, 81; Schwartzberg, ed., *Historical Atlas*, 34.

অংশেই স্থায়ী হয়ে যায়, এমনকি এখনো ভাগিরথি-হুগলি নদীটিকে অনেক সময়ে আদি-গঙ্গা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, অন্যদিকে ইন্দো-আর্য সভ্যতার সাথে বাংলার প্রবল মোকাবেলার সময়কালে বদ্বীপটির পূর্বাঞ্চলের দু-তৃতীয়াংশ গঙ্গা থেকে আলাদা হয়ে পড়ে, ফলে ইন্দো-আর্য পবিত্রতা এবং পুরাণতত্ত্বের কেন্দ্রভূমি উত্তর ভারত থেকে বাংলা প্রতীকীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে করতোয়ার পশ্চিম অংশের অধিকাংশ এবং সেই সাথে ভাগিরথি-হুগলি সমভূমি এলাকা সেন রাজবংশের অনুসৃত হিন্দু সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধে লীন হয়ে যাওয়া কৃষিকাজে নিয়োজিত লোকদের বসতিতে পরিণত হয়। সেখানকার আদিবাসী গোত্রগুলোও ব্রাহ্মণ নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থায় বেশ ভালভাবেই আত্মীকৃত হয়ে পড়ে। কিন্তু বদ্বীপটির মধ্যাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশাল এলাকায় ইন্দো-আর্য সভ্যতা তেমন বিকশিত হতে পারেনি। ঢাকা এলাকায় বিক্রমপুর নগরী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার প্রায় সকল তাম্রলিপি এখান থেকেই ইস্যু করা সত্ত্বেও আকার ও পবিত্রতার দিক থেকে শহরটি পশ্চিমস্থ তার প্রতিবেশীদের তুলনায় সংকুচিত হতে থাকে। সর্বদক্ষিণ-পূর্বে লালমাই-ময়নামতিতে বিরল শৈল্পিক ঐতিহ্যমণ্ডিত[৬২] আকর্ষণীয় নগর কমপ্লেক্স, বৌদ্ধ পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপক ইতিহাস এবং মুদ্রাকেন্দ্রিক অর্থনীতি থাকা সত্ত্বেও যে কারণেই হোক না কেন পশ্চিমের গাঙ্গেয় সংস্কৃতি থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন দেখা যায় এবং ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কের সাথেই তাকে ব্যাপকতর সম্পর্ক রাখতে উৎসাহিত মনে হয়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, পূর্বাঞ্চলীয় বদ্বীপে বিশেষ করে বৃহত্তর নদীব্যবস্থা সমৃদ্ধ উপত্যকাগুলোতে যেমন বিক্রমপুর ও লালমাই-এ, কৃষিকরণ নিশ্চিতভাবেই শুরু হলেও বাংলার পশ্চিম উত্তর-পশ্চিমাংশের মতো সেখানে তা বিকশিত হয়নি। করতোয়ার পূর্ব এবং পদ্মার দক্ষিণ ভাগ বনাঞ্চল ও জলাভূমিতে প্রধানত অনার্য গোত্রগুলোও বসবাস করতে থাকে, তারা তখনও মগধ ও পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ স্থানে বিপ্লব সৃষ্টিকারী কৃষিব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয়নি। ফলে ১২০৪ সালে মোহাম্মদ বখতিয়ারের অশ্বারোহী বাহিনী যখন পশ্চিমাঞ্চলীয় সেননগরী নদীয়া দখল করে, তখন রাজা লক্ষণ সেন ও তার পারিষদবর্গ পূর্বাঞ্চলে এই পশ্চাদভূমিতেই পালিয়ে যায়। বাংলার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সীমান্তগুলো যখন অব্যাহতভাবে পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন এ অঞ্চলের পথপ্রদর্শকদের পরবর্তী প্রজন্মরাই তাদের সমস্ত শক্তি সন্নিবেশিত করে সে কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিল।

---

৬২. Asher. *Art of Eastern India*, 69. Huntington, *"Pala-Sena" Schools*, 200.

২ রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রকাশ

পৃথিবী একটা উদ্যান, যার মালি হলো রাষ্ট্র।

ফখরউদ্দিন রাজি (মৃত্যু ১২০৯)

আমরা সুলতানের সামনে উপস্থিত হলাম। তিনি একটি অলংকৃত বিশাল সোফায় বসেছিলেন, তাতে অসংখ্য মূল্যবান পাথর ও ক্ষুদ্র মুক্তা বসানো বিভিন্ন আকারের কুশন ছিল। আমরা দেশটির প্রথা অনুযায়ী হাত দুটি বুকে রেখে মাথা যতটুকু সম্ভব নীচু করে তাঁকে শুভেচ্ছা জানালাম।

—বাংলায় আগত জনৈক পর্তুগীজ কর্মকর্তা (১৫২১)

প্রাক-আধুনিক বাংলায় মুসলমানদের ক্ষমতার ভৌগোলিক সম্প্রসারণের রেখাচিত্র আঁকা বেশ সহজ। সাধারণভাবে প্রাক-আধুনিক মুসলিম বিশ্বের মতো বদ্বীপটির যে কোন নির্দিষ্ট এলাকায় মসজিদ, দরগাহ, মাদরাসা কিংবা সামরিক বা বেসামরিক অন্যান্য ভবনের নির্মাণস্থানটি মুসলিম রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে বলেই ধরে নেওয়া যায়। এ ধরনের ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত শিলালিপি প্রাপ্তি তাই রাজনৈতিক সম্প্রসারণের এক ধরনের প্রমাণ। মুদ্রার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যেহেতু ক্ষমতাসীন রাজাগণ তাদের সার্বভৌমত্বের নিদর্শন হিসেবে নিজস্ব মুদ্রা তৈরির অধিকারের ঈর্ষণীয় দাবি করতেন, তাই টাকশাল-শহরের সংখ্যা বৃদ্ধি মুসলিম রাজ্যগুলোর ভূখণ্ডগত সম্প্রসারণের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়। শিলালিপি ও মুদ্রা এ দুধরনের উৎস তাই বিভিন্ন সময় ও প্রেক্ষাপটে বাংলায় মুসলিম রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সম্প্রসারণের অবস্থা পরিস্ফুটিত করে, যা ২ নম্বর মানচিত্রে দেখানো হয়েছে।

তবে শাসক এবং শাসিত জনসাধারণ উভয়ের কাছেই কর্তৃত্বের অর্থ পরিবর্তনের বিষয়টি উপলব্ধি করা অনেক বেশি কষ্টকর। সকল রাজনৈতিক আচরণ তার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অর্থ পেয়ে থাকে। একইভাবে, শাসকবৃন্দ ও তাদের প্রজাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি একই হলে, শাসককুল তখন সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব পেয়ে থাকে।[১] কিন্তু বাংলায় 'বিজয়ী রাজবংশগুলোর' ক্ষেত্রে, যেখানে বিজয়ী শ্রেণীর সংস্কৃতি

১. এখানে *কর্তৃত্ব* ও *ক্ষমতা* এই শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য করা গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাক্স ওয়েবার ক্ষমতাকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে: "এমন এক সম্ভাব্যতা যেখানে কোন নায়ক একটি সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে এমন এক অবস্থানে থাকেন, যাতে এই সম্ভাব্যতার অবস্থানের ভিত্তি নির্বিশেষে প্রতিরোধ সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিজের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম।" সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক প্রতীকীর প্রকাশ

ও প্রজাদের সংস্কৃতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান, সেখানে পরিস্থিতি কেমন হতে পারে? কিন্তু এ ধরনের পরিস্থিতি সত্ত্বেও দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে শাসকরা কিভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণ কার্যকর রাখলেন? এর উত্তরে একথা বলা যায়, শুধুমাত্র সেনানিবাস, টাকশাল শহর এবং প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকসমূহের অগ্রগতির মাধ্যমেই বাংলার রাজনৈতিক সীমান্ত বোঝা যায় না। পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতার আরও সূক্ষ্ম কোন বিষয়ও সম্পৃক্ত ছিল, কিংবা তা না থাকলে, ১২০৪ সালের মতো, শাসক শ্রেণী ও শাসিত জনসাধারণের মধ্যে বৈধ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সম্পর্কিত ধারণায় মৌলিক পার্থক্য ছিল। কর্তৃত্বের এসব ধারণা একে অন্যের সাথে বৈচিত্র্য বা সমরূপতা বিভিন্ন সময়ে রূপান্তরিত হয়েছে, সামরিক উপস্থিতির বাইরেও একটি অস্পষ্ট রাজনৈতিক সীমান্ত গড়ে উঠেছে। তবে তারপরও বাংলার প্রাক-আধুনিক ইতিহাসের গতিশীলতা উপলব্ধি করা আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রশ্নে পারসো-ইসলামী ধারণা (একাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী)

মুহাম্মদ বখতিয়ার যখন ১২০৪ সালে উত্তর-পশ্চিম বাংলা বিজয় করেন, তখন সমগ্র বিশ্বে একজন আরব খলিফা সংক্রান্ত এককেন্দ্রিক ইসলামী দর্শন সম্পর্কিত ইসলামী চিন্তাধারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের দর্শন অনুযায়ী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর 'উত্তরসুরি' হিসেবে খলিফা সমগ্র বিশ্বের মুসলমান সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ও প্রশাসনিক উভয় নেতা। তবে ৭৫০ সাল থেকে বাগদাদ থেকে শাসিত খিলাফত রাষ্ট্র নীতিগতভাবে সারাবিশ্বে মুসলমান সম্প্রদায়ের শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিষয়টিই প্রকাশ করতো। কিন্তু দশম শতাব্দী থেকে ইসলামী রাষ্ট্রটি সংকুচিত হতে থাকে এবং আরো তাৎপর্যপূর্ণভাবে শুধুমাত্র ভূখণ্ডগত দিক দিয়ে নয়, রাজনৈতিক-আধ্যাত্মিক যৌথ নেতৃত্ব প্রদানে তার সামর্থ্য অনেক কমে আসে। সেই সাথে নবম থেকে একাদশ শতাব্দীকালে এশিয়ার মধ্যাঞ্চল থেকে তুর্কী ভাষাভাষী বিভিন্ন গোত্র, উপজাতি খিলাফত রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে সমবেত হয়। নেতিয়ে পড়া আব্বাসী সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য সামরিক দাস-সৈন্য হিসেবে তাদের নিয়োগ করা হয়েছিল, কিন্তু যাযাবর পশুপালক কিংবা সশস্ত্র অভিযানকারী যে হিসেবেই হোক না কেন এসব তুর্কী খোরাসানে তথা বর্তমানকালের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ইরান, পশ্চিম আফগানিস্তান, অক্ষু (আমু দরিয়া) নদীর দক্ষিণে অবস্থিত মধ্য এশিয়া

বিশ্লেষণ করতে যেয়ে বর্তমান অধ্যায়ে ওয়েবার যাকে 'এই সম্ভাব্য অবস্থানের' ভিত্তি হিসেবে বুঝেছেন অর্থাৎ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বলেছেন, তার উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, ed., and trans. A.M. Henderson and Talcott Parsons (New York: Oxford University Press, 1947), 152.

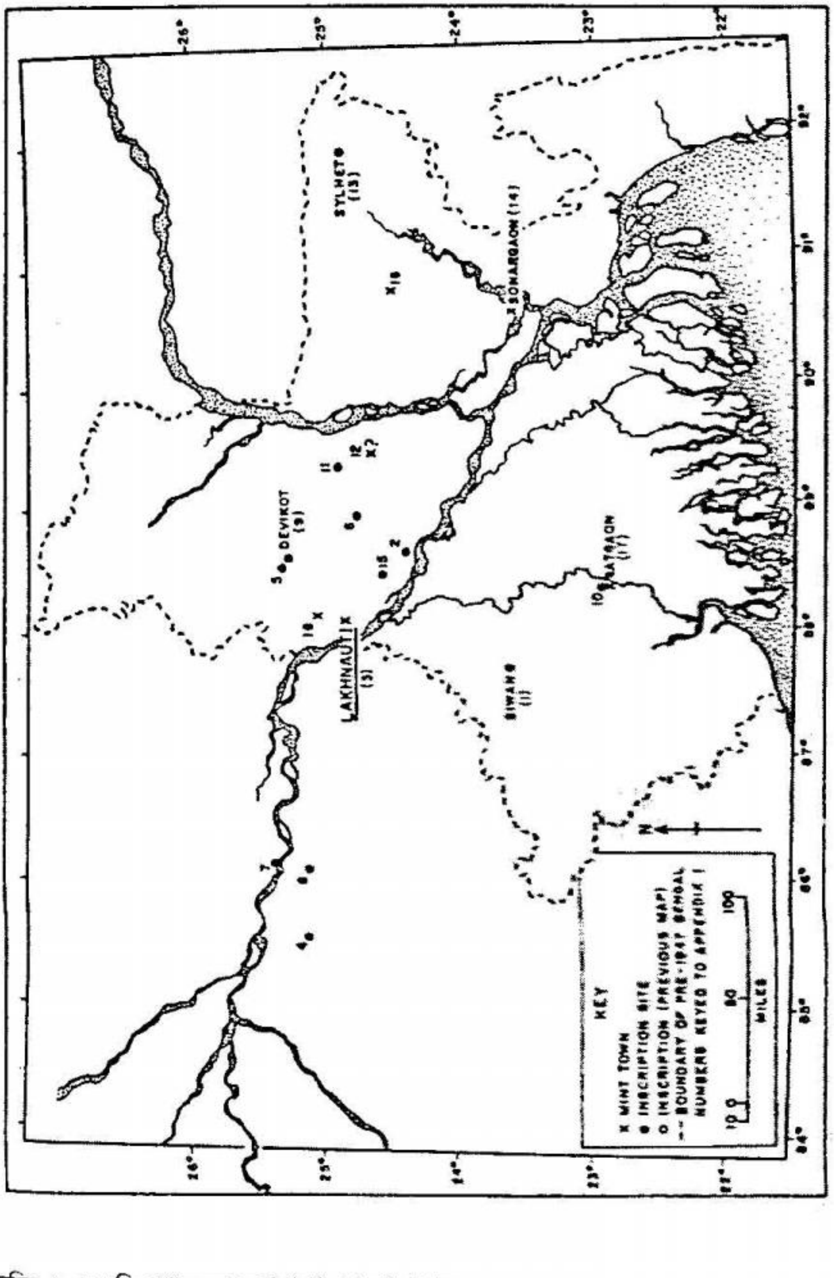

মানচিত্র ২। মুসলিম শাসনের সম্প্রসারণ, ১২০৪-১৭৬০

ক) ১২০৪-১৩৪২: সুবেদার (গভর্নর) বলবনি শাসক, শামসউদ্দিন ফিরোজ ও উত্তরসুরিবৃন্দের আমলে (১২০৪-৮১: ১২৮১-১৩০০; ১৩০১-২২; ১৩২২-৪২)

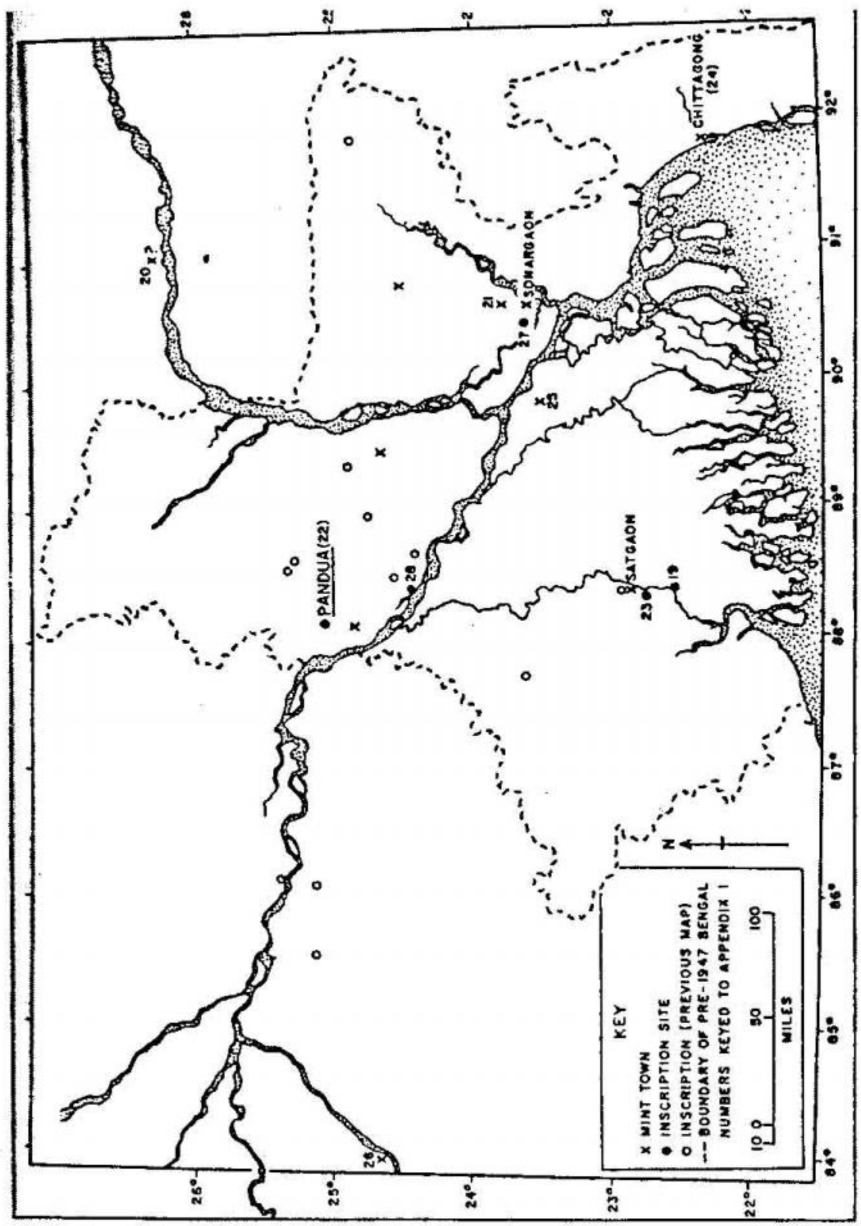

খ) ১৩৪২-১৪৩৩: ইলিয়াস শাহী ও রাজা গণেশের রাজবংশের আমলে (১৩৪২-১৪১৪; ১৪১৫-৩৩)

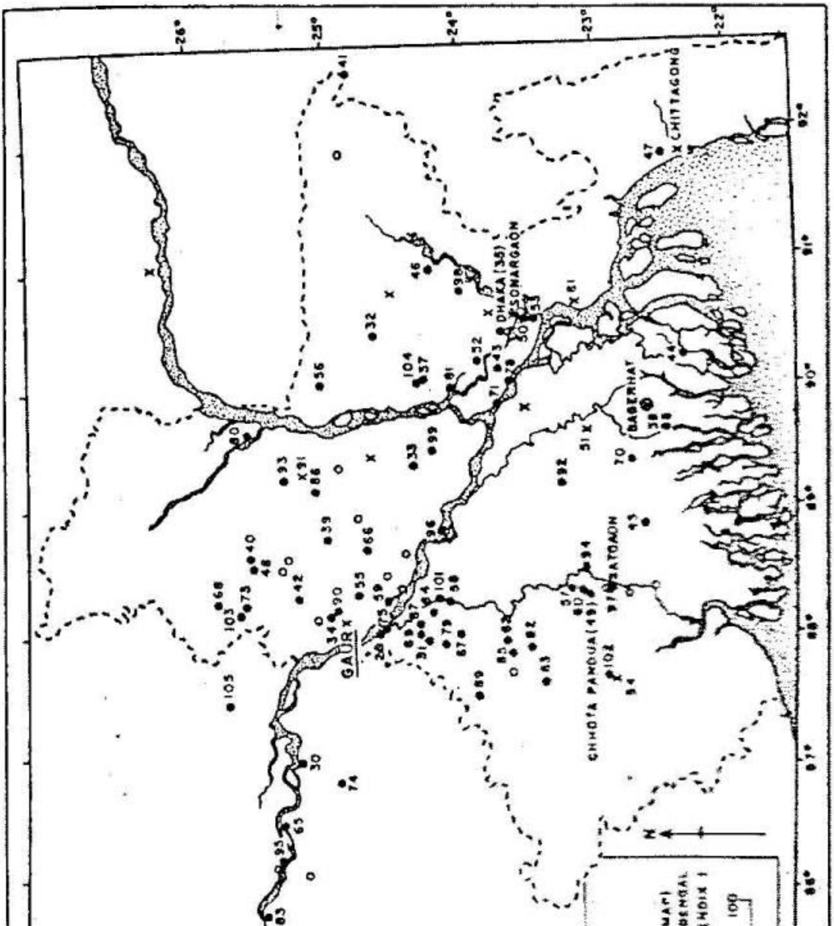

গ) ১৪৩৩-১৫৩৮: পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ইলিয়াস শাহী, আবিসিনীয় রাজা, ও হোসেন শাহী আমলে (১৪৩৩-৮৬; ১৪৮৬-৯৩; ১৪৯৩-১৫৩৮)

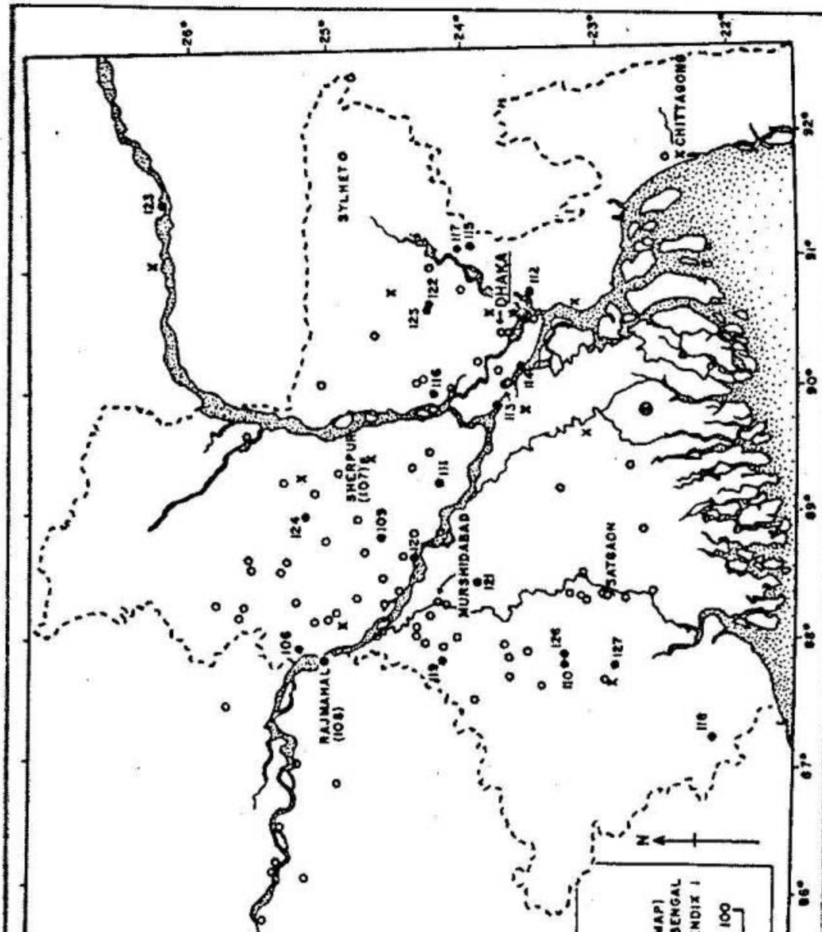

ঘ) ১৫৩৮-১৭৬০; আফগান ও মোগল আমলে (১৫৩৮-৭৫; ১৫৭৫-১৭৬০)

নিয়ে গঠিত বিশাল এলাকায় বসতি স্থাপন করে। বাগদাদের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়ায় তুর্কী সামরিক শক্তি কিছু ইরানি, কিছু তুর্কী ইত্যাদি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠায় সামরিক ভিত্তি প্রদান করে, আর এর মাধ্যমে তারা নিজেদের খোরাসানের প্রকৃত শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

এ সব জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক ঘটনার সাথে কাকতালীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও সাধিত হয়। খোরাসান শুধুমাত্র ইরানী মালভূমি ও ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশের মধ্য এশিয়ার প্রবেশদ্বারই ছিল না। এই অঞ্চলেই আরব-ইসলামী শাসনের প্রথমদিকে ব্যাপকভাবে মিশে যাওয়া ইরানের সমৃদ্ধ সভ্যতা সৃষ্টিশীলতার সাথে পারসিক ও আরব-ইসলামী সভ্যতার সাথে মিথষ্ক্রিয়া ঘটিয়ে নতুন করে বিকশিত হয়েছিল। সেই সময়ে পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় বাগদাদের কর্তৃত্ব বেশ দুর্বল হয়ে পড়ার প্রেক্ষাপটে এ এলাকায় সৃষ্ট বেশ কয়েকটি রাজবংশ, বিশেষ করে তাহিরি, সাফারি, সামানি ও গজনভি, নব বিকশিত পারসো-ইসলামী সভ্যতার অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিল। গজনভিরা (৯৬২-১১৮৬) জাতিগতভাবে তুর্কী হলেও ইরানের মহান মহাকবি ফেরদৌসি (মৃত্যু ১০২০) সহ ফারসি সাহিত্যের উজ্জ্বলতম 'নক্ষত্রগুলোকে' তাদের রাজদরবারে আকৃষ্ট করার মাধ্যমে ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতি পুনর্জাগরণে উৎসাহিত করে। গজনভি শাসকরা সরকারি কাজে ফারসি ভাষা ব্যবহার করে, তারা পারসিক রাজদরবারে প্রচলিত আদব-কায়দা গ্রহণ করে এবং শিল্পকলা, ক্যালিওগ্রাফি ও হস্তশিল্পে পরিস্ফুটিত পারসি নান্দনিক দর্শনকে উৎসাহিত করে। তারা নিজেদেরকে বাগদাদে ক্ষমতাসীন আব্বাসী খলিফার 'নিযুক্ত' প্রতিনিধি হিসেবেও মেনে নেয়। বাস্তবিকই, সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী গজনভির তুর্কী সৈন্যরা সুন্নি ইসলামের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ, রক্ষাকর্তা ও প্রচারের আন্তরিকতা প্রদর্শন করতে থাকে।[২].

এই গজনভিরাই পারসো-ইসলামী সভ্যতাকে ভারতে প্রথম নিয়ে আসে। অধিকতর শক্তিশালী তুর্কী কনফেডারেশন সেলজুকরা তাদেরকে পেছন থেকে চাপ দিয়ে দিয়ে ১০৪০ সালে তাদের থেকে পুরো খোরাসান দখল করে নেয়, এমতাবস্থায় গজনভি সেনাবাহিনী আরো পূর্বদিকে তথা উপমহাদেশে, প্রথমে আফগানিস্তান এবং পরে পাঞ্জাবের লাহোরের দিকে, এগুতে থাকে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আফগানিস্তানের পার্বত্য এলাকার ঘোরের সরদারদের নিয়ে গঠিত আরেকটি তুর্কী কনফেডারেশনের কাছে গজনভিরা নিজেরাই পর্যুদস্ত হয়। ১১৮৬ সালে মুহাম্মদ ঘোরি লাহোর দখল করে সেখানকার গজনভি শক্তিকে ধ্বংস করেন, সাত বছর পরে তিনি দিল্লীতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এ ঘটনার এক দশক পর ঘোরির

২. Marilyn Robinson Waldman, *Toward a Theory of Historical Narrative: A Case Study in Perso-Islamicate Historiography* (Columbus: Ohio State University Press, 1988), 30.

সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা মুহাম্মদ বখতিয়ার দ্রুতবেগে নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি ও বাংলায় নেমে আসেন।

কয়েকশত বছর ধরে খোরাসানে যে রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা দানা বেঁধে উঠেছিল, ১২০৪ সালে বাংলায় প্রবেশের আগেই মোহাম্মদ বখতিয়ার এবং তার তুর্কী অনুসারীরা সেসব ঘটনার ঐতিহ্য অনুসরণ করেছিলেন। এ সময় ইরানি আলেমগণ শাসনকার্য সম্পর্কিত উত্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করছিলেন, ক্ষয়িষ্ণু আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাগুলোতে সদ্য ক্ষমতালাভকারী তুর্কী গ্রুপগুলোর বাস্তবতা এবং একক ইসলামী রাষ্ট্রের চিরায়ত ধারণার মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করছিলেন তাঁরা। এর ফলে শাসক সম্পর্কে পরিবর্তিত যে দর্শনের সৃষ্টি হলো, তাতে নীতিগতভাবে আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে খলিফার কর্তৃত্ব সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে কার্যত পার্থক্য সৃষ্টি করা হলো। বাগদাদের খলিফার হাতে ধর্মীয় কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকলেও তরবারির শক্তিতে বিজয়ীর হাতেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব বর্তালো। খারাপ পরিস্থিতিতে সর্বোত্তম কাজটি করার কৌশল হিসেবে সে যুগের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ আবু হামিদ আল গাজ্জালি (মৃত্যু ১১১১) মত দেন যে কোন শাসক বা সুলতান তার এলাকায় যতদিন পর্যন্ত খলিফার তাত্ত্বিক কর্তৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নেবে, সে সরকার ততদিন পর্যন্ত বৈধ থাকবে। ইমাম গাজ্জালি বলেন, শাসক বা সুলতান খুতবায় ক্ষমতাসীন খলিফার নাম অন্তর্ভুক্ত ও তার নামে মুদ্রা (সিক্কা) প্রকাশ করে তা করতে পারে।[৩] সংক্ষেপে বলতে গেলে, সুলতানের কর্তৃত্ব খোদাপ্রদত্ত নিযুক্তি বা জাতিগত উত্তরাধিকারের মাধ্যমে পাওয়া যেত না, বরং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও জনশৃংখলা বিধানের মাধ্যমেই সুলতানের কর্তৃত্ব বহাল থাকতো।[৪]

এভাবেই শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত প্রাক-ইসলামী পারসিক ভাবাদর্শ বিশেষ করে শক্তিশালী শাসনযন্ত্র সম্পর্কিত সমাজের আনুষঙ্গিক প্রয়োজন এবং সেই সাথে ন্যায়বিচারের সাথে শাসন করার শাসকের কর্তব্য খলিফার পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে

---

৩. Ann K. S. Lambton, *State and Government in Medieval Islam* (New York: Oxford University Press, 1981), 106-29. See also Erwin I.J. Rosenthal, *Political Thought in Medievel Islam: An introductory Outline* (Cambridge: Cambridge University Press 1962), 42-43.

৪. সেলজুক সুলতানদের ইরানি প্রধানমন্ত্রী নিজাম উল-মুলক (মৃত্যু ১০৯২) রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার একটি বিস্তৃত নেওটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য এমনকি তিনি তাঁর তুর্কী পৃষ্ঠপোষকদের মন্ত্রণা পর্যন্ত দিয়েছিলেন। তাঁর মহান সৃষ্টকর্ম *সিয়াসত-নামা* ('সরকারের গ্রন্থ') একজন অভিজ্ঞ ইরানি প্রশাসকের নতুন তুর্কী শাসকদের প্রাক-মুসলিম পারস্য রাজতন্ত্রের স্বৈরশাসনের ঐতিহ্যে একীভূত করার প্রয়াস। দেখুন, *The Book of Government, or Rules for Kings: The Siyar al-Muluk or Siyasat-nama of Nizam al-Mulk,* trans. Hubert Darke, 2d ed. (London: Routledge & Kegan Paul, 1978).

আকস্মিকভাবে সৃষ্ট সালতানাতের অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছিল।[৫] হিরাতে বসবাসকারী ইরানি পণ্ডিত ও আইনজ্ঞ ফখর আল-দ্বীন রাযী (মৃত্যু ১২০৯) বেশ কয়েকজন খোরাসানি শাসক বিশেষ করে তুর্কীদের ঘোরি রাজবংশের সাথে কাজ করেছেন এবং এই রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে রায় দিয়েছেন। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত রাযীর পৃষ্ঠপোষকরাই উত্তর ভারত (১১৯৩) ও বাংলা ১২০৪) জয় করেছিল, তিনি নিজেও একবার উত্তর-পশ্চিমভাগে একটি মিশনে (আনুমানিক ১১৮৪ সালে) প্রেরিত হয়েছিলেন, তাই বাংলার ঘোরি বিজয়ীদের কাছে সম্ভবত তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা সুপরিচিত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে খোরাসানে প্রচলিত এবং সাধারণভাবে পারসো-ইসলামী বিশ্বের রাজনৈতিক বিশ্বাস ও ধান-ধারণার সাথে রাযী ও মুহাম্মদ বখতিয়ার অবশ্যই একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন। রাযি তাঁর 'জামি আল-উলূম' গ্রন্থে নিম্নোক্ত বর্ণনা দেন–

"পৃথিবী একটি বাগান, যার মালি হলো রাষ্ট্র (দৌলত);
রাষ্ট্র হলো সুলতান, যার অভিভাবক হলো আইন (শরিয়াহ);
আইন একটি নীতি, যা দিয়ে রক্ষা হয় রাজত্ব (মুলক);
রাজত্ব একটি নগর, যা নিয়ন্ত্রণে আনে সেনাবাহিনী (লস্কর);
সেনাবাহিনী গঠন নিশ্চিত করে সম্পদ (মাল);
সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যম হলো প্রজা (রায়ত);
প্রজাদের সেবক বানায় ন্যায়বিচার (আদল);
ন্যায়বিচারকে কেন্দ্র করেই সমৃদ্ধ হয় পৃথিবী (আলম)।"[৬]

এসব উক্তি শুধুমাত্র রাজার আচার-আচরণ সম্পর্কিত সাধারণ পরামর্শ নয়, বরং তা সমাজের নৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে সমন্বিত তত্ত্ব, যা একই সাথে সুসংহত, ধারাবাহিক এবং সুসংঘবদ্ধ বিশ্বদর্শনও। সৃষ্টিকর্তার কথা এতে উল্লেখ না থাকার বিষয়টিও লক্ষণীয়, এটা হলো রাজকীয় দায়িত্ব, সৃষ্টিকর্তার নয়, এটাই পুরো কাঠামোকে একত্র করে রাখে। এ ব্যবস্থায় ইসলামী আইন অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তা

---

৫. এসব ধারণা সম্পর্কে চমৎকার আলোচনার জন্য দেখুন A.K.S. Lambton, "Justtice in the Medieval Persian Theory of Kingship," *Studia Islamica 17* (1962): 91-119 See also Waldman, *Toward a Theory 99, A Mirror for Prices: "The Qabus Nama" by Kai Ka'us ibn Iskandr, Prince of Gurgan*, tran. Reuben Levy (New York: Dutton, 1951), 213; and Cornell H. Fleischer, "Royal Authority, Dynastic Cyclism, and 'Ibn Khaldunism' in Sixteenth-Century Ottoman Letters," *Journal of Asian and African Studies* 18 (1983): 201-3.

৬. Fakhr al-Din Razi, *Jami al-ulum*, ed. Muhammad Khan Malik al-Kuttab (Bombay, A.H. 1313 [AD 1905], 207. রাজির আমলে "রাজপুরুষদের আয়না" শ্রেণীভুক্ত সাহিত্য এতো জনপ্রিয় হয়েছিল যে, এ ধরনের প্রবচন প্রায়ই আলেকজান্ডার দি গ্রেটের উপর আরোপ করা হতো।

সুলতানের অবলম্বনের বেশি কিছু নয়। এই কাঠামোতে খলিফার অস্তিত্ব থাকলেও তার কথা মোটেই উল্লেখ করা হয়নি।

মুহাম্মদ বখতিয়ার ও তার সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের কাছে জাগতিক কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে রাজকীয় একনায়কত্ব সংক্রান্ত আদর্শই একমাত্র দর্শন ছিল না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত ও মৌখিক উভয়ভাবেই পারসো-ইসলামী সংস্কৃতির লোককাহিনী ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, যাতে মুসলিম সাধুপুরুষ সূফী-সাধকদের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক কর্তৃত্বের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। তাঁদের কর্তৃত্ব ছিল কখনো রাজদরবারের সমান্তরাল, আবার কখনও বিরোধী। অধিকন্তু তুর্কীদের কাছে সূফীদের কর্তৃত্বের মডেল ছিল বিশেষভাবে অত্যন্ত উজ্জ্বল, কারণ মধ্য এশিয়া থেকে খোরাসান, আফগানিস্তান ও ভারতে অভিবাসন করার সামান্য আগে সূফীরাই তুর্কী গোত্রগুলোকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেছিল।[৭] আলী হুজবিরি (মৃত্যু ১০৭২) লিখিত সূফীবাদের উপর ইরানি প্রথম গবেষণা গ্রন্থ *'কাশফ আল-মাহজাব'* (Kashf al-Mahjab) এ ধরনের কর্তৃত্বের চিত্র পাওয়া যায়। গজনভি আমলে লাহোরে এটি লিখিত হয়েছিল এবং তৎকালীন ভারতে তা ব্যাপকভাবে পঠিত হয়েছিল, তাতে একাদশ শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বের পূর্বাঞ্চলে সূফী মতবাদ সংক্রান্ত ধারণা, অনুশীলন এবং উপলব্ধি সম্পর্কে গবেষণা গ্রন্থটিতে সারাংশ টানা হয়েছিল। এতে বিশেষভাবে ইন্দো-মুসলিম বিশ্বে ইসলামী জীবন পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হিসেবে সূফীবাদকে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে সূফী-দরবেশদের স্থান সম্পর্কে লিখতে গিয়ে হুজবিরি জোর দিয়ে বলেন, আল্লাহ 'দরবেশদেরকে বিশ্বের পরিচালক করেছেন; তারা তাঁর প্রতি পুরোপুরি নিবেদিতপ্রাণ এবং তাদের ভোগবিলাস পরিত্যাগ করেছে। তাদের দোয়ায় বেহেশত থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং তাদের জীবনের পবিত্রতার কারণে পৃথিবীতে গাছপালা জন্মায় এবং তাদের আধ্যাত্মিক প্রভাবের মাধ্যমেই মুসলমানরা অবিশ্বাসীদের উপর বিজয়ী হয়।'[৮]

আল্লাহ'র সৃষ্ট সকল জিনিসের উপর সূফী-দরবেশদের নির্ভরশীলতার প্রাধান্য পরম্পরা বিষয়ক এ দর্শন স্বাধীন সুলতান এবং তার উপর নির্ভরশীল 'প্রজা' তথা জনসাধারণ বহাল থাকা সংক্রান্ত রাজকীয় দর্শন পারস্পরিক বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বলেই মনে হয়। বাস্তবিকই কর্তৃত্ব প্রশ্নে এ দুই দর্শনের মধ্যে সংঘর্ষের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

---

৭. দেখুন W. Barthold, *Turkestan Down to the Mongol Invasion*, 3d ed. (London: Luzac: 1968), 160,255, 376: J. Spencer Trimingham, *The Sufi Orders in Islam* (Oxford; Clarendon Press, 1971), 51-54.

৮. Ali Hujwiri, *The Kashf al-Mahjub*, trans. Reynold A. Nicholson, 2d ed. (reprint, London: Luzac, 1970), 213.

তবে এটাও সত্য যে, সূফী-দরবেশদের ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্ব সম্পর্কে যে বক্তব্য পাওয়া যায়, তা অনেক ক্ষেত্রেই যুগপৎভাবে ঘটেছে এবং এমনকি অনেক সময়ে তা রাজকীয় ঐতিহ্যের অনুরূপ হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সূফী ও রাজকীয় উভয় সাহিত্যেই ভূখণ্ডভাবে সুনির্দিষ্ট অঞ্চল অর্থাৎ 'বিলায়াত' এর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আরবী শব্দ *'ওয়ালি'* অর্থ যে *'বিলায়াত'* প্রতিষ্ঠা করে, প্রচলিত এক অর্থে *'ওয়ালি'* শব্দ দিয়ে 'গভর্নর' বা 'শাসক' বোঝানো হয় এবং অন্য অর্থে 'দরবেশ' বা 'আল্লাহর বন্ধু' বোঝানো হয়। আবার ফারসি শব্দ *'শাহ'* দিয়ে রাজকীয় অভিধানে 'রাজা' বোঝায়, কিন্তু সূফীগণ কোন শক্তিশালী দরবেশের পদবি হিসেবে এটাকে ব্যবহার করেন। একইভাবে *'দরগাহ'* শব্দটি দিয়ে রাজকীয় ভাষায় রাজার দরবার বোঝানো হয়, আর সূফীগণ এ দিয়ে বোঝান কোন শক্তিশালী দরবেশের মাযার। রাজা বা সুলতানের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত রাজ-মুকুট *(তাজ)* আইনসংগত কর্তৃত্বের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়; এর প্রায় সমান্তরালে সূফী নেতৃত্বের উত্তরসুরি ঘোষণা অনুষ্ঠানেও ব্যবহৃত হয় সূফীদের পাগড়ি (দস্তর)।

এসব বিষয় বিবেচনা করলে এটাই বোঝা যায়, সে সময়ের পারসো-ইসলাম বিশ্বে সুলতানরা একক কর্তৃত্ব কিংবা এমনকি চূড়ান্ত কর্তৃত্ব রাখতেন না। তাঁরা অবশ্যই কার্যকর ক্ষমতা রাখতেন এবং প্রাক-ইসলামী পারস্যের রাজকীয় দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত রাযীর উক্তি 'পৃথিবী একটি বাগান, যার মালি হলো রাষ্ট্র'-থেকে বোঝা যায়, পৃথিবী তথা রাষ্ট্র সুলতানের একটি খেলার সামগ্রী মাত্র। কিন্তু ঐতিহাসিক এবং সূফী উভয় দিক থেকেই বারবার এই চলতি মতবাদের বিপরীত একটি দর্শনের ইংগিত দিয়ে বলা হচ্ছিল, কোন-না-কোন মুসলিম দরবেশের দয়ায় (বারাকা) এসব অস্থায়ী শাসকদের সাময়িক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছিল, রাজা বা রাজপুত্ররা নয়, বরং এসব সূফী-দরবেশেরাই আল্লাহ'র বিশেষ নৈকট্যের অধিকারী, বাস্তবেও তাই, এজন্য পৃথিবীতে তাঁরাই খোদার প্রতিনিধি হওয়ার অধিকতর দাবিদার। তাঁদের অনুসারীদের মতে, এ ধরনের ক্ষমতাধর দরবেশরা যে-কোন রাজা ও রাজ্য সৃষ্টি করেন কিংবা ধ্বংস করতে পারেন।[৯] তাই সুলতানরা যখন তাদের কর্তৃত্বের ব্যাপারে খলিফার আনুগত্যের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করতেন, তখন অনেক মানুষ, এমনকি অনেক সময় সুলতানরাও, তাদের কর্তৃত্বের চূড়ান্ত উৎসের জন্য ক্ষমতাধর সূফীদের আধ্যাত্মিক সহযোগিতা কামনা করতেন। সুলতান বা খলিফাগণ ভৌগোলিকভাবে দূরে অবস্থান করায় প্রত্যন্ত পল্লীতে তারা ছিলেন রাজনৈতিকভাবে বিমূর্ত, আর ১২৫৮ সালে

৯. Simon Digby, "The Sufi Shaikh as a Source of Authority in Mediaeval India," in *Purusartha*. Vol. 9. *Islam et Societe en Asie du Sud*, ed. Marc Gaborieau (Paris: Ecole des Hautes etudes en sciences sociales, 1986), 62.

মোঙ্গল আক্রমণে বাগদাদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর এমনকি খলিফার নামের অস্তিত্ব পর্যন্ত থাকলো না। বিপরীতক্রমে সূফী-দরবেশগণ জনসাধারণের অত্যন্ত কাছে থাকায় তাঁরা ছিলেন সুস্পষ্ট সমুজ্জ্বল।

তাই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন তুর্কী মুসলমানরা বাংলা বিজয় করে, তখন সুলতান ও সূফী সাধকগণ কর্তৃত্বের অনেক প্রতীকী ব্যাপারে একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করলেও বিশ্ব এবং সেখানে আল্লাহ, রাজা ও দরবেশদের স্থান সম্পর্কে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। অধিকন্তু ইতিপূর্বে সেন রাজবংশ শাসিত হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বৈধতা সম্পর্কিত ধারণা থেকে উপরোক্ত উভয় দৃষ্টিভঙ্গিই চরম বৈপরীত্যপূর্ণ। ইসলামী মহাজাগতিক ধারণায়, মুসলিম বাংলার মুদ্রায় দৃষ্ট উদাহরণ থেকে বলা যায়, লৌকিক ও অতিলৌকিক জগৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন, অতিলৌকিক জগতের কর্তৃত্ব ছিল শুধু আল্লাহ'র এবং সুলতান ও খলিফা উভয়েই তাঁর চরম কর্তৃত্বের নীচে রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করতেন। অন্তত, তাত্ত্বিকভাবে হলেও, সুলতানের প্রকৃত ভূমিকা শুধুমাত্র পবিত্র শরীয়া আইন বাস্তবায়নের মধ্যেই সীমিত ছিল। অন্যদিকে সেনদের দর্শনে লৌকিক ও অতিলৌকিকের ক্ষেত্রের মধ্যে অলংঘনীয় কোন সীমারেখা ছিল না, দুইয়ের মধ্যে শুধুমাত্র চলাচলই সম্ভব ছিল না, রাজার ধর্মাচারের মাধ্যমে তা অর্জন করা যেত। এবং কোন পবিত্র আইনের আওতায় না থেকে সেনরা ধর্ম বলতে বোঝাতো রাজার ধর্মাচারের অনুসরণ। তাই সেনরা কোন পবিত্র আইন বাস্তবায়নের জন্য নিজেদের নিয়োজিত না করে, তারা বরং পৃথিবীতে সেই নিয়ম রচনা করতে চাইতো, এবং এমনকি দেবতাদের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি মন্দিরে বাস করার জন্য নামিয়ে আনতো।

কিন্তু তারপরও পারস্পরিক সম্পূর্ণ ভিন্ন মতাদর্শের জন-অধ্যুষিত বাংলায় মুসলিম বিজয়ী মুহাম্মদ বখতিয়ার ও তাঁর উত্তরসুরিরা যখন এখানে থেকে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, তখন কিভাবে তাঁরা সমঝোতায় পৌছেছিল?

দিল্লী সালতানাতের একটি প্রদেশ, ১২০৪-১৩৪২

১২০৪ সালে মুহাম্মদ বখতিয়ারের সেন রাজধানী দখলের প্রায়-সমসাময়িক একমাত্র বর্ণনাটি দিয়েছেন ঐতিহাসিক মিনহাজ উস-সিরাজ। তিনি উক্ত সময়ের ৪০ বছর পর বাংলা সফর করেন এবং এ সংক্রান্ত প্রচলিত মৌখিক ভাষ্য ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করেন।[১০] মিনহাজ লিখেন:

---

১০. মিনহাজ যদিও বিজয়ের কোন তারিখ প্রদান করেননি, তবে মুদ্রাভিত্তিক প্রমাণে তা নির্ধারণ করা যায় হিজরী ৬০১ সালে, ইংরেজী ১২০৪-৫ সাল, বিজয়ী নিজেই কিংবদন্তির গৌড় বিজয় (তথা বাংলা) মুদ্রিত স্বর্ণ মুদ্রা (চিত্র ১) প্রকাশ করেন তবে মুদ্রাটিতে মুদ্রিত ৬০১ হিজরী সালটি মুদ্রাটি

মুহাম্মদ বখতিয়ার অঞ্চলটি দখলের পর নদীয়া নগরীকে তিনি জনমানবশূন্য অবস্থায় ত্যাগ করে (বর্তমানের) লক্ষ্ণৌতিতে তাঁর সরকারের রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি অঞ্চলটির বিভিন্ন অংশ তাঁর শাসনাধীনে আনেন, প্রতিষ্ঠানিকীকরণ করেন, প্রতিটি অংশে খুতবা পাঠের ব্যবস্থা করেন, মুদ্রা প্রকাশ করেন এবং তাঁর ও তাঁর আমিরদের প্রশংসনীয় উদ্যোগের ফলে সকল স্থানে মসজিদ, মাদরাসা, দরগাহ (দরবেশদের জন্য) নির্মাণ করেন।"[১১]

উপরোক্ত বর্ণনায় রাজনৈতিক বৈধতার ব্যাপারে বিজয়ীদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে নির্দেশনা পাওয়া যায়; জুমার নামাযে খুতবা পাঠ, মুদ্রা প্রকাশ এবং অনানুষ্ঠানিক সূফী বুদ্ধিজীবী ও আনুষ্ঠানিক বুদ্ধিজীবী তথা আলেমদের জন্য স্থাপনা নির্মাণ।

মুদ্রা ও স্থাপনা থেকে ধারণা করা যায় শাসকরা নিজেদেরকে কী ভাবতো এবং অন্যদের থেকে তারা কেমন ভাবনার আশা করতো। অধিকন্তু উভয়ই একই সাথে বিভিন্ন শ্রেণীকে নির্দেশনা দিত। এগুলোর একটি ছিল বাংলার বিজিত হিন্দুদের প্রতি, যারা, কখনো খুতবা শোনেনি, মুসলমান মুদ্রা দেখেনি, মসজিদে পা রাখেনি, প্রাথমিকভাবে এসব প্রতীক ও সেগুলোর পৃষ্ঠপোষকদের বৈধ কর্তৃত্ব স্বীকারের মতো কোন অবস্থা তাদের ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীটি ছিল সাধারণভাবে মুসলিম বিশ্ব এবং আরো ঘনিষ্ঠভাবে দিল্লী সালতানাতের শাসকরা, যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার নতুন শাসক শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে খুতবা, মুদ্রা এবং ভবনরাজি তাদের কাছে বড় কোন অর্থ প্রকাশ করছিল। বাংলার মুসলিম শাসকদের রাজনৈতিক প্রপাগান্ডা 'পড়ার' সময় এসব বিভিন্ন শ্রেণীর কথা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

সামরিকভাবে, মুহাম্মদ বখতিয়ারের বিজয় ছিল একটি ঝটিকা অভিযান, ঘোড়সওয়ার বাহিনী মোকাবেলায় অনভ্যস্ত স্থানীয় জনসাধারণকে তাঁর প্রায় ১০ হাজার

প্রকাশের বছর বাংলা জয়ের বছর নয়। বিজয়ের কয়েক বছর পর প্রদেশটির গভর্নর আলী মর্দান দিল্লী থেকে তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তাঁর নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ করতে শুরু করেন, এসবের একটিতে সময় ছিল রমযান ৬০০ হিজরী বা মে, ১২০৪ (চিত্র ২)। যেহেতু আলী মর্দান ১২১০ সালের আগে তাঁর সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেননি, তাই মুদ্রাটিতে মুদ্রিত সালটি বিজয়ের সালের প্রমাণবাহী, মুদ্রাটির প্রকাশের সাল নয়। এই ব্যাখ্যা মুদ্রাটিতে তারিখকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রমযান, ৬০০ হিজরী হিসেবে উল্লেখ করায় আরো সমর্থিত হয়। কারণ সাধারণত ইন্দো-মুসলিম মুদ্রায় প্রকাশের শুধুমাত্র সাল থাকতো, মাস নয়, তাই এ ধরনের নিখুঁত ব্যবস্থা ব্যতিক্রমধর্মী কোন বিষয়ের তথ্য নিঃসন্দেহে বাংলা জয়ের কারণেই হয়েছে। দেখুন John Deyell *Living without Silver: The Monetary History of early Medieval North India* (Delhi: Oxford University Press, 1990), 364, coin no. 298.

১১.Minhaj-ud-Din Abul-Umar-I-Usman, *Tabakat-I-Nasiri: A General History of the Muhammadan Dynasties of Asia, Including Hindustan (810-1260)*, trans. H.G. Reverty (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1881; reprint, New Delhi: Oriental Books Reprint Corp., 1970, 1: 559-60.

চিত্র ১। বাংলায় সুলতান মুহাম্মদ ঘোরির নামে ৬০১ হিজরিতে (১২০৪-৫ খ্রিস্টাব্দে) মুদ্রিত মুহাম্মদ বখতিয়ারের স্বর্ণমুদ্রা। সোজা পিঠ ও উল্টা পিঠ। স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনের চার্লস র‍্যান্ডের ছবি।

সদস্যের অশ্বারোহী বাহিনী পুরোপুরি পর্যুদস্ত করে।[১২] বিজয়ের পর পরাজিত বাঙালিদের কাছে বখতিয়ার ও তাঁর উত্তরসুরিরা তাঁদের শক্তির-তাদের পরাক্রান্ত অশ্বারোহী বাহিনী-অপরিবর্তনীয় ও তেজোদীপ্ত হিসেবে পরিচিতি অব্যাহত রাখলেন। ১২০৪-৫ খ্রিস্টাব্দে (৬০১ হিজরি) বখতিয়ার নিজে তাঁর দিল্লীস্থ প্রভু সুলতান মুহাম্মদ ঘোরির নামে স্বর্ণমুদ্রা মুদ্রিত করলেন। এর এক পিঠে অংকিত ছবিতে দেখা যায় এক অশ্বারোহী প্রচণ্ড বেগে তার ঘোড়া ছুটাচ্ছে ও এক হাতে রাজদণ্ড ধরে আছে (ছবি-১)। এই চিত্রের নীচে লেখা ছিল 'গৌড় বিজয়' (অর্থাৎ বাংলা বিজয়), আর তা আরবিতে নয়, সংস্কৃতিতে লেখা হয়েছিল।[১৩] ছয় বছর পর দিল্লীর সুলতানের ইন্তেকালের পর বাংলার তদানিন্তন গভর্নর আলী মর্দান উত্তর ভারত থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং অশ্বারোহীর ছবি সম্বলিত রৌপ্য মুদ্রা প্রকাশ করেন (ছবি-২)।[১৪]

১২. নদিয়ায় লক্ষণসেনকে বিস্মিতকারী বখতিয়ারের দুই শত অশ্বারোহী বাহিনীটি তার ১০ হাজার সৈন্যের মূল বাহিনী থেকে বেশ অগ্রসর হয়ে পড়েছিল।

১৩. Nicholas W. Lowick, "The Horseman Type of Bengal and the Question of Commemorative Issue," *Journal of the Numismatic Society of India* 35 (1973): 196-208; P.L. Gupta "Nagari Legend on Horseman Tankah of Muhammad bin Sam," ibid.: 209-12. See too P. L. Gupta, "On the Date of the Horseman Type Coin of Muhammad bin Sam," ibid. 38 (1976): 81-87.

১৪.G.S. Farid, "Hitherto Unknown Silver Tankah of Sultan Alauddin Ali Mardan Khilji, 607-610 AH", *Journal of the Asiatic Society* 18, nos. 1-4 (1976): 104-6. ফরিদের মতানুযায়ী, এই মুদ্রাটির তারিখ হলো ৬১০ হিজরী (১২১৩-১৪ (খ্রিস্টাব্দ)। তবে তার প্রকাশিত মুদ্রাটি, চিত্র ২ হিসেবে মুদ্রিত, যেখানে তারিখটি প্রদান করা হয়, সেই

চিত্র ২। আলী মর্দানের রৌপ্যমুদ্রা (আনুমানিক ১২০৮-১৩), ৬০০ হিজরিতে (মে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ) বাংলা জয়ের স্মারক। শুধুমাত্র সোজা পিঠ।

চিত্র ৩। সুলতান ইলতুতমিশের রৌপ্যমুদ্রা (১২১০-৩৫)। শুধুমাত্র সোজা পিঠ।

দিল্লী পুনরায় বাংলাকে তার শাসনাধীনে আনার পর ইলতুৎমিশের (১২১০-৩৫) নামে মুদ্রা প্রকাশ করা হয় এবং তাতেও অশ্বারোহীর ছবি ছিল (ছবি-৩)।[১৫] মুহাম্মদ বখতিয়ার, আলী মর্দান বা সুলতান ইলতুৎমিশের কেউই বাঙালি হিন্দু সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে বৈধতা কামনা করেননি বা পরাজিত সেন রাজ্যের কোন প্রথা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। বরং নতুন শাসকরা বাহুবলে বার্তা ঘোষণা করেছেন। এ ব্যাপারে পিটার হার্ডি প্রাথমিক ইন্দো-তুর্কী শাসন সম্পর্কে সাধারণভাবে যে কথা বলেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য, "উত্তর ভারতে মুসলিম শাসকরা যেহেতু সেখানে ছিলেন, তাই শাসন করতেন আর যেহেতু তাঁরা জয়লাভ করেছেন, তাই তাঁরা সেখানে ছিলেন।"[১৬]

স্থানটি ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল। একই মুদ্রার আরেকটি কপি নতুন করে প্রকাশ করে জন ডেইয়েল প্রমাণ করেন তারিখটি ছিল রমযান ৬০০ হিজরী, স্পষ্টতই বাংলায় তুর্কী বিজয়ের তারিখটির কথা বলা হয়েছে। Deyell, *Living without Silver*, 364, coin no. 298.

১৫. Lowick, "Horseman Type," 200.

১৬. Peter Hardy, "The Growth of Authority over a Conquered Political Elite: The Delhi Sultanate as a Possible Case Study," in *Kingship and Authority in South Asia*, ed. J.F. Richards (Madison: South Asian Studies, University of Wisconsin, 1978), 207.

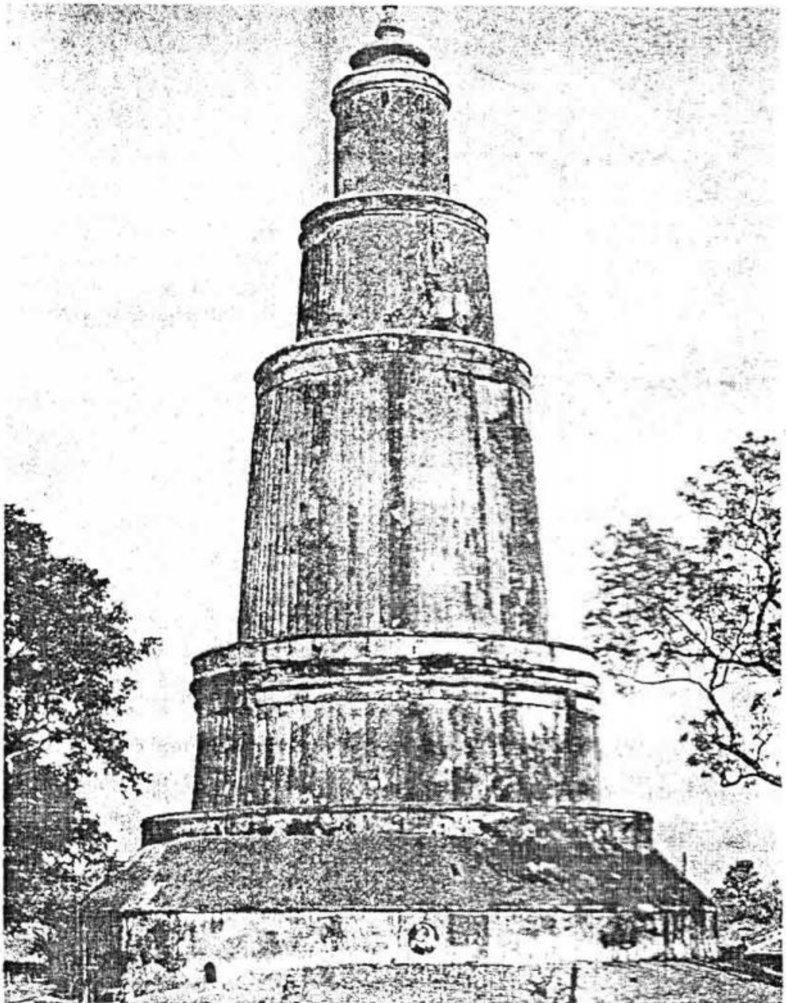

চিত্র ৪। ছোট পাণ্ডুয়ার মিনার (ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকের)।

বাহুবলের উপর এ ধরনের প্রকাশ্য নির্ভরশীলতা কিংবা অন্তত এ ধরনের ভাবমূর্তির পরিচয় মুসলিম বাংলায় প্রাথমিককালের স্মারক স্থাপনাগুলোতেও দেখা যায়। এ ধরনের একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপনা হলো কলকাতার কাছে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় অবস্থিত ছোট পাণ্ডুয়া মিনার বা টাওয়ার (ছবি-৪)। ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে এটি নির্মিত হয়েছিল, ততদিনে বদ্বীপের এ অংশটিতে মুসলিম শক্তি সুসংহত হয়েছিল. একটি মসজিদের কাছে অবস্থিত হওয়ায় ছোট পাণ্ডুয়া মিনারটি

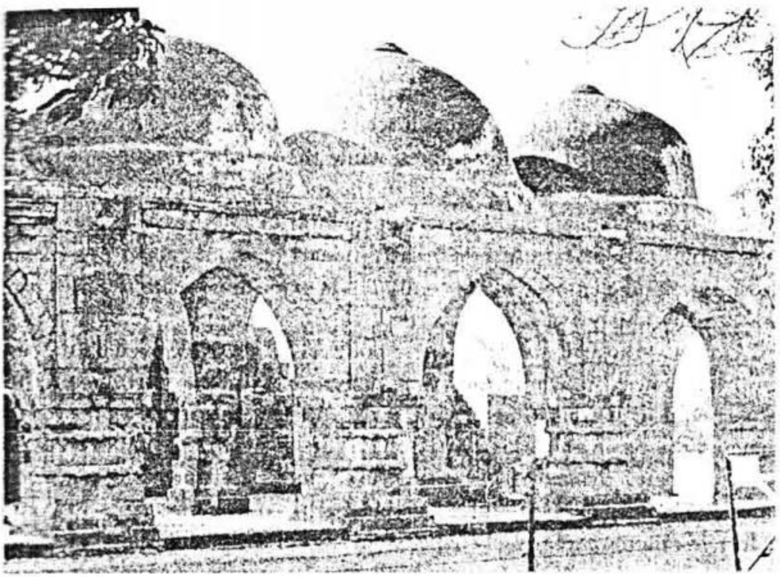

চিত্র ৫। জাফর খানের মসজিদ, ত্রিবেনি (১২৯৮)।

নিঃসন্দেহে নামাযের আযান দেওয়ার কাজেই ব্যবহৃত হতো। কিন্তু এর উচ্চতা ও আকার দেখে বোঝা যায়, এটা বিজেতা জনগণের উপর জয় ঘোষণার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও হাসিল করেছে। অধিকন্তু এ ধরনের স্মারক স্থাপনার নজির তুর্কী স্থাপত্য ঐতিহ্যে আগে থেকেই ছিল।[১৭] বাংলায় এখনো টিকে থাকা প্রথমদিককার মসজিদগুলো অন্যত্র থেকে এসে বদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী শাসকদের উদ্দীপনাই ঘোষণা করে। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার হিন্দু সভ্যতার সাবেক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ত্রিবেনীতে ১২৯৮ সালে নির্মিত (কিংবা পুনঃ স্থাপিত) জাফর খানের মসজিদটি (ছবি-৫) ইন্দো-তুর্কী স্থাপত্যকলার প্রাথমিককালের নান্দনিক দর্শনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে, এর আরেকটি প্রতিনিধি হলো দিল্লীর বেগমপুর মসজিদ (আনুমানিক ১৩৪৩)। ত্রিবেনীস্থ মসজিদটি নির্মাণের (বা পুনঃ স্থাপন) সূত্র পাওয়া যায়, দানপত্রে লেখা ঘোষণায়:

> জাফর খান, সিংহদের সিংহ, প্রতিটি অভিযানে
> ভারতের শহরগুলো জয় করেন, এবং ক্ষয়িষ্ণু দাতব্য
> প্রতিষ্ঠানগুলো পুনঃ নির্মাণ করেন।

---

১৭. উদাহরণসমূহের মধ্যে রয়েছে গজনির বাহরাম শাহ *মিনার* (দ্বাদশ শতকের প্রথমদিকে), আফগানিস্তানের হরি রুদ নদীর নিকটবর্তী জামে অবস্থিত গিয়াসউদ্দিন মুহাম্মদের *মিনার* এবং সময় ও স্থানের দিক থেকে বাংলার কাছাকাছি অবস্থিত দিল্লীর কুতুব মিনার (১২০০-১২১৫). বিশাল ও জমকালো এই মিনারটি ছিল উত্তর ভারতে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠার পর তুর্কীদের প্রথম কোন স্মারক স্থাপনা।

এবং তিনি তাঁর তরবারি ও বর্শা দিয়ে
কাফেরদের সমূলে ধ্বংস করেন এবং
দরিদ্রদের মাঝে অকাতরে তাঁর
সম্পদ দান করেন।[১৮]

কাফেরদের প্রতি নির্মম ধ্বংসকারী হওয়ার জাফর খানের দাবিকে মসজিদটির লিখিত ফলকে কিছুটা কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে, লিখিত ফলকটিও তৈরি করা হয়েছে ধ্বংসপ্রাপ্ত হিন্দু মন্দিরের সামগ্রী থেকে, অন্যদিকে মিনারটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য ব্যবহৃত পাথরে হিন্দু দেব-দেবীদের বিকৃত ছবি দেখা যায়।[১৯] জাফর খানের মসজিদের কাছে আরেকটি স্থাপনা দেখা যায়। ১৩১৩ সালে নির্মিত এই স্থাপনাটিকে তাঁর কবর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এটির যাতায়াত পথে প্রাথমিক প্রাক-ইসলামী আমলের স্থাপনার অংশবিশেষ পুনঃ ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর বহির্ভাগের প্যানেলে বৈষ্ণবদের বিষয়বস্তু সম্বলিত ছবি দেখা যায়।[২০]

এসব রাজনৈতিক প্রতীক যেসব 'শ্রেণী'র প্রতি নির্দেশিত হয়েছিল, তারা কিভাবে তা গ্রহণ করেছিল? তুর্কী বিজয়েরও প্রায় ত্রিশ বছর পরও যেসব এলাকায় তুর্কী সেনানিবাস পৌছাতে পারেনি, সেসব বিচ্ছিন্ন এলাকায় সেনদের কর্তৃত্ব অব্যাহত ছিল। তুর্কী বাহিনী দৃষ্টির অগোচরে চলে যাওয়া মাত্র ক্ষুদে গোত্রপতিরা ক্ষুদ্র প্রতিকৃতির চলমান রাজসভা, পূর্ণ সার্বভৌমত্ব সহকারে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত হতো, গজদন্ত শোভিত চাঁদোয়ার নীচে হাতির পিঠে চড়ে, অলংকারপূর্ণ সাদা সিল্কের পাগড়ি পরে এবং সহস্র রক্ষী সমভিব্যাহারে আসতো, দৃশ্যত আগের মতোই কর আদায় ও প্রশাসন পরিচালনা করতো।[২১] ১২৩৬ সালে জনৈক তিব্বতি বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীর লিপিবদ্ধ একটি ঘটনায় জানা যায়, তিনি যখন বিহারে নৌকাযোগে গঙ্গা নদী পার হচ্ছিলেন, তখন দু'জন তুর্কী সৈন্য তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সৈন্যরা যখন তাঁর কাছে স্বর্ণ দাবি করলো, তিনি স্থানীয় রাজাকে তাদের সম্পর্কে বলে দেওয়ার হুমকি দেন, এতে তুর্কী সৈন্যরা এতো রেগে গিয়েছিল যে তার জীবন নিয়েই

---

১৮. Shamsud-Din Ahmed, ed. And trans., *Inscriptions of Bengal*, vol. 4 (Rajshahi: Varendra Research Museum, 1960), 20.

১৯. প্রাগুক্ত, ১৯

২০. Catherine B. Asher, "Inventory of Key Monuments," in *The Islamic Heritage of Bengal*, ed. George Michell (Paris: UNESCO, 1984), 136. ছোট পাণ্ডুয়ার বারি মসজিদের কৃষ্ণপাথরের স্তম্ভগুলো প্রাক-ইসলামী স্থাপনা থেকে নেওয়া হয়েছিল, কারণ তাতে এখনো হিন্দু বা বৌদ্ধ চিত্র দেখা যায়; খুব সম্ভবত চতুর্দশ শতকের প্রথমদিকে এগুলো খোদাই করা হয়েছিল। প্রাগুক্ত, ৫২।

২১. George Roerich, trans., *Biography of Dharmasvamin (Chag lo-tsa-ba Chos-rje-dpal), a Tibetan Monk Pilgrim* (Patna: K.P. Jayaswal Research Institute, 1959), 64-65.

সংশয় দেখা দিয়েছিল।[২২] স্পষ্টত বিদেশী শাসনের তিন দশক সময়কালে জনসাধারণ সুবিচার প্রাপ্তির বৈধ কর্তৃপক্ষ হিসেবে হিন্দু রাজাকেই গণ্য করতো। এ সময়কালে মুসলমান মুদ্রা ও স্থাপত্য যদি বাংলার জনসাধারণের কাছে তাদের বল্গাহীন ক্ষমতা প্রদর্শনের লক্ষ্যে হয়ে থাকে, তবে দিল্লীতে তাদের পৃষ্ঠপোষক সালতানাত এবং তারও বাইরে থাকা বৃহত্তর মুসলিম বিশ্বের কাছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবমূর্তি প্রকাশ করেছে।

পুরো ত্রয়োদশ শতক জুড়ে বাংলার গভর্নররা যখনই দিল্লীস্থ তাঁদের পৃষ্ঠপোষক সালতানাত থেকে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করার চেষ্টা করেছেন, তখন তাঁরা তাঁদের এ উদ্যোগের সাথে ইসলামের বৃহত্তর রাজনৈতিক মহাজাগতিক তত্ত্বের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়ানোর সাহসী প্রয়াস চালিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১২১৩ সালে স্বঘোষিত সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইউয়াজ যখন দিল্লী থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তখন তিনি দিল্লীর সুলতানের মাথার উপর দিয়ে তাঁর অবস্থান বৈধ করার প্রয়াস চালান এবং নিজেকে পৃথিবীতে ইসলামী সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ বাগদাদের খলিফার ডান-হাত রক্ষক (নাসির) হিসেবে ঘোষণা করেন।[২৩] এই প্রথম ভারতের কোন শাসক ইসলামী বিশ্বের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের সাথে নিজের সরাসরি সম্পর্ক থাকার কথা ঘোষণা করলেন। এর ফলে দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিশ শুধুমাত্র বাংলা আক্রমণ ও পুনঃ একত্রিকরণের কাজই জোরদার করেননি, বাংলার শাসককে খলিফার সমর্থন থেকে নিজের দিকে ফেরানোর পদক্ষেপও গ্রহণ করেন। তাঁর সেনাবাহিনী ১২২৭ সালে গিয়াসউদ্দিনকে পরাজিত করার পর ইলতুৎমিশ বাগদাদের খলিফা আন-নাসিরের নিকট থেকে সম্মানসূচক আলখাল্লা আনারও ব্যবস্থা করেন, এবং এর মধ্য থেকে লাল চাঁদোয়াসহ একটি বাংলায় পাঠিয়েছিলেন। বাংলার স্বাধীন সুলতানের শিরোশ্ছেদের পর লক্ষ্ণৌতিতে অবস্থানরত ইলতুৎমিশের ছেলেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আলখাল্লাটি পরানো হয়।[২৪] বাংলার পরাজিত সুলতানের রাজধানীতে অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর ইলতুৎমিশ নাটকীয়ভাবে খলিফার বৈধতা সংক্রান্ত তার পূর্বেকার দাবি জাঁকজমকভাবে ঘোষণা করেন। পরবর্তী বেশ কিছু সময়ের জন্য বদ্বীপটি রাজনৈতিকভাবে উত্তর ভারতের সাথে একত্রিত হয়ে যায়। পরের ত্রিশ বছর ধরে দিল্লী বাংলায় গভর্নর নিযুক্ত করতো, আর তাঁরা নিজেদেরকে শুধুমাত্র 'পূর্বদিকে রাজাদের রাজা' (মালিক-ই-মুলুক আল-শার্ক) হিসেবে পরিচিত করতেন।[২৫]

২২. প্রাগুক্ত, ৯৮।

২৩. দেখুন Abdul Karim, *Corpus of the Muslim Coins of* Bengal down to AD 1538. Asiatic Society of Pakistan, 1960). 18

২৪. Minhaj-ud-din Usman, *Tabakat-I-Nasiri*, trans. Raverty, 1: 629-30.

২৫. Shamsud-Din Ahmed, ed. and trans. *Inscriptions*, 4:7-8

কিন্তু দিল্লী ছিল দূরে, এবং পুরো ত্রয়োদশ শতক জুড়ে এই আনুগত্য ছুড়ে ফেলার প্রয়াস অপ্রতিরোধ্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে, বিশেষ করে সুলতানরা যখন ইরানি মালভূমি থেকে আগত মোঙ্গল হুমকি মোকাবেলায় ব্যস্ত থাকতেন। গভর্নররা বিদ্রোহ করতেন এবং প্রতিটি স্বাধীনতা ঘোষণার সময়ই তাঁরা তাঁদের মুদ্রা ও স্মারক স্থাপনাসমূহে আরো জাঁকালো পদবি গ্রহণ করতেন। ১২৮১ সালে দিল্লীর শক্তিশালী সার্বভৌম সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন নির্মমভাবে একটি বিদ্রোহ দমন করেন এবং তাঁর বিদ্রোহী গভর্নরকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেন। কিন্তু ১৮৮৭ সালে বলবনের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে গভর্নর হিসেবে নিয়োগকৃত তাঁরই নিজের পুত্র বুগরা খান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বুগরা খানের উত্তরসুরি হিসেবে তাঁর পুত্র রোকনউদ্দিন কায়কাউস (১২৯১-১৩০০) বাংলার সিংহাসনে বসেন। একটি মসজিদে তিনি নিজের সম্পর্কে ঘোষণা উৎকীর্ণ করেন, 'মহান সুলতান, রাষ্ট্রসমূহের কণ্ঠের প্রভু, তুর্কী ও পারসিদের রাজাদের রাজা, রাজমুকুট ও মোহরের (সিল) মালিক,' এবং একই সাথে 'আল্লাহ'র প্রতিনিধির ডান হাত' অর্থাৎ 'খলিফার সাহায্যকারী'। অপর একটি মসজিদে তিনি নিজেকে ঘোষণা করেন, 'আল্লাহ'র ছায়া' (যিলাল্লাহ্), জাঁকজমক পদবিটি গৃহীত হয়েছিল রাজকীয় পারসিক রীতি থেকে।[২৬]

বিদ্রোহপ্রবণ প্রদেশটির প্রতি বিরক্ত হয়ে দিল্লী কয়েক দশক পর্যন্ত এটিকে কজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বড় ধরনের সামরিক অভিযান থেকে বিরত থাকে। বাস্তবিকই সুলতান জালালউদ্দিন খলজির (শাসনকাল ১২৯০-৯৬) কিছু পদক্ষেপ বাংলার প্রতি উদাসীন থাকার চেয়েও বেশি কিছু বোঝায়। সমসাময়িক এক ঐতিহাসিক জানান, একবার সুলতান হাজারখানেক অপরাধীকে (ঠগী) ধরে নৌকায় করে ভাটির দেশে পাঠান এবং লখনৌতির আশেপাশে তাদেরকে মুক্ত করার নির্দেশ দেন। উদ্দেশ্য ঠগীরা লখনৌতির কাছাকাছি বসবাস করবে এবং দিল্লীর আশেপাশে গোলমাল সৃষ্টি করতে পারবে না।[২৭] যে বাংলা বিজয়কে স্মরণীয় করার জন্য স্বর্ণের স্মারক মুদ্রা প্রকাশ করা হয়েছিল, এক শতাব্দীর মধ্যেই তা সম্রাটের রাজকীয় রত্ন না হয়ে দিল্লীর সামাজিক অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তু নিক্ষেপের আস্তাকুঁড়ে পরিণত হলো। ইতিমধ্যেই আমরা উপলব্ধি করতে পারছি, ষোড়শ শতকের শেষভাগে মোগল বিজয়ের পর বাংলার প্রতি উত্তর ভারতীয় অন্ধ স্বাদেশিকতার মূল কিভাবে আরো ব্যাপক হলো।

---

২৬. Ibid., 14-15, 17-18.

২৭. Zia al-Din Barani, *Tarikh-I Firuz Shahi*, in *The History of India as Told by Its Own Historians*, trans. and ed. H.M. Elliot and John Dowson (Allahabad: Kitab Mahal, 1964), 3: 141. *ঠগ* শব্দটির লিখিত উল্লেখ সর্বপ্রথম এখানেই হয়েছে।

বাংলার প্রাথমিক সালতানাত : ১৩৪২-আনুমানিক ১৪০০

১২৫৮ সালে হালাকু খানের নেতৃত্বে মোঙ্গল সেনাবাহিনী বাগদাদ লুণ্ঠন ও ক্ষমতাসীন খলিফা আল-মুস্তাসিমকে হত্যা করে। ফলে ইসলামী রাজনৈতিক কর্তৃত্বের চূড়ান্ত পদটির আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘটে। এ বিপর্যয়ে অর্ধ শতাব্দী কাল পর্যন্ত ভারতে প্রকাশিত মুদ্রাগুলোতে 'খলিফা আল মুস্তাসিমের সময়কালে' বাক্য উৎকীর্ণ দেখা যায়, অর্থাৎ এ সময়ে ইন্দো-মুসলিম শাসকরা নামমাত্র আব্বাসী খলিফাকে ছাড়া অন্য কাউকে বৈধ কর্তৃত্বশীল হিসেবে মেনে নিতে অক্ষম ছিল। অবশেষে, ১৩২০ সালে দিল্লীর সুলতান কুতুবউদ্দিন মোবারক ঐতিহ্য ভেঙ্গে সাহসী কণ্ঠে নিজেকে ইসলামের খলিফা ঘোষণা করেন। পদবিটি যদিও দৃঢ় ছিল না, এবং বাস্তবে রূঢ়ভাবে গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু তবুও এখন এটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল ইসলামে একাধিক খলিফা থাকতে পারেন এবং তারা আরব বিশ্বের বাইরেও অবস্থান করতে পারেন। ইসলামী রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এ বৈপ্লবিক ঘটনা এমন এক সময় ঘটে, যখন বাংলা মাত্র পুনরায় দিল্লী সালতানাত থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। ১৩৪২ সালে শক্তিশালী মহাপ্রাণ ব্যক্তি শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-৫৭) দিল্লীর নাগপাশ থেকে বাংলার স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনেন এবং পরবর্তী আড়াই শত বছর ধরে উত্তর ভারত থেকে স্বতন্ত্র থেকে কয়েকটি রাজবংশের মাধ্যমে বদ্বীপটি পরিচালনার পথপ্রদর্শন করেন। দিল্লীর আনুগত্য ছিন্ন করার প্রতীক হিসেবে তিনি দিল্লীর কর্তৃত্ব থাকাকালীন সময়ের প্রাদেশিক রাজধানী লখনৌতি থেকে সরিয়ে ২০ মাইল উত্তরে পাণ্ডুয়ায় নতুন স্থানে স্থানান্তরিত করেন। প্রাথমিকভাবে দিল্লী বাংলার স্বাধীনতাকে বিনা চ্যালেঞ্জে স্বীকার করে নেয়নি। ১৩৫৩ সালে সুলতান ফিরোজ তোগলক বিচ্ছিন্ন রাজ্যটিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য গঙ্গা অববাহিকায় বিশাল সেনাবাহিনী নামান। ফিরোজ শাহ যদিও এক লাখ ৮০ হাজার বাঙালিকে চেপে ধরেন এবং এমনকি শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহকে তাঁর রাজধানী পাণ্ডুয়া থেকে সাময়িকভাবে সরে যেতে বাধ্য করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা পুনর্দখল করতে পারেননি। ছয় বছর পর ফিরোজ বাংলায় দিল্লীর কর্তৃত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালান, কিন্তু এবারো ব্যর্থ হন, আর এবার তা করেন শামসউদ্দিনের পুত্র ও উত্তরসুরি সিকান্দার শাহ (শাসনকাল ১৩৫৭-৮৯)।[২৮] বাংলায় এসব নিষ্ফল আগ্রাসন এবং এই দুই বাঙালি সুলতানের সফল কৌশলের কাছে উত্তর ভারতের সাম্রাজ্যবাদীদের অভ্যন্তরে প্রবেশের অভিলাষ ব্যর্থ হয়। ১৩৫৯ সালের পর প্রায় দু শতাব্দী ধরে বাংলা উত্তর ভারতীয় সেনাবহিনীর হামলা থেকে মুক্ত থাকে।

---

২৮. Shams-I -Siraj 'Afif, *Tarikh-i-Firuz Shahi, in The History of India as Told by Its Own Historians*, trans. and ed. H.M. Elliot and John Dowson (Allahabad: Kitab Mahal, 1964), 3: 297, 303-12).

বাস্তবিকই স্বাধীন ইলিয়াস শাহ রাজবংশের আত্মপ্রকাশ ছিল দীর্ঘস্থায়ী সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের রাজনৈতিক অভিব্যক্তির প্রকাশ। ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে মার্কো পলো 'বাঙালা' নামক একটি স্থানের উল্লেখ করেছেন, দৃশ্যত মুসলমান সংবাদদাতার নিকট থেকে এ স্থান সম্পর্কিত তথ্য পেয়েছিলেন, একে 'ভারতের অত্যন্ত নিকটবর্তী' এবং এখানকার মানুষদের 'অদ্ভুত ভাষা' ব্যবহারকারী 'জঘন্য রকমের মূর্তিপূজারী' বলে অভিহিত করেছেন।[২৯] 'বাংলা' সম্পর্কে আমাদের প্রথম দেশীয় উল্লেখ পাওয়া যায় মধ্য চতুর্দশ শতকে, ঐতিহাসিক শামসউদ্দিন সিরাজ আফিফ শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহকে (১৩৪২-৫৭) 'বাঙালি সুলতান' এবং 'বাংলার রাজা' হিসেবে উল্লেখ করার মধ্যে।[৩০] এই শাসকের মুদ্রা এবং তাঁর পুত্র ও উত্তরসুরির স্থাপত্য নিদর্শনে স্বাধীনতার একটি নতুন মাত্রা পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। শামসউদ্দিনের মুদ্রায় লেখা হয়:

[প্রথম পিঠে] ন্যায়পরায়ণ সুলতান, শামস আল-দুনিয়া বা আল-দিন আবু'ল মুজাফফর, ইলিয়াস শাহ, মহান সুলতান।

[উল্টা পিঠে] দ্বিতীয় আলেকজান্ডার, খলিফার ডান হাত, বিশ্বাসীদের নেতার রক্ষক (সাহায্যকারী)।[৩১] এখানে সুলতান নিজেকে শুধুমাত্র খলিফার সাথে সম্পর্কযুক্তই করেননি, বরং নিজেকে 'দ্বিতীয় আলেকজান্ডার' হিসেবেও দাবি করে তার রাজকীয় মহিমার কথা প্রকাশ করেছেন। মহামতি আলেকজান্ডারের কৃতিত্বের সাথে তুলনা করা না গেলেও চতুর্দশ-শতকের ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবহুল মঞ্চে শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ 'বিশ্ববিজয়ীর' মর্যাদার অধিকারী অবশ্যই; দিল্লীর উপর্যুপরি আক্রমণ প্রতিরোধ ছাড়াও তিনি প্রতিবেশী হিন্দু রাজাদের, বিশেষভাবে চম্পারন, ত্রিহুত, কাঠমান্ডু, জাজনগর ও কামরূপের (বর্তমানের বিহার, নেপাল, উড়িষ্যা ও আসাম নিয়ে এসব অঞ্চল গঠিত) রাজাদের পরাজিত করেন।

রাজবংশটির রাজকীয় জাঁকজমকের সবচেয়ে দর্শনীয় প্রমাণ পাওয়া যায় প্রতিষ্ঠাতার পুত্র ও উত্তরসুরি সুলতান সিকান্দারের (শাসনকাল ১৩৫৭-৮৯) নির্মিত একটি একক স্মারক স্থাপনায়। এটা হলো বিখ্যাত আদিনা মসজিদ, ইলিয়াস শাহি বংশের রাজধানী পান্ডুয়ায় ১৩৭৫ সালে এটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছিল (ছবি ৬ ও ৭)। মসজিদটিতে সাবেক আমলের অনেক স্থাপনার সামগ্রী ব্যবহৃত হলেও তার মাধ্যমে অঞ্চলটির রাজনৈতিকভাবে পরাজিত অ-মুসলিম প্রজাদের জন্য কোন বার্তাবহ ছিল না, কারণ তারা কোনভাবেই মসজিদটি ব্যবহার করতো না।[৩২]

২৯. *The Book of Ser Marco Polo*, trans. and ed. Henry Yule and Henri Cordier. 3d ed. (Amsterdam: Philo Press, 1975) 2: 115.
৩০. Afif, *Tarikh*, in Elliot and Dowson, *History of India*.
৩১. Karim, *Corpus*, 42
৩২. Naseem Ahmed Banerji, "The *Mihrabs* in the Adina Mosque at Pandua,

বাস্তবিকই মসজিদটিতে নামাযের স্থানগুলো অলংকরণে নির্মাতারা পাল-সেন আমলের শেষদিকে শিল্পকলা সার্থকভাবে গ্রহণের বিষয়টি ফুটিয়ে তোলে। বিশাল স্থাপনাটি সম্ভবত সিকান্দারের অনেক দূরবর্তী মুসলমান প্রতিপক্ষ, দিল্লীস্থ তাঁর সাবেক প্রভু, বর্তমানের তিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বির প্রতি একটি ঘোষণা ছিল।

ফিরোজ শাহের সেনাবাহিনীর কবল থেকে নিজের রাজ্য সফলভাবে রক্ষা করে সিকান্দার তাঁর উত্তর ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্মিত যে-কোন স্থাপনার চেয়ে বড় স্মারক সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর ক্ষমতা ও স্বাধীনতাকে ফুটিয়ে তোলেন। ৫৬৫ x ৩১৭ বর্গফুট আয়তন, মসজিদ সংলগ্ন বিশাল খোলা চত্বর (৪৪৫ x ১৬৮ ফুট), চারদিকে ধনুকাকৃতির খিলান এবং ৩৭০টি গম্বুজ বিশিষ্ট আদিনা মসজিদটি ফিরোজ শাহ তোগলকের (১৩৫১-৮৮) নির্মিত দিল্লীর প্রধান বেগমপুর মসজিদকে সহজেই ছাড়িয়ে যায়।[৩৩] বাস্তবিকই আদিনা মসজিদ তখন পর্যন্ত উপমহাদেশে নির্মিত বৃহত্তম মসজিদ হিসেবে পরিচিতি পায়।

অধিকন্তু এর নির্মাণ রীতিতে দিল্লী ভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যকৌশল থেকে সুস্পষ্ট ভিন্নতার ইংগিতবাহী। মসজিদটির কেবলামুখি অর্থাৎ পশ্চিমদিকটি রাজকীয় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছে যা প্রাক-ইসলামী ইরানের জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[৩৪] এই দেয়ালটি বহুধাপ বিশিষ্ট একটি বিশাল অন্তপট, যার বাইরের অংশে পর্যায়ক্রমিক কুলুঙ্গি এবং আনুভূমিক ও উলম্ব উভয়ভাবেই প্রতিচ্ছায়া ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য নিদর্শনে এর আগে এ ধরনের কোন সুস্পষ্ট নজির পাওয়া যায় না, এটা সাসানীয় আমলের পারস্য (২২৫-৬৪১) সাম্রাজ্যের সবচেয়ে জাঁকালো স্থাপত্য নিদর্শন তেসিফোনের (তৃতীয় শতাব্দী) বিখ্যাত তাক-ই কিসরা প্রাসাদের বাইরের দেয়ালের কথা মনে করিয়ে দেয় (চিত্র ৮)। মুসল্লিদের নামাযের অংশটির নক্সায় এ বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট। দিল্লীস্থ তোগলকের বেগমপুর মসজিদটির নামাযের স্থানটি একটি গম্বুজ দিয়ে ঢাকা,

India: Evidence of the Reuse of Pala-Sena Remains" (paper read at the twenty-first conference on South Asia, University of Wisconsin, Madison, November 6-8, 1992).

৩৩. Asher, "Inventory," 109-10. See also Yolande Crowe, "Reflections on the Adina Mosque at Pandua," In *The Islamic Heritage of Bengal*, ed. George Mitchell (Paris: UNESCO, 1984), 157. এসব হিসাবের সাথে বেগমপুর মসজিদের বাইরের প্রতিদিকের দৈর্ঘ্য ৩২৮ ফুট, আঙিনা ২৮৪ বাই ২৭৩ ফুট এবং মোট ১০৫টি গম্বুজের তুলনা করা যায়। দেখুন Anthony Welch and Howard Crane, "The Tughluqs: Master Builders of the Delhi Sultanate," *Muqarnas* 1 (1983): 130-31.

৩৪. পারসি ব্রাউন উল্লেখ করেন, স্থাপনাটিতে "পশ্চিমদিকে উঁচু ধনুকাকৃতির পবিত্র স্থান এবং একই সাথে রাজকীয় ভাবগাম্ভীর্য থাকায় এটিকে স্বমহিমায় ভাস্বর একটি মুসলমান এবাদতগাহের চাইতে বরং কোন প্রাচীন ক্লাসিক্যাল নগরী" হিসেবে বেশি মনে হতো। Brown, Indian Architecture, Islamic Period, 5th ed. (Bombay: DB Taraporevala, 1968), 36.

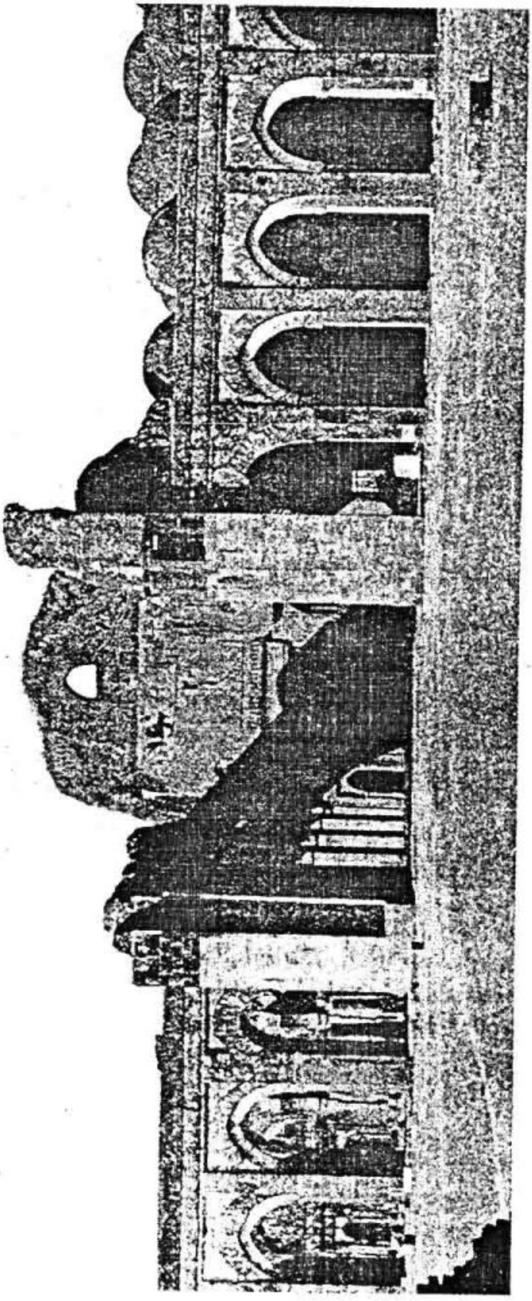

চিত্র ৬। আদিনা মসজিদ, পাণ্ডুয়া (১৩৭৫)। পশ্চিমমুখি ভেতরের দেয়াল, ব্যারেল খিলানের বিধ্বস্ত হওয়াটি দেখা যাচ্ছে। ছবি ক্যাথেরিন আসগর।

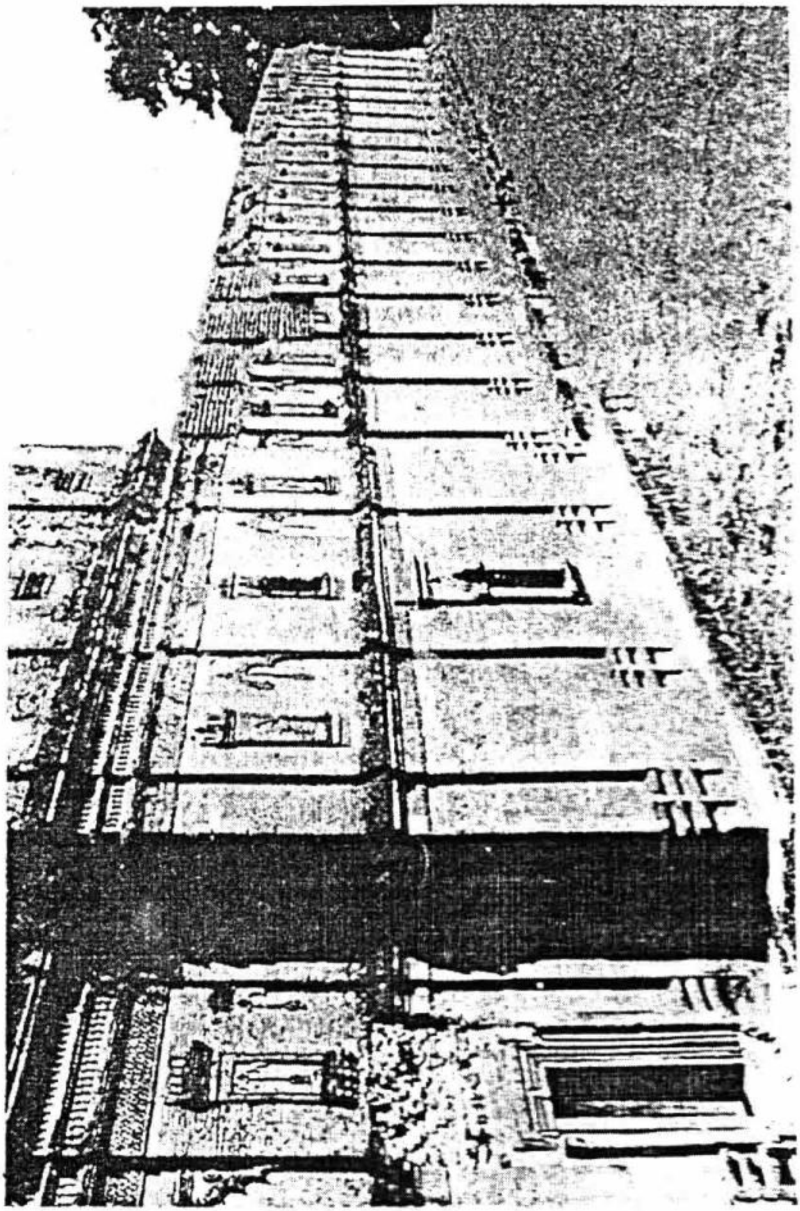

চিত্র ৭। আদিনা মসজিদ, পাণ্ডুয়া (১৩৭৫)। পশ্চিমদিকের বাইরের দেয়াল, ব্যারেল খিলানের সম্মুখভাগ দেখা যাচ্ছে।

চিত্র ৮। তাক-ই কিসরা, তেসিফোন (বাগদাদের নিকটবর্তী, তৃতীয় শতাব্দী)। ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে সম্মুখভাগের দৃশ্য। Arthur Upham Pope, *A Survey of Persian Art* (Ashiya, Japan: Jay Gluck, 1964), vol. 7, pl, 149. Reprinted by Permission of Jay Gluck.

সেলজুক ইরানের (১০৩৭-১১৫৭) এই ধারণাটি দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে ভারতে আমদানি করা হয়,[৩৫] অথচ আদিনা মসজিদে গোলাকার খিলান ব্যবহৃত হয়েছে। ভারতের অন্য কোন স্থাপত্যকর্মে কখনো ব্যবহৃত হওয়ার আগে মসজিদটিতে তাক-ই কিসরার বিশাল পিপাকৃতির খিলানের মতো করে গোটা কাঠামোকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ অনেক পূর্বেকার সাসানীয় ইরানের ঐতিহ্য দৃঢ়তার সাথে অনুসরণ করে আদিনা মসজিদটি নির্মাণে দিল্লীর স্থাপত্য ঐতিহ্য পরিত্যাগ করা হয়েছে। আমরা জানি, ইরানি স্থাপত্যবিদ ও শাসকরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সাসানীয় তাক-ই-কিসরা প্রাসাদকে দৃশ্যমান সাড়ম্বরতা ও গৌরবের শীর্ষবিন্দু হিসেবে মনে করতো এবং সচেতনভাবে এটাকেই অনুকরণীয় মডেল হিসেবে স্বীকার করতো।[৩৬] তাই সিকান্দার সচেতন অনুসরণকারী না হলেও অন্তত সেই ঐতিহ্যের উত্তরসুরি ছিলেন।

৩৫.See Tsukinowa Tokifusa, "The Influence of Seljuq Architecture on the Earliest Mosques of the Delhi Sultanate Period in India," Acta Asiatica 43 (1982): 37-60.

৩৬. আদিনা মসজিদ নির্মাণের মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে ইলখানি রাজপুরুষ আলী শাহ তাবরিজে পিপাকার খিলানের একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেন, যা তাক-ই কিসরাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। তারপর থেকে সমসাময়িক পর্যবেক্ষকরা তাবরিজের মসজিদের সাথে তাক-ই কিসরার তুলনা করেন, অর্থাৎ এটা স্পষ্ট যে, এই মহান সাসানীয় প্রাসাদটি চতুর্দশ শতকের ইরানিদের মনে জাগরূক ছিল। Donald N. Wilber, *The Architecture of Islamic Iran:* The Il Khanid Period (Princeton: Princeton University Press, 1955), 146-47.

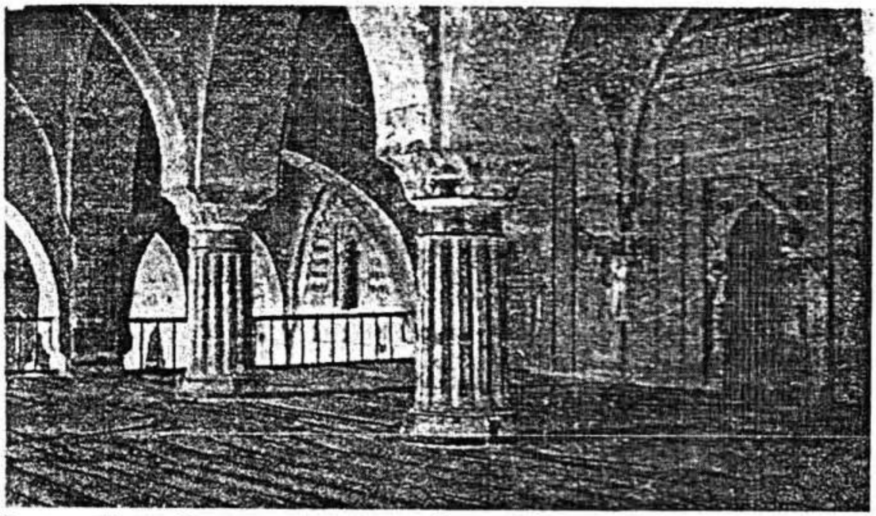

চিত্র ৯। আদিনা মসজিদ, পাণ্ডুয়া (১৩৭৫)। রাজকীয় ব্যালকনি, অভ্যন্তরভাগ।

আদিনা মসজিদের অভ্যন্তরভাগেও রাজকীয় জাঁকজমকের প্রতিফলন দেখা যায়। নামায পড়ার মূল স্থানের লাগোয়া উত্তরে কথিত 'রাজার সিংহাসন' (*বাদশাহ কা তখ্‌ত*) নামের একটি উঁচু বেদীতে সাধারণ মেঝে থেকে উচ্চস্থানে সুলতান ও তার পারিষদবর্গ নামায আদায় করতেন (চিত্র ৯)।[৩৭] সাধারণ মানুষ মসজিদের দক্ষিণ-পূর্বদিকের দরজা ব্যবহার করতো, অন্যদিকে পশ্চিম দিকে বিদ্যমান একটি ব্যক্তিগত প্রবেশপথের মাধ্যমে *বাদশাহ কা তখতে* পৌছা যেত। এই পুরো দরজা-কাঠামোটি প্রাক-মুসলিম কোন ভবন থেকে নেয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, কারণ উপরে বিদ্যমান অস্পষ্ট একটি বৌদ্ধ বা হিন্দু মূর্তির দৃশ্য দেখা যায় (চিত্র ১০)। সুলতান সিকান্দারের নির্দেশে মসজিদটির পশ্চিম দেয়ালে নিম্নলিখিত বাণী উৎকীর্ণ করা হয়:

'মহামান্বিত সুলতানের রাজত্বকালে, আরব ও পারস্যের সুলতানদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী, সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ, সবচেয়ে উদার এবং সবচেয়ে ত্রুটিমুক্ত সুলতান, যিনি দয়াময় আল্লাহ'র উপর বিশ্বাসী, সুলতান ইলিয়াস শাহের পুত্র, সুলতান আবুল মুজাহিদ সিকান্দার শাহ। হাশরের দিন পর্যন্ত তার শাসন স্থায়ী হোক।'[৩৮]

৩৭. গুজরাটের আহমদাবাদের জামে মসজিদে একই ধরনের কাঠামো দেখা যায়, মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর যেটিকে লোকসমাগমের জন্য রাজা ও তার ঘনিষ্ঠজন ও অমাত্যদের ব্যবহৃত জমাট পাথরের বেদি হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। জাহাঙ্গীর, *তুজক ই জাহাঙ্গীরি*, Alexander Rodgers and Henry Beveridge, 2d ed. 2 Vol in 1 (Delhi: Munshiram Manoharlal, 1968), 1: 425.

৩৮. Shamud-Din Ahmed, ed. and trans., *Inscriptions*, 4: 38.

আল্লাহ'র প্রশংসায় মাত্র একটি বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, বাকি সব সুলতানের প্রশংসা!

ইলিয়াস শাহি রাজবংশের প্রথমদিককার সুলতানদের মুদ্রা ও স্থাপত্যকর্মে রাজনৈতিক বৈধতার কৌশলের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা তাদের পূর্বসূরিদের অনুসৃত নীতি থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন। অন্যদিকে ত্রয়োদশ শতকের বাংলার গভর্নররা বদ্বীপে যখন স্রেফ দিল্লীর স্থাপত্য কৌশলের প্রতিস্থাপন করেছেন, তখন এই সুলতানরা দিল্লীর নিকট থেকে স্বাধিকার অর্জন করে পর্যায়ক্রমে প্যান-ইসলামী ও সামাজিক বুনিয়াদের উপর রাষ্ট্রীয় আদর্শ ভিত্তি করে তাঁদের বৈধতার দৃঢ় ঘোষণা দিয়েছেন। 'সুলতান সিকান্দারের স্থাপত্যে এবং সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের মুদ্রায় বৈধতার রাজকীয় কৌশলের প্রতিফলনের প্রেক্ষাপটে সুলতান ইলিয়াসের সঙ্গে খলিফার সম্পর্ক থাকার দাবী এবং সুলতান সিকান্দারের পুত্র ও উত্তরসুরি সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের (শাসনকাল ১৩৮৯-১৪১০) ইসলামের পবিত্রতম স্থানসমূহে—মক্কা ও মদিনা উভয় স্থানে-মাদরাসা নির্মাণে উদারহস্তে পৃষ্ঠপোষকতায় প্যান-ইসলামী অভিগমন আমরা দেখতে পাই।[৩৯] অধিকন্তু যদিও বাংলার সুলতানগণ তাদের স্থাপনাসমূহ ও মুদ্রায় আরবি হরফে মুদ্রণ অব্যাহত রাখেন, তবুও চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ থেকে তাঁদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিষয়গুলোতে পারসো-ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করতে থাকেন। তাঁরা পারস্যের রাজকীয় অনুষ্ঠানাদির পৃষ্ঠপোষকতা, সাসানীয় রাজকীয় ঐতিহ্যের অনুকরণে রাজদরবারের বিস্তারিত অনুষ্ঠান গ্রহণ, ক্রমাধিকারতান্ত্রিক আমলাতন্ত্র নিয়োগ, ইসলামকে রাষ্ট্রীয়-পৃষ্ঠপোষকতার ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে, যা রাষ্ট্রীয় মুদ্রায় জাঁকজমক ও অব্যাহতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। পঞ্চদশ শতকের প্রথমদিকে খ্যাতির শীর্ষদেশে অবস্থানের সময়ে পাণ্ডুয়া সফরকারি বিদেশি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ রাজদরবারের আনুষ্ঠানিকতার যে বর্ণনা দিয়েছে, তাকে সুনির্দিষ্টভাবে পারস্যের সংস্কৃতি হিসেবেই স্বীকার করে নিতে পারি। মিং রাজবংশের জনৈক চীনা দূত ১৪১৫ সালে লিখেন, 'রাজপ্রাসদটি পুরোপুরি চুন-সুরকি মেশানো ইটের তৈরি, উঁচু ও চওড়া সিঁড়ি বেয়ে প্রাসাদে উঠতে হয়। কক্ষগুলোর ছাদ সমতল এবং অভ্যন্তরভাগ সাদা রং করা। ভেতরের দরজাগুলো তিনগুণ পুরু এবং ৯ প্যানেল বিশিষ্ট। দরবারকক্ষের সকল স্তম্ভ পিতল দিয়ে মোড়ানো। এগুলো খোদাই ও পলিশ করা ঝকমকে ফুল ও জীবজন্তুর ছবি দ্বারা অলংকৃত। ডানে ও বামের লম্বা বারান্দায় উজ্জ্বল অস্ত্র হাতে হাজার হাজার লোক (আমাদের সাক্ষাতের

৩৯. Ibn-Hajzr al-Asqalani, *Inba 'al-Ghumr bi-anba al-'umr* (Cairo: Al-Majlis al-Ala li-I-shuun al-Islamiyah, 1969), 2: 496: Muhammad Sakhavi, *Al-Zau al-lami li-ahl al-qarn al-tasi* (Beirut: Maktabat al-Hayat, 1966), 2: 313. See also Ziauddin Desai, "some New Data Regarding the Pre-Mughal Muslim Rulers of Bengal," *Islamic Culture* 32 (1958): 199-200.

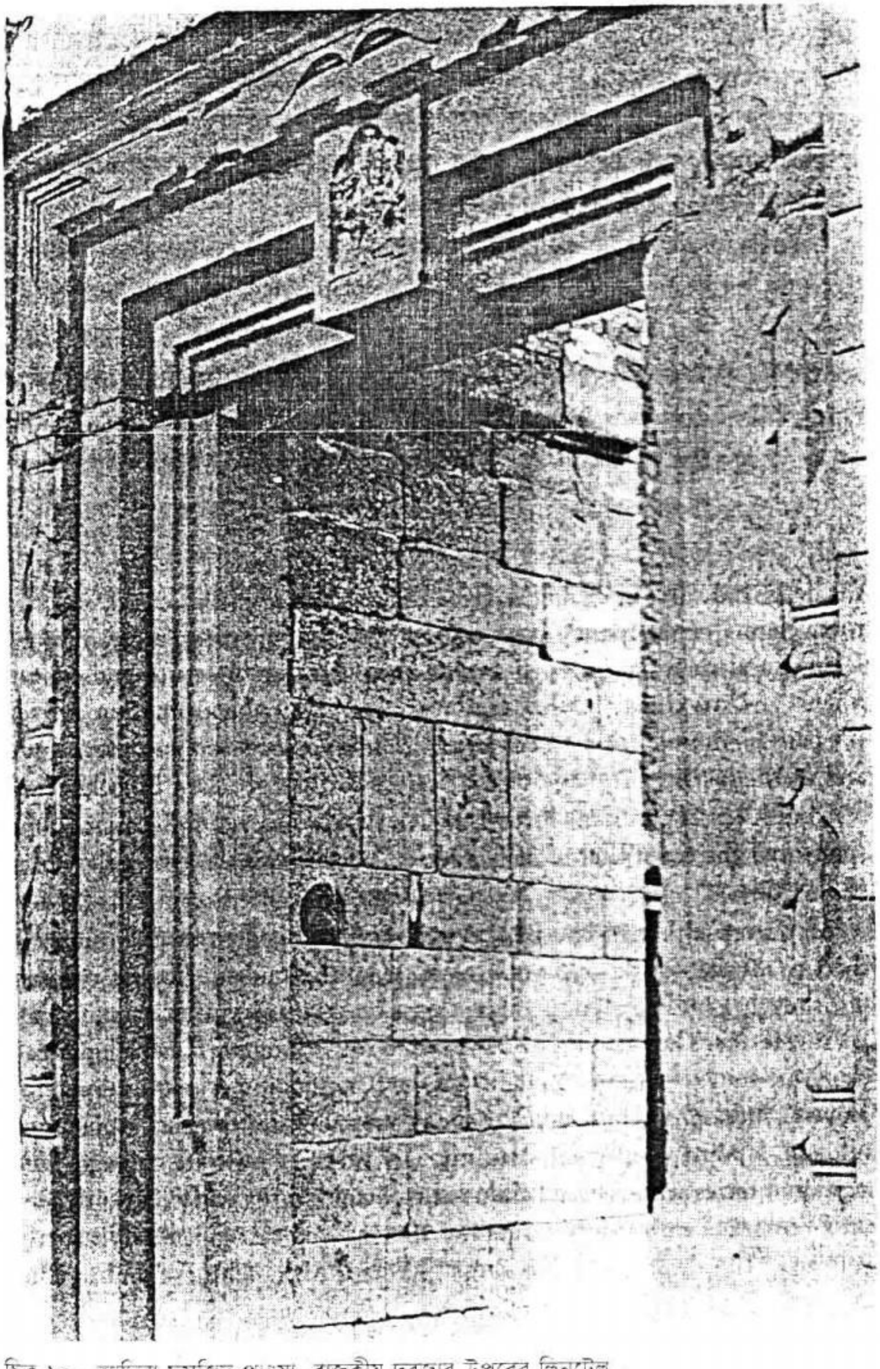

চিত্র ১০ : আদিনা মসজিদ পাণ্ডুয়া, রাজকীয় দরজার উপরের লিনটেল

সময়) অবস্থান করছে, বাইরেও আঙিনা পূর্ণ করে অনেকে অশ্বপৃষ্ঠে রয়েছে, যাদের বর্শা, তরবারি, তীর-ধনুক সহকারে উজ্জ্বল শিরোস্ত্রাণ ও বর্ম পরিহিত তেজদীপ্ত ও বলবান দেখাচ্ছে, রাজার ডানে ও বাঁয়ে ময়ুরের হাজার হাজার পালক দিয়ে তৈরি ছাতা এবং সভাকক্ষের বাইরে হাতির পিঠে কয়েকশ সৈন্য রয়েছে। প্রধান সভাকক্ষে মূল্যবান পাথরসমূহের উপর স্থাপিত উঁচু সিংহাসনে রাজা পা ভাঁজ করে বসে আছেন এবং তার কোলে একটি দুধারি তরবারি রাখা।[৪০]

পাণ্ডুয়ার রাজদরবারের অনুষ্ঠানাদিতে স্পষ্টতই হতবাক হয়ে দূত লিখে চলেছেন, 'রৌপ্যদণ্ড হাতে এবং পাগড়ি পরিহিত দুব্যক্তি এসে ভেতরে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। পাঁচ কদম এগিয়ে আমরা অভিবাদন জানালাম। (দরবারকক্ষের) মাঝামাঝি পৌছে তারা থেকে গেল এবং স্বর্ণদণ্ড হাতে অন্য দুব্যক্তি এসে আগের মতো আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেল। আমাদের অভিবাদনের জবাব দেওয়ার পর রাজা রাজকীয় আদেশনামাটি তুলে মাথায় ঠেকিয়ে সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং তারপর তা খুলে পাঠ করলেন। রাজকীয় উপহারসমূহ দরবারকক্ষের গালিচার উপর ছড়িয়ে দেওয়া হলো।' এরপর দূতকে জাঁকজমকপূর্ণ এক ভোজসভায় নিয়ে যাওয়া হলো, তারপর সুলতান 'দূতদের স্বর্ণের পাত্র, স্বর্ণের কোমরবন্ধ, স্বর্ণের সোরাহি (পানপাত্র) ও স্বর্ণের গামলা প্রদান করলেন।'[৪১] ময়ুরের পালক, ছাতা, পদাতিক সৈন্যদলের সারি, মূল্যবান পাথরের উপর স্থাপিত সিংহাসন, স্বর্ণের অঢেল ব্যবহার– সবই পারসো-ইসলামী এবং এমনকি সাসানীয় রাজকীয় নিয়মকানুনের সাথে নির্ভুলভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শুধুমাত্র হাতির উপস্থিতি ভারতীয় রাজদরবারের ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশেষত ১২১৩ থেকে ১৩৪২ পর্যন্ত প্রধানত ইসলামী কর্তৃত্বের প্রতীকী কিংবা ১৩৪২ সালের পর থেকে রাজকীয় পারস্যের কর্তৃত্বের প্রতীকী, যাই প্রয়োগ করা হোক না কেন, মুসলিম শাসকশ্রেণী তাদের শাসিত এলাকার 'বাইরের' রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতীকসমূহকে পরিস্ফুটিত করেছে। প্রথমদিককার গভর্নরদের মতো বাংলার কোন শাসক নিজেকে শুধুমাত্র' প্রাচ্যের রাজাদের' সেরা হিসেবে দাবি করেই ক্ষান্ত থাকেননি। মসজিদে সুলতান

৪০. W.W. Rockhill, "Notes on the Relations and Trade of China with the Eastern Archipelago and the Coast of the Indian Ocean during the Fourteenth Century," Toung Pao 16, pt. 2 (1915): 441-42. পঞ্চদশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে প্রাথমিক মিঙ রাজবংশের আমলে চীনাদের সমুদ্রপথে সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাৎপর্যমণ্ডিত আগমন দেখা যায়। ভারত মহাসাগরে প্রেরিত মিঙ রাজদরবারের সাতটি মহা অভিযানের দুটিতে চীনা কর্মকর্তারা চট্টগ্রাম ও সোনারগাঁও হয়ে বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়ায় (১৪১৫) ও গৌড়ে (১৪৩২) পৌছেছিলেন।

৪১. প্রাগুক্ত, ৪৪২.

সিকান্দার নিজেকে আরব ও পারস্যের রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে ত্রুটিমুক্ত হিসেবে ঘোষণা করেছেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে উপমহাদেশের যে এলাকা শাসন করতেন সেখানকার কারো কথা উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। একই চেতনায় তাঁর পুত্র ও উত্তরসুরি সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ শিরাজের শ্রেষ্ঠ কবি হাফিজকে প্রলুব্ধ করে পাণ্ডুয়ায় এনে তাঁর রাজদরবার আলোকিত করার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছিলেন।[৪২] এসব সুলতানদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যপরিধি দিল্লী বা মধ্য এশিয়ায় না থেকে আরো পশ্চিমে মক্কা, মদিনা, শিরাজ ও প্রাচীন তেসিফোনে বিস্তৃত হয়েছিল।

রাজা গণেশের উত্থান (আনুমানিক ১৪০০-১৪২১)

বাংলার মুসলিম শাসকদের তাদের শাসিত এলাকার বাইরের আত্ম-স্বীকৃতির দীর্ঘ ঐতিহ্যের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়াটা ছিল অনিবার্য, মুসলিম শাসকদের শাসিত অংশে তথা বাঙালি জনসাধারণ বিশেষ করে হিন্দু ভূস্বামী অভিজাতদের মধ্যে যাদের সহযোগিতা রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনার জন্য ছিল অপরিহার্য। চতুর্দশ শতকের শেষভাগ থেকে ইন্দো-তুর্কী শাসক শ্রেণী ও হিন্দু বাঙালি সমাজের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে, যখন সংশোধিত ও বিশুদ্ধ ইসলামের কট্টর অনুসারী হিসেবে দাবিদার চিশতি ও ফেরদৌসি তরিকার সূফীরা শাসকশ্রেণীতে বাঙালিদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র ও ইসলামী পরিচিতি ক্ষুন্ন না করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। ১৩৯৭ সালে ফেরদৌসি তরিকার সূফী মাওলানা মুজাফ্‌ফর শামস বলখি (মৃত্যু ১৪০০) সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের কাছে লেখা এক পত্রে অভিযোগ করেন:

> 'পরাজিত অবিশ্বাসীরা মাথা নীচু করে তাদের মালিকানাধীন এলাকার প্রশাসন চালাতে তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে। কিন্তু ইসলামী ভূখণ্ডে মুসলমানদের উপরেও তাদেরকে (নির্বাহী) কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করা হচ্ছে এবং তারা তাদের উপর তাদের বিধি-নিষেধ জারি করছে। এ ধরনের কাজ হতে দেওয়া উচিত নয়।'[৪৩]

৪২. M.I. Borah, "An Account of the Immigration of Persian Poets into Bengal," *Dacca University Studies* 1 (November 1935): 144.

৪৩. Muzaffar Shams Balkhi, *Maktubat-I Muzaffar Shams Balkhi* (Persian MS., Acc. No. 1859, Khuda Bakhsh Oriental Public Library, Patna), letter 163, p. 509. See also S.H. Askari, "The Correspondence of Two Fourteenth-Century Sufi Saints of Bihar with the Contemporary Sovereigns of Delhi and Bengal," *Journal of the Bihar Research Society* 42, no. 2 (1956): 187. Askari's translation.

কিন্তু এ ধরনের কাজ হয়েছে; বস্তুত তারা তা করেছে। বাঙালি অভিজাত ব্যক্তিবর্গ ছিল প্রশাসকদের গর্বিত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শ্রেণী, তারা দেশ, জনসাধারণ এবং যে সনাতন পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকার পরিচালিত হচ্ছে, তা জানতো। এমনকি ইন্দো-তুর্কী ক্ষমতাসীন শ্রেণী উত্তর ভারত কিংবা মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিদেশি প্রশাসক নিয়োগ করতে চাইলেও সেসব এলাকা থেকে বাংলার ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতায় এবং উত্তর ভারতের থেকে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার কারণে তা হতে পারতো না। তাই, শক্তিশালী বাঙালী অভিজাত শ্রেণীই ছিল স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনা অব্যাহত রাখার উপযুক্ত মাধ্যম। মুজাফ্ফর শামসের প্রতিবাদেই প্রমাণ পাওয়া যায়, তা ছিল নীতি।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আদর্শগতভাবে সালতানাত ছিল মধ্যপ্রাচ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর রাজনৈতিক মূল নিহিত ছিল বাংলায়। আর এই মৌলিক দ্বন্দ্বেই সালতানাত সবচেয়ে কঠিন অভ্যন্তরীণ সংকটের মুখে পড়ে, রাজা গণেশ নামক এক প্রভাবশালী অভিজাতের অভ্যুদয়ের পথ সৃষ্ট করে। সমসাময়িক এক পত্রে তাঁকে 'চারশ বছর ধরে বিদ্যমান জমিদার' (*চাহার সাদ সালা জমিনদার*) হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে,[৪৪] তিনি পাল ও সেন আমল থেকে এক প্রখ্যাত ক্ষমতাসীন পরিবারের উত্তরসুরি ছিলেন। পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে রাজা গণেশ আধুনিক রাজশাহী ও পাবনার মধ্যকার গঙ্গা-তীরের উর্বরা ভূমির প্রকৃত নিয়ন্ত্রণকারী ছিলেন বলে ধারণা করা হয়।[৪৫] ১৩৯৭ সালে মুজাফফর শামসের লিখিত পত্রে বর্ণিত বাংলার মুসলমানদের উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রয়োগকারী 'পরাজিত অবিশ্বাসী' শ্রেণীর লোক ছিলেন তিনি। ১৪১০ সালে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের মৃত্যুর পর তুর্কী ও বাঙালিদের মধ্যকার উত্তেজনা বেশ বৃদ্ধি পায়, পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সংকটটি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ঐতিহাসিক মুহাম্মদ কাশিম ফিরিশতার (মৃত্যু ১৬২৩) মতে, রাজা গণেশ সুলতান শিহাবউদ্দিনের (১৪১১-১৪) শাসনকালে 'প্রচুর ক্ষমতা ও প্রাধান্য লাভ করেন', এ সময় এই বাঙালি অভিজাত ব্যক্তিটি 'রাজ্য ও খাজাঞ্চিখানার প্রভু' হয়ে যান। তিনি লিখেন, সুলতান মারা যাওয়ার পর 'রাজত্বের ধ্বজা উঁচু করেন, রাজসিংহাসন দখল করেন এবং তিন বছর ও কয়েক মাস শাসন করেন।'[৪৬] কিন্তু

৪৪. Shaikh Nur Qutb-i-'Alam, *Maktubat-i-Shaikh Nur Qutb-i-'Alam* (Persian MS., Subhan Allah no. 297671/18, Maulana Azad Library, Aligarh Muslim University, Aligarh), letter 9. p. 68. See also Abul Karim, "Nur Qutb Alam's Letter on the Acendany of Ganesa," in Muhammad Enamul Haq, Abdul Karim Sahityavisarad Commemoration Volume (Daca: Asiatic Society of Bangladesh, 1972), 338.

৪৫. The best treatment of the revolution is found in the study of Ahmad Hasan Dani, "The House of Raja Ganesa of Bengal." *Journal of the Asiatic Society of Bengal: Letters* 18. no. 2 (1952): 121-70.

৪৬.Muhammad Qasim Firisthta. *Tarikh-i-Firishta* (Lucknow: Nawal Kishore, 1864-65). 2:297.

ঐতিহাসিক নিজামউদ্দিন আহমদ (মৃত্যু ১৫৯৪) রাজা গণেশের সত্যি সত্যিই সিংহাসন জবরদখলের কোন কথা উল্লেখ করেননি, তিনি শুধুমাত্র উল্লেখ করেন, সুলতান শিহাবউদ্দিন বায়েজিদ শাহের মৃত্যুর পর 'কানস (গণেশ) নামের এক জমিদার ক্ষমতা দখল করেন এবং বাঙলায় প্রভুত্ব বিস্তার করেন,' এবং তার 'ক্ষমতায় থাকার মেয়াদ' (*মুদ্দাত-ই-ইসতিলা*) স্থায়ী হয়েছিল সাত বছর।[৪৭] এ ঘটনার সমসাময়িক বর্ণনা পাওয়া যায় একমাত্র আরব ঐতিহাসিকদের নিকট থেকেই, তারা হয় হজ্বযাত্রীদের নিকট থেকে নয়তো বাংলা সফর শেষে আরবে গমনকারীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের পর তাঁর পুত্র সাইফউদ্দিনের (১৪১০-১১) সিংহাসন লাভ করার কথা বর্ণনাকারীরা নিশ্চিতভাবেই জানিয়ে বলেন, তাঁর দাস রাজা গণেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং রাজত্বের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। কিন্তু তারপরে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন, রাজা গণেশের পুত্র জবরদখলকারীকে উচ্ছেদ করে ইসলাম গ্রহণ করে মুহাম্মদ জালালউদ্দিন নাম ধারণ করেন এবং বাংলার সুলতান হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৪৮] ১৪১০ থেকে ১৪১৭ সাল চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যেও বাংলার মুসলিম শাসকদের অব্যাহতভাবে মুদ্রা প্রচলনের ঘটনা প্রমাণ করে সে সময়ে বদ্বীপটির ন্যায়সংগত কর্তৃত্ব ছিল মুসলিম সুলতানদের হাতে।[৪৯] নিজামউদ্দিন বর্ণিত রাজা গণেশের রাজ্যের কর্তৃত্ব অর্জনের ঘটনায় দেখা যায়, এই বাঙালি ব্যক্তিটি রাজ্য পরিচালনা করছেন, কিন্তু রাজত্ব করতে পারেননি, বরং তিনি একজন ক্রীড়নক মুসলিম উত্তরসুরির মাধমে বাংলা শাসনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। গণেশ যদিও এসব ক্রীড়নক সুলতানদের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, তবুও সমসাময়িক আরব ঐতিহাসিকগণ এবং পরে ফিরিশতাও ন্যায়সংগত সার্বভৌমত্বের বদলে তাঁর প্রকৃত শাসন কর্তৃত্বকে ভুল বুঝেছেন। ১৪১৫ সালে তিনি আরো সাহসী হয়ে তাঁর মাত্র ১২ বছর বয়স্ক পুত্র যদুকে[৫০] -পরবর্তী সূত্রটি মতে-বাংলার সিংহাসনে বসান। বাংলার অন্যান্য অভিজাতদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে রাজা গণেশ এখন তাঁর নিজ পুত্রের রাজপ্রতিভূ হিসেবে বাংলা শাসন করতে শুরু করলেন।

---

৪৭. Khawjah Nizamuddin Ahmad, *The Tabaqat-i-Akbari*, trans, Brajendranath De, ed. Baini Prasad (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1931-39), 3, pt. 1: 430-31; text, ed., B. De and M. Hidayat Hosein (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1931-35), 3: 265.

৪৮. See Ibn Hajar al-'Asqalani, *Inba'*, 2: 496; 3:532. See also Muhammad Sakhawi, Al-Zau', 8: 280.

৪৯. See. Karim, *Corpus*. 70-73.

৫০. Ghulam Hussain Salim, *Riyazu-s-Salatin: A History of Bengal*, trans.. Abdus Salam (Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1903), 115.

রাজা গণেশের দুর্বিনীত পদক্ষেপ সত্ত্বেও তুর্কী অভিজাতদের পুরাতন রক্ষাব্যবস্থা তাঁকে ও তাঁর সমর্থকদেরকে দুশত বছর ধরে প্রচলিত দেশটির রাজনৈতিক আদর্শ যে প্রতীকী কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা ধ্বংস করতে বাধা দেয়। গণেশের পুত্র যদু হিন্দু রাজা হিসেবে রাজ্য পরিচালনা করেননি, কিংবা তিনি কোন হিন্দু রাজত্বের যথার্থ প্রতীক সাথে নিয়ে ক্ষমতায় বসেননি। বরং বাঙালি ও তুর্কী উপদলগুলোর মধ্যে দৃশ্যত এক সমঝোতা হয়। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাম বদলিয়ে নাম রাখেন সুলতান জালালউদ্দিন মুহাম্মদ এবং তারপর তাঁকে একজন মুসলিম রাজা হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করতে দেওয়া হয়।[৫১] ১৪১৫ সালে ক্ষমতায় আরোহণের পরপরই নতুন সুলতান তাঁর ইসলামী নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। এসব মুদ্রা পাণ্ডুয়া এবং প্রাদেশিক নগরী চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও ও সাতগাঁও থেকে একই সাথে প্রকাশ করায় বোঝা যায় তা ছিল রাজা গণেশের একটি হিসাবি পদক্ষেপ, যা সমগ্র বাংলার শাসক হিসেবে তাঁর পুত্রের ক্ষমতায় আরোহণের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করে।

মুসলিম অভিজাতশ্রেণী রাজনৈতিক বাস্তবতার কাছে নতি স্বীকার করে তা যদি মেনে নিয়ে থাকে এবং এমনকি নতুন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করলেও রাজধানীতে ইসলাম ধর্মের রক্ষাকারী তথা সূফীরা এ ঘটনায় অত্যন্ত মর্মান্তিক ও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। সমসাময়িককালের শ্রেষ্ঠ সূফী সাধক শেখ নূর কুতুব-ই আলম চিৎকার করে বলে উঠেন,

'খোদার কী মহত্ত্ব! কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই তিনি এক মুশরিক বালককে ঈমানের পোশাক পরালেন, এবং তাঁর বন্ধুদের বাদ দিয়ে তাঁকে রাজ্যের সিংহাসনে বসালেন। কুফুরি প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং ইসলামের রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেছে।

কে জানে, আসমানি কুদরতের মহিমা কি
যারা বেঁচে আছে, তাদের নিয়তি কি?

হায়, কি দুঃখজনক, ইসলামের সূর্য আড়াল হয়ে পড়েছে আর ধর্মের চাঁদে গ্রহণ লেগেছে।'[৫২]

নূর কুতুব-ই আলম এমনকি প্রতিবেশী জৈনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কির কাছে পত্র লিখে তাঁকে বদ্বীপটি আক্রমণ এবং জবরদখলকারী রাজা গণেশের হাত থেকে বাংলাকে উদ্ধারের অনুরোধ করেন। তিনি, লিখেন, 'ইসলামে বিশ্বাসীদের আবাসভূমি

৫১. এই সমঝোতার ফলে ফিরিশতার ধারণা জন্মে, সিংহাসনে আরোহণের আগে রাজা গণেশের পুত্র যখন মুসলমান হওয়ার সংকল্পের কথা ঘোষণা করেন, তখন দরবারের অভিজাতবর্গ সর্বসম্মতভাবে ঘোষণা করেন, "আমরা রাজাকে জাগতিক বিষয়ে অনুসরণ করবো, তবে ধর্মের ব্যাপারে নয়।" ("জামি আহল-ই হল ভা আকদ মুত্তাফিক শুদা, গোফতান্দ: মা তাবি-ই-পাদশাহ-ইম দার উমার-ই দুনিয়াভি, বা মাজহাব ভা দিন কারি নিস্ত")। ফিরিশতা, *তারিখ-ই-ফিরিশতা*, ২:১৯৭

৫২. Shaikh Nur Qutb-i Alam, Maktubat, letter 9, p. 69. See also Abdul Karim, "Nur Qutb Alam's Letter," 342-43 Karim's translation.

যখন এমনভাবে সংকুচিত হয়ে পড়েছে, তখন আপনি কিভাবে আপনার সিংহাসনে শান্ত ও সুখে থাকতে পারেন! উঠুন এবং ধর্মের সাহায্যে এগিয়ে আসুন, আপনার কাছে সম্পদ থাকায় এটা করা আপনার জন্য বাধ্যতামূলক।'[৫৩] একটি চীনা সূত্র ১৪১৫-২০ সালের ঘটনাপঞ্জিতে উল্লেখ করে, বাংলার পশ্চিম দিকের, একটি রাষ্ট্র বদ্বীপটি আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু স্বর্ণ ও অর্থ দিয়ে তা প্রশমিত করা হয়।[৫৪] অবশ্য মধ্য এশীয় ও আরাকানী প্রচলিত সূত্রগুলো সুলতান ইব্রাহিমের আক্রমণের ফলাফল সম্পর্কে কিছুটা ভিন্ন তথ্য দেয়,[৫৫] তবে সূফী নূর কুতুব-ই আলমের প্রত্যাশা অনুযায়ী জৈনপুরের সুলতান ইসলামের জন্য বদ্বীপটি 'মুক্ত' করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন কি না সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট কিছু পাওয়া যায় না।

অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং বৈদেশিক আক্রমণ উভয়ে রাজধানীকে আচ্ছন্ন করে ফেলার প্রেক্ষাপটে মুসলিম শাসনপূর্ব বেশ কিছু শাসক পরিবারের উত্তরসুরি তুর্কী শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জনের সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে এবং তারা বদ্বীপটির পূর্ব ও দক্ষিণ অংশের বিরাট এলাকা পুনর্দখল করে। হিজরী ৮২০ সালে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি ১৪১৭-ফেব্রুয়ারি ১৪১৮ সালে একই বছরে বাংলার কোন স্থান থেকেই কোন

৫৩. এই পত্রের কিছু অংশ সমসাময়িক শেখ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানির চিঠিপত্রে পুনরায় ব্যক্ত হয়েছে। দেখুন Ashraf Jahangir Simnani, *Maktubat-i-Ashrafi* (Persian MS no. 27, Aligarh Muslim University History Department, Aligarh), letter 45, fol, 139a. See also S.H. Askari, "New Light on Rajah Ganesh and Sultan Ibrahim Sharqi of Jaunpur from Contemporary Correspondence of Two Muslims Saints," *Bengal Past and Present* 57 (1984): 34. Askari's translation.

৫৪. P.C Bagchi, "Political Relations between Bengal and China in the Pathan Period," *Visva-Bharati Annals* 1 (1945): 103-4.

৫৫. ১৪৪২ সালের দিকে হেরাতের তৈমুরি শাসক শাহরুখের (১৪০৫–৪৭) অধীনস্থ একজন কূটনীতিক লিখেন যে, তার প্রভু বাংলার সুলতানের অনুরোধে বাংলা-জৈনপুর সংকটে হস্তক্ষেপ করে "জৈনপুরের শাসককে বাংলার রাজাকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন, অন্যথায় তার নিজেকেই পরিণাম ভোগ করতে হবে বলে হুঁশিয়ার করে দেন। এই নির্দেশে জৈনপুরের শাসক ভীত হয়ে তা পালন করেন এবং বাংলা আক্রমণ থেকে বিরত থাকেন।" Abd al-Razzaq, *Matla' al-sa'dain*, in *The History of India as Told by Its Own Historians*, trans. and ed. H.M. Elliot and John dowson (Allahabad: Kitab Mahal, 1964), 4: 99. অন্যদিকে সমসাময়িক আরাকানি কাহিনীগুলোতে বলা হয়, তখন পাণ্ডুয়া দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণকারী রাজা গণেশের বাহিনী যুদ্ধে জৈনপুরের সুলতান ইব্রাহীমকে পরাজিত করে। এই কাহিনী অনুযায়ী আরাকানের এক রাজা ১৪০৬ সালে বার্মার সিংহাসনের লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে পাণ্ডুয়ায় আশ্রয় লাভ করেন এবং তিনি রাজা গণেশকে এমন সামরিক পরামর্শ দান করেন, যার ফলে বাঙালিদের পক্ষে জৈনপুরের সুলতানকে পরাজিত করা সম্ভব হয়। A.P. Phayre, Journal of the Asiatic Society of Bengal 13 (1844): 44-46, cited in Dani, "House," 135-37, See also A.P. Phayre, *History of Burma* (London: Trubner, 1884), 78.

সুলতানের নামে মুদ্রা প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায়নি। অন্যদিকে সেই সংক্ষিপ্ত সময়ে উপর্যুপরি দুই, হিন্দু রাজা দনুজামর্দন দেব ও তাঁর পুত্র মহেন্দ্রদেব চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার দৃশ্যত ছোট পাণ্ডুয়ার 'পাণ্ডুয়ানগর' থেকে মুদ্রা অবমুক্ত করেন।[৫৬] এ দুই রাজা সম্ভবত চন্দ্রদ্বীপ রাজাদের দেব রাজবংশের উত্তরসুরি, বর্তমানের বৃহত্তর বরিশাল ছিল এ রাজবংশের কেন্দ্র, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সোনারগাঁও থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিশাল এলাকা তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতেন।[৫৭] কিন্তু দনুজামর্দন ও মহেন্দ্রের রাজ্য পুনর্দখল খুব কম সময়ের জন্যই সফল হয়েছিল। ১৪১৮ সালে সুলতান জালালউদ্দিন বর্তমানের ফরিদপুর থেকে মুদ্রা অবমুক্ত করেন। এতে বোঝা যায়, রাজা গণেশের বাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব বদ্বীপের কেন্দ্রস্থলে সালতানাতের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৫৮] একই বছর সোনারগাঁও ও সাতগাঁও থেকেও একই ধরনের মুদ্রা প্রকাশিত হয়। এবং ১৪২০ সালে মুদ্রা প্রকাশিত হয় চট্টগ্রাম থেকে। এতে নাটকীয়ভাবে সমগ্র বদ্বীপে সালতানাতের কর্তৃত্ব পুনপ্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে।[৫৯]

যদিও বিদ্রোহ মাত্র এক বছর বা এরকম সময় স্থায়ী হয়েছিল কিন্তু তবুও বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ যেসব মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলো তাদের আদর্শগত ভিত্তি এবং সেসময় বাংলার পশ্চাদভূমিতে বিদ্যমান ধর্মীয় অনুভূতি সম্পর্কে অনেক কিছুই বলে দেয়। দেব রাজাদের প্রকাশিত মুদ্রার প্রথম পিঠে সংস্কৃতিতে লেখা হয়, 'শ্রী চণ্ডিচরণপরায়ণ' অর্থাৎ 'দেবী চণ্ডির পদতলে উৎসর্গীকৃত।'[৬০] এই বাক্যের মাধ্যমে প্রসিদ্ধ চণ্ডিকে এক প্রখ্যাত লোকদেবী হিসেবে এবং বাঙালি রাজত্বের রক্ষাকর্ত্রী হিসেবে গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬১] হিন্দু রাজত্বের বিশেষ স্মৃতির কথা প্রকাশ করলেও এসব

৫৬. মুদ্রাগুলোতে তারিখ দেওয়া ছিল ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শক সন, সে অনুযায়ী ইংরেজী এপ্রিল ১৪১৬ থেকে এপ্রিল ১৩১৮ সাল। এই দুই রাজার পরিচিতি এবং জীবনী সম্পর্কে সবচেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করেছেন দানি তাঁর "House" গ্রন্থে। দানি দুই রাজাকে দক্ষিণ-পূর্ব বদ্বীপের বরিশাল এলাকার চন্দ্রদ্বীপের দেবরাজবংশের রাজাদের সাথে সম্পর্কিত করেছেন এই যুক্তিতে যে, পরবর্তীকালের মৌখিক ও সাহিত্যিক সূত্রগুলো মহেন্দ্র দেবকে দনুজা দেবের পুত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে। "পাণ্ডয়নগরের" পরিচিতি সম্পর্কে তিন বলেন, যেহেতু দেব রাজারা কখনই উত্তর বাংলা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি, তাই সালতানাতের হাত থেকে ইতিপূর্বে তাঁদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ভূমির পুনরুদ্ধারের প্রয়াস বলতে, যেমনটি মুদ্রায় উল্লিখিত "পাণ্ডয়নগর"-এর ক্ষেত্রে দেখানো যায়, তা উত্তর বাংলায় অবস্থিত রাজধানী হয়ত পাণ্ডুয়া নয়, বরং বদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমে আধুনিককালের কলকাতার কাছে অবস্থিত প্রাদেশিক শহর ছোট পাণ্ডুয়া বোঝানো হয়েছে।

৫৭. Dani, "House" 152-53.

৫৮. Ibid., 145.

৫৯. Karim, *Corpus*, table 2, facing 163.

৬০. Ibid., 191-93.

৬১. See France Bhattacharya, "La Deesse et le royaume selon le Kalaketu *Upakhuana du Candi Mangala*," in *Purusartha*, vol. 5. *Autour de la deesse*

মুদ্রা একই সময়ে সমগ্র বদ্বীপে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ইসলামী ধারণা ছড়িয়ে পড়ার ইংগিত দেয়। দেবরাজাদের মুদ্রিত মুদ্রাগুলো হতো একক বর্গাকার, দ্বিবর্গাকার, মসৃণ বৃত্তাকার, খাঁজকাটা ষড়কোণী ইত্যাদি নানা আকারের, যা সুনির্দিষ্টভাবেই ইন্দো-তুর্কী মুদ্রার ঐতিহ্যকেই প্রতিষ্ঠিত করে।[৬২] এ থেকে বোঝা যায়, হিন্দু বাঙালি শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়ার সময়েও স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সাধারণ জনগণের কাছে তাদের বৈধতা প্রকাশের জন্য ইন্দো-তুর্কী ধরনের মুদ্রা-তত্ত্ব ব্যবহার করেছেন।

রাজা গণেশের আমলটি ছিল বাঙালি ইতিহাসের একটি যুগসন্ধিক্ষণ। প্রথমত এটা প্রমাণিত হয়েছে, মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর প্রভাবশালী সদস্যদের আপত্তি সত্ত্বেও এরপর থেকে বাঙালি হিন্দুরা সালতানাতের শাসন কাঠামোতে আনুষ্ঠানিকভাবে একীভূত হয়েছে। বাস্তবিকই, রাজা গণেশের উত্থানের অনেক আগে থেকেই ইন্দো-তুর্কী শাসন কাঠামোতে অমুসলিমদের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে, সালতানাতের আদর্শের প্রতি তাদের আনুগত্যের প্রমাণ পাওয়া যায় তার আচরণের মাধ্যমে। জৈনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কির আক্রমণ সামাল দেওয়ার সময় দক্ষিণাঞ্চলীয় ও পূর্বাঞ্চলীয় বাংলার দেব আন্দোলনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন গণেশ। এর মাধ্যমে তিনি বাংলার যেকোন স্থানেই প্রকাশ্যে হিন্দু শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সমর্থন দিতে অস্বীকার করার কথা জোরালোভাবে ঘোষণা করেন। সমগ্র রাজ্যের স্বার্থের সাথে নিজের সার্বিক স্বার্থকে একাকার করে এবং নিজের শক্তির সাথে রাজধানীর শক্তিশালী ইন্দো-তুর্কী শ্রেণীর সাথে আপোসমূলক নীতি গ্রহণ করেই কেবল রাজা গণেশ রাজনৈতিক প্রভাব অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছিলেন।[৬৩] দ্বিতীয়ত রাজা গণেশের ঘটনাবলী বাংলায় নেতিয়ে পড়া হিন্দু রাজনৈতিক শক্তিকে মূল্যায়ন করার বিষয়টি প্রকাশ করে। রাজধানী নগরীতে রাজা গণেশ তাঁর পুত্রকে হিন্দু হিসেবে সিংহাসনে বসাননি এবং পারেনওনি, ভবিষ্যৎ সুলতান জালালউদ্দিন একজন মুসলমান হিসেবেই সিংহাসনে বসেছিলেন। একটি সূফী সূত্র জানায়, 'সুলতান হওয়ার জন্য সে মুসলমান হয়' (*'আজ হাসব-ই-সুলতান মুসলমান গাসত'*)।[৬৪] অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে চণ্ডিদেবীর নামে সৃষ্ট বিদ্রোহ অব্যাহত

hindoue, ed. Madeleine Biardeau (Paris: Ecole des Hautes etuds en sciences sociales, 1981), 17-53.

৬২. Karim, *Corpus*, 191-93 and plates 1-6.

৬৩. ফিরিশতা সুস্পষ্টভাবে পাণ্ডুয়ার ইন্দো-তুর্কী শ্রেণীর সাথে গণেশের সমন্বয়ের নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেন, "যদিও রাজা গণেশ মুসলমান ছিলেন না, কিন্তু তবুও তিনি তাদের সাথে অবাধে মিশতেন এবং তাদের প্রতি তার এতো ভালবাসা ছিল যে, অনেক মুসলমান মনে করতো ইসলামের প্রতি তাঁর বিশ্বাস আছে এবং তাই তারা ইসলামী বিধান অনুযায়ী তাঁকে কবর দিতে চেয়েছিল।" ফিরিশতা *তারিখ-ই- ফিরিশতা*, ২: ২৯৭।

৬৪. *Mirat al-asrar* (Persian MS. No. 204, Khuda Bakhsh Library Patna: Compiled in 1654 by Abd al-Rahman Chisti, copied in 1806), fol.

জনপ্রিয়তা পেতে থাকে এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষক দেবী হয়ে পড়ে। ইসলামী রাজনৈতিক কর্তৃত্বের মূল ভাব গ্রহণ না করলেও সরকারি প্রতীক গ্রহণের বিষয়টির মূল অনেক গভীরে প্রোথিত ছিল। বাঙালি সুলতানদের অনুসরণ করেই মুদ্রায় রক্ষীদেবীর কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। রাজকীয় ও সাধারণভাবে উভয় দিক দিয়েই বাঙালিরা ধীরে ধীরে মুসলিম শাসনের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিচ্ছিল।

সুলতান জালালউদ্দিন মুহাম্মদ (১৪১৫-৩২) ও তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ

অভ্যন্তরভাগে বিদ্রোহভাবাপন্ন হিন্দু এবং রাজধানীতে মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর সতর্ক সদস্য পরিবেষ্টিত অবস্থায় বালক-রাজা ও ইসলামে ধর্মান্তরিত সুলতান জালালউদ্দিন কিভাবে সিংহাসনের প্রতি তাঁর দাবি ঘোষণা করেছিলেন? প্রথমত তিনি তাঁর হিন্দু পিতার নীতি বদলিয়ে রাজধানীতে প্রভাবশালী চিশতি সূফী দরবেশদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা জানাতে থাকেন। শেখদের প্রতি সহজাত পক্ষপাত প্রদর্শনকারী চিশতি সূত্রগুলো রাজা গণেশকে পাণ্ডুয়ার সূফীদের একজন চরম নির্যাতনকারী, এমনকি তাঁকে তাঁদের একজন পরম আত্মীয়কে খুন করার ব্যবস্থাকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।[৬৫] কিন্তু সুলতান জালালউদ্দিন এই নীতির অবসান ঘটিয়ে নিজেকে পাণ্ডুয়ার চিশতি নেতা শেখ নূর কুতুব-ই আলমের ব্যক্তিগত নির্দেশনার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন। গণেশের পুত্রকে শাসক হিসেবে গ্রহণ করে রাজা গণেশ ও প্রভাবশালী ইন্দো-তুর্কী অভিজাত শ্রেণীর মধ্যকার সমঝোতার অংশ হিসেবে সিংহাসনে আরোহণের সময় তরুণ রাজার অল্প বয়সের কথা বিবেচনা করে সম্ভবত তাঁকে সর্বজনশ্রদ্ধেয় চিশতি দরবেশের ধর্মীয় তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছিল। যে কোন ঘটনায় বাংলার ইসলামী কর্তৃত্বের প্রধান কর্তৃপক্ষ হিসেবে চিশতি তরিকা প্রখ্যাত সদস্যরাই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, স্বাধীন সুলতানি আমলের অবশিষ্ট সময়ে এবং মোগল আমলেও তা অব্যাহত ছিল।[৬৬]

517a-b. এই ব্যাখ্যাকে ঐতিহাসিক নিজামউদ্দিন আহমদ (মৃত্যু ১৫৯৪) দৃঢ়তার সাথে সমর্থন করেছেন,তিনি উল্লেখ করেন, রাজা গণেশের পুত্র "শাসন করার আসক্তির দরুন সুলতান জালালউদ্দিন নাম নিয়ে মুসলমান হন।" ("পিসার-ইউ বা-ওয়াসিতা-ইয়ি হাব-ই রিয়াসাত মুসলমান শুদা, সুলতান জালালউদ্দিন নাম-ই- খুদ নিহাদ")। নিজামউদ্দিন আহমদ *তাবাকাত-ই আকবরি*, ৩: ২৬৬।

৬৫. *Mirat al-Asrar*, fol. 517a. See also Askari, "New Light, " 37; Karim, "Nur Qutb Alam's Letter," 336-337.

৬৬. *মিরাত আল আসরার* আমাদের জানাচ্ছেন, জালালউদ্দিন এবং তাঁর পুত্র ও উত্তরসুরি আহমদই শুধু নূর কুতুব-ই আলমের মুরিদ হননি, বরং সেই সাথে তখন থেকে ১৫৩২ সাল পর্যন্ত বাংলার সিংহাসনে আরোহণকারী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর আরো বারজন সুলতানের সবাই পাণ্ডুয়ায় শেখ আলাউল হকের প্রতিষ্ঠিত চিশতি তরিকার শেখদের মুরিদ হয়েছিলেন। (Ibid., fol. 517b).

দ্বিতীয়ত নতুন শাসক একজন নিবেদিতপ্রাণ ও সঠিক মুসলমান হিসেবে প্রকাশ্যে নিজেকে পরিচিত করে তিনি তাঁর শাসনের বৈধতা কামনা করেছেন।[৬৭] সমসাময়িক আরব সূত্রগুলো জানায়, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর জালালউদ্দিন হানাফি মাযহাব গ্রহণ করেন এবং তাঁর পিতার বিধ্বস্ত করা মসজিদগুলো পুনঃ নির্মাণ করেন। ১৪২৮ সাল থেকে ১৪৩১ সালে তিনি মক্কায় একটি মাদরাসা নির্মাণে সাহায্য করেন এবং মিসরের মামলুক শাসক সুলতান আশরাফ বারস্‌বে'র সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেন। উপহারসহ পত্রে জালালউদ্দিন তদানিন্তন ইসলামী কেন্দ্রভূমির সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন মুসলিম শাসক এবং আব্বাসী খিলাফতের টিকে থাকা অংশের রক্ষক মিসরীয় সুলতানকে ফিরতি পত্রে তাঁকে স্বীকৃতি দিতে অনুরোধ করেন। অনুরোধ রক্ষা করে মামলুক সুলতান বাংলার সুলতানকে সম্মানসূচক আলখাল্লা পাঠান এবং একই সাথে স্বীকৃতিপত্র দেন।[৬৮] জালালউদ্দিন তাঁর মুদ্রায় মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের স্বীকারোক্তি সম্বলিত ধারার পুনঃ প্রচলন করেছিলেন যা গিয়াসউদ্দিন আইওয়াজের (শাসনকাল ১২১৩-২৭) সময় থেকে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার মুদ্রা থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।[৬৯] বাস্তবিকই তিনি এসব ব্যাপারে আরো অগ্রসর হন। সম্ভবত তিনি তাঁর স্মারক স্থাপত্যসমূহ ও মুদ্রায় প্রচলিত স্ব-ঘোষিত সূত্র 'সুলতান, সুলতানের পুত্র' এ শব্দাবলী উৎকীর্ণ করতে না পারায় ১৪২৭ সালে ১২ বছর শাসন করার অভিজ্ঞতাপুষ্ট সুলতান এক স্থানে উৎকীর্ণ করেন, 'মহান সুলতানদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন, পৃথিবীতে আল্লাহ'র খলিফা।[৭০] একটিমাত্র মসজিদে এই সাহসী ঘোষণার স্বাদ গ্রহণের তিন বছর পর তিনি আরও সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যার মধ্যে ছিল একটি মুদ্রায়

৬৭. পরবর্তীকালের কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁর প্রয়াসকে অত্যন্ত গোঁড়ামিপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু বিষয়টির সমর্থনে সমসাময়িক কোন প্রমাণ নেই-প্রথমে অষ্টাদশ শতকে গোলাম হোসাইন সেলিম এ নিয়ে কথা বলেন এবং তারপর ঊনবিংশ শতকে জেমস ওয়াইজের মতো প্রভাবশালী বৃটিশ কর্তৃপক্ষ পুনরাবৃত্তি করে জানান, জালালউদ্দিন তাঁর বাঙালি অনুসারীদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করার বলপ্রয়োগকারী নীতি অনুসরণ করেছিলেন। দেখুন Salim, Riyazu-s-Salatin, 118; Wise, "Muhammadans of Eastern Bengal," 29.

৬৮. Ibn Hajar al-Asqalani, *Inba*, 2: 497; 3: 532; and Muhammad Sakhawi, *Al-Zahu*, 8 : 280. See also Ziauddin Desai, "Some New Data Regarding the Pre-Mughal Muslim Rulers of Bengal," *Islamic Culture* 32 (1958): 204.

৬৯. Karim, *Corpus*, 77.

৭০. *"al-sultan al-Azam al-muazzamin khalifat Allah ali al-makunin Jalal al-Dunya wal-Din."* Shamsud-Din Ahmed, ed. and trans., Inscriptions, 4 : 45. এটি ঢাকা জেলার মান্দ্রার মসজিদে দেখা গেছে।

তাঁর পদবি হিসেবে 'খলিফাতুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ'র খলিফা' শব্দাবলী উৎকীর্ণ করা।[৭১] সুন্নি মুসলিম বিশ্বে-মহানবীর (সা) দ্বিতীয় এই সর্বোচ্চ পদবিটিতে নিজেকে অভিষিক্ত করার দাবি একজন ধর্মান্তরিত মুসলমানের জন্য ছিল সম্ভবত পর্বত থেকে ঝাঁপ দেওয়ার শামিল।[৭২] এমনকি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসেবে নিজের পরিচয় তেজদীপ্তভাবে ঘোষণা করার সময় সুলতান জালালউদ্দিন শাসক শ্রেণীর জন্য স্থানীয় সংস্কৃতির ভিত্তি সৃষ্টি করার মাধ্যমে দুশতাব্দীর একটি যুগের উদ্বোধন করেন। মুদ্রা, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার ধরন, ভাষা, সাহিত্য ও স্থাপত্যকর্মে প্রতিফলিত এই ঘোষণা ছিল সুলতান জালালউদ্দিনের ১৭ বছরের শাসনকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তাঁর ইস্যুকৃত বেশ কিছু তারিখবিহীন রৌপ্যমুদ্রা[৭৩] এবং ১৪২১ সালে পাণ্ডুয়া থেকে প্রকাশিত একটি বিশালাকার স্মারক রৌপ্য মুদ্রায় শুধুমাত্র তাঁর মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের কথা ঘোষণা করা হয়নি, সেই সাথে এতে বিশেষ রীতিতে আঁকা একটি সিংহের ছবিও রয়েছে (চিত্র ১১)। ১০৫ গ্রাম ওজন এবং ৬.৭ সেন্টিমিটার প্রশস্ত এ যাবতকালের সম্ভবত বৃহত্তম ও সবচেয়ে ভারি মুদ্রাটির অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করে প্রত্নতত্ত্ববিদ জি এস ফরিদ বলেন, পঞ্চদশ শতকের প্রথমদিকে বাংলার রাজসভায় অবস্থানকারী চীনা দূত ও সৈন্যদের মাধ্যমে চীন সম্রাটকে উপহার দেওয়ার

---

৭১. Karim, *Corpus*, 170. আবদুল করিম যুক্তি প্রদর্শন করেন, জৈনপুরের সুলতান ইবরাহিম শর্কির বিরুদ্ধে তাঁর জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি রাজনৈতিক চমক হিসেবে জালালউদ্দিন *খলিফাতুল্লাহ'র* মতো আড়ম্বড়পূর্ণ পদবি ব্যবহার করেছিলেন (Ibid., 176)। কিন্তু এই ধারণা সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ ১৪২৭ সালের আগে বাংলার সুলতান এই ফরমুলা প্রবর্তন করেননি, আর সুলতান ইব্রাহীম ১৪২০ সালের পর থেকে বাংলার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেননি।

৭২. ১৪৩৩ সালে ইলিয়াস শাহি রাজবংশ পুনরায় যখন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন জন্মসূত্রে মুসলমান এই বংশের সুলতানগণ নিজেদেরকে "প্রমাণ ও সাক্ষ্যে আল্লাহ'র খলিফা" *(খালিফাত আল্লাহ বিল-হুজ্জাত ওয়াল-বুরহান)* হিসেবে পরিচিত করেন। পঞ্চদশ শতক নাগাদ খিলাফতের প্রতীকীর এতো বেশি ব্যবহার হয়েছে যে, পদবিটির ব্যবহারকারীদের বৈধতা লাভের সম্ভব্যতা প্রায় শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়। প্রায় সবাই শুধুমাত্র খলিফার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, বরং নিজেকে *খলিফা* হিসেবে পরিচিতি দিতে থাকেন এবং এমনকি "প্রমাণ ও সাক্ষ্যে" তা হয়েছে বলেও দাবি করা হতে থাকে। এটা একটা ফাঁকা পদবিতে পরিণত হয়। দেখুন Abdul Karim, "Khalifat Allah' Title in the Coins of Bengal Sultans," *Journal of the Pakistan Historical Society* 8, no. 1 (January, 1960): 29.

৭৩. Karim, *Corpus*, 78, 80, pl. 7, no. 1. এই মুদ্রার আরেকটি কপি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, কলকাতার জি. এস ফরিদে প্রদর্শন করা হয়েছে। দেখুন Farid, "Rare Lion-Coins of Jalalauddin Mohammad Shah of Bengal Including a Unique Hexagonal Variety," *Journal of the Asiatic Society of Bengal* 16, nos. 1-4 (1974): 151-54.

জন্য তা তৈরি করা হয়েছিল।৭৪ চীনা ঐতিহাসিকগণ তাদের বাংলা মিশনের সদস্যদের বাংলার সুলতানের রৌপ্যমুদ্রা উপহার দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।৭৫ কিন্তু একই সুলতান কেন সাধারণ একই রৌপ্য মুদ্রায় ও একই সিংহের ছবি এঁকেছেন, তার ব্যাখ্যা এই অনুমানের মধ্যে পাওয়া যায় না। এর একটি বিকল্প ব্যাখ্যা দিয়েছেন এ এইচ দানি। তিনি ত্রিপুরার কথা উল্লেখ করেছেন, বাংলার পূর্ব প্রান্তের এই ক্ষুদ্র পার্বত্য হিন্দু রাজ্যটি সুলতানী ও মোগল আমল জুড়ে তাঁর অনিশ্চিত স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখেছিলেন।৭৬ এই রাজ্যটির তাঁর মুদ্রায় সিংহ চিত্রায়িত করার কথা উল্লেখ করে দানি মত প্রকাশ করেন যে, দক্ষিণবঙ্গ পুনর্বিজয় ছাড়াও জালালউদ্দিন ত্রিপুরা বা এর অংশবিশেষও জয় করেছিলেন এবং সেখানকার জনগণের সমর্থন লাভের জন্য মুদ্রায় এই ধরনের নক্সা প্রণয়ন করেন।৭৭ অবশ্য ১৪৬৪ সালে অর্থাৎ সুলতান জালালউদ্দিনের মৃত্যুর ৩২ বছর পূর্বে ত্রিপুরার কোন স্বাধীন রাজার সিংহ অংকিত মুদ্রা এখন পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়নি, তাই সেই রাজ্যের প্রচলিত প্রথা হিসেবে তাঁর তা অনুসরণের কথা নয়।

অন্যদিকে সিংহের কিছু প্রজাতি ভারতে থাকায় অনেকের মতে প্রাণীটির চিত্র শুধুমাত্র ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তা পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অনেক বেশী স্বীকৃত প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। ১৪৬৪ সাল থেকে ত্রিপুরার রাজারা তাদের নিজস্ব সিংহ অংকিত মুদ্রা অবমুক্ত করা শুরু করেন, তখন তারা তা করেছেন দুর্গা দেবীর পূজারী হিসেবে, যার বাহন ছিল সিংহ।৭৮

---

৭৪. See G. S. Farid, "A New and Unique Ten Tankah Commemorative Mohammad Shah of Bengal (818-837)." *Journal of the Numismatic Society of India* 38 (1976): 88-95. মুদ্রাটি ফরিদের ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত। Asiatic Society of Bengal, Calcutta.

৭৫. দেখুন Fei Hsin, *Hsing Ch'a Sheng lan* ("Description of the Stary Raft"), in W.W. Rockhill, "Notes on the Relations," *Toung pao,* 16, pt. 2, sec. 4 (1915): 442.

৭৬. On Tripura, See D.C Sircar, *Some Epigraphical Records of the Medieval Period from Eastern India* (New Delhi: Abhinav Publications, 1979), 95-96.

৭৭. এ ধরনের যে কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া গেছে, তার সবই ত্রিপুরা সংলগ্ন ঢাকা জেলায়। Dani, "House" 164.

৭৮. A. N. Lahiri, "Tripura Coins of Iconographic Interst," *Journal of the Numismatic Society* 29 (1967): 73-75. কিছু সময় পর বিজয়মানিকের (আনুমানিক ১৫৩২-আনুমানিক ১৫৬৩) মুদ্রার সূচনার সাথে তারা সিংহের পিঠে উপবিষ্ট শিব দেবতার সাথে দ্ব্যর্থহীনভাবে সম্পর্কিত *ত্রিশূলের* ছবি অঙ্কন করে। পরে, ১৬০০ সালে, রাজা যশোধারমাণাক্য পাশে এক গোপী বালিকা সম্বলিত বংশীবাদক কৃষ্ণের ছবি সম্বলিত মুদ্রার উপর সিংহ ও *ত্রিশূলের* ছাপ প্রদান করে। ত্রিপুরায় বৈষ্ণব অনুভূতির এই পরিবর্তন অনুসৃত হয়েছিল বাংলার সদরে অ-মুসলিমদের মধ্যে একই ধরনের বিবর্তনের রেশ ধরে। দেখুন পৃষ্ঠা ১০৯-১২।

চিত্র ১১। ১৪২১ সালে মুদ্রিত সুলতান জালালউদ্দিনের বিশালাকার স্মারক রৌপ্য মুদ্রা।

১৪১৬-১৮ সালে দেব রাজবংশের ব্যর্থ বিদ্রোহের সময়ে সিংহ-বাহন সম্বলিত চণ্ডি দেবীর পুনরাবির্ভাব ঘটে, তাই সুলতান সম্ভবত দেবী পূজাকেন্দ্রিক অত্যন্ত সুগভীর ভাবাবেগকে কাজে লাগানোর জন্যই মুদ্রায় সিংহের ছাপ দিয়েছেন। তিনি যে একজন হিন্দু গোত্রপতির ছেলে একথাও গোপন করার চেষ্টা করেননি, বরং তার বদলে তিনি আরবী হরফে তাঁর পিতার পরিচয় দিয়েছেন, 'রাজা গণেশের পুত্র (বিন কান্‌স রাও)।'[৭৯] সুলতান জালালউদ্দিন তাঁর রাজ্যের বিভিন্ন অংশে

৭৯. একই মুদ্রায় তিনি পারস্য ধরনে লিখেছিলেন, *বিন কানস শাহ*, অর্থাৎ "গণেশের পুত্র।" দেখুন Karim, *Corpus*, 78. এসব মুদ্রিত কিংবদন্তি রাজা গণেশের সুপরিচিত এবং এমনকি প্রকাশ্য গ্রহণযোগ্যতারও ইঙ্গিতবাহী; কারণ কোন সার্বভৌম শাসকই এইভাবে ঘৃণিত অত্যাচারীর সাথে নিজেকে সম্পর্কিত করবে না।

বিভিন্ন বার্তা পাঠাচ্ছিলেন। মুসলমানদের কাছে তিনি নিজেকে ধর্মপ্রাণ সুলতান হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, তাঁর মুদ্রায় মুসলমান ধর্মবিশ্বাস উৎকীর্ণ করার প্রথার পুনঃ প্রচলন করেন, নজিরবিহীনভাবে বাংলায় নিজেকে 'খলিফাতুল্লাহ বা আল্লাহ'র খলিফা' হিসেবে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে হিন্দুদের কাছে তাঁর মুদ্রা তাঁকে এক হিন্দু রাজার পুত্র সার্বভোম শাসক হিসেবে চিহ্নিত করে, অধিকন্তু চণ্ডি বা দুর্গার নাম প্রকৃতপক্ষে উল্লেখ ছাড়াই মুদ্রায় তাঁর বাহনের ছাপটির মাধ্যমে দেবীর পূজারীদের সাথে তাঁর সংযোগের পথ করে দেয়। চিরায়ত ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য ও শিল্পে সুপণ্ডিতদের প্রকাশ্যে প্রশংসা করার মাধ্যমে তিনি সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতা করেন।[৮০] আরো তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় সমসাময়িক এক চীনা পর্যটকের বক্তব্যে, রাজদরবারে অনেকে পারসি ভাষা বুঝলেও সার্বজনীন ব্যবহৃত ভাষা ছিল বাংলা।[৮১] এ সময়ে দুশত বছর আগে বাংলায় আগত মুসলমান শাসক শ্রেণীর মধ্যকার বৈদেশিক মানসিকতা অদৃশ্য না হলেও বেশ ম্লান হয়ে পড়েছিল। স্থানীয় বাঙালি সংস্কৃতি এক সময় টিকে থাকার সংগ্রাম করেছিল, এখন তা বিজয়ী হিসেবে সরকারি সমাজের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অভিষিক্ত হয়।

রাজা গণেশের ঘটনার পরপরই নতুন ভাবধারা সবচেয়ে বর্ণাঢ্যভাবে প্রকাশিত হয় রাজ্যটির স্থাপত্যকর্মে। ধর্মীয় স্থাপত্যে মধ্যপ্রাচ্য বা উত্তর ভারতীয় ঐতিহ্য পরিত্যাগ করে সুলতান জালালউদ্দিনের আমল থেকে বাংলার মসজিদ নির্মাণে সম্পূর্ণ দেশীয় চিত্র ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য গ্রহণের নীতি অনুসরণ করা হয়।[৮২] পাণ্ডুয়ার একলাখি সমাধিসৌধটি (চিত্র ১২), যাকে সুলতানের নিজের সমাধিসৌধ মনে করা হয়, মসজিদ না হলেও তাই এরপর থেকে বাঙালি রীতির মসজিদের ছাঁচে পরিণত হয়। এখানে আমরা নতুন স্টাইলের সকল বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই: বর্গাকৃতি, একক গম্বুজ, বাইরের ও ভেতর উভয় দিকের নির্মাণে ইটের বিশেষ ব্যবহার, বিশাল দেয়াল, কোণায় অষ্টকোণী মিনার, বাঁকানো কার্নিস এবং পোড়ামাটির

৮০. উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তিনি সে সময়ে অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত বৃহস্পতিকে ছয়টি উপাধি দিয়েছিলেন এবং যখন তাঁকে "রায় মুকুট" উপাধিটি প্রদান করেন, তখন একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। Chintaharan Chakravarti, "Muslim Patronage to Sanskrit Learning," in B.C. Law Volume, ed. D.R. Bhandrakar et al., pt 2 (Poona: Bhandarkar Orientat Research Institute, 1946), 177.

৮১. Ma Huan, *Ying-Yai Sheng-lan: "The Overlal Survey of the Ocean's Shores,"* trans. J.V.G. Mills (Cambridge University Press, 1970), 161.

৮২. Hitesranjan Sanyal, "Religious Architecture in Bengal (15th-17th Centuries): A Study of the Major Trends," Indian History Congress, Proceedings, 32d session (1970), 1: 416. Ahmad Hasan Dani, Muslim Architecture in Bengal, Asiatic Society of Pakistan Publication No.7 (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1961), 22.

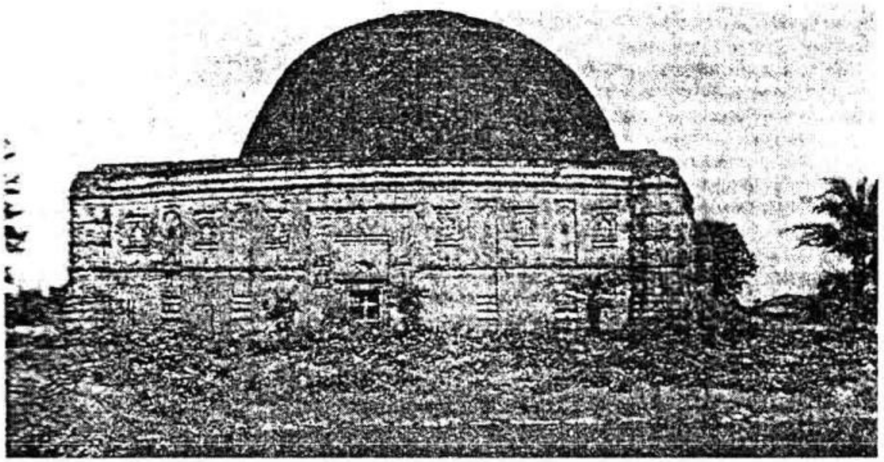

চিত্র ১২। একলাখি সমাধিসৌধ, পাণ্ডুয়া (আনুমানিক ১৪৩২)।

অলংকরণের ব্যাপক প্রয়োগ।[৮৩] অন্তত অষ্টম শতক থেকে শুরু হওয়া টেরাকোটা (পোড়ামাটি) অলংকরণ-রীতি যা পাহাড়পুরের বৌদ্ধ মঠে দেখা যায়, এখন আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলো, একলাখির সামনের দিকের সরদল তার প্রমাণ। নতুন রীতির উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো আনুমানিক ১৪৯৩-১৫১৯ সালে গৌড়ের লাত্তন মসজিদ (চিত্র ১৩)।

মসজিদ নির্মাণে এ রীতির উদ্দীপনা কোথা থেকে এলো? একটি সূত্র হলো গ্রাম বাংলার সর্বত্র বহুল প্রচলিত বাঁশ-খড় দিয়ে তৈরি কুঁড়েঘর। কুঁড়েঘরের বাঁশের বাঁকানো কাঠামোর উপর খড় দিয়ে চালার পরিবর্তে একলাখি সমাধিসৌধে সামান্য বাঁকানো কার্নিসসহ প্রথমবারের মতো ইট ব্যবহার করা হয়। তারপর থেকে সুলতানি আমলের শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত বা সরকারি, হিন্দু বা মুসলমান সকল বাঙালি স্থাপত্যকর্মের অপরিহার্য উপাদান হয়ে পড়ে কুঁড়েঘরের বৈশিষ্ট।[৮৪] শিল্পকলা বিষয়ক ইতিহাসবিদ পারভিন হাসান বাঙালিদের মসজিদ নির্মাণে আরেকটি স্থানীয় সূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। ৮ম থেকে ১১তম শতাব্দী পর্যন্ত বার্মার বৌদ্ধ মঠগুলোর সাথে সুলতানি

৮৩. Dani, *Muslim Architecture*, 26. Perween Hasan, "Sultanate Mosques and Continuity in Bengal Architecture," *Muqarnas* 6 (1989): 62.

৮৪. প্রাক-আধুনিক বাংলায় দেশজ স্থাপত্যকর্মের উপর জরিপ পরিচালনায় পথপ্রদর্শক ডেভিড ম্যাককুশিওন বলেন, "যদিও কোন মসজিদ কখনো হিন্দুদের *রেখা বা পিরহার* বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেনি এবং কোন হিন্দু মন্দিরও ইসলামী গম্বুজের বহির্ভাগের অবয়ব গ্রহণ করেনি, উভয়েই স্বাধীনভাবে স্থাপত্য ঐতিহ্য গ্রহণ করেছে, তাই ব্যাপকভাবে ভিন্ন কাজ করলেও নক্সায় মন্দির ও মসজিদ নির্দিষ্ট সামঞ্জস্য অর্জন করে। McCutchion, "Hindu-Muslim Continuities in Bengal," *Journal of the Asiatic Society of Pakistan* 13, no. 3 (December, 1968): 241.

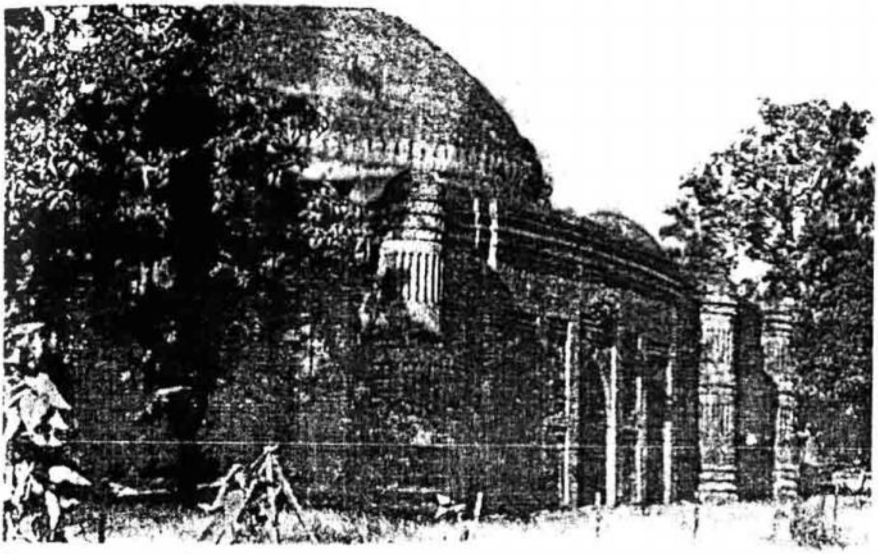

চিত্র ১৩। লাত্তান মসজিদ, গৌড় (আনুমানিক ১৪৯৩-১৫১৯)।

আমলের মসজিদগুলোর তুলনা করে এবং সেই সাথে প্রাক-দ্বাদশ শতকের বাংলায় টিকে থাকা বৌদ্ধ স্থাপত্য নিদর্শনগুলোকে বিবেচনায় এনে পারভীন হাসান উপসংহার টেনেছেন এই বলে, বাংলার বৌদ্ধ মঠগুলোর ঐতিহ্যই পঞ্চদশ শতকে বাঙালি মসজিদগুলোর বর্গাকারে ইটের তৈরি নির্মাণের ধারা পুনর্জীবনে সরাসরি অবদান রেখেছে।[৮৫] গ্রামবাংলার কুঁড়েঘর এবং প্রাক-ইসলামী বৌদ্ধ মন্দির উভয় ধরন থেকেই উপাদান সংগ্রহ করে এসব স্থাপনাগুলোতে স্থানীয় ভাবধারার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, যা স্থানীয়ভাবে সুপরিচিত বিষয়কে ইসলামী প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ করা হয়। রাজকীয় সংস্কৃতির এই রীতিটি এতো দৃঢ় ছিল যে, ১৪৩৩ সালে সাবেক ইলিয়াস শাহী রাজবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং ১৪৩২ সালে জালালউদ্দিনের ইন্তেকালের পরবর্তী শতাব্দীতে শাসকশ্রেণীর সামাজিক অবস্থানে ব্যাপক পরিবর্তন সত্ত্বেও ধারাটি অক্ষুন্ন থাকে।[৮৬]

রাজকীয় কর্তৃত্বের স্থানীয়করণ, ১৪৩৩-১৫৩৮

জালালউদ্দিনের ইন্তেকালের পঞ্চাশ বছর পর সাবেক ইলিয়াস শাহী বংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং উত্তর ভারতে তুর্কী শাসনের প্রাথমিক দিনগুলোতে কৌতূহলজনক প্রত্যাবর্তন, সামরিক ক্রীতদাস প্রথা ব্যবস্থার আবির্ভাব দেখা

৮৫. See Hasan, "Sultanate Mosques".

৮৬. Ziauddin Desai, "Some New Data Regarding the Pre-Mughal Muslim Rulers of Bengal," *Islamic Culture* 32 (1958): 204.

যায়। ১৪৬০ ও ১৪৭০ -এর দশকে সামরিক ও বেসামরিক কাজের জন্য মধ্য এশীয় তুর্কীদের বদলে পূর্ব আফ্রিকার আবিসিনিয়া থেকে কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস (হাবসি গোলাম) সংগ্রহ করা হয়।[৮৭] সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে হাবসিদের প্রভাবও বেড়ে যায়, সময় সময় যে-কাজের জন্য তাদের আনা হয়েছিল, তাই তারা বানচাল করে দেয়।[৮৮] ১৪৮৬ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানে ইলিয়াস শাহি রাজবংশের শাসনকাল চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যায়, একের পর এক হাবসির ক্ষমতা দখলের প্রয়াসে সালতানাত সাত বছর স্থায়ী প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও হত্যাকাণ্ডের টালমাটাল অবস্থায় পড়ে। পরিশেষে মক্কা থেকে আগত আরবীয় আলাউদ্দিন হোসেন, যিনি কোন আবিসিনীয় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, আরেকটি প্রাসাদ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিজয়ী হন এবং স্বাধীন বাংলার শেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতাসীন পরিবার হোসেন শাহি রাজবংশের সূচনা করেন।[৮৯]

সুলতান-আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) ও তাঁর পুত্র নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহের (১৫১৯-৩২) শাসনামলকে সাধারণভাবে বাংলা সালতানাতের 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে অভিহিত করা হয়।[৯০] উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, হোসেন শাহের আমলে বাঙালি হিন্দুরা সরকারি কাজে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিল, তাঁর মুখ্যমন্ত্রী (উজির), তাঁর প্রধান দেহরক্ষী, তাঁর টাকশালের গভর্নর, তাঁর চট্টগ্রামের গভর্নর, তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক, তাঁর ব্যক্তিগত সচিব (দবির-ই-খাস) সবাই ছিলেন বাঙালি হিন্দু।[৯১] প্রত্যক্ষ ক্ষমতা ও ভূখণ্ডগত অবস্থানের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, এসব পদ

৮৭. Firista, *Tarikh*, 2: 298.

৮৮. ইলিয়াস শাহী রাজবংশের শেষ শাসক সুলতান জালালউদ্দিন ফাতেহ শাহ (১৪৮১-১৪৮৬), "বারবাক শাহ এবং ইউসুফ শাহের আমলে জড়ো হওয়া ক্রমবর্ধমান সংখ্যক প্রাসাদ খোজা ও আবিসিনীয় ক্রীতদাসের উপর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং তিনি আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছেছিলেন ও অকল্পনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। Firista, *Tarikh*, 2: 299.

৮৯. Ibid., 299, 301.

৯০. এই বিশিষ্টতা দান শুরু হয়েছিল ঐতিহাসিক নিজামউদ্দিন আহমদের মাধ্যমে, ১৫৯৪ সালে আলাউদ্দিন হুসেন শাহকে "একজন বুদ্ধিমান ও সক্ষম ব্যক্তি" হিসেবে মহিমান্বিত করে বলেন, তিনি "রাজত্বের বিভিন্ন অংশ থেকে জ্ঞানী, মহান ও ধার্মিক লোকদের তলব করেন এবং তাঁদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন। তিনি দেশের অবস্থা সমৃদ্ধ ও উন্নত করার জন্য অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস ও উদ্যোগ গ্রহণ করেন।-----প্রশংসনীয় নৈতিক শক্তি এবং সদগুণাবলীর কারণে তিনি অনেক বছর সার্বভৌম শাসক হিসেবে বহাল থাকেন; আর তাঁর জীবন ছিল আনন্দ ও সুখে ভরপুর।" নিজামউদ্দিন আহমদ, *তাবাকাত-ই-আকবরি*, গ্রন্থ, ৩:২৭০; অনুবাদ B. De, 3 pt. 1: 443.

৯১. Jadunath Sarkar. ed. *The History of Bengal*, vol. 2, *Muslim Period, 1200-1757* (1947: Patna: Janaki Prakashan, 1977). 151-2. ষোড়শ শতকের সূফীরা, যাদের পূর্বসূরিরা উচ্চ পদে হিন্দুদের নিয়োগে বিরোধিতা করেছিলেন, এসব ঘটনা সম্পর্কে কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, তার কোন বিবরণ নেই।

ছিল সালতানাতের অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার। ১৪৯৪ সালে সুলতান হোসেন শাহ তাঁর শাসনকালের দ্বিতীয় বছরে উত্তর সীমান্তে তাঁর রাজ্যসীমা সম্প্রসারণ করেন, কুচবিহার ('কামতা') ও পশ্চিম আসামে ('কমরূপ') অভিযান চালিয়ে রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে।[৯২] ১৫১৫ সালের দিকে টম পিরেস এই সুলতানের সশস্ত্রবাহিনীতে এক লাখ অশ্বারোহী সৈন্য থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। পর্তুগীজ এই কর্মকর্তা বলেন, 'তিনি বিধর্মী রাজাদের, বড় বড় জমিদার এবং তাঁর চেয়েও শক্তিশালী নৃপতিদের সাথে যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু বাংলার রাজা সমুদ্রের নিকটবর্তীতে থাকায়, তিনি যুদ্ধে বেশ অভ্যস্ত থাকায় তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে প্রাধান্য পেতেন।'[৯৩] রাজা তাই তাঁর প্রতিবেশীদের উপর আনুগত্যের একটি বৃত্ত রচনা করেন-দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যা, দক্ষিণ-পূর্বে আরাকান এবং পূর্বে ত্রিপুরা।[৯৪]

কিন্তু বাংলার সমৃদ্ধির দিনের সংখ্যা ছিল সীমিত। হোসেন শাহি রাজবংশ যখন মূল বিস্তার করছিল, তখন সাহসী তৈমুরি রাজপুত্র বাবর মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্তানে আধিপত্য বিস্তার করা শুরু করেন। ১৫২৬ সালে উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য বাবর তার অশ্বারোহী ও কামানসমূহ খাইবার পাস দিয়ে চালনা করেন এবং ব্যাপকভাবে সংকুচিত ও ক্ষয়িষ্ণু দিল্লী সালতানাতের শেষ শাসক পরিবার আফগানিস্তানের লোদি রাজবংশকে উৎখাত করেন। বাবরের এ চমকপ্রদ বিজয়ের ফলে পরাজিত আফগানরা গাঙ্গেয় উপত্যকায় এবং বাংলায় নেমে আসে, আর এখানে তাঁরা নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহের আতিথেয়তা লাভ করে।[৯৫] জালালউদ্দিনের ইন্তেকালের (১৪৩২) পর থেকে নাসিরউদ্দিন (মৃত্যু ১৫৩২) পর্যন্ত এক শতাব্দী কালের ব্যবধানে বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। সাবেক সুলতানের সময়ে পুরানো তুর্কী পরিবারগুলোর উত্তরসুরিরা রাজ্যের প্রভাবশালী শাসক গ্রুপ হিসেবে বহাল ছিল। কিন্তু পরবর্তী শতকে সরকারের সর্বপর্যায়ে বাঙালিদের অংশগ্রহণে বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে, কিন্তু রাজসিংহাসন ইন্দো-তুর্কীদের থেকে

৯২. Simon Digby, "The Fate of Daniyal Prince of Bengal, in the Light of an Unpublished Inscription, "*Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 36, no. 3 (1973): 593-601.

৯৩. Tome Pires, *Suma Oriental of Tome Pires*, trans. A Cortesao, 2 vols. (London: Hakluyt Society, 1944), 1: 89.

৯৪. পিরেস বলেন, "বাংলার সমৃদ্ধ সামগ্রীসমূহ এসব দেশে তৈরি হয় এবং যেহেতু তারা সমুদ্র ছাড় বাঁচতে পারে না, তাই তারা (বাংলার) সুলতানের অনুগত হয়, কারণ তিনি তাদের বণিকদের যাতায়াতের সুযোগ দেন।" প্রাগুক্ত, ৮৯-৯০.

৯৫. নুসরাত শাহ শুধুমাত্র এসব আফগান উদ্বাস্তুকে ভূমি ও নগরই দেননি, উপরন্তু তিনি সম্প্রতি বাবরের কাছে পরাজিত সুলতান ইব্রাহীম লোদির কন্যাকেও বিয়ে করেন। ফিরিশতা তারিখ, ২: ৩০২।

পূর্ব আফ্রিকান, তাদের থেকে আরব পরিবার এবং পরিশেষে আফগানদের দখলে চলে যায়।

এসব পরিবর্তন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রকাশে কেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল? রাজদরবারের পরিমণ্ডলে, নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, সালতানাতের শেষ পর্যন্ত আত্মসচেতন পারস্যের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক কর্তৃত্বের রীতি অনুসরণ করা হতো। ১৫২১ সালে নাসিরউদ্দিনের রাজদরবারে প্রেরিত পর্তুগীজ মিশনের এক সদস্য বাংলায় এ পর্যন্ত জানা সর্বপ্রাচীন ইউরোপিয়ান মিশন-রাজধানীতে তাঁর সফরকালে রাজশক্তির প্রদর্শনের এক বর্ণাঢ্য বর্ণনা দিয়েছেন। সুলতানের দরবারে গমনপথে লেখক তরবারি ও গোলাকার ঢালধারী তিনশ উন্মুক্ত-বক্ষ সৈন্য এবং কালো থাবাযুক্ত সোনালী সিংহের ছবি আঁকা ঢাল সম্বলিত সমসংখ্যক তীরন্দাজকে অতিক্রম করেন। পর্তুগীজ মিশনটির পরিচয়হীন উক্ত সদস্য লিখেন, 'আমরা (প্রাসাদের) দ্বিতীয় ফটকে উপস্থিত হলাম এবং প্রথমটির মতো এখানেও আমাদের তল্লাশি চালানো হলো।' তিনি লিখেন:

> আমরা এ ধরনের ৯টি ফটক অতিক্রম করলাম এবং প্রতিবারই তল্লাশি চালানো হলো। শেষ ফটকের পেছনে আমরা দেড়টি মল্লভূমির সমান বিশাল এক মাঠ দেখলাম, যা দৈর্ঘ্যের চেয়ে প্রস্থে বেশি বলে মনে হলো। সেখানে ১২ জন অশ্বারোহী পোলো খেলছিল। এক প্রান্তে ভারি চন্দন কাঠের খুঁটির উপর তৈরি বিশাল এক মঞ্চ ছিল। মঞ্চের উপর ছাদ পর্যন্ত স্থাপিত অপেক্ষাকৃত সরু খুঁটিগুলোতে ফুল, পাতা ও ছোট ছোট পাখি আঁকা ছিল। উজ্জ্বল চাদেও স্বর্ণখচিত চাঁদ, সূর্য, তারকারাজি আঁকা ছিল।
>
> আমরা সুলতানের সামনে উপস্থিত হলাম। তিনি স্বর্ণখচিত বিশাল এক সোফায় বসেছিলেন। তাতে মূল্যবান পাথর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তাশোভিত বিভিন্ন আকারের অনেক কুশন ছিল। আমরা দেশীয় রীতি অনুযায়ী আমাদের হাত বুকে রেখে মাথা যতদূর সম্ভব নীচু করে তাকে অভিনন্দন জানালাম।[৯৬]

রাজদরবারের প্রাণকেন্দ্রে পোলো মাঠ, চন্দনকাঠের খুঁটির উপর স্থাপিত রাজকীয় মঞ্চ, স্বর্ণখচিত পাখ-পাখালি ও স্বর্গীয় উপাদানসমূহের ছবি দিয়ে ছাদ সজ্জিতকরণ এবং সুলতানের সামনে আনুষ্ঠানিক আদব-কায়দা-সবকিছুই সালতানাতের আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে পারস্য রাজনৈতিক প্রতীকের অস্তিত্বের ইংগিত করে। বস্তুত গৌড়ের রাজদরবারের এই বর্ণনা এক শতাব্দী আগে (চলতি অধ্যায়ের প্রথমদিকে দ্রষ্টব্য) জনৈক চীনা দূতের পাণ্ডুয়ার রাজদরবারের রীতিনীতির সাথে তুলনীয়।

৯৬. *Voyage dans les deltas du Gange et de l'Irraouaddy: Relation Portugaise anonyme* (1521), trans. and ed. Genevieve Bouchon and Luis Filipe Thomaz (Paris: Centre culturel Portugais, 1988), 321 22.

তবে রাজদরবার যদি তাঁর পারস্যের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের বিষয়টি প্রকাশ করে থাকে, তবে তা কেবল অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য এই রাজনৈতিক প্রতীকীর আয়োজন করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।[৯৭] কারণ প্রকাশ্যভাবে পরবর্তী সুলতানরা অকৃপণ উদারতা প্রদর্শনের মাধ্যমে স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি নিজেদের স্বার্থ একীভূত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। উক্ত পর্তুগীজ কূটনীতিকের উদ্ধৃতি অনুযায়ী, আমরা ১৫০ গাড়ি বোঝাই ভাত, বিপুল পরিমাণ রুটি, সরিষা, পেয়াজ, কলা ও পৃথিবীতে উৎপাদিত অন্যান্য ফলমূল দেখলাম। অন্য ৫০টি গাড়িতে বোঝাইকৃত সিদ্ধ ও ঝলসানো গরু ও ভেড়ার গোশত এবং রান্না করা প্রচুর মাছ দেখলাম। দরিদ্রদের মাঝে বিতরণের জন্য এগুলো আনা হয়েছে। খাদ্যসামগ্রী বিতরণের পরে তাদেরকে অর্থ দেওয়া হলো, যার মোট মূল্য আমাদের টংকায় ৬ লাখ।--- আমি পুরোপুরি হতবাক হয়ে গেলাম; এটা বিশ্বাস করার জন্য দেখতে হয়। একটি মঞ্চের উপর থেকে চার বা পাঁচ হাজার লোকের প্রতি অর্থ ছিটানো হলো।[৯৮] বিদেশী মেহমান পারস্যের অনুকরণে রাজদরবার, সোনায় মোড়া ছাদ আর চন্দন কাঠের খুঁটি দেখেছেন, আর সাধারণ জনতা দেখেছে গাড়ি বোঝাই ভাত ও পৃথিবীতে উৎপাদিত ফলমূল।

পঞ্চদশ শতকের শেষ ও ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকেই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সারা বাংলায় স্থানীয় আদলে নির্মিত মসজিদগুলো নির্মাণ করা হয়েছে (দেখুন, টেবিল ১)। বাঙালির ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিও রাজদরবারের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। পঞ্চদশ শতকের প্রথমদিকেই চীনা পর্যটক মা হুয়ান লক্ষ্য করেছেন, বাংলা ছিল, 'সার্বজনীন ব্যবহৃত ভাষা।'[৯৯] এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাজদরবার বাঙালি

৯৭. হুসেন শাহি সুলতানগণ পারসি মিনিয়েচার পেইন্টিং ঐতিহ্যের পৃষ্ঠপোষকতাও করেন। দৃশ্যত সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৫০৭-৮ সালে জামির *ইউসুফ ও জুলায়খা'র* একটি খণ্ডে ছাব্বিশটি মিনিয়েচার পেইন্টিং করা হয়েছিল। এছাড়া ১৫৩১-৩২ সালের তারিখ সম্বলিত নিজামির *সিকান্দার-নামার* একটি বর্ণাঢ্য খণ্ড পাওয়া গেছে এবং তা সুলতান নুসরাত শাহকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। দেখুন Norah M. Titley, *Persian Miniature Painting and Its Influence on the Art of Turkey and India* (London: British Library, 1983), 179, 182-83; Robert Skelton, "The Iskandar Nama of Nusrat Shah," in *Indian Painting: Mughal and Rajput and a Sultanate Manuscript*, ed. Toby Falk, Ellen Smart, and Robert Skelton (London: P. and D. Colnaghi, 1978), 144. যদিও এসব সৃষ্টির বিষয়বস্তু পুরোপুরি পারসি, তবুও ছবিগুলোতে অঙ্কিত স্থাপত্য ডিটেইলে উপরে বর্ণিত বিশেষত ধনুকাকৃতির খিলান, বহুবর্ণের টাইলসের বদলে ইটের কাজ, পোড়ামাটির টাইলস এবং কার্নিস ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলার মসজিদের বৈশিষ্টসূচক সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। Jeremiah P. Losty, *The Art of the Book on India* (London: British Library, 1982), 68

৯৮. *Voyage dans les deltas du Gange*, 327.

৯৯. Rockhill, "Notes on the Relations," 437.

টেবিল ১: বাংলায় মসজিদ নির্মাণের সময়সূচি (১২০০-১৮০০)

সময়কাল	সাধারণ	জামে	মোট
১২০০-১২৫০	২	০	২
১২৫০-১৩০০	৩	১	৪
১৩০০-১৩৫০	২	০	২
১৩৫০-১৪০০	৪	১	৫
১৪০০-১৪৫০	৫	০	৫
১৪৫০-১৫০০	৫২	৯	৬১
১৫০০-১৫৫০	২৮	২৮	৫৬
১৫৫০-১৬০০	১৫	২	১৭
১৬০০-১৬৫০	৭	০	৭
১৬৫০-১৭০০	১৭	০	১৭
১৭০০-১৭৫০	৮	০	৮
১৭৫০-১৮০০	৪	০	৪
মোট	**১৪৭**	**৪১**	**১৮৮**

সূত্র: শামসুদ্দিন আহমদ, সম্পাদনা ও অনুবাদ, Inscriptions of Bengal (রাজশাহী বরেন্দ্র গবেষণা যাদুঘর, ১৯৬০), ৪, ৩১৭-৩৮; কিয়ামুদ্দিন আহমদ Corpus of Arabic and Persian Inscriptions of Bihar (পাটনা; কে পি জয়াওয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৭৩); এ এইচ দানি, Muslim Architecture in Bengal (ঢাকা এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ১৯৬১), ১৯৪-৯৫; Epoigraphia Indica, Arabic and Persian Supplement, 1965, 24.

Journal of the Asiatic Society of Pakistan 2 (1957), Journal of the Asiatic Society of Bangladesh 28, Journal of the Asiatic Society of Bengal 6, Journal of the Varendra Research Museum 2 (1973), 67-70; Bulletin of the School of Oriental and African Studies 30, no 3 (1973), 589; Mohammad Yusuf Siddiq, Arabic and Persian Text of the Islamic Inscriptions of Bengal (Watertown, Mass.: South Asia Press, 1991), 4-123.

সাহিত্যকর্মকে পৃষ্ঠপোষকতার সাথে সাথে পারস্যের রোমান্টিক সাহিত্যও উৎসাহিত করতো। সুলতান রোকনউদ্দিন বারবাক (শাসনকাল ১৪৫৯-৭৪) মালাধর বসুকে '*শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়*' লিখতে পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫৩২) ও নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহের (১৫১৯-৩২) রাজদরবার বিপ্রদাসের '*মনসা মঙ্গল*', এবং বিজয় পণ্ডিত ও কবিন্দ্র পরমেশ্বর কর্তৃক সংস্কৃতি মহাকাব্য 'মহাভারত'

অনুবাদে পৃষ্ঠপোষকতা করেন।[১০০] সুলতান মাহমুদ শাহ (১৫৩২-৩৮) এমনকি বাংলা হরফে সংস্কৃতি পুস্তক লেখার সেতুবন্ধ রচনা করেন এবং হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী তারিখ দিতেন।[১০১]

সংক্ষেপে বলতে গেলে, রাজদরবারের অভ্যন্তরে পারস্যের ঐতিহ্য অনুযায়ী রাজনৈতিক প্রথা বিদ্যমান থাকলেও পঞ্চদশ শতকের প্রথম থেকেই বাঙালি গণমাধ্যমযোগেই সুলতানগণ তাদের কর্তৃত্ব প্রকাশ করতেন। অংশত রাজা গণেশের উত্থানের প্রেক্ষাপটে পুনর্মূল্যায়ন এবং অংশত উত্তর ভারত থেকে দীর্ঘমেয়াদী বিচ্ছিন্নতার কারণে সুলতানগণ পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য স্থানীয় সমর্থন লাভের মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক বৈধতার পন্থা অবলম্বন করেন। তবে বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল প্রকৃতিগতভাবে বাছাইকৃত। শাসকরা তাঁদের কর্তৃত্বের মূল আরো বিস্তৃত করার দৃশ্যমান লক্ষ্যে চিরায়ত ভারতীয় ধ্যানধারণা ত্যাগ করে তাঁরা লোকসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, জনপ্রিয় সাহিত্যগুলো সংস্কৃতির বদলে বাংলায় লিখাতেন এবং শাক্ত ব্রাহ্মণদের পরিবর্তে বৈষ্ণব বাঙালি কর্মকর্তাদের প্রাধান্য দিতেন। একই সময়ে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রদর্শনে ইসলামী প্রতীক ব্যবহার ছিল বেশ কম। রাজনৈতিক প্রয়োগবাদে মুদ্রা তৈরিতে রাজকীয় সকল কার্যের অধিকাংশ নির্দেশনা প্রকাশ করা হতো। সুলতান নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহ তাঁর মুদ্রায় নিজেকে চিহ্নিত করেন,' সুলতান, সুলতানের পুত্র, সুলতান হোসেন শাহের পুত্র সুলতান নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহ।'[১০২] পূর্বেকার সময়ে আড়ম্বরপূর্ণ ভাষার ব্যবহার বিদায় নিয়েছে এবং গ্রীক বিজয়ী বা আরব খলিফাদের প্রসংগও বাদ পড়েছে। স্রেফ পিতা সুলতান হওয়ায় নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহ সুলতান হয়েছেন, অন্য কোন যুক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন পড়েনি। ক্ষমতা নিশ্চিত করে এসব সুলতান এখন নিজেদেরকে সকল বাঙালির কাছে স্বদেশজাত শাসক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

অধিকন্তু সমসাময়িক হিন্দু কবিরা তাঁদেরকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন, তাতেও বিষয়টি বোঝা যায়। ১৪৯৪ সালে দেবী মনসাকে মহিমান্বিত করা কাব্যে কবি বিজয়গুপ্ত বাংলার সুলতানের প্রশংসা করে শুরুতেই এমন কিছু স্তবক রচনা করেছেন, যা ভারতের চিরায়ত রাজার তোষামোদ করার মতোই:

---

১০০. Niharranjan Ray, "Mediaeval Bengali Culture," *Visva-Bharati Quarterly* 11, no.2 (August-October 1945): 54; Md. Enamul Haq, *Muslim Bengali Literature* (Karachi: Pakistan Publications, 1957), 38-39.

১০১. Shamsud-Din Ahmed, ed. and trans., *Inscriptions*, 4: 236-37.

১০২. Karim, *Corpus*, 118 নাসিরউদ্দিনের পুত্রের সিংহাসনে আরোহণের পর থেকে বাংলার স্বাধীন সালতানাতের শেষ পর্যন্ত মুদ্রা ও মসজিদের খোদাইলিপিগুলোতে স্রেফ "সুলতান, সুলতানের পুত্র" সূত্র বর্ণিত থাকতো। দেখুন প্রাগুক্ত, ২৩৮, ২৪৪, ২৮৯

সুলতান হোসেন রাজা বিশ্বের প্রতিপালক:
যুদ্ধে তিনি অপ্রতিরোধ্য: প্রতিপক্ষের কাছে তিনি যম (মৃত্যুর দেবতা),
দানে তিনি কল্পতরু
সৌন্দর্যে তিনি কাম (ভালবাসার দেবতা),
তা প্রজারা তার শাসনে আনন্দে থাকে।[১০৩]

একইভাবে ১৫৪০ -এর দশকে রচিত বৃন্দাবন দাস তার 'শ্রীচৈতন্য ভগবত' কাব্যে বাংলার শাসককে 'রাজা' হিসেবে অভিহিত করেছেন, আরব-পারস্য শব্দ 'শাহ' বা 'সুলতান' ব্যবহার করেননি। আর ১৫৫০-এর দশকের প্রথমভাগে আরেক বৈষ্ণব কবি জয়ানন্দ তার 'চৈতন্য-মঙ্গল' কাব্যে মুসলিম শাসককে শুধুমাত্র 'রাজা' হিসেবেই সম্বোধন করেননি, তিনি তাকে 'ঈশ্বর' এবং এমনকি বৈদিক দেবতাদের রাজা ইন্দ্র হিসেবেও অভিহিত করেছেন।[১০৪] এ ধরনের পদবি ব্যবহার সুলতানের কর্তৃত্ব প্রশ্নে বৈশিষ্ট্যসূচক বাঙালি বৈধতার ইংগিতবহ।

১৬১৯ সালে, মোগলদের বাংলা বিজয়ের সামান্য পরে এবং তখনো সুলতানি স্মৃতি সজীব, অগাস্টিয়ান সন্ন্যাসী সেবাসটিয়াও ম্যানরিক এখানকার অনেক মুসলিম শাসকের আদিগঙ্গা (বর্তমান হুগলি) যেখানে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে, সেই পবিত্র স্থান গঙ্গাসাগর থেকে পানি সংগ্রহের জন্য লোক পাঠানোর অভ্যাসের কথা উল্লেখ করেছেন। সন্ন্যাসী উল্লেখ করেন, এ অঞ্চলের হিন্দু শাসকদের মতো এসব শাসকরাও অভিষেক সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে সেই পবিত্র পানি দিয়ে গোসল করে নেন।[১০৫]

ইউরোপিয়ান সন্ন্যাসীটির কাছে এই বিচ্ছিন্ন তথ্যটি যদি সঠিকভাব বর্ণনা করা হয়ে থাকে, তবে নিজস্ব পরিমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত পারসিক প্রতীকীর সাথে ভারসাম্য রক্ষার জন্য পরবর্তী সুলতানদের তাঁদের অভিষেককালে ভারতীয় রীতি জাঁকালোভাবে প্রকাশ করার মানে দাঁড়ায় ঘটনাবলী ছিল অত্যন্ত প্রকাশ্য এবং প্রতীকীভাবে আক্রমণাত্মক। সমসাময়িক কাব্যে এসব সুলতানদের 'রাজা' বা 'ঈশ্বর' হিসেবে উল্লেখ করাকে শুধুমাত্র অতিরঞ্জন হিসেবে বাতিল করে দেওয়া যায় না। তারা আসলেই বাঙালি রাজায় পরিণত হয়েছিলেন।

---

১০৩. বিজয় গুপ্ত, *পদ্ম-পুরাণ*, সম্পাদনা জয়ন্ত কুমার দাসগুপ্ত (কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৬২), ৮।

১০৪. J.T.O' Connell, "Vaisnava Perceptions of Muslims in Sixteenth-Century Bengal," in *Islamic Society and Culture: Essays in Honour of Professor Aziz Ahmad*, ed. Milton Israel and N.K. Wagle (New Delhi: Manohar. 1983). 298-302.

১০৫. Sebastiao Manrique. *Travels of Fray Sebastien Manrique*. 1629-1643. trans.E Luard and H. Hosten (Oxford: Hakluyt Society 1927). 1: 77.

সারমর্ম

বাংলায় একটি হিন্দু রাজবংশকে উৎখাতের মধ্য দিয়ে প্রথমদিককার মুসলিম শাসকরা ক্ষমতা দখল করে তাঁদের মুদ্রায় বিজেতা প্রজাদের উপর কর্তৃত্বের বৈধতা ঘোষণার কোন চেষ্টা না করে তাঁরা বরং দমনমূলক শক্তির প্রকাশকে প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের একেবারে প্রথমদিকের স্থাপত্য নিদর্শনে এটাই প্রকাশ পায়, অভিবাসী এই লোকেরা তখনো দূরবর্তী দিল্লীর দিকে মুখ করে আছে। অবশ্য, ত্রয়োদশ শতকের দিকে দিল্লীর সাথে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ফলে বাংলার শাসকরা তাঁদের সাবেক প্রভুদের মোকাবেলায় উদ্দীপ্ত ধর্মীয় ভাবধারা গ্রহণ করেন। ইসলামের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বশীল বাগদাদের খলিফার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে তারা তা করেছিলেন। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে দিল্লীর নিকট থেকে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলার সুলতানদের পারস্যের রাজকীয় ভাবাদর্শ গ্রহণ করার বিষয়টি প্রকাশিত হয় 'দ্বিতীয় আলেকজান্ডার' মুদ্রা সূত্র এবং সিকান্দারের মহাজাঁকজমকপূর্ণ ও রাজকীয় আদিনা মসজিদের মাধ্যমে।

পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে বৈধতার বৈদেশিক ভিত্তির ইসলামী বা রাজকীয় পারসিক উপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীলতার কারণে সংখ্যালঘু মুসলিম শাসকশ্রেণী অব্যাহত রাজনৈতিক সমর্থনের জন্য যে শক্তিশালী হিন্দু অভিজাতদের উপর চূড়ান্তভাবে নির্ভর করতেন, তাদের মধ্যে আস্থার সংকটের সৃষ্টি হয়। রাজা গণেশের উত্থান এই সংকটকে সুস্পষ্ট করে তোলে, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম সচেতন সমাজ তথা সূফীসাধকদের মধ্যে আস্থাহীনতার সৃষ্টি করে। এই উত্তেজনা সাময়িকভাবে প্রশমিত করা হয় অংশত রাজা গণেশের পুত্র সুলতান জালালউদ্দিনকে ধর্মান্তরিত করে এবং পরে তাঁর মাধ্যমে দেশের মুখ্য নির্বাচনমণ্ডলী ধার্মিক মুসলমান, চিশতি তরিকার সূফীদরবেশ এবং দেব-দেবীতে অনুরক্তদের আলাদা আলাদা ও বিচ্ছিন্নভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে।

অবশ্য, সকল বাঙালির কাছে ব্যাপকভিত্তিক রাজনৈতিক মতাদর্শ শুধুমাত্র ইলিয়াস রাজবংশের পুনপ্রতিষ্ঠা দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। একটি স্থিতিশীল প্রধানত ধর্মনিরপেক্ষ অবয়বে বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তন, যেখানে পারস্পরিক সন্তোষজনক পৃষ্ঠপোষক আশ্রিতের সম্পর্ক রাজনৈতিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছিল এবং যেখানে রাষ্ট্র ক্রমপরম্পমরায় প্রজা জনসাধারণের সংস্কৃতিতে পৃষ্ঠপোষকতা করতো, এমন এক পর্যায়ে উপনীত পরবর্তী বাংলা সালতানাতকে মার্শাল হজসন অভিহিত করেছেন 'সামরিক সমর্থক রাষ্ট্র' হিসেবে।[১০৬] কর্তৃত্ব বিষয়ক বৈদেশিক সকল উৎসের

১০৬. Marshall Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization* (Chicago: University Press, 1974), 3: 25-27.

উল্লেখ বাদ দিয়ে পরবর্তী সুলতানদের প্রকাশিত সকল মুদ্রায় উত্তরসুরির বৈধতার ধর্মনিরপেক্ষ রাজবংশগত ফরমুলায় প্রণীত হয়: অমুক রাজা, কারণ তাঁর পিতাও ছিলেন একজন রাজা। এবং সরকারি স্থাপত্য নিদর্শনে আয়তন ও মাধ্যম হিসেবে এসব রাজা এতো বেশি বাঙালি ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করেছেন, যাকে শিল্পকলার ঐতিহাসিক পারসি ব্রাউন বলেছেন, 'দেশটি প্রথমে দখলকারীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, এখন তারাই নিয়ন্ত্রিত।'[১০৭]

১০৭. Percy Brown. *Indian Architecture. Islamic Period*. 5th ed. (Bombay: D. B. Taraporevala. 1968). 38.

৩ বদ্বীপের প্রথমদিকের সূফী-দরবেশ

বাংলাদেশে, মহানগরীগুলোর কথা বলা হচ্ছে না, এমন কোন শহর এবং এমন কোনগ্রাম নেই, যেখানে সূফী দরবেশগণ আসেননি এবং বসতি স্থাপন করেননি।

-----আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানি (আনুমানিক ১৪১৪)

সূফী-দরবেশ এবং সীমান্ত যুদ্ধ প্রশ্ন

বাংলার সাথে ইসলামী সভ্যতার সর্বপ্রথম স্থায়ী সংযোগ ঘটেছিল ভৌগোলিক পরিবর্তনে তাড়িত হয়ে মধ্য এশিয়া থেকে তুর্কী ভাষাভাষী গ্রুপগুলোর বিপুল সংখ্যক মানুষের ইরানী মালভূমি ও ভারতে প্রবেশ করার ঘটনায়। মোঙ্গল অগ্রাভিযানের প্রেক্ষাপটে সামরিক ক্রীতদাস, অভিযাত্রী কিংবা পলায়নপর উদ্বাস্তু যেভাবেই হোক না কেন, এসব তুর্কী শুধুমাত্র ইসলামী বিশ্বের প্রাচীনতর কেন্দ্রগুলোতে – বাগদাদ, কায়রো, সমরকন্দ - কেন্দ্রীভূত না হয়ে বাংলাসহ প্রত্যন্ত এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়েছিল। সাধারণত অভিবাসী গ্রুপগুলোর নেতৃত্ব দিতেন আল্প (alp) বা আল্প-ইরেন (alp-eren) পদবিধারী এক ব্যক্তি, যিনি তুর্কী গাঁথায় বর্ণিত বীর হিসেবে চিহ্নিত হতেন, তিনিই তাঁর জীবনযাপনের পন্থা অনুসরণ করে অন্যদের চালিত করতেন।[১] অভিবাসী তুর্কীরা বিশেষভাবে সূফী নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে সংগঠিত ইসলামী মরমী ভ্রাতৃসংঘকে কেন্দ্র করেও সংঘবদ্ধ হতো। এসব সূফী নেতা ছিলেন একই সাথে প্রাচীন তুর্কী গাঁথায় বীর ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ 'আলপ' এবং প্রাক-ইসলামী তুর্কী সাধুপুরুষ তথা কারামত প্রদর্শনের ক্ষমতাসম্পন্ন ও অদৃশ্য জগতের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার শক্তিসম্পন্ন বুজুর্গ ব্যক্তি -এই উভয় গুণের অধিকারী। অধিকন্তু ইসলামী মরমী-জ্ঞান মুরশিদ (শিক্ষক) থেকে মুরিদের (ছাত্র) মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার এমন একটি কঠোর কর্তৃত্ববোধক কাঠামো ছিল যা আধ্যাত্মিক নেতৃবৃন্দের কাছে অনুগত অনুসারীরা চমৎকারভাবে খাপ খেয়ে যেত। বাংলা সীমান্তে তুর্কীদের আগমনের সময়ও এটা ছিল চালিকাশক্তি।

বাংলায় এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সর্বপ্রথম মুসলিম শিলালিপিটি এ ধরনের অভিবাসী সূফীগ্রুপের সাথেই সম্পর্কিত। বীরভূম জেলায় প্রাপ্ত শিলালিপিটিতে তারিখ

১. Rudi Paul Lindner, Nomadas and Ottomans in Medieval Anatolia (Bloomington: Indiana University, 1983), 24. See also Gerald Clauson, Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish (Oxford: Clarendon Press, 1972), 128.

ছিল ২৯ জুলাই, ১২২১, তা ছিল মুহাম্মদ বখতিয়ারের বাংলা বিজয়ের মাত্র সাত বছর পরের, তাতে উত্তর-পশ্চিম ইরানের মারাঘা এলাকার এক লোকের পুত্র এবং এক 'ফকিরের' তথা সূফীর একটি খানকা (সূফী ভবন) নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। ভবনটি উক্ত ফকিরের একার ছিল না, একদল সূফী-সাধকের (আহলে সুফ্ফা), যারা 'মহিমান্বিত আল্লাহ'র উপস্থিতি অনুভব করে তাঁর বাধ্য থাকতেন এবং তাঁরা সবসময়ে মহিমান্বিত আল্লাহ'র যিকিরে মশগুল থাকেন'।[২] শিলালিপিটি খানকায় ব্যবহারের আগে প্রাক-ইসলামী কোন অট্টালিকার অংশ ছিল বলেই মনে হয়, কারণ এর উল্টো পিঠে আনুমানিক ১০৩৫ থেকে ১০৫০ সালের পাল রাজা নয়া পালের কোন অধীনস্থ ব্যক্তির বদ্বীপে একটি বিজয় অভিযানের কথা সংস্কৃত হরফে লিখিত রয়েছে। সংস্কৃত লিপিতে এ অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক হিন্দু মন্দির থাকার কথা বলা হয়েছে, এবং পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও এতে প্রমাণিত হয় অনুগত শাসকটি ছিলেন ব্রাহ্মণিক দেবতার পূজারী।[৩] মানে দাঁড়াচ্ছে একই শিলালিপির দুদিকের বর্ণনায় বাংলা বদ্বীপটির এ অংশের জটিল সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে : একদিকে দেখা যাচ্ছে, সরকারী ধর্ম বৌদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্যবাদ বিকশিত এবং এমনকি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে, অন্যদিকে এই অঞ্চলে প্রাপ্ত ইসলামের প্রাচীনতম দলিলটি আমাদের কাছে এসেছে বাংলায় প্রাক-মুসলমান অতীতের বিধ্বস্ত ধ্বংসাবশেষ থেকে।

কিন্তু এসব সূফী-দরবেশরা কি মন্দির ধ্বংসকারী ধর্মান্ধ ছিলেন? আমরা কি মনে করতে পারি, তাঁরা ছিলেন গাজি অর্থাৎ তাঁরা অমুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন? এটা বস্তুত প্রাচ্যবিদদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। ১৯৩০-এর দশকে জার্মান প্রাচ্যবিদ পল উইটেক তাঁর গবেষণা থিসিসে জানান, আনাতোলিয়া জুড়ে পশ্চিমমুখী তুর্কীদের বায়জান্টাইন গ্রীক সভ্যতার বিলীনকারী অভিযান ছিল বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ইসলামের জিহাদ তথা ধর্মযুদ্ধের অনুপ্রেরণাপুষ্ট। এই বক্তব্যটি সাথে সাথেই মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহাসিকদের মধ্যেও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, যদিও সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায়, এ তত্ত্বে সমসাময়িক প্রমাণের অভাব রয়েছে।[৪] বাস্তবিকই, এ মতবাদের সাথে ভিন্নতা প্রকাশ করে রুডি লিন্ডনার যুক্তি উপস্থাপন করে বলেছেন,

---

২. Z. A. Desai, "An Early Thirteen-Century Inscription from West Bengal," Epigraphia Indica, Arabic Supplement (1975): 6-12. লিপিটি বীরভূম জেলা বোলপুর থানার সিবন গ্রামে পাওয়া যায়।

৩. D. C. Sircar, "New Light on the Reign of Nayapala," *Bangladesh Itihas Parishad: Third History Congress, Processings* (Dacca: Bangladesh Itihas Parishad, 1973: 36-43.

৪. Lindner, Nomads and Ottomans, 1-38: R.C Jennings, "Some Thought on the Gazi Thesis," *Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes* 76 (1986): 151-61.

উসমানিয়া তুর্কীদের প্রাথমিক উত্থানের সাথে জিহাদের মূল্যবোধ ছিল বলে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে, সেই সব মতাদর্শভিত্তিক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ঘটনাবলী ঘটার কয়েক শতাব্দী পরে। লিন্ডনারের মতে, তারা যা লিখেছিলো, তা ছিল উসমানিয়া তুর্কীদের প্রাথমিককালের ঘটনাবলীর বিশুদ্ধকরণ, একে প্রাথমিককালের ইতিহাসের চেয়ে পরবর্তীকালের প্রচারণা বলাই অধিকতর যৌক্তিক।[৫]

একই ধরনের ঐতিহাসিক চিত্র পাওয়া যায় বাংলাতেও। এটা সত্য যে, পারসি জীবন-ইতিহাসে প্রায়ই বাংলার সূফী-দরবেশদেরকে মূর্তিপূজারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুজাহিদ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, কিন্তু এসব জীবনী উক্ত সূফী-দরবেশদের সমসাময়িক নয়। উদাহরণ হিসেবে শেখ জালালউদ্দিন তাবরিজির (মৃত্যু ১২৪৪-৪৫) কথা বলা যায়, বাংলার একেবারে প্রথম দিককার সূফী-দরবেশদের মধ্যে তিনি অন্যতম সুপরিচিত। তাঁর সম্পর্কে সর্বপ্রথম বর্ণনা পাওয়া যায় সিয়ার-আল-আরেফিন নামক একটি দরবেশদের জীবনীমূলক গ্রন্থে, যা সংকলিত হয়েছিল ১৫৩০-৩৬ সালের দিকে, অর্থাৎ তাঁর ইন্তেকালেরও প্রায় তিনশত বছর পর। উক্ত সংকলন অনুযায়ী নিজ জন্মভূমি তাবরিজে (উত্তর-পশ্চিম ইরান) সূফীবাদ সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর শেখ তাবরিজি ১২২৪ সালের দিকে বাগদাদ যান, সেখানে তিনি প্রখ্যাত দরবেশ শিহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দির কাছে সাত বছর শিক্ষালাভ করেন। ১২৩৫ সালে শেখ শিহাবের ইন্তেকালের পর জালালউদ্দিন তাবরিজি ভারতে যান, কিন্তু দিল্লীর রাজদরবারে উষ্ণ সংবর্ধনা না পেয়ে তিনি তদানিন্তন প্রত্যন্ত প্রদেশ বাংলার রাজধানী লক্ষ্মৌতিতে গমন করেন। ১০ বছর পর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এখানেই বসবাস করেন।[৬]

সংকলনটিতে লেখা হয়-

তিনি যখন বাংলায় যান, তখন সেখানকার সকল মানুষ তাঁর কাছে আসে এবং মুরীদে (অনুসারী) পরিণত হয়। এখানে তিনি একটি সরাইখানা ও একটি লঙ্গরখানা নির্মাণ করেন এবং লঙ্গরখানার জন্য তিনি অনেকগুলো বাগান ও জমি ওয়াকফ হিসেবে সংগ্রহ করেন। এগুলো বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেখানে দেবমহল নামে এক (নদী) বন্দর ছিল, যেখানে এক মূর্তিপূজারী প্রচুর অর্থ ব্যয়ে একটি মন্দির নির্মাণ করেছিল। শেখ মন্দিরটি ধ্বংস করেন এবং সে স্থানে তাকিয়া (সূফীদের বিশ্রামাগার) নির্মাণ করেন। তিনি সেখানকার অনেক মূর্তিপূজারীকে মুসলমানে পরিণত করেন। বর্তমানে (অর্থাৎ ১৫৩০-৩৬) তাঁর পবিত্র মাযারটি সেই মন্দিরের

---

৫. Lindner, *Nomads and Ottomans*, 7. See also Rudi Paul Lindner, "Stimulus and Justification in Early Ottoman History," in *Greek Orthodox Theological Review* 27, nos. 2-3 (Summer-Fall 1982): 2-7-24.

৬. Maulana Jamali, *Siyar al-'arifin* (Delhi: Matba Rizvi, 1893), 164-69.

ভেতরেই অবস্থিত এবং নদীবন্দরটির আয়ের অর্ধেক অর্থ সেখানকার লঙ্গরখানাটির ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ওয়াকফকৃত।[৭]

কিন্তু সমসাময়িক ঘটনাবলীতে এমন কোন প্রমাণ পওয়া যায় না, যাতে দেখা যায় তিনি বা বাংলার অন্য কোন সূফী-দরবেশ প্রকৃতপক্ষে মন্দির ভেঙ্গে তৃপ্তি পেয়েছেন। এটা সম্ভবত সমসাময়িক আনাতোলিয়ায় তুর্কী সূফীদের মতো পরবর্তীকালের জীবনীকারগণ অতীতের দিনগুলো কেমন হওয়া উচিত ছিল, তা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী জালালউদ্দিন তাবরিজির কর্মজীবন পুনঃ রচনা করেছেন। এ ধরনের জীবনীকারদের জন্য, শেখের কথিত একটি হিন্দু মন্দির ধ্বংস, স্থানীয় লোকজনদের তাঁর ধর্মান্তরকরণ এবং মন্দিরের স্থানে তাঁর একটি তাকিয়া নির্মাণ সবই ছিল পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে কল্পনাপ্রসূত বৃত্তান্ত, যার মাধ্যমে তাঁকে বিবেচনা করা হচ্ছিল বাংলার হিন্দু অতীত ও মুসলমান ভবিষ্যতের মধ্যকার সিদ্ধান্তসূচক পরিবর্তনকারী।

প্রায় একই ধরনের ঐতিহাসিক পুনর্নির্মাণ দেখা যায় বাংলার সর্বাপেক্ষা পরিচিত দরবেশ শাহজালাল মুজাররদের (মৃত্যু ১৩৪৬) জীবনীতে। শাহজালালের প্রথম লিখিত জীবনী লিপিবদ্ধ করেছিলেন ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে তারই এক সঙ্গীর বংশধর জনৈক শেখ আলী (মৃত্যু আনুমানিক ১৫৬২)। এখানেও দরবেশের জীবনকাল এবং তার সর্বপ্রথম জীবনীকারের মধ্যে কয়েক শতাব্দী ব্যবধান দেখা যায়। এই বর্ণনা অনুযায়ী, শেখ জালাল তুর্কিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি মধ্য এশিয়ার একটি সূফী তরিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আহমদ ইয়াসবির আধ্যাত্মিক মুরীদ হন।[৮] এতে জিহাদের কাঠামোর মধ্যে শাহজালালের ভারত আগমনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। মূর্তিপূজারীদের বিরুদ্ধে তাঁর ছোট জিহাদ এবং অপরটি নফসের বিরুদ্ধে বড় জিহাদ উভয়ের উল্লেখ রয়েছে। জীবনীকার উল্লেখ করেন, একদিন শাহজালাল তাঁর পুণ্যাত্মা পীরের (অর্থাৎ আহমদ ইয়াসবি) কাছে তার উচ্চাভিলাষের কথা জানিয়ে বলেন, তিনি প্রভুর তত্ত্বাবধানে উচ্চতর (আধ্যাত্মিক) জিহাদে বেশ কিছুটা সফলতা অর্জন করেছেন, একইভাবে তিনি তাঁর লক্ষ্য-পূরণের সাহস দিয়ে ছোট (বস্তুগত) জিহাদেও অংশ নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছেন, যেখানেই দারুল হরব (অমুসলমান ভূমি) থাকবে, তিনি তা জয় করার চেষ্টা করে হয় গাজি নয় শহীদ হবেন।

৭. Ibid., 17.

৮. শেখ শাহজালালের বিবরণী পরবর্তীকালে আনুমানিক ১৬১৩ সালে নতুন করে প্রকাশিত হয়েছিল প্রখ্যাত জীবনীগ্রন্থ *গুলজার-ই আবরার*-এ, প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি এস. এম ইকরামের "an Unnoticed Account of Shaikh Jalal of Sylhet," *Journal of the Asiatic Society of Pakistan* 2 (1957): 63-68 এ। যেহেতু আহমদ ইয়াসবি ১১৬৬ সালে মারা যান, শাহ জালালের নিজের আধ্যাত্মিক গুরু অবশ্যই ইয়াসবি ও শাহজালালের মধ্যবর্তী অজ্ঞাতনামা কেউ হবেন।

শ্রদ্ধেয় পীর তার অনুরোধ রাখলেন এবং ৭০০ পদস্থ সৌভাগ্যবান মুরীদকে তার সাথে যেতে দিলেন। তাঁরা যেখানেই শত্রুর সাথে লড়াই করলেন, সেখানেই তাঁরা বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে দিলেন।[৯]

এটা সত্য যে, শাহজালালের জীবনকালেরও কয়েক শত বছর আগে থেকেই পারসো-ইসলামী বিশ্বে দুই জিহাদের (সংগ্রাম) একটি অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে এবং অপরটি নিজের নফসের বিরুদ্ধে ধারণা বহাল ছিল।[১০] কিন্তু উল্লিখিত জীবনী গ্রন্থটিতে শেখের বাংলায় আগমনের অন্য একটি উদ্দেশ্য দেখা যায়। ভারতীয় উপমহাদেশে পৌঁছার পর তিনি ও তাঁর অনুসারী দলটি বাংলা বদ্বীপটির সর্বপূর্ব প্রান্তে অবস্থিত সিলেটে গমন করেন। গ্রন্থটিতে বলা হয়, 'এই সুদূরপ্রসারী অভিযানে মালে গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) ছাড়া তাঁদের আর কোন উপকরণ ছিল না, কিন্তু তা দিয়েই তাঁরা সুন্দর জীবনযাপন করতেন। যখনই তাঁরা কোন উপত্যকা বা বসতি করায়ত্ত করতেন, তখন তাঁরা সেখানে ইসলামের সম্প্রসারণ ও শিক্ষার দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে (শাহজালাল) বাংলা প্রদেশের অন্যতম অঞ্চল শিরহাটে (সিলেট) পৌঁছেন ৩১৩ জন সঙ্গী নিয়ে। (এলাকাটির শাসককে পরাজিত করার পর) সমগ্র অঞ্চলটি আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত বিশ্বের বিজয়ীদের হাতে যায়। শেখ (জালাল) মুজাররদ প্রত্যেকের জন্য একটি করে অংশ ভাতা হিসেবে নির্ধারিত করে দিলেন এবং বিয়ে করার অনুমতি দিলেন।'[১১]

ঘটনা ঘটার দীর্ঘ সময় পরে লিখিত এই বর্ণনাটির একটি নির্দিষ্ট আদর্শগত কাঠামো সংক্রান্ত গুণ রয়েছে। জালালউদ্দিন তাবরিজির মতো শাহজালালকেও বাংলার হিন্দু অতীত ও মুসলিম ভবিষ্যতের মধ্যকার যোগসূত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং অধিকন্তু এর পরে দরবেশের জীবনের সাথে ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে সমান্তরাল রেখা আঁকা হয়েছে। শাহজালালের সঙ্গে আগত সঙ্গীর সংখ্যা ৩১৩ হিসেবে বলা হয়েছে, মহানবী (সা)-এর জীবনের প্রথম বৃহৎ যুদ্ধ এবং বিশ্বধর্ম হিসেবে ইসলামের সূচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত বদর যুদ্ধেও মহানবীর (সা) সঙ্গী সাহাবীর সংখ্যা ছিল ঠিক একই সংখ্যক। অর্থাৎ বর্ণনাটি আদর্শগতভাবে সেই ঘটনা থেকে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু বর্ণনাটির অন্যান্য বিষয় বিজয়ের সমকালীন বাংলার সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার প্রেক্ষাপটে বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ। 'সুদূরপ্রসারী অভিযানে' শাহজালালের

৯. প্রাগুক্ত, ইকরামের অনুবাদ।

১০. সূফীবাদের উপর রচিত প্রাচীনতম পারসি গ্রন্থ আলী হুজাইব'র (মৃত্যু আনুমানিক ১৯৭২) কাশফ আল-মাহজুব লাহোরে মুদ্রিত হয়েছিল, যাতে দু ধরনের জিহাদের ব্যাপারে সূফী-ধারণার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। দেখুন *The Kashf al-Mahjub*, trans. Reynold A. Nicholson, 2d ed. (reprint, London: Luzac, 1970). 201.

১১. Ikram,"Unnoticed Account," 66.

মুজাহিদ-মুরীদদের যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী ছাড়া আর কোন অবলম্বন ছিল না,' এ থেকে বলা যায়, তাঁরা ছিলেন সমকালীন তুর্কীদের যাযাবর মানসিকতাসম্পন্ন। এবং ঘটনাক্রমে (একই বর্ণনায়) শাহজালালের ধর্মীয় কারণে বাংলায় আসার দাবিও নাকচ করে দিচ্ছে।

অন্যদিকে তিনি 'প্রত্যেককে একটি অংশ দিলেন' এ বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর গোত্রীয় অধিপতি এবং একই সাথে ধর্মীয় নেতার ছবিটি ফুটে উঠে, সেই সাথে নিজের পদবি 'মুজাররদ' অর্থাৎ 'অবিবাহিত' হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অবিবাহিত যাযাবর সফরসঙ্গীদের বিয়ে করার অনুমতি প্রদানের ফলে ধারণা করা যায়, তিনি স্থানীয় সমাজে মূল বিস্তারকারী সম্পদশালী গ্রুপ হিসেবে তাঁদের বসতি স্থাপন করিয়েছেন। অধিকন্তু ফারসি রেকর্ডে দেখা যায়, শাহজালাল তার অনুসারীদের খাদখুদা (Khadkhuda) হতে নির্দেশ দিয়েছেন, যার অর্থ 'গৃহস্বামী' বা 'ভূস্বামী।[১২] তাঁর সঙ্গী-সাথীরা সাথে করে তাঁদের স্ত্রী ও পরিবারবর্গ নিয়ে আসেননি, তাই স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়, তাঁরা স্থানীয় মহিলাদের বিয়ে করেছেন এবং উক্ত ভূমিতে বসবাস করে ধীরে ধীরে স্থানীয় সমাজের সাথে মিশে গেছেন। এসবই উসমানিয়া সালতানাতের প্রথমদিককার অভিজ্ঞতার মতো। শাহজালালের মুসাফির সঙ্গীরা যখন পূর্ব বাংলায় বসতি স্থাপন করছিলেন, তখন উসমানিয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উসমানের (মৃত্যু ১৪২৬) সঙ্গী-সাথীরা পশুপালকের জীবন থেকে উত্তর-পশ্চিম আনাতোলিয়ায় স্থায়ী জীবন শুরু করেছিলেন।[১৩]

সৌভাগ্যবশত মহাপুরুষদের জীবনী নয়, এমন দুটি নিরপেক্ষ সূত্র থেকে শাহজালালের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বেশ তথ্য পাওয়ায় আমরা তাঁকে তুলনায় আনার

---

১২. মোহাম্মদ ঘাউসি বিন হাসান বিন মুসা সাত্তারি রচিত ১৬১৩ সালে পারস্য ভাষার মূল গ্রন্থটিতে লেখা ছিল 'শেখ মুজাররদ হামা-রা হিসা সাখতা... ওয়া হার ইয়াক-রা দাসতুরি-ইয়ি কাদখুদা শুদান নিজ বার দাদ।' *Gulzar-i Abrar* (Asiatic Society of Bengal, Calcutta, Perian MS. 259) fol. 41a. ইকরামের প্রকাশিত ফারসি সংস্করণে ভুল করে বলা হয়েছিল, "... ওয়া হার ইয়াক-রা দাসতুরি কি খুদা শুদান নিজ বার দাদ, যার অর্থ দাঁড়ায়,"... এবং তিনি নির্দেশ দিলেন যে তাদের প্রত্যেক খোদাও হবে (!)" Ikram, "Unnoticed Account." 65

১৩. লিন্ডনার যুক্তি প্রদর্শন করেন, "যাযাবর উসমানীয়রা তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে তা, অর্থাৎ বসতি স্থাপন করেছিল, কারণ এতে করে তারা বিথিনিয়ায় ভূস্বামী বা চাষী হিসেবে অপেক্ষাকৃত ভাল ও অনেক নিরাপদ জীবন পেয়েছিল।" অধিকন্তু, "বিথিনিয়ার মতো উর্বর কোন এলাকা যদি চাষাবাদের জন্য দেওয়া হয়, তবে যাযাবর জীবনের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক জনসংখ্যার ভরণ-পোষণ করতে পারে ক্যালোরির হিসাবে চাষাবাদে ব্যবহৃত এক খণ্ড ভাল জমিতে যে ফসল উৎপাদিত হয়, তা সেই ভূমিতে শুধুমাত্র পশুচারণের চূড়ান্ত উৎপাদন থেকে বহুগুণ বেশি।" Lindner, Nomads and Ottomans, 30. একই যুক্তি ব্যবহার করা যায় বাংলার ক্ষেত্রে, সেখানে চারণভূমি হিসেবে ব্যবহারের চেয়ে একটি ভূমি ধানচাষের জন্য ব্যবহৃত হলে তাতে অনেক বেশি অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়া যায়।

মতো অবস্থায় আছি। প্রথমটি হলো ১৫১২-১৩ সালে লিখিত সিলেট শহরের একটি শিলালিপি, যার থেকে আমরা জানতে পারি, শাহজালাল নন, জনৈক সিকান্দার খান গাজি প্রকৃতপক্ষে শহরটি জয় করেছিলেন ১৩০৩-৪ সালে।[১৪] দ্বিতীয় সূত্রটি এসেছে সমসাময়িক প্রখ্যাত মরক্কান পর্যটক ইবনে বতুতার (মৃত্যু ১৩৭৭) কলম থেকে, যিনি ব্যক্তিগতভাবে ১৩৪৫ সালে শাহজালালের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তখন শেখ ছিলেন বেশ বৃদ্ধ, তবে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে অত্যন্ত বিখ্যাত, তাই মহান বিশ্বপর্যটক তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য দক্ষিণ ভারত থেকে চীন পর্যন্ত বিশাল এলাকা সফর করেছিলেন। মেঘনা ও সুরমা নদীপথে নৌকায় ভ্রমণ করে সিলেট শহরের কাছে শাহজালালের পার্বত্য গুহা আবাসে তিনি তিনদিন তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। ইবনে বতুতা পরে লিখেন,

'এই শেখ একজন মহান দরবেশ এবং একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর কারামত (অতিলৌকিক ঘটনা) ও মহান দাতা হিসেবে জনগণের কাছে সুপরিচিত, এবং তাঁর বেশ বয়স হয়েছে। এই পার্বত্য এলাকার মানুষজন তার হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং এ কারণে তিনি তাদের মাঝে অবস্থান করছেন।'[১৫]

ইসলামে ধর্মান্তরের আগে এ অঞ্চলের লোকদের ধর্মীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। ইবনে বতুতার বিবরণীতে খণ্ডিত প্রমাণ পাওয়া যায়, তারা ছিল আদিবাসী জনসাধারণ, ব্রাহ্মণ্যবাদ বা বৌদ্ধবাদের লিখিতরূপের সাথে তাদের আনুষ্ঠানিক সংস্পর্শ ছিল খুবই কম, কারণ মরক্কোর এই পর্যটক অন্যত্র পূর্ব বাংলার পাহাড়ি এলাকার অধিবাসীদের অভিহিত করেছেন 'যাদু ও ডাকিনীবিদ্যা অনুশীলন এবং এ ব্যাপারে নিবেদিতপ্রাণ হিসেবে প্রসিদ্ধ।'[১৬] এ মন্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, সিলেটের পাহাড়ি এলাকার নীচে অবস্থিত সুরমা সমতলভূমিতে বসবাসরত কৃষিজীবী সমাজ, ইবনে বতুতা যে সমাজকে দ্ব্যর্থহীনভাবে হিন্দু অভিহিত করেছেন, এসব লোক তাদের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির।[১৭] তাই এটা সম্ভব যে, শাহজালালের মাধ্যমেই পাহাড়ি জনগণ প্রথম আনুষ্ঠানিক, লিখিত কোন ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হয়। সংক্ষেপে

১৪. Shamsud-Din Ahmed, ed. and trans., *Inscriptions*, 4:25. এই খোদাইলিপির সময়ে শাহজালালের খ্যাতি বোঝা যায় প্রথম লাইন থেকেই, যাতে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে এই বলে যে, "মহামান্বিত শেখদের শেখ, পরম পবিত্র শেখ জালাল, মহান তপস্বী, মুহাম্মদের পুত্র।" বর্তমানে ঢাকা জাদুঘরে সংরক্ষিত এই খোদাইলিপিটি সিলেটের কোন্ ভবনটিতে একেবারে প্রথমে স্থাপন করা হয়েছিল, তা স্পষ্ট নয়।

১৫.Ibn Battuta, *The Rehla of Ibn Battuta*, trans., Mahdi Husain (Baroda: Oriental Institute, 1953), 238-39.

১৬. Ibid., 237-38.

১৭. "হবাং (হবিগঞ্জের নিকটে) এর অধিবাসীরা জিম্মি হিসেবে থাকা পৌত্তলিক, তাদের উৎপাদিত অর্ধেক শস্য গ্রহণ করা হয়।" Ibid., 241.

বলতে গেলে, অধিকতর সমসাময়িক প্রামাণ্য দলিলপত্রে রাজনৈতিক সীমান্তে আগত সূফী সাধকদের মুজাহিদ হিসেবে বদ্বীপটিতে আগমনকারী হিসেবে নয়, বরং পরহেজগার দরবেশ কিংবা আধ্যাত্মিক নেতৃবৃন্দের কর্তৃত্বের আওতায় থেকে পিছুটানহীন বসতি স্থাপনকারী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। সমসাময়িক কোন সূত্রই তাঁদেরকে জিহাদের আদর্শবাদে নিমজ্জিত ব্যক্তি বা সমসাময়িক কোন প্রমাণেই তাদেরকে অমুসলিম নিধনকারী বা অমুসলিম স্থাপনা ধ্বংসকারী হিসেবে দেখা যায় না। বাংলার কোন সূফী-দরবেশই এবং সেই সাথে বাঙালি কোন সুলতানই তাঁদের শিলালিপি বা মুদ্রায় নিজেদেরকে গাজি হিসেবে অভিহিত করেননি। শুধুমাত্র বিজয়ের কয়েক শত বছর পর লিখিত জীবনকাহিনীতে এ ধরনের ধারণা দেখা যায়। বিশেষ করে ষোড়শ শতাব্দীতে জীবনীকার ও দরবেশকাহিনী লেখকরা সচেতনভাবে (কিংবা হয়তো অসচেতনভাবে) তাঁদের নিজেদের সময়ের বিরাজমান বিজয় ও ধর্মান্তর-করণের পরিস্থিতির আলোকে পেছন দিকের ঘটনা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই, সেই কাঠামোর আওতায় তাঁরা ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের সূফি-দরবেশদের জীবন ও কর্ম বিনির্মাণ করেছেন।

বাঙালি সূফী-দরবেশ ও হিন্দু চিন্তাধারা

বাংলার সাথে ইন্দো-তুর্কীদের মোকাবেলার শুরু থেকেই মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি অংশ তাদের ধর্মীয় জীবনের সাথে স্থানীয় যোগীদের আধ্যাত্মিক সাধনা এবং সেই সাথে এসব সাধনাকে গুরুত্ব দেয়—এমন সব সৃষ্টিতত্ত্বের সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট হয়েছিল। সমসাময়িক মুসলমানরা মনে করতে থাকে, সাধারণভাবে উত্তরবঙ্গ এবং বিশেষভাবে ব্রহ্মপুত্র নদ ও ভুটানের পাহাড়ি এলাকার মাঝে অবস্থিত কামরূপ পৌরাণিক এবং রহস্যমণ্ডিত স্থান, যেখানে ঐন্দ্রজালিক, যোগ এবং যাদুবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ সাধনাকারীরা বসবাস করে। সিলেট সফরের সময় ইবনে বতুতা উল্লেখ করেছেন, 'এসব পার্বত্য এলাকার অধিবাসীরা— যাদু ও ডাকিনি বিদ্যার অনুশীলন এবং সাধনার জন্য বিখ্যাত।'[১৮] ১৫৯৫ সালের দিকে মোগলদের প্রখ্যাত প্রশাসনিক বিবরণী 'আইন-ই-আকবরি'তে কামরূপের অধিবাসীদের 'যাদুবিদ্যা অনুশীলনে অভ্যস্ত হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।[১৯] প্রায় ২৫ বছর পর, উত্তরবঙ্গে কর্মরত জনৈক মোগল কর্মকর্তা পশ্চিম কামরূপের কান্তাঘাট এলাকাকে 'যাদু ও ডাকিনিবিদ্যার জন্য কুখ্যাত'

---

১৮. Ibid., 237-38.

১৯. Abul -Fazl Allami, *Ain-i-Akbari* (Lucknow: Nawal Kishor, 1869), 2 : 74. Vol. 1 trans. H. Blockmann, ed. D. C. Phillott; vols. 2 and 3 trans. H. S. Jarrett, ed. Jadunath Sarkar, 3d ed. (New Delhi: Oriental Books Reprint Corp., 1978), 2 : 130.

হিসেবে অভিহিত করেছেন।[২০] ১৬৬২-৬৩ সালে আরেক মোগল ঐতিহাসিক জানান, পুরা আসাম এলাকা, কামরূপ যার পশ্চিমাঞ্চলীয় অংশ 'ভারতের মানুষ অসমীয়দের যাদুকর হিসেবেই জানে এবং যাদু কাটানোর জন্য তারা 'আসাম' শব্দটি ব্যবহার করে।'[২১]

ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব কিংবা অন্য জাগতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আওতার বাইরে থেকে সূফীরা যেহেতু অপার্থিব বাস্তবতা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানসমৃদ্ধ হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তাই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, তাঁরাই কামরূপের যোগী প্রথার প্রতি সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তুর্কী বিজয়ের একেবারে প্রথম দশকেই, অমৃতকুণ্ড নামের তান্ত্রিক যোগসাধনা সম্পর্কিত একটি পুস্তক ফারসি ও আরবিতে অনুবাদ হয়ে প্রচারিত হতে থাকে। অনূদিত পুস্তকের ভাষ্য অনুযায়ী সংস্কৃতিতে লেখা মূল অমৃতকুণ্ড লিখেছিলেন কামরূপের এক ব্রাহ্মণ যোগী, তিনি ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর পুস্তকটি লক্ষ্ণৌতির প্রধান কাজি (বিচারক) রোকনউদ্দিন সমরকান্দিকে (মৃত্যু ১২১৮) উপহার দিয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে, কাজিই পুস্তকটির প্রথম আরবি ও ফারসি অনুবাদ করেছিলেন।[২২] এই শেষ বিষয়টি নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলেও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পরবর্তী পাঁচ শত বছর ধরে আরবি ও ফারসিতে বারবার অনূদিত হয়ে অমৃতকুণ্ড বাংলার এমনকি সমগ্র ভারতের সূফী-সাধকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে।[২৩] উত্তর ভারতের সূফী শেখ আব্দুল কুদ্দুস গানঘোহি (মৃত্যু ১৫৩৭) নিজে

---

২০. Mirza Nathan, *Baharistan-i-ghaibi,* Persian MS., Bibliotheque Nationale, Paris, Sup. Pers. 252, fol. 146b; trans. M. I. Borah as *Baharistan-i-Ghaybi: A History of the Mughal Wars in Assam, Cooch Behar, Bengal, Bihar and Orissa during the reigns of Jahangir and Shahjahan, by Mirza Nathan* (Gauhati: Government of Assam, 1936), 1: 273.

২১. Shihab al-Din Talish, *Fathiya-i-ibriyah*, in H. Blockmann, "Koch Bihar, Koch Hajo, and Assam in the 16th and 17th Centuries. According to the Akbarnamah, the Padshahnamah, and the Fathiyah i 'Ibriyah," *Journal of the Asiatic Society of Bengal* 41, no.1 (1872): 79.

২২. রোকনউদ্দিন সমরকান্দির উপর মন্তব্যের জন্য দেখুন *Encyclopaedia of Islam*, new ed. (Leiden; Brill, 1960), 1; 434-35. অমরকুণ্ডের অনুবাদকদের পরিচিতির সমস্যা আলোচনার জন্য দেখুন Yusuf Husain, "Haud al-hayat; La Version arable de l' Amrakund, "*Journal asiatique 113 (October-December 1928); 292-295.*

২৩. যদিও সংস্কৃত গ্রন্থটির কোন মূল কপির কথা জানা যায় না, কিন্তু ইসলামী ভাষাগুলোর বেশ কয়েকটি অনুবাদ দেখা যাওয়ায় বাংলার ভেতর ও বাইরে গ্রন্থটির ব্যাপক প্রভাবের বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। *ইসলামিক কালচার* ২১ (১৯৪৭): ১৯১-৯২ এ *বাহর আল-হায়াত* নামে ফারসি ভাষার একটি সংস্করণ গুজরাটের আহমদাবাদের (নং ২২৩) পীর মুহাম্মদ শাহের লাইব্রেরিতে সংরক্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই গ্রন্থের আরেকটি ফারসি অনুলিপি আছে লন্ডনের অফিস লাইব্রেরিতে (পারসিয়ান এমএস, নং ২০০২)। তৃতীয় পাণ্ডুলিপির কপিটি আছে রাওয়ালপিন্ডির গঞ্জ বক্স লাইব্রেরিতে (এমএস নং ৬২৯৮)। চতুর্থটি, ষোড়শ শতকের শেষদিকের কিংবা সপ্তদশ

অমৃতকুণ্ড-এর সাধনা আত্মস্থ করেছিলেন এবং নিজের মুরীদদের সে অনুযায়ী শিক্ষা দিতেন।[২৪] সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কাশ্মিরি লেখক মোহসিন ফানি উল্লেখ করেন, তিনি অমৃতকুণ্ড-এর ফারসি অনুবাদ দেখেছেন।[২৫] এবং একই শতকে আনাতোলিয়ার সূফী পণ্ডিত মুহাম্মদ আল-মিসরি (মৃত্যু ১৬৯৪) জানান, অমৃতকুণ্ড যোগসাধনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক এবং তিনি আরও উল্লেখ করেন, ভারতে এ সাধনা সূফীবাদের সাথে আংশিকভাবে অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে।[২৬]

ফারসি এবং আরবি উভয় অনুবাদেই অমৃতকুণ্ড তান্ত্রিক যোগের একটি সারগ্রন্থের মর্যাদা লাভ করে। এর প্রথম ১০ অধ্যায়ে মানবদেহের অংশবিশেষের সাথে মহাবিশ্বের অংশবিশেষের বিশিষ্ট তান্ত্রিক সাদৃশ্যের তুলনা করে জোর দিয়ে বলা হয়, 'বিশ্বের সকল বৃহৎ সামগ্রীই তার ক্ষুদ্র অবয়বে বিদ্যমান।' ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে গুজরাটে অমৃতকুণ্ড-এর একটি ফারসি সমালোচনা দেখা যায় 'বাহার আল হায়াত' নামে যা গোয়ালিয়রের মহান সাত্তারি শেখ মুহাম্মদ গাউসের (মৃত্যু ১৫৬৩) প্রতি উৎসর্গ করা হয়।[২৭] শেখের এক মুরীদের লেখা পুস্তকটির মুখবন্ধে বাঙালি সূফীধারায় কিভাবে এসব 'যোগ' ধারণা অন্তর্ভুক্ত হয়, তার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ দেওয়া হয়েছে:

শতকের প্রথমদিকের এই কপিটিতে যোগ সাধনার একুশটি ছবি সম্বলিত, আছে ডাবলিনের এ. চেস্টার বেটি লাইব্রেরিতে; দেখুন Thomas A. Arnold, The Library of A. Chester Beatty: A Catalogue of the Indian Miniature, *revised* and ed. J.V.S. Wilkinson (London: Oxford University Press, 1936), 1: 80-81, 3:98 উপরোল্লিখিত ইসলামিক কালচার প্রবন্ধ অনুযায়ী (পৃ. ১৯২), ফারসি ভাষায় *বাহর আল-হায়াত* সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯২-৯৩ সালে মাদ্রাজে। অমৃতকুণ্ডের আরবি অনুবাদ হয়েছিল *হাউজ আল-হায়াত* নামে এবং ইউরোপের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত পাঁচটি কপি ইউসুফ হোসাইন তুলনা ও বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর "Haud al-hayat: La Version arable" নামক প্রবন্ধে, যাতে গ্রন্থকার গ্রন্থটির একটি আরবী সংস্করণ সংযুক্ত করেছেন। বর্তমানে আরবি গ্রন্থটির টিকা সম্বলিত অনুবাদ ও প্রতিবেদন আকারে ভূমিকাসহ একটি সমালোচনা প্রকাশের প্রস্তুতিরত কার্ল আরনেস্ট আরবি অনুবাদের চল্লিশটি পাণ্ডুলিপি চিহ্নিত করেছেন, যার সতেরটি আছে ইস্তাম্বুলে। তুর্কী অনুবাদগুলো মধ্য অষ্টাদশ শতকে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে এবং এটি প্রকাশিত হয় ১৯১০-১১ সালে। উনবিংশ শতকের একটি উর্দু অনুবাদ পাণ্ডুলিপি আকারে আছে ভারতের হায়দ্রাবাদে। দেখুন Carl W. Ernst, trans., *The Arabic Version of "The Pool of the Water of Life"* (Amratkunda), forthcoming.

২৪. SAA. Rizvi, *A History of Sufism in India* (Delhi: Munshiram Manoharlal, 1978): 1: 335.

২৫. Muhsin Fani, *Dabistan-e Mazahib*, ed. Nazir Ashraf and W.B. Bayley (Calcutta, 1809), 224.

২৬. Husain, "Haud al-Hayat: La Version arabe," 294.

২৭. *গুলজার আল-আবরার* ১৬১৩ সালের দিকে বা শেখ মুহাম্মদ গাউসের ইন্তেকালের মাত্র ৫০ বছর পর সংকলিত হয়, এতে গোয়ালিয়রের মহান দরবেশের লিখিত গ্রন্থরাজির অন্যতম হিসেবে *বাহর আল-হায়াতের* একটি অনুবাদের কথা উল্লেখ করা হয়। দেখুন Muhammad Ghauthi

ভারতীয় ভাষায় (অর্থাৎ সংস্কৃতিতে) রচিত এই আশ্চর্য ও বিস্ময়কর পুস্তকটির নাম 'অমৃতকুণ্ড'। তার অর্থ 'জীবনের পানি' এবং পুস্তকটি নিম্নোক্ত কারণে মুসলমানদের মধ্যে আবির্ভূত হয়। যখন সুলতান আলাউদ্দিন (অর্থাৎ আলী মর্দান) বাংলা জয় করেন এবং ইসলাম সেখানে প্রাধান্য বিস্তার করে, তখন কামরূপে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন, জনৈক পণ্ডিত ভদ্রলোকের কাছে সে খবর পৌঁছে। তার নাম ছিল কাম এবং তিনি ছিলেন যোগ-বিজ্ঞানের গুরু।

মুসলমান উলেমাদের (পণ্ডিত) সাথে বাহাস (বিতর্ক) করার জন্য তিনি লক্ষ্ণৌতি নগরীতে আসেন এবং এক শুক্রবার জামে মসজিদে প্রবেশ করেন। একদল মুসলমান তাঁকে উলেমাদের একটি দলকে দেখিয়ে দেন এবং তারা তাঁকে কাজি রোকনউদ্দিন সমরকান্দির দরবারের কথা বলেন। তাই তিনি সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন 'তোমরা কার উপাসনা কর?' তাঁরা জবাব দিলেন, 'আমরা নির্ভুল আল্লাহ্‌র উপাসনা করি।' তার পরের প্রশ্ন ছিল 'তোমাদের নেতা কে?' তাঁরা বললেন, 'আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ মুহাম্মদ।' তিনি বললেন, "রূহ" সম্পর্কে তোমাদের নেতা কি বলেন?' তাঁরা জবাবে বললেন, 'সবকিছুর লালনকারী খোদা রূহকে নিয়ন্ত্রণ করেন।' তিনি বললেন, 'সত্যিই, আমিও নিগূঢ় ও স্মরণীয় পুস্তকগুলোতে এই জিনিস পেয়েছি।'

তারপর সেই ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম কবুল করলেন ও নিজেকে ধর্মীয় জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত করলেন এবং শীঘ্রই তিনি একজন মুফতিতে (জ্ঞানী) পরিণত হলেন। তারপর তিনি এই পুস্তকটি লিখে কাজি রোকনউদ্দিন তামামি (সমরকান্দি)-কে উপহার দিলেন। কাজি সেটিকে ভারতীয় ভাষা থেকে ত্রিশ অধ্যায়ে আরবিতে অনুবাদ করেন এবং অন্য কেউ তা আবার ১০ অধ্যায়ে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন।.... হযরত গাউসউদ্দিন নিজে কামরূপ গিয়ে বেশ কয়েক বছর এই বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন।... এই পুস্তকটির নাম বহর উল হায়াত।[২৮]

এখানে কাজি ও যোগীর মধ্যকার বাক্য বিনিময়ের যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তা পবিত্র কুরআনে (১৭ : ৮৫) বর্ণিত আয়াতের অনুরূপ, যাতে আল্লাহ নবী মুহাম্মদকে বলছেন, 'তারা (ইহুদিরা) আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দিন রূহ আমার পালনকর্তার আদেশঘটিত।' কুরআনে উল্লিখিত মুহাম্মদ (সা)–এর সাথে ইহুদিদের কথোপকথনের দৃশ্যটিই এক যোগীর মুখ দিয়ে বলিয়ে সমালোচনার লেখক দৃশ্যত মুসলিম জনতার কাছে যোগীর কথোপকথন বোধগম্য করতে চেয়েছেন।

Shattari Mandawi, Gulzar-i-Abrar, Urdu trans. by Fazl Ahmad Jiwari (Lahore: Islamic Book Foundation, 1975) 300.

২৮. Islamic Culture 21 (1947). *ইসলামিক কালচারে* প্রকাশিত ফারসি উদ্ধৃতি নেওয়া হয় এলাহাবাদের পীর মুহাম্মদ শাহের লাইব্রেরী থেকে। এ ছাড়া ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির একটি খণ্ডে যোগীর নাম দেওয়া হয়েছে কনম।

বহর-আল হায়াতের দ্বিতীয় মুখবন্ধের এমন একটি কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, যাতে চিরায়ত সূফী লোকজ্ঞানের সমৃদ্ধ অংশের মধ্যে যোগ সম্পর্কিত পাঠ খাপ খেয়ে যায়। এতে অনুবাদক একদা একটি দেশে থাকার কথা বলেন, একদিন সেদেশের রাজা তাকে তলব করলেন এবং তাকে দূরবর্তী অথচ পৌরাণিক এলাকায় দীর্ঘ সফরের নির্দেশ দিলেন। রাজা মুসাফিরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, তাঁরা একটি চুক্তিতে আবদ্ধ এবং মুসাফিরের সফরের শেষে তাঁরা আবার একত্রিত হবেন। তারপর অনুবাদক/মুসাফির তাঁর সফরকালের কষ্টকর অবস্থার মোকাবেলার বর্ণনা দেন: দুই সমুদ্র (আত্মা ও প্রকৃতি), ৭টি পর্বতমালা, ৪টি সংকীর্ণ গিরিপথ, বিপদসংকুল তিনটি মঞ্জিল এবং পিপীলিকার চোখের চেয়েও সংকীর্ণ পথ। শেষ পর্যন্ত তিনি প্রতিশ্রুত ভূমিতে পৌঁছেন। সেখানে তিনি একজন শেখকে দেখতে পেলেন আর তিনি তাঁর নিজের পদক্ষেপ ও শব্দের প্রতিফলন ও প্রতিধ্বনি করেন। লোকটি যে তাঁর নিজেরই প্রতিফলন তা বুঝতে পেরে মুসাফিরের তাঁর প্রভুর সাথে সম্পাদিত চুক্তির কথা মনে হলো, যার কাছে তিনি যাচ্ছেন। মুসাফিরের নিজেকে নিজের মধ্যে আবিষ্কারের মধ্যে গল্পটির চরম পরিণতি ঘটে; 'আমি নিজের মধ্যেই রাজা ও মন্ত্রীকে পেয়েছি।'[২৯] এই দ্বিতীয় মুখবন্ধটিতে যে ভাবটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে; তা হলো-মুসাফির, প্রলোভন ও বিপদসংকুল কষ্টসাধ্য পথ এবং চূড়ান্ত উপলব্ধি যে আকাঙ্ক্ষাকারীর মাঝেই লক্ষ্য নিহিত এর সবই ত্রয়োদশ শতকে বিদ্যমান পারসো-ইসলামী বিশ্বের সূফী মতবাদকে প্রভাবান্বিত করতে দেখা যায়।[৩০] এই মুখবন্ধের পরেই যোগতন্ত্রের পুস্তকটি স্থাপনের মানে দাঁড়ায়, এতে যে দুর্বোধ্য সাধনার বর্ণনা আছে, দ্বিতীয় মুখবন্ধে বর্ণিত মরমি লক্ষ্যের মাধ্যমেই তা অর্জন করা যেতে পারে। যদিও কোন কোন বিশেষজ্ঞ বহর আল-হায়াতকে একটি ধর্মীয় সমন্বয় সাধন সৃষ্টির প্রয়াস জাতীয় কর্ম হিসেবে

২৯. *Bahr al-Hayat* (India Office Library, London, Persian MS 2002), fols, 3a-6b.

৩০. তাঁরা সুনির্দিষ্টভাবে ফরিদউদ্দিন আত্তারের (মৃত্যু ১২২০) *মানতিক আত-তাইর* তথা চিরায়ত সূফী পথ-নির্দেশনার কথাই উল্লেখ করেছেন। বাস্তবিকই আত্তার এবং অমৃতকুণ্ডের প্রথম অনুবাদক শেখ রোকনউদ্দিন সমরকান্দি উভয়েই ষোড়শ শতকের শেষদিকে খোরাশানের সমসাময়িক ছিলেন এবং এটা খুবই সম্ভব যে, শেষোক্তজন আত্তারের মরমি দর্শন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, উভয়েই একই পারসো-ইসলামী সাহিত্য ও ধর্মীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। অন্যদিকে, এটাও সম্ভব যে, দ্বিতীয় প্রস্তাবনাটি সমরকান্দি নয়, বরং তিন শতাব্দী পর মুহাম্মদ গাউস লিখেছিলেন, কারণ আমরা দ্বিতীয়জনের ফারসিতে পুনঃ অনুবাদের কথা জানি। হেনরি করবিনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে কার্ল আরনেস্ট যুক্তি দেখান, বিকশিত গল্পটি চূড়ান্তভাবে টমাসের রূপকথায় বর্ণিত "হিম অব দি পার্ল" ("Hymn of the Pearl") থেকে নেওয়া। দেখুন, Ernst, Arabic Version (forthcoming), and Henry Corbin, "Pour une morphologie de la spiritualite Shiite," Eranos-Jahrbuch 1960 (Zurich: Rhein-Verlag, 1961), 29: 102-7.

বিবেচনা করেননি, কিন্তু ধর্মীয় সমন্বয় সাধন বলতে যদি দুই বা ততোধিক বৈপরীত্বপূর্ণ উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত একটি নতুন মতবাদ তৈরি অর্থে বোঝায় তবে উক্ত বিবেচনা মূল্যায়ন করা কঠিন।[৩১] বরং পুস্তকটি দুটি স্বতন্ত্র ও স্ব-নিয়ন্ত্রিত বিশ্বমতবাদকে একের সাথে অপরকে পাশপাশি আবদ্ধ করেছে সূফী রূপক কাহিনীর মাধ্যমে যোগশাস্ত্রের প্রায়োগিক সারবস্তু সেই সাথে পরবর্তীকালের সম্পাদক বা অনুবাদকদের দ্বারা তাদের ঐকমত্যের বিষয়ে গুরুত্বারোপের জন্য কিছু সম্প্রসারণ। মূল পুস্তকে ইসলামী পরিভাষা ও অতিলৌকিক বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও ইসলামী আখ্যানভাগের পরোক্ষ উল্লেখ শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি ভারতীয় ধ্যান-ধারণাকে মজবুত ও বর্ণাঢ্য করতেই কাজে লেগেছে।[৩২] এখানে অন্তত যোগ ও সূফী ধারণাগুলো সঠিক সংমিশ্রণে বাধা দিয়েছে।

তবুও পুস্তকটির জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতি দুর্বোধ্য সাধনার ব্যাপারে সূফীরা কত আগ্রহী ছিলেন, এমনকি প্রখ্যাত সাত্তারি দরবেশ শেখ মুহাম্মদ গাউসের মারেফতের জ্ঞানলাভের জন্য উত্তর ভারতের গোয়ালিয়র থেকে কামরূপে গিয়েছিলেন। এটা করার সময় তিনি সাত্তারি তরিকার সূফী ঐতিহ্য অনুসরণ করেন, এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা শাহ আব্দুল্লাহ সাত্তারি (মৃত্যু ১৪৮৫), মধ্য এশিয়া থেকে ভারত হয়ে সফরের জন্য তিনি বাংলাকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।[৩৩] যদিও কেউ ত্রয়োদশ শতকের বাঙালি মুসলমান এবং পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের সাত্তারি সূফীদের মধ্যে অব্যাহত বুদ্ধিবৃত্তিক নিরবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, তবুও ত্রয়োদশ শতকের রোকনউদ্দিন সমরকান্দির বহর আল-হায়াত এবং ষোড়শ শতকে শেখ

৩১. অন্যদের মতো ইউসুফ হোসাইন গ্রন্থটিকে মিলনধর্মী কাজ হিসেবে মনে করেন। দেখুন, Husain, "Haud al-hayat: La Version arabe," 292.

৩২. উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি অধ্যায়ে যথাযথ শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের পদ্ধতিকে মায়ের গর্ভে থাকা ভ্রূণের শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে তুলনা করা হয়েছে, ভ্রূণকে পানি ও চিরন্তন জীবনের সাথে সম্পর্কিত জনপ্রিয় ইসলামী দরবেশ আল-খিজির হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবার, এ ধরনের শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের সাথে পানি না গিলেই মাছের শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের সাথে যখন তুলনা করা হয়েছে, তখন মাছকে চিহ্নিত করা হয়েছে ইউনুস নবী হিসেবে। এবং মেরুদণ্ডের সাতটি স্নায়ুকেন্দ্রের সাথে সম্পর্কিত সাতটি সংস্কৃত মন্ত্রের সবকটিকেই ঈশ্বরের আরবি নাম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, *হামকে* অনুবাদ করা হয়েছে *ইয়া রব* এবং *আউমকে* অনুবাদ করা হয়েছে *ইয়া কাদিম* হিসেবে। এগুলোকে পুরোপুরি 'অনুবাদ' বলা যায় না, কারণ আধ্যাত্মিক শক্তির যোগ শব্দ ও সূফীদের ব্যবহৃত খোদার নামের মধ্যে কার্যকরী সমতা বিধান করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। দেখুন Yusuf Husain, "Haud al-hayat: la Version arabe," 300 and Ernst, *Arabic Version* (forthcoming).

৩৩. বাংলায় শাহ আবদুল্লাহ হন শেখ মুহাম্মদ আলার আধ্যাত্মিক মুরীদ এবং তিনি বদ্বীপটিতে সাত্তারি তরিকা প্রচারের প্রাণপণ প্রয়াস চালান এবং তাঁর নিজের আধ্যাত্মিক মুরীদ শেখ জুহুর বাবা হাজি হামিদ (মৃত্যু ১৫২৪) ছিলেন শেখ মুহাম্মদ গাউসের আধ্যাত্মিক শিক্ষক। Rizvi, *History of*

মুহাম্মদ গাউসের সংযোগ এটাই প্রমাণ করে অন্তর্বর্তীকালে বাংলায় তা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজধানীর সূফী-দরবেশ

বাংলা সালতানাতে ইসলামী সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের প্রধান ধারক ও বাহক হচ্ছে পর্যায়ক্রমিক রাজধানী নগরী লক্ষ্ণৌতি (১২০৪ থেকে), পাণ্ডুয়া (আনুমানিক ১৩৪২ থেকে) ও গৌড়ে (আনুমানিক ১৪৩২ থেকে) বসবাসকারী প্রখ্যাত ও প্রভাবশালী সূফী দরবেশদের জমায়েত। এসব সূফী-দরবেশের অধিকাংশই সূফী ভ্রাতৃসংঘ বিশেষ করে সোহরাওয়ার্দি, ফেরদৌসি ও চিশতি তরিকার মাধ্যমে সংঘবদ্ধ ছিলেন এবং আমরা তাঁদের সম্পর্কে জানতে পারি শুধুমাত্র প্রাপ্ত চিঠিপত্র ও জীবনী থেকে। শহরে যেসব সূফী-দরবেশ সম্পর্কে আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি তথ্য রয়েছে, তা প্রথমদিককার সালতানাত আমলে তথা ১৩৪২ সালে পাণ্ডুয়ায় স্বাধীন ইলিয়াস শাহি রাজবংশের গোড়াপত্তন থেকে ১৪১৫ সালে রাজা গণেশের বিপ্লবের শেষ পর্যন্ত।[৩৪]

বাংলার রাজধানীতে সূফী-দরবেশরা যে রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করতেন, তা ছিল সূফী কর্তৃপক্ষের ধারণকৃত ধারণা যা ইতোপূর্বেই সমসাময়িক ফারসি ভাষাভাষী বিশ্বে বিকশিত হয়েছিল। আমরা ইতিমধ্যেই ক্ষমতাবান সূফী-দরবেশদের দায়িত্বভার সম্পর্কিত সূফী ঐতিহ্যের আসল অবস্থান ব্যাখ্যা করেছি আলী হুজবিরির বিবৃতির মাধ্যমে: আল্লাহ 'দরবেশদের বিশ্বের গভর্নর করেছেন।' তাত্ত্বিকভাবে ক্ষমতাপিপাসু রাজপুরুষদের চেয়ে আল্লাহ্‌র সাথে অধিকতর ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে মুসলমান দরবেশগণ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হওয়ার নৈতিক দাবি করতেন।

Sufism in India, 2: 153-55. মুহাম্মদ গাউসের বড় ভাই শেখ বাহলুলও ১৫৩৮ সালে প্রথম মোগল অভিযানের সময়ে আগমনের পর থেকে বাংলায় বসবাস করতে থাকেন। জাহাঙ্গীর, *তুজুক-ই জাহাঙ্গীরি* ২:৬৩।

৩৪. ১৪১৪ সালের দিকে চিশতি শেখ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানি বলেন, শেখ শিহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দির সত্তরজন মুরিদকে দেবগাঁও-এ (স্থানটি চিহ্নিত করা যায়নি) সমাহিত করা হয় এবং সোহরাওয়ার্দি তরিকার অন্যান্য সূফী এবং তাদের সাথে শেখ জালালউদ্দিন তাবরিজির অনুসারীদের (দেখুন উপরে) পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী মহিসন্তোষ ও দেওতলায় সমাহিত করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, "সংক্ষেপে, বাংলাদেশে, মহানগরীগুলোর কথা বলা হচ্ছে না, এমন কোন শহর এবং এমন কোন গ্রাম নেই, যেখানে সুফি-দরবেশগণ আসেননি এবং বসতি স্থাপন করেননি।" Shaikh Ashrar Jahangir Simnani, *Maktubat-i ashrafi*, Aligarh Muslim Univesity History Department, Aligarh, Persian MS. No 27, letter 45, fols. 139b-140a. See also S.H. Askari, "New Light on Rajah Ganesh and Sultan Ibrahim Sharqi of Jaunpur from Contemporary Correspondence of Two Muslim Saints," *Bengal Past and Present* 57 (1948): 35.

এই দর্শন অনুযায়ী ক্ষমতাসীন রাজন্যবর্গ জাগতিক ক্ষমতা অর্জনের কোন সহজাত অধিকার রাখতেন না, বরং শুধুমাত্র কোন মুসলিম দরবেশের দয়ায় কিছু ক্ষমতা সাময়িকভাবে ভোগ করতেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই সম্ভবত ইন্দো-মুসলিম ইতিহাসে আমরা প্রায়ই দেখতে পাই, দরবেশগণ ভবিষ্যদ্বাণী করছেন, কে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করবে, এবং কে কতদিন তা ধরে রাখতে পারবে। প্রকাশ্যে 'ভবিষ্যদ্বাণী' করার পেছনে রয়েছে নিয়োগ করার ইঙ্গিতময় তৎপরতা অর্থাৎ একজন দরবেশ তাঁর ওয়ালিয়াত অর্থাৎ জাগতিক কর্তৃত্ব কোন এক রাজপুরুষকে অর্পণ করছেন। উদাহরণ হিসেবে চতুর্দশ শতকের ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফিফ উল্লিখিত ঘটনার কথা বলা যায়, দিল্লীর তোগলক রাজবংশের (১৩২১-১৩৯৮) প্রতিষ্ঠাতা ভবিষ্যৎ সুলতান গিয়াসউদ্দিন তোগলক রাজদণ্ড লাভের আগে আরো অনেক অমাত্যের মতো প্রখ্যাত চিশতি সূফী শেখ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকরের (মৃত্যু ১২৬৫) দৌহিত্রের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার উপর বিশ্বাসী ছিলেন। গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় প্রায়ই পাঞ্জাবে দরবেশের খানকায় যেতেন, একবার তিনি সাথে করে পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে ভবিষ্যতের দুই সুলতান, মুহাম্মদ বিন তোগলক ও ফিরোজ তোগলককে সঙ্গে নেন। দরবেশ তিনজনকেই পাগড়ি দেন এবং বলেন, তাদের প্রত্যেকেই ভারত শাসন করবে। অধিকন্তু স্ব স্ব পাগড়ির দৈর্ঘ্য অনুসারে ঠিক তত বছর তারা রাজত্ব করবে।[৩৫] এই কাহিনীর মাধ্যমে চিশতি তরিকার দরবেশ এবং ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম শক্তিশালী সাম্রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক পৃষ্ঠপোষকতার জটিল অবস্থার গভীরতা উপলব্ধি করা যায়।

বাংলায় স্বাধীন মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও এই ধরনের কাহিনীর প্রচার দেখা যায়। ১২৪৩-৪৪ সালে ঐতিহাসিক মিনহাজ আল-সিরাজ লক্ষ্মৌতি সফর করেন এবং নিম্নলিখিত কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করেন।[৩৬] ভারত যাত্রার পূর্বে বাংলার ভবিষ্যৎ সুলতান গিয়াসউদ্দিন আইওয়াজ (১২১৩-২৭) তাঁর মালবোঝাই গাধা সমেত একবার আফগানিস্তানের ধূলিধুসরিত রাস্তায় ভ্রমণ করছিলেন। সেখানে তাঁর সাথে জীর্ণ জামাকাপড় পরিহিত দুই দরবেশের সাক্ষাৎ ঘটলো। তাঁরা তাঁর কাছে খাবার আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি সম্মতিসূচক জবাব দিয়ে গাধার পিঠ থেকে বোঝা নামালেন। তিনি মাটিতে কাপড় বিছিয়ে তাঁর খাদ্যসামগ্রী দরবেশদের গ্রহণের অনুরোধ করলেন। খাদ্য গ্রহণের পর সন্তুষ্ট দরবেশদ্বয় একে অন্যের সাথে কথা বলে

৩৫. Shams-i Siraj, *Tarikh-i Firuz Shahi'* Ed., Maulavi Vilayat Husain (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1891), 27-28.

৩৬. যেহেতু সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইউয়াজ মিনহাজের সফরের মাত্র সতের বছর আগে মারা গিয়েছিলেন, তাই এটা সম্ভব যে, বাংলার রাজধানীতে এই গল্পটি তার পরপরই এবং হয়তো তাঁর শাসনকালেই প্রচারিত হয়েছিল।

ঠিক করলেন, এ ধরনের বদান্যতাকে পুরস্কৃত করা ছাড়া যেতে দেওয়া উচিত নয়। তাঁরা তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হিন্দুস্থানে চলে যাও, মুসলমানদের বসতির একেবারে শেষ অংশটি আমরা তোমাকে দিয়ে দিলাম।' দুই দরবেশের ইঙ্গিত অনুসারে ভবিষ্যৎ সুলতান 'তৎক্ষণাৎ তাঁর পরিবার একত্রিত করে ভারত যাত্রা করলেন।'[৩৭] ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের পারসো-ইসলামী সাংস্কৃতিক বিশ্বের ধারণা অনুযায়ী বাংলা প্রকৃতপক্ষেই ছিল উক্ত দুই দরবেশের আয়ত্তাধীন এবং তাঁরা এক দয়ালু আগন্তুককে তা দিয়ে দেওয়ার অধিকারপ্রাপ্ত ছিলেন।

উত্তর ভারতের মতো বাংলায় রাজনৈতিক সৌভাগ্য ও আধ্যাত্মিক আশীর্বাদের মধ্যকার সংযোগ চিশতি তরিকার প্রাথমিক ইতিহাসের সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়। দিল্লী ছিল চতুর্দশ শতকের প্রথমভাগে এ তরিকার সবচেয়ে প্রভাবশালী দরবেশদের আবাসস্থল। সাইমন ডিগবির ভাষায়, 'সে যেই হোক না কেন' দিল্লীতে সে যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত দরবেশ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার (মৃত্যু ১৩২৫) খানকায় যেতই। বাস্তবিকই চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগের দুই প্রধান ফারসি কবি আমির খসরু ও আমির হাসান এবং সুলতানের শীর্ষস্থানীয় ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি সবাই ছিলেন উক্ত দরবেশের আধ্যাত্মিক মুরীদ। যেহেতু এ সময়ে দিল্লী ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্প্রসারমান সাম্রাজ্যের রাজধানী, তাই এটা বিস্ময়কর নয় যে, এই নগরীর সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্য সেইসাথে প্রখ্যাত তরিকার দরবেশবৃন্দ এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠানসমূহ খলজি ও তোগলক সেনাবাহিনীর সাথে বাংলাসহ ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৩৮]

তবে ইন্দো-মুসলিম রাজদরবারগুলোর চিশতি তরিকার দরবেশদের পৃষ্ঠপোষকতার আরো গভীরতর কারণ রয়েছে। চতুর্দশ শতকের দিকে ভারতের অন্যান্য সূফী তরিকা যখন তাদের আধ্যাত্মিক আবাস হিসেবে মধ্য এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকিয়েছিল, তখন চিশতি তরিকার প্রধান প্রধান খানকা ভারতীয় উপমহাদেশে স্থাপন করে পুরোপুরি এদেশীয় হয়ে পড়েছিল। তাই ইন্দো-মুসলিম

---

৩৭. মিনহাজউদ্দিন উসমান, *তাবাকাত-ই নাসিরি*, ১: ৫৮১।

৩৮. Simon Digby, "The Sufi Shaikh as a Source of Authority in Medieval India," in *Purusartha*, vol. 9: *Islam et societe en Asie du sud*, ed., Marc Gaborieau (Paris: Ecole des Hautes etudes en sciences sociales, 1986), 68-69. এমনকি বাংলা যখন দিল্লী থেকে স্বাধীন ছিল, তখনো এই তরিকার প্রখ্যাত সূফীগণ উত্তর ভারতের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অব্যাহত রেখেছিলেন, এমতাবস্থায় এ.বি.এম. হাবিবুল্লাহ বাংলার চিশতিদের দিল্লি সালতানাতের 'পঞ্চম বাহিনী' হিসেবে অভিহিত করেছেন। A.B.M. Habibullah, review of Abdul Karim, *Social History of the Muslims in Bengal, in Journal of the Asiatic Society of Pakistan* 5 (1960): 216-17.

শাসকরা মুসলমান এবং সেই সাথে ভারতীয় উভয় দিক থেকেই বৈধতা লাভের জন্য এই তরিকার প্রখ্যাত দরবেশদের দোয়া ও সমর্থন কামনা করতেন। একই কারণে শীর্ষস্থানীয় চিশতি দরবেশগণ শেখ নিজামউদ্দিনের খানকা থেকে সাম্রাজ্যের সকল অংশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং প্রায়ই তাঁরা প্রাদেশিক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন। বিপরীতদিকে, ভারতীয় বংশোদ্ভূত অনেক তরুণ মুসলমান দরবেশদের খানকায় বা আশেপাশে বসবাসের জন্য সমগ্র ভারত থেকে আসতেন এবং উক্ত শেখের খানকায় বা আশেপাশে বাস করতেন এবং পরে তাঁরা তাঁদের নিজেদের এলাকায় ফিরে গিয়ে সেখানে অনুরূপ চিশতি খানকা প্রতিষ্ঠা করতেন এবং শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন (দেখুন তালিকা ২)

টেবিল ২ : বাংলার শীর্ষস্থানীয় সূফী-দরবেশ

নিজামউদ্দিন আউলিয়া (মৃত্যু ১৩২৫)
(দিল্লী)

আখি সিরাজউদ্দিন (মৃত্যু ১৩৫৭)
(লক্ষ্ণৌতি– দিল্লী–লক্ষ্ণৌতি)

শেখ আলাউল হক
(মৃত্যু ১৩৯৮) (পাণ্ডুয়া)

আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানি
(মধ্যএশিয়া–পাণ্ডুয়া)
(মৃত্যু অজ্ঞাত)

নূর-কুতুব-ই-আলম
(পাণ্ডুয়া)
(মৃত্যু ১৪৫৯)

হুসামউদ্দিন মানিকপুরি (মৃত্যু ১৪৪৯)

শেখ নিজামউদ্দিনের কাছে অধ্যয়নকারী হিসেবে পরিচিত প্রথম বাঙালি বংশোদ্ভূত মুসলমানের নাম আখি সিরাজউদ্দিন (মৃত্যু ১৩৫৭), তিনি তরুণ বয়সে দিল্লী যান।

প্রখ্যাত দরবেশের সান্নিধ্যে থেকে মর্যাদাবান হয়ে সিরাজউদ্দিন উত্তরসুরি সনদ লাভ করেন এবং উত্তর ভারতে চিশতি তরিকার ঐতিহ্য অনুযায়ী তাঁকে 'আয়না-ই-হিন্দুস্তান' বা 'হিন্দুস্তানের দর্পণ' খেতাব দেওয়া হয়। ১৩২৫ সালে মুর্শিদের ইন্তেকালের কিছু সময় আগে তিনি বাংলায় ফিরে আসেন এবং অন্যদের চিশতি তরিকায় দীক্ষা দিতে থাকেন, তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র ছিলেন আরেক বাঙালি বংশোদ্ভূত মুসলমান শেখ আলাউল হক (মৃত্যু ১৩৯৮)।[৩৯] শেখ সিরাজ রাজদরবারের সাথে সম্পর্ক না রাখলেও[৪০] তাঁর ছাত্র শেখ আলাউল হক মুসলিম বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। বস্তুত, বাংলার দীর্ঘতম রাজবংশ ইলিয়াস শাহি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নির্মিত সর্বপ্রথম স্মারক স্তম্ভটি এই দরবেশকেই উৎসর্গ করা হয়েছিল। বর্তমানে কলকাতায় অবস্থিত ১৩৪২ সালে নির্মিত একটি মসজিদে শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ দরবেশের প্রশংসা করে বলেন, 'দয়ালু ও শ্রদ্ধেয় দরবেশ যাঁর গুণাবলী আকর্ষণীয় ও মহিমান্বিত, আল্লাহ্র দ্বারা উদ্দীপ্ত, তিনি তাঁর হৃদয় অতিলৌকিক ক্ষমতা ও বিশ্বাস দিয়ে আলোক-উদ্ভাসিত করেন এবং তিনি গৌরবময় ধর্মের পথপ্রদর্শক, আলাউল হক---- তাঁর ধর্মানুরাগ চিরস্থায়ী হোক।'[৪১]

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকেই এই শিলালিপির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। এক উচ্চাভিলাষী ও রাজনৈতিক বিচক্ষণ ব্যক্তি শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ তখন বাংলা বদ্বীপে নবাগত, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাকে নিজের শক্তির ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে তিনি দিল্লীর নাগপাশ থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন সবেমাত্র শুরু করেছেন। নিকটবর্তী সাতগাঁও-এ রাজকীয় গভর্নর সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন, সুলতান মুহাম্মদ বিন

---

৩৯. Abd al-Rahman Chisty, Mirat al-Asrar, fol. 514a.

৪০. বাস্তবিকই আখি সিরাজ তাঁর উচ্চবংশজাত মুরীদদের তাদের আভিজাত্যের ধরন নস্যাতের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। লাহোর থেকে আগত এবং বাংলার প্রাদেশিক সরকারের খাজাঞ্চি প্রখ্যাত অভিবাসীর পুত্র আলাউল হকের ক্ষেত্রে সিরাজ তাঁর শিষ্যকে লক্ষ্ণৌতিতে যেখানে তার পরিবার-পরিজন বাস করতো, সেখানে উত্তপ্ত কড়াই মাথায় নিয়ে হাঁটিয়ে তাকে নিজে থেকে বিনীত হওয়ার শিক্ষা দিয়েছিলেন। *Akhbar al-Akhyar,* comp. Abd al-Haq Muhaddis Dihlavi (Deoband, U.P.: Kitab Khana-yi Rahimia, 1915-16), 149. ১৩৫৭ সালে আখি সিরাজ ইন্তেকাল করেন এবং লক্ষ্ণৌতির এক উপশহরে তাঁকে সমাহিত করা হয়। আলেকজান্ডার কানিংহ্যাম সাগর দীঘি পুকুরের উত্তর-পূর্ব কোণার কাছে 'সাদুল্লাহপুরে' উঁচু ঢিবিতে তাঁর কবর ও মাযার চিহ্নিত করেছেন। Cunningham, "Report of a Tour in Bihar and Bengal in 1870-80 from Patna to Sunargaon," in *Archaeological Survey of India*, Report 15 (Calcutta, 1882): 70.

৪১. Shamsud-Din Ahmed, ed. and trans., *Inscriptions*, 4: 31-33. সম্পাদক নিজে। ১৯৩৯ সালের প্রথমদিকে কলকাতার উপশহরে ইতস্তত ভ্রমণের সময়ে খোদাইলিপি সম্বলিত পাথরটি দেখেছেন। তাকে বলা হয়েছিল, পার্শ্ববর্তী একটি বিধ্বস্ত মসজিদ থেকে ১৯০০ সালের দিকে পাথরটি তোলা হয়েছিল।

তোগলকের খামখেয়ালিপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে সাম্রাজ্যে নানা ধরনের সংকট সৃষ্টি হয়েছে, শামসউদ্দিন এ ব্যাপারে সজাগ থেকে প্রদেশব্যাপী ক্ষমতা দখলের এটাই সঠিক সময় হিসেবে বেছে নিলেন।[৪২] তাঁর এযাবতকালের প্রাপ্ত সর্বপ্রথম মুদ্রাটি পাণ্ডুয়ার টাকশাল থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪২-১৩৪৩ (হিজরি ৭৪৩)[৪৩] সালে, তাই একথা বলা যায়, উক্ত মসজিদ এবং তার পৃষ্ঠপোষক শেখ আলাউল হকের প্রতি উৎসর্গ করার সময় থেকেই শামসউদ্দিনের প্রাধান্য বিস্তার শুরু হয়। অধিকন্তু শেখ আলাউল হক শামসউদ্দিনকে তাঁর নিজের শিক্ষা ও আশীর্বাদ গ্রহণকারী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে নেন, তাই এই উদীয়মান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করায় এই দুই ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ছিল পারস্পরিক। সরকার ও প্রখ্যাত চিশতি দরবেশের মধ্যকার এই প্রাথমিক যোগাযোগ প্রতিনিয়ত আরো জোরদার হয় এবং বাংলায় মুসলিম শাসনের পুরো সময়ে তা বিদ্যমান থাকে।

সূফী দরবেশ ও সুলতানদের মধ্যকার মৈত্রী শুধুমাত্র রাজনৈতিক ভিত সম্প্রসারণে ইচ্ছুক ভাবী শাসকদের মাধ্যমেই সূচিত হয়নি। অনেক সূফী-দরবেশ ইসলামের উন্নতির ঐকান্তিক ইচ্ছা ও সে এলাকার মুসলমানদের কল্যাণের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজদরবারের সংস্পর্শে এসেছিলেন। আমরা মুজাফফর শামস বলখি (মৃত্যু ১৪০০) ও সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের (শাসনকাল ১৩৮৯-১৪১০) মধ্যে এ ধরনের যোগাযোগ দেখি। মধ্য এশিয়ার বলখ থেকে অভিবাসী মুজাফফর দিল্লী আসেন, সেখানে তিনি ফিরোজ শাহ তোগলকের মাদরাসায় শিক্ষা দেন। কিন্তু ক্লান্তিহীন উদ্দীপনায় তিনি বিহার নগরীতে চলে যান, সেখানে তিনি ফেরদৌসি তরিকার প্রখ্যাত দরবেশ শেখ শারাফউদ্দিন মানেরির (মৃত্যু ১৩৮১) সাথে মিলিত হন এবং তাঁর মুরীদ হন। এ সময় তাঁর জীবনপথের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। নিজের পাণ্ডিত্যের প্রতি অহংকার ত্যাগ করে মুজাফফর বিভিন্ন ধরনের কৃচ্ছ্র সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং তাঁর সকল জাগতিক সম্পদ দান করে দেন। তিনি বেশ কয়েকবার হজ্জ করেন, একবার মক্কায় চার বছর অবস্থান করে হাদীস শাস্ত্র চর্চা করেন।[৪৪] তাঁর যেসব চিঠিপত্র পাওয়া গেছে, তাতে তাঁকে আধ্যাত্মিক সাধনায় ধ্যানমগ্ন নিষ্ক্রিয় বা রূঢ় প্রকৃতির মানুষ হিসেবে মনে হয়নি, বরং নবীজীর ধর্মীয় দর্শনের ব্যাপারে তাঁর উপলব্ধি সমসাময়িক পৃথিবীতে পুরোপুরি বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিশীল, আধ্যাত্মিক মানদণ্ডে মানবসমাজকে বিশ্লেষণ সাপেক্ষে তাঁর ত্রুটিবিচ্যুতি সারিয়ে সেই মানদণ্ড অনুযায়ী তাঁকে রূপান্তরের আগ্রহী ব্যক্তি মনে হয়। বাংলার সুলতানের মধ্যে তিনি এসব বিধান বাস্তবায়নের সুযোগ দেখেছিলেন।

---

৪২. প্রাগুক্ত, ৩২।

৪৩. Karim, *Corpus*, 47.

৪৪. S. H. Askari, *Maktub and Malfuz Literature as a Source of Socio Political History* (Patna: Khuda Bakhsh Oriental Public Library, 1981), 22.

মুজাফফর শামস চট্টগ্রাম থেকে জাহাজে করে মক্কায় রওয়ানার আগে সরকারী অনুমতির জন্য পাণ্ডুয়ায় অপেক্ষাকালে দৃশ্যত প্রথমবারের মতো সুলতান গিয়াসউদ্দিনের শিক্ষার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তিনি লিখেন, 'আমাদের সামনে জাহাজে চার মাসের সফর রয়েছে, আর আট মাস এখনো বাকি আছে; এ পুরো সময়টাতে আপনার রাজ্যের কল্যাণময় প্রান্তভাগে আপনার মেহমান হিসেবে আমার সময় অতিবাহিত করাকালে সম্ভবত আপনার উন্নতি হ্রাস পায়নি।'[৪৫] দরবেশ এখানে বিনীতভাবে নিজেকে সুলতানের শুধুমাত্র একজন 'মেহমান' হিসেবে অভিহিত করলেও তিনি নিজেকে আরও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে বিশ্বাস করতেন। তিনি সুলতানকে লিখেন:

আমার মতে, মানবজাতির লালনকারী আল্লাহ্র রহমতে আপনি নির্ভেজাল ঈমানের ভেতরের জিনিস এবং বিবিধ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় অনুধাবনের সামর্থ্য বিকশিত করেছেন। মনে হচ্ছে, আমার হৃদয় আপনার জন্য উন্মুক্ত হবে। ধার্মিক ও উদ্দীপ্ত ব্যক্তি, আবদুল মালিক, আমার চিঠিপত্র পেয়েছেন; সেগুলো সংখ্যায় অনেক হতে পারে। এটা পাণ্ডুয়া বা মোয়াজ্জমাবাদে হতে পারে, তবে আমি ঠিকভাবে মনে করতে পারছি না। হে আমার পুত্র, অনুমতিক্রমে নিন এবং সেগুলো অনুসরণ করুন। আমার ভেতরের কোন অংশ আপনার কাছে উন্মুক্ত হয়ে যেতে পারে। আপনি হলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি, যার কাছে আমি আমার গোপন (মারেফত) চিন্তাভাবনা অনুপ্রবেশ করিয়েছি। আপনার উচিত এসব কিছু অন্য কারো কাছে প্রকাশ না করা।[৪৬]

এখানে কে কার পৃষ্ঠপোষকতা করছে? সুলতানকে দরবেশ তাঁর 'পুত্র' হিসেবে অভিহিত করাটা একজন বংশানুক্রমিক রাজা ও তাঁর প্রজাদের স্বাভাবিক সম্পর্কের পরিষ্কার বৈপরীত্বের ইঙ্গিতবাহী। দরবেশ সুলতানকে তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র লাভের বিশেষ অধিকার দেননি বরং তৃতীয় পক্ষের নিকট থেকে প্রথমে তাঁকে অনুমতি নিতে বলা হয়েছে। মুজাফফর বলখি সুলতানকে একথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, দিল্লীর সুলতান ফিরোজ তোগলক মুজাফফরের স্বীয় উস্তাদ শেখ শরাফউদ্দিন মানেরির নিকট বারবার চিঠিপত্র ও আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনার অনুরোধ করেছেন, তবুও তিনি তা না করে গিয়াসউদ্দিনের পিতা বাংলার সুলতান সিকান্দারের সাথে থাকাটা পছন্দ করে

---

৪৫. Muzaffar Shams Balkhi, *Maktubat-i-Muzaffar Shams Balkhi* (Khuda Bakhsh Oriental Public Library, Patna, Persian MS., Acc. No. 1859) letter 148, p. 448, S.H. Askari, *Maktub and Malfuz Literature* ১৬, এর আংশিক অনুবাদ, আশকারির অনুবাদ।

৪৬. দরবেশ মহোদয় তারপর সুলতানকে উপদেশ দেন, তিনি যখনই কোন বিষয় নিয়ে সমস্যায় পড়বেন, তখন যেন মক্কায় চিঠি লিখে কিংবা কোন বার্তাবহককে পাঠিয়ে তাঁকে তা অবহিত করা হয়। Balkhi, *Maktubat*, letter 163, p. 493. See also Askari, *Maktub and Malfuz Literature*, 20.

নিয়েছিলেন। তিনি সুনির্দিষ্ট করে বলেছেন, 'আপনাকে আপনার উপর সেইসব রহমত কার্যকর ও নির্দিষ্ট করে নিতে হবে।'[৪৭] সংক্ষেপে বলতে গেলে, মুজাফফর মনে করতেন, তিনি ও তাঁর নিজের ওস্তাদ দিল্লীর সুলতানদের বদলে বাংলার সুলতানদের আশীর্বাদ ও উপদেশ দিয়ে তাঁদের আনুকূল্য প্রদর্শন করেছেন।[৪৮]

শরিয়ায় বলা হয়নি এমন নতুন নতুন বিষয় বাতিলে প্রয়োজনীয়তা কিংবা মুসলমানদের দান করতে বাধ্য করা ইত্যাদি ইসলামী বিধান সংক্রান্ত সুপারিশ ছাড়াও[৪৯] মুজাফফর শাসন ক্ষমতায় অমুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রদানের বিরুদ্ধে সুলতানকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি লিখেন, ঐতিহ্য এবং ঘটনা পরম্পরায় যা কিছু এসেছে, তার সারমর্ম হলো এই যে, "হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা অপরিচিতদের, অর্থাৎ কাফেরদের, তোমাদের একান্ত প্রিয়ভাজন ও রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী করো না।" তারা বলে, তারা কাউকে দ্বারস্থ হতে দেয় না; কিন্তু তা প্রত্যক্ষভাবেই করা হয় এবং সালতানাতের স্বার্থে এবং জাগতিক প্রয়োজনে অনেক ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর উত্তর হলো এই যে, আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী, এটা স্বার্থও নয়, প্রয়োজনও নয়, বরং তার উল্টো, অর্থাৎ তা হলো শয়তানি এবং ক্ষতিকর জিনিস------কোন কারণেই কাফেরদের হাতে এমন কোন দায়িত্ব দিও না, যাতে তারা মুসলমানদের উপর ওয়ালি (গভর্নর-শাসক বা শ্রেষ্ঠ) হয়, তাঁদের ব্যাপারে তারা তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তাঁদের উপর তারা কর্তৃত্ব ব্যবহার করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, 'কোন ঈমানদারের উচিত নয়, কোন কাফেরকে তাঁর বন্ধু বা ওয়ালি হিসেবে বেছে নেওয়া, এবং যারা তা করে আল্লাহ্র দরবারে তাঁদের কোন স্থান নেই।' আল্লাহ্র কথা শোন এবং নিবেদিতপ্রাণ ও ধার্মিক হও; কাফেরদের ঈমানদারদের উপর শাসক হিসেবে নিযুক্তির প্রথার বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে কিতাবে (পবিত্র গ্রন্থে)।[৫০]

দরবেশ মহোদয়ের দৃষ্টিতে অনিবার্য বিপর্যয় এড়ানোর জন্য সুলতানের কর্তব্য হলো ইসলামী আইনের দ্বিধাহীন অনুসরণ। বাংলার ঘটনাবলী মুজাফফর শামসের

---

৪৭. Balkhi, *Maktubat*, letter 163, p. 503. See also Askari, *Maktub and Malfuz Literature*, ২১, আশকারির অনুবাদ।

৪৮. এখানে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার জন্য প্রধান দুটি সূফী তরিকার মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাও কাজ করছিল-একটি ছিল চিশতি, দিল্লীতে যাদের প্রাধান্য ছিল এবং অপরটি ফেরদৌসি, শেখ শারফ আল-দিন মানেরির নেতৃত্বে বিহারে যাদের প্রাধান্য ছিল। এই চিঠিতে স্পষ্টভাবেই বাংলার সুলতানদের নিকট থেকে ফেরদৌসি সূফীরা পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়াস চালাচ্ছেন বলে বোঝা যাচ্ছে। ফেরদৌসি-চিশতি দ্বন্দ্বের জন্য দেখুন Digby, *Sufi Shaikh as a Source*, 65-67.

৪৯. Balkhi, *Muktubat*, letter 163, p. 495. See also Askari, *Maktub and Malfuz Literature*, 20.

৫০. Balkhi, *Maktubat*, letter 165, See also Askari, *Maktub and Malfuz Literature*, ২২, আশকারির অনুবাদ।

দৃষ্টিতে শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক সংকটই ছিল না। তৈমুরের সাম্প্রতিক দিল্লী লুণ্ঠনের (১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ ৮০১ হিজরি) কথা উল্লেখ করে, যার পরিণতিতে একদা-শক্তিশালী তোগলক সাম্রাজ্যের পতন সূচিত হয়। তিনি লিখেন, '৮ম শতক শেষ হয়েছে, পুনর্জাগরণ অত্যাসন্ন হওয়ার চিহ্ন ক্রমবর্ধমান হারে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। দিল্লীর মতো বিস্তৃত ও প্রাচুর্যপূর্ণ, আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত সুবিধা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা থাকা সত্ত্বেও তা বিধ্বস্ত (লণ্ডভণ্ড) হয়েছে। কাফেররা এখন মাঠ দখল করতে যাচ্ছে, অন্যান্য দেশের অবস্থাও ভাল নয়। এখন সেই সময় এবং এটাই সেই সুযোগ।[৫১] ধর্মগ্রন্থের প্রতি স্থির দৃষ্টি রেখে, মুজাফফর সেই বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে, জাগতিক ধ্বংস ও হাশরের দিনের মধ্যে স্পষ্টত বোধগম্য যোগসূত্র স্থাপন করলেন। শুধুমাত্র পৌত্তলিকতা দূর করে মুসলমানরা নিশ্চিত আসমানি গজব থেকে রেহাই পেতে পারে। যেহেতু মূলত মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটিতে অমুসলমানদের দমনের মাধ্যমে সুলতান পৌত্তলিকতা দূর করার ক্ষমতা রাখেন, তাই দরবেশ এ প্রক্রিয়ায় আল্লাহ্‌র ইচ্ছা সংক্রান্ত তাঁর উপলব্ধি বাস্তবায়নে সুলতানকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম দেখতে পেলেন।

এই চিশতি তরিকার দরবেশরাই ১৫শ শতকের প্রথমদিকে বাংলায় একটি মুসলিম প্রাধান্য বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান মুখপাত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। যদি বলা হয়, ইলিয়াস শাহি রাজবংশের সৌভাগ্য নির্মাণের মাধ্যমে শেখ আলাউল হক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন, তবে তাঁর পুত্র ও উত্তরসুরি নূর কুতুবউল আলম (মৃত্যু ১৪৫৯) ইলিয়াস শাহি বংশের চরম দুর্ভাগ্যের কালে তথা ইলিয়াস শাহি রাজমুকুট উৎখাত করে রাজা গণেশের প্রাধান্য বিস্তারের সময়ে বাংলায় চিশতি তরিকার নেতৃত্বে ছিলেন।[৫২]

৫১ Balkhi, *Maktubat*, letter 165, pp 502. See also Askari, *Maktub and Malfuz Literature*, ২১, আশকারির অনুবাদ।

৫২. *মিরাত আল-আসরার* (folss 603b) বর্ণনা অনুযায়ী শেখ নূর কুতুব-ই আলমের মৃত্যুর প্রচলিত সময় হচ্ছে ৮১৮ হিজরী (১৪১৫-১৬)। কিন্তু একই গ্রন্থের আরেকটি বক্তব্যের সাথে তা সাংঘর্ষিক, তাতে বলা হয়েছে শেখ ১৪৩২-৩৩ সালে ক্ষমতাসীন সুলতান আহমদের আধ্যাত্মিক শিক্ষক ছিলেন (প্রাগুক্ত, fols. 517b)। অধিকন্তু পাণ্ডুয়ায় শেখ নূর কুতুব-ই আলমের পাকশালায় একটি খোদাইলিপিতে বলা হয়, "আমাদের শ্রদ্ধেয় অভিভাবক, ইমামদের শিক্ষক, জামায়াতের প্রমাণ, বিশ্বাসের সূর্য, ইসলাম ও মুসলমানের বিশ্বাসের সাক্ষ্য, যিনি দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অগ্রাধিকার দেন, দরবেশদের পথনির্দেশনা দেন এবং একইভাবে নির্দেশনা কামনা করেন।" খোদাইলিপিতে অজ্ঞাতনামা দরবেশ মহোদয়ের, স্পষ্টতই তিনি নূর কুতুব-ই আলম, মৃত্যুর তারিখ দেওয়া হয় ২৮ জিলহজ্জ, ৮৬৩ বা ১৩৪৯ খৃস্টাব্দ (দেখুন Dani, "House of Raja Ganesh," 139-40). দরবেশ মহোদয়ের প্রাপ্ত লেখা এই সময়ে বাংলার রাজধানীতে চিশতি চিন্তাধারা ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ স্মারক। তাঁর মরমি সাধনার টিকে থাকা একটি কর্ম হলো *মুনিস আল-ফুকারা* (Asiatic Society of Bengal, Calcutta, Persian MS. No 466). এ ছাড়া আমাদের কাছে আছে তাঁর পত্রাবলী *মুকতুবাত ই শেখ নূর কুতুব-ই আলম* (Indian National Archives, New Delhi, Persian

সূফী সূত্রের ভাষ্যানুযায়ী রাজা গণেশ এমনকি চিশতি দরবেশদের নির্যাতন-নিষ্পেষণ করেন, নূর কুতুব উল আলমের আপন ছেলে শেখ আনোয়ারকে সোনারগাঁয়ে হত্যা করেন এবং আরেক চিশতি দরবেশ হোসাইন ধুখারপাশের ছেলেকে হত্যার চক্রান্ত করেন।[৫৩] এমতাবস্থায়, যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, দরবেশ মহোদয় উদ্বিগ্ন হয়ে জৈনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কিকে বাংলা আক্রমণ এবং রাজা গণেশের 'বিপদ' দূর করার আহ্বান জানান। নিম্নে বর্ণিত অংশে দেখা যায়, বাংলায় চিশতি দরবেশগণ ইলিয়াস শাহি রাজবংশের রাজনৈতিক সৌভাগ্যের সাথে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে এক করে চিহ্নিত করেছেন। সূফী দরবেশ লিখেন, 'তিন শত বছরের সময়কালের পর বাংলার ইসলামী ভূখণ্ড নশ্বর ভূমি, সাত বেহেশতের শেষের রাজ্য- পৌত্তলিকতার অন্ধকারে পুরোপুরি নিমজ্জিত ও পরিচালিত হচ্ছে এবং অবিশ্বাসীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে।' দরবেশ এখানে সূফী ও কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি তুলে ধরেছেন:

> ইসলাম ধর্ম ও সত্যিকারের পাথেয়'র প্রদীপ
> যা (আগে) তার আলোতে প্রতিটি কোণ আলোকিত করতো,
> রাজা গণেশের অবিশ্বাসের ঝড়ো হাওয়ায় তা নিভে গেছে।
> বিজয়ের খবরের হিংসেয় জ্বলে পুড়ে
> (শ্রদ্ধেয় ধর্মপ্রচারক আবুল হোসেন নূরীর) প্রদ্বীপ এবং
> শেখ হোসেনের বাতি
> তরবারির শক্তি ও ক্ষমতার কাছে সব কিছুই নিভে গেছে।
> মানুষ কার কাছে প্রদ্বীপ ও বাতি চাইবে
> যার প্রকৃতি পৌরুষবর্জিত (কর্পূরের মতো উবে যাওয়া)?
> যখন ঈমান আর ইসলামের ভূমি এমন করুণ দশায় পৌছেছে
> তখন আপনি কেন সুখে সিংহাসনে বসে আছেন?
> উঠুন, আসুন আর ধর্মকে রক্ষা করুন,
> এই দায়িত্ব এখন আপনার উপর
> হে রাজা, আপনার ক্ষমতা ও সামর্থ্য প্রদর্শন করুন।[৫৪]

MS., or. Persian MS. No. 332, and Maulana Azad Library, Aligarh Muslim University, Aligarh, Subhan Allah No. 297671/18).

৫৩. Abd al-Rahman Chisty, *Mirat al-Asrar,* fol. 517a. See also Askari, "New Light" 37; Abdul Karim, "Nur Qutb Alam's Letter on the Ascendancy of Ganesa," in *Abdul Karim Sahitya-Visarad Commemoration Volume,* ed. Muhammad Enamul Haq (Dacca: Asiatic Society of Bangladesh, 1972), 336-37.

৫৪. Quoted by Shaikh Ashraf Jahangir Simnani in his *Maktubat-i Ashrafi,* letter no. 45, fol. 139a.

সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্য প্রকাশ্যে আহবান জানালেও নূর কুতুব-ই-আলম ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রবাসী পুত্রকে লেখা এক পত্রে বাংলার ইতিহাসে রাজা গণেশের আবির্ভাবের ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিক্ষুব্ধ দরবেশের কাছে মনে হয়েছে, কুরআন যাদেরকে আসমানি আনুকূল্য ও রক্ষাকবচের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আল্লাহ সেসব লোকের কাকুতি মিনতির প্রতি কর্ণপাত করেননি। তিনি লিখেন, 'অবিশ্বাসীরা প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং ইসলামের রাজ্য নস্যাৎ হয়ে গেছে----- খোদার আনুগত্যকারীদের কোরবানি কিংবা বন্দেগি কোনটাই তাদের কাছে উপকারী হিসেবে প্রমাণিত হয়নি কিংবা মূর্তিপূজার প্রতি অবিশ্বাসও তাদের পদক্ষেপ রোধ করতে পারেনি। ইবাদত এবং কোরবানি পরম পবিত্র সৃষ্টিকর্তার কোন কল্যাণ করতে পারেনি কিংবা মূর্তিপূজা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারেনি। হায়, হায়, কী বেদনাদায়ক! তাঁর একটা ইঙ্গিতে এবং খেয়ালে অনেক আত্মা শেষ করে দিতে পারেন, অনেক জীবন ধ্বংস করতে পারেন এবং অনেক কষ্টদায়ক কান্নার অবসান ঘটাতে পারেন। হায়, আমার কাছে কী দুঃখজনক! ইসলামের সূর্য আড়াল হয়ে গেছে আর ধর্মের চাঁদ ম্লান হয়ে পড়েছে।[৫৫]

কিন্তু দরবেশ যেমন আশংকা করেছিলেন, বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য তত করুণ হয়নি। রাজা গণেশের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মেয়াদ প্রশমিত হওয়ার পর তারই ধর্মান্তরিত পুত্র চিশতি তরিকার পৃষ্ঠপোষকতা পুনরায় শুরু করেন এবং নূর-ই-কুতুব-আলমের পিতা এবং ইলিয়াস শাহি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার মধ্যকার চিশতি-রাজদরবারের মৈত্রী পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান জালালউদ্দিন এবং তাঁর পুত্র ও উত্তরসুরি আহমদ (শাসনকাল ১৪৩২-৩৩) উভয়ই নূর কুতুব-ই-আলমের মুরীদ হন এবং ১৫৩২ সাল পর্যন্ত তাঁদের পরবর্তী আরও ১২ জন শাসক শেখ আলাউল হকের বংশধরদের মুরীদ

---

৫৫. Shaikh Nur Qutb Alam, *Maktubat-i Shaikh Nur Qutb Alam* (Maulana Azad Library. Aligarh Muslim University, Aligarh, Subhan Allah No. 287671/18), letter no. 9, p 60. See also Abdul Karim, "Nur Qutb Alam's Letter," 342-43. করিমের অনুবাদ। মোজাফফর শামস বলখির চিঠিপত্রের মতো এসব বিবৃতির ফলে ধারণা করা যায়, বাংলায় ইসলামী ধর্মকর্ম নিয়ে যে যথাযথ উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছিল, তার কারণেই পাণ্ডুয়ার সূফী-দরবেশগণ এধরনের বক্তব্য প্রদান এবং কর্মপন্থা গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তা যদুনাথ সরকারের বর্ণিত নিজস্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকীর্ণ স্বার্থের কারণে নয়। "শেখ ও মুসলমান সন্ন্যাসীদের বেয়াদব ও উচ্চাভিলাষী অনুসারী, যাদের সম্পদ ও ক্ষমতা শেষদিকে বেসামরিক ক্ষমতায় ছায়াপাত করতে শুরু করেছিল," হিসেবে বর্ণনা করে যদুনাথ সরকার এসব ব্যক্তিকে বৃদ্ধ ও দুর্বল শাসকদের নিজেদের শিকারে পরিণতকারী পরজীবী জাতীয় কীট হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং তাদের অবস্থানকে "সম্রাট অশোকের বার্ধক্যজনিত বুদ্ধিনাশের কারণে তাঁর সকল রাষ্ট্রীয় সম্পদ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দান করার সাথে তুলনা করেন।" Sarkar, ed. *History of Bengal*, 2: 126, 127.

ছিলেন।[৫৬] পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে শেখ নূর কুতুব-ই-আলমের মাযারটি কার্যত রাষ্ট্রীয় দরগায় পরিণত হয় এবং সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (শাসনকাল ১৪৯৩-১৫১৯) প্রতিবছর মাযারটি যিয়ারত করতেন।[৫৭]

বাংলার সূফী দরবেশ এবং শাসকদের মধ্যে পারস্পরিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং এমনকি নির্ভরতা থাকলেও তাঁদের মধ্যে ভেতরে ভেতরে দ্বন্দ্বও লক্ষ্য করা যায়। মাঝে মাঝে তাঁদের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য রূপও নিত এবং 'দ্বিন ও দুনিয়া' অর্থাৎ 'ধর্ম ও জগৎ' এই দুইয়ের মধ্যকার ইসলামের চরম পার্থক্যরূপে সংঘাতটি আত্মপ্রকাশ করতো। জাগতিক বিষয়সমূহ থেকে নিজেদের সরিয়ে, দারিদ্র্যপূর্ণ জীবন যাপন করে, আত্ম-অস্বীকৃতি এবং খোদার ধ্যানে মগ্ন সূফী দরবেশদের সন্ন্যাস জীবনের তত্ত্বকে শাসক-প্রশাসকগণ নাটকীয়ভাবে বিরোধিতা করতেন তাঁদের সম্পদ ও জাগতিক বিষয়সমূহ জাঁকজমকভাবে প্রদর্শনের মাধ্যমে। সূফীগণ 'পার্থিব' লোকদের সংস্পর্শ প্রত্যাখ্যান করে সব ধরনের আনুগত্যের ঊর্ধ্বে থাকতেন। বিপরীতক্রমে, শাসকগণ অনেক সময় তাঁদের মিত্র দরবেশগণকে সন্দেহ করতেন, তাঁরা এমনও আশংকা করতেন, এ ধরনের জনপ্রিয় ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা হয়তো জনতাকে দাঙ্গা এমনকি বিদ্রোহ করতে উসকিয়ে দিবেন।[৫৮]

এখানে আমরা ১৩৬৩ সালে সুলতান সিকান্দার ইলিয়াস শাহের একটি শিলালিপির কথা বিবেচনা করতে পারি। এতে সুলতান মাওলানা আতা নামক এক দরবেশের মাযারের জন্য নির্মিত গম্বুজ উৎসর্গের কথা বলা হয়েছে। দরবেশ মহোদয় সুলতানের সমসাময়িক হলেও শিলালিপিটি তৈরির সময় সম্ভবত মাওলানা আতা পূর্বেকার পূত-পবিত্র ব্যক্তি হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন এবং তাঁর মাযারটি সে সময়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল।[৫৯] শিলালিপিতে লেখা রয়েছে:

---

৫৭. Nizamuddin Ahmad, *Tabaqat-i Akbari*, text, 3: 270; trans. B. De. 3 Pt. 1, 443.

৫৮. বিষয়টি আলোচনার জন্য দেখুন, Digby, "The Sufi Shaikh as a Source of Authority," esp. 63-69.

৫৯. দরগাটি প্রাচীন মুসলমান সেনাছাউনি নগরী দেবীকোটে অবস্থিত, সিকান্দারের রাজধানী পাণ্ডুয়া থেকে প্রায় ৩৩ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে যা বর্তমান পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত। খোদাইলিপিটির ভাষা দেখে বোঝা যায়, সিকান্দার দৃশ্যত শুধুমাত্র গম্বুজটি নির্মাণের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, দরগাটির নয়, এর মাধ্যমে অনেক আগে ইন্তেকালকারী দরবেশের প্রতি সম্মান দেখানোর ধর্মমতের অস্তিত্বও অনুমান করা যায়। দরগাটির দেয়ালে আরো তিনটি খোদাইলিপি বসানো হয়েছিল, এগুলোর একটিতে ১২৯৭ সালের, সুলতান রোকনউদ্দিন কায়কাউসের মসজিদটি নির্মাণের বছরের উল্লেখ করা হয়েছে। ১৪৯৩ সালের তারিখ দেওয়া অপরটিতে বলা হয়েছে, "মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে প্রখ্যাত দরবেশ, সাধুপুরুষদের প্রধান, মাখদুম মাওলানা 'আতার সময়ে, আল্লাহ তাঁর ছাইভস্মকে সুগন্ধি করুন এবং তিনি তাঁর বিশ্রামের স্থানকে বেহেশত বানিয়ে দিন।"

'এই গম্বুজে, যা আতা প্রতিষ্ঠা করেছেন, উভয় দুনিয়ায় তা পুণ্যস্থান হিসেবে বিরাজ করুক। কিয়ামতের দিন পর্যন্ত ফেরেশতাগণ এর স্থায়িত্বের জন্য দোয়া করতে থাকুক: "আমরা তোমার উপর সাতটি দৃঢ় আকাশ তৈরি করেছি।" (কুরআন ৭৮ : ১২)

সাতটি আশ্চর্য দহলিজের (নির্মাতার) করুণায়: যিনি সাতটি মজবুত আকাশ, একটির উপর আরেকটি, তৈরি করেছেন (কুরআন ৬৭ : ৩), তাঁর নাম গৌরবান্বিত হোক; এই সুউচ্চ গম্বুজের নির্মাণ শেষ হয়েছে। (বস্তুত এটা) জ্যোতির ছাদের খিলানের একটি নমুনা। "এবং আমরা সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সুসজ্জিত করেছি (কুরআন ৬৭ : ৫)। সূফী-দরবেশদের নেতা, অনুসন্ধিৎসুদের মধ্যে অদ্বিতীয়, সত্য, শরিয়ত ও ঈমানের চেরাগ, মাওলানা আতার মহান আল্লাহ উভয় দুনিয়ায় তাঁর প্রতি কৃপা বর্ষণ করুন। পবিত্র মাযারের উপর (এই সুউচ্চ গম্বুজটি) নির্মাণ করা হয়েছে যুগ ও কালের প্রভু, ন্যায়বিচার ও চরম হিতাকাঙ্ক্ষী, শহরসমূহের রক্ষক, জনগণের নেতা, ন্যায়বিচারক, জ্ঞানী ও মহান সম্রাট, দুনিয়ায় আল্লাহ্র ছায়া, পরম করুণাময়ের দয়ায় ধন্য আবুল মুজাহিদ সিকান্দার শাহ, ইলিয়াস শাহের পুত্র, সুলতানের নির্দেশে, আল্লাহ তাঁর রাজত্ব চিরস্থায়ী করুক। বিশ্বের সুলতান সিকান্দার শাহ, যাঁর নামে দোয়ার মুক্তা দিয়ে মালা গাঁথা হয়, তাঁর প্রসঙ্গে তাঁরা বলে, 'আল্লাহ তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দিন,' এবং তাঁর সম্পর্কে তারা দোয়া করে, আল্লাহ তাঁর রাজত্ব চিরস্থায়ী করো।'[৬০]

বাহ্যিকভাবে সুলতান সিকান্দার মাওলানা আতার মহত্ত্ব প্রকাশ করলেও তিনি খোদার সাথে নিজের ঘনিষ্ঠতা দেখিয়েছেন এই বলে যে, তিনি তাঁদের একজন যাঁর নাম 'দোয়ার মুক্তা দিয়ে মালা গাঁথা হয়', এবং 'দুনিয়াতে খোদার ছায়া।' অধিকন্তু মাযারটিকে বেহেশতের অনুলিপি (নক্সা) হিসেবে উল্লেখ করে সুলতান খোদার সৃষ্টিশীল কর্মের সাথে নিজের তৎপরতার সমান্তরাল অবস্থার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যদি সাত বেহেশতকে প্রদীপ (মাসাবিহ) অর্থাৎ তারকামণ্ডলী দিয়ে সজ্জিত করাটা খোদার সৃষ্টিশীল কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়, তবে সুলতান সিকান্দারের পৃথিবীতে সত্য, শরিয়া ও ঈমানের বাতি (সিরাজ) অর্থাৎ মাওলানা আতার কবরকে সজ্জিত করাটা একই ধরনের সৃষ্টি। প্রচ্ছন্নভাবে এই ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে, সুলতান সিকান্দারের উদারতা না থাকলে মাওলানা আতা অস্পষ্টতার চাদরে মোড়া থেকে যেতেন।

শেষোক্ত খোদাইলিপিটি যদি ১২৯৭ সালের মসজিদটির কথাই বলেই থাকে-এবং তা পুরোপুরি নিশ্চিত নয়-তবে মাওলানা 'আতা সুলতান সিকান্দারের সিংহাসনে আরোহণের ষাট বছর আগে জীবিত ছিলেন বলে ধরা যায়। Shamsud-Din Ahmed, ed. and trans., *Inscriptions*, 4: 15-18, 143-44.

৬০. প্রাগুক্ত, ৩৪-৩৫।

সূফী-দরবেশদের প্রতি রাজকীয় অবিশ্বাস এবং অসন্তুষ্টি, এমনকি চিশতি তরিকার উপরও, অন্যভাবেও দেখা যায়। শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ একটি নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠার সময় প্রখ্যাত একজন চিশতি তরিকার দরবেশকে পৃষ্ঠপোষকতা করলেও তাঁর পুত্র ও উত্তরসুরি সুলতান সিকান্দার তাঁর পিতার পীর সাহেবের মুরীদদের সন্দেহের চোখে দেখতেন। তিনি বিশেষ করে তাঁর পিতার পীর সাহেবের মুরিদদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান শেখ আলাউল হককে বেশ সন্দেহ করতেন, সিকান্দারের আমলে উক্ত মাযার কমপ্লেক্সটি অর্থনৈতিক লেনদেনের একটি প্রধান সংযোগস্থল হিসেবে গড়ে ওঠেছিল। ধর্মীয় দান সামগ্রীর আয় থেকে নগরীর দরিদ্র জনতাকে প্রচুর দান-খয়রাত করে দেওয়া হতো।[৬১] নগরবাসীদের প্রতি দরবেশের ব্যাপক খরচে সতর্ক হয়ে সিকান্দার শাহ বলেন, 'আমার খাজাঞ্চিখানা আপনার পিতার হাতে (অর্থাৎ রাজকীয় খাজাঞ্চিখানা); (যদিও) তিনি যত খুশি ব্যয় করেছেন, আপনি তা দিয়ে যাচ্ছেন।' কার্যত দরবেশের সম্পদ ও প্রভাবে ঈর্ষান্বিত হয়ে সুলতান তাঁকে সোনারগাঁওয়ে নির্বাসন দেন।[৬২]

অর্থাৎ বাংলার সূফী-দরবেশ এবং সুলতানদের মধ্যকার সম্পর্ক পারস্পরিক মৈত্রী এবং বিতৃষ্ণার অবশ্যম্ভাবী বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। সাধারণভবে যখন তাঁরা রাজনৈতিকভাবে নিজেদের প্রথমে প্রতিষ্ঠা করতেন, এবং বিশেষভাবে যখন তাঁরা নতুন রাজবংশের সূচনা করতেন, তখন শাসকরা ক্ষমতাবান সূফী-দরবেশদের নিকট থেকে সক্রিয় সাহায্য কামনা করতেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজের বাংলায় প্রথম স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটের (১২১৩) প্রাথমিক বর্ণনায় রয়েছে, আফগানিস্তানের দুই সাধারণ দরবেশের দয়া বা বারাকা। তারপর ১৩৪২ সালে মুসলিম বাংলার দীর্ঘতম রাজবংশ প্রতিষ্ঠাকালে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ মর্যাদাসম্পন্ন চিশতি তরিকার প্রসিদ্ধ অনুসারীর দোয়া লাভ করেছিলেন। সাধারণ মানুষ মহিমান্বিত দরবেশদেরকে

---

৬১. অধিকন্তু এই পুরো অঞ্চল এবং বাইরে থেকেও মুরীদরা শিক্ষা গ্রহণের জন্য শেখ আলাউল হকের খানকায় আসতেন, যাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রখ্যাত ছিলেন আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানি। মধ্য এশিয়ার এই অভিবাসীর চিঠিপত্রগুলো এই সময়ের দরবেশদের জীবনীগ্রন্থরাজির সবচেয়ে বড় উপাদান। যদিও তাঁর *মাকতুবাত-ই আশরাফি* কখনো প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু তবুও হাতে লেখা অনুলিপি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে এবং বৃটিশ লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়।

৬২. Abd al-Rahman Chisty, *Mirat al-asrar,* fol. 515b-516a. আলাউল হকের নির্বাসন মাত্র কয়েক বছর স্থায়ী হয়েছিল, তারপর তাঁকে রাজধানীতে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হয়, সেখানে তিনি সুলতানের ইন্তেকালের নয় বছর পর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতার সাথে মাওলানা আশরাফউদ্দিন তাওয়ামার তুলনা করা যায়। বুখারা থেকে চতুর্দশ শতকের প্রথমদিকে দিল্লীতে অভিবাসন করা এই আলেম ও সূফী নগরীর জনসাধারণের মধ্যে নিজের ব্যাপক সংখ্যক মুরীদ সৃষ্টির পর দিল্লীর রাজদরবার তাঁকে সোনারগাঁয়ে নির্বাসন দেন। দেখুন Shaih Shuaib Firdausi, Comp., *Manaqib al-asfiya* (Calcutta: Nur- al-Af aq), 131.

ব্যাপক আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবান হিসেবে চিহ্নিত করতো, কিংবা বিশ্বাস করতো ক্ষমতায় তাঁদের সাময়িক অবস্থান এ ধরনের শক্তিধর মানুষের কোন-না-কোন অবদান, নতুন মুসলিম শাসকরা তাঁদের আনুকূল্য চাইতেন, তাঁদের জন্য খানকা বা মাযার নির্মাণ করে দিতেন অথবা আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের কবর যিয়ারত করতেন। বিপরীতক্রমে, অনেক দরবেশ তাঁদের উপলব্ধি অনুযায়ী সত্য ধর্ম (দীন) পৃথিবীতে (দুনিয়া) কায়েমের জন্য সংস্কার আন্দোলনে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা কামনা করতেন।

অন্যদিকে, একবার যদি কোন রাজবংশ ক্ষমতায় নিরাপদে বহাল হয়ে যেতে পারতেন, তবে অনেক সুলতানই আর মহিমান্বিত দরবেশদের কাছে তাঁদের স্বীকৃতি চাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন না। বাস্তবিকই, অনেক সময় ক্ষমতাবান দরবেশদের সম্পদ ও প্রভাব রাজকীয় কর্তৃত্বের প্রতি সম্ভাব্য হুমকি হিসেবে দেখা হতো। সিকান্দার ইলিয়াস শাহ বিতৃষ্ণভাবে একজন দরবেশকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, তাঁর মাযারে দরবেশের চেয়ে নিজের প্রশংসাই করেছেন বেশি। আর যখন দেখেছেন, তাঁর ক্ষমতার প্রতি হুমকি হয়ে যেতে পারে, তখনি সে সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত দরবেশকে রাজধানী থেকে নির্বাসিত করেছেন। পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে নূর কুতুব-ই-আলমের ইন্তেকালের পর সূফীবাদের রোমাঞ্চকর বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার স্থলে রাজনৈতিক নির্বিরোধী মাযার-সংস্কৃতি ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই কেবল আবার রাষ্ট্র চিশতি তরিকাকে সর্বান্তকরণে নিজের মৈত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

৪ অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি

এসব লোকের (বাঙালি) সব শান্তি ও সমৃদ্ধির কৃতিত্ব তাদের নিজেদেরই, এ সবকিছুর উৎস হচ্ছে কৃষির প্রতি তাদের আন্তরিকতা, আগে যে জমিটি ছিল বনভূমি, অবিরাম কঠোর পরিশ্রম করে তারা তা উদ্ধার করেছে এবং চাষ করেছে ও গাছ লাগিয়েছে।

--ওয়াং তা ইউয়ান (১৩৪৯)

সালতানাতের রাজনৈতিক অর্থনীতি

ইন্দো-ভারতীয় শাসন কায়েমের ফলে বাংলার ভৌত ও সামাজিক দৃশ্যপটে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে, সফরকারি চীনা বণিক ওয়াং তা ইউয়ান উল্লেখ করেন, কৃষিজ সীমান্তকে বদ্বীপের পশ্চাদভূমিতে ঠেলে দিয়ে সাবেক বনভূমিকে উর্বরা ধানি জমিতে (দেখুন উপরের অধ্যায়ের সূচনাংশ) পরিণত করা হয়।[১] মুসলিম শাসনামলেই বাংলার অর্থনীতিতে প্রথমবারের মতো পুরোপুরি মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। এখন এটা সত্যি যে, চন্দ্র রাজবংশের (আনুমানিক ৮২৫-১০৩৫) রাজাদের মুদ্রিত রৌপ্য মুদ্রা ছিল এবং নবম কিংবা দশম শতাব্দী থেকে বদ্বীপটির অন্তত দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল বৃহত্তর ভারত মহাসাগরীয় অর্থনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল।[২] কিন্তু পাল কিংবা সেন আমলে

---

১. Rockhill, "Notes on the Relations," 436. দেশটির ভূমি রাজস্ব দাবির পরিমাণটি নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। ওয়াং তা-ইউয়ানের "দ্বীপের বর্বরদের বর্ণনা" উদ্ধৃতি দিয়ে রকহিল জানান, সরকার মোট উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশ শুল্ক হিসেবে দাবি করে। অবশ্য, এর মাত্র চার বছর পর ইবনে বতুতা লিখেন, সিলেট জেলার হবিগঞ্জে সরকার হিন্দু চাষীদের নিকট থেকে উৎপাদনের অর্ধেক দাবি করে। উভয় পর্যবেক্ষণই সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে, হতে পারে ইবনে বতুতার উল্লিখিত উচ্চহারটি *(জমা)* ছিল সরকারের দাবি, এবং অন্যদিকে চীনা পর্যটকের উল্লিখিত নিম্নহারটি ছিল প্রকৃত রাজস্ব আদায় *(হাসিল)*। যে কোন ঘটনার ক্ষেত্রেই এটা বিবেচনা করা ভুল হবে যে, বাংলার মুসলমান শাসকরা অতিরিক্ত কর আদায়ের নীতির মাধ্যমে কৃষকদের বনাঞ্চলীয় পশ্চাদভূমিতে ঠেলে দেবে, কারণ আবাদযোগ্য ভূমি পরিত্যাগ মানেই দেশের প্রধান সম্পদের উৎস থেকেই বঞ্চিত হওয়া। বরং প্রমাণ পাওয়া যায়, রাষ্ট্র অনেক বেশি সহিষ্ণু ছিল, এবং সাবেক বনজ ভূমিতে কৃষকদের পরিমিত ও নিয়ন্ত্রিত চলাচলে উৎসাহিত করতো। দেখুন Rockhill, "Notes on the Relations," 435; Ibn Batuta, *Rehla* 241.

২. বাংলা বদ্বীপের কোথাও রৌপ্যখনি ছিল না। তুর্কী বিজয়ের কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই ইয়াংজি, মেকং, সালবিন ও ইরাবতি নদীর প্রায় সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বার্মা-ইউনান অঞ্চল থেকে রূপা আমদানি

বদ্বীপটির প্রধান অংশে ধাতব মুদ্রা চালু থাকার কথা একেবারেই জানা নেই। পক্ষান্তরে, ত্রয়োদশ শতক থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত মুসলিম শাসকদের রৌপ্যমুদ্রা 'তংকা' সমগ্র অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে চালু ছিল।

প্রকৃতপক্ষে, স্থানীয় বিজয়ের ধারাবাহিকতা এবং অর্থ সরবরাহের ব্যাপকতায় ধারণা করা হয়, অমুদ্রিত রৌপ্যের অনুসন্ধানে ইন্দো-তুর্কী শাসকরা বাংলার পশ্চাদভূমিতে, অন্তত অংশবিশেষে হলেও, অভিযান চালিয়েছে। বাংলার দক্ষিণ, পূর্ব বা উত্তর সীমান্তে প্রতিটি নতুন বিজয়ের পরপরই বিজয়ী শাসকরা তাদের রৌপ্য মুদ্রা তংকার প্রচলন সম্প্রসারণ করেছেন, যা এসেছে পরাজিত হিন্দু রাজার সঞ্চিত রৌপ্যভাণ্ডার থেকে। ১২৯১ সালে সুলতান রোকনউদ্দিন কায়কাউসের উত্তর-পূর্ব বাংলা বিজয়ের ফলে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্যপিণ্ড তাঁর দখলে আসে আর শীঘ্রই তা মুদ্রায় পরিণত হয়। সুলতান ফখরউদ্দিন মোবারক শাহের (শাসনকাল ১৩৩৮-৪৯) সোনারগাঁও অঞ্চল বিজয়ের ফলেও রূপার সরবরাহের বৃদ্ধি ঘটে। ১৩৫৮ সালে সুলতান সিকান্দারের কামরূপ বা উত্তরবঙ্গ জয়ের ফলেও একই ঘটনা ঘটে।[৩] চতুর্দশ শতকের শেষভাগে মুদ্রিত রূপার সরবরাহ থমকে গেলেও এক ব্যর্থ বিদ্রোহের পর, ১৪২০ সালে সুলতান জালালউদ্দিন মুহাম্মদের পূর্ববঙ্গ পুনর্জয়ের ফলে রৌপ্যমুদ্রার পরিমাণ আবার বেড়ে যায়। ১৪৯৫ সালে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের উত্তরবঙ্গের কামরূপ পুনর্দখলের পরেও একই ঘটনা ঘটে।[৪] অধিকৃত রাজ্যের লুণ্ঠিত সামগ্রী থেকে রৌপ্যমুদ্রা ছাড়াও রফতানির জন্য স্থানীয়ভাবে তৈরি পণ্যের বিনিময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ আমদানি করা হতো। ১৪১৫ সালের মতো সময়কালেও আমরা দেখি, চীনা বাণিজ্য মিশনগুলো বদ্বীপটিতে সার্টিন সিল্ক ও পোরসিলিন ছাড়াও স্বর্ণ ও রৌপ্য নিয়ে আসছে।[৫] এক দশক পরে আরেকজন চীনা পর্যটক উল্লেখ করেন, বাংলার দূরপাল্লার বণিকরা তংকার মাধ্যমে লেনদেন করছেন।[৬] পরবর্তী শতকেও এই ধরনটি বলবৎ ছিল। ১৫৬৯ সালে ভেনেশীয় পর্যটক সিজার ফেডেরিসি লিখেন, 'রৌপ্য ও স্বর্ণ তারা পেগু (বার্মা) থেকে বাঙলায় আনতো, অন্য কোন পণ্য নয়।'[৭]

করা হতো। সেখান থেকে স্থল ও আরাকান উপকূল ও উচ্চ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নদীপথে বদ্বীপে নিয়ে আসা হতো। John Deyell. "The China Connection: Problems of Silver Supply in Medieval Bengal," in *Precious Metals in the Later Medieval and Early Modern Worlds*, ed. J.F. Richards (Durham, N.C: Carolina Academic Press, 1983), 207-24.

৩. প্রাগুক্ত, ২১৪-১৫

৪. দেখুন, প্রাগুক্ত, চার্ট ২, ২২৭।

৫. Rockhill, "Notes on the Relations," 444.

৬. প্রাগুক্ত, ৪৩৭।

৭. Cesare Federici, "Extracts of Master Caesar Frederike his Eighteene Yeers Indian observations," in *Hakluytus Posthumus, or Purchas his Pilgrimes*, by Samuel Purchas (1625; Glasgow: James Mac Lehose & Sons. 1905), 10: 136.

বাংলার অর্থনীতি মুদ্রায়ন এবং ভারত মহাসাগরীয় বাজারের সাথে একীভূত হওয়ায় অঞ্চলটির রফতানিমুখী খাতটি বেগবান হয়ে ওঠে। দশম শতাব্দীতে মুসলিম অগ্রাভিযানের সূচনালগ্নেই স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর মধ্যে বস্ত্রখাতটি প্রসিদ্ধ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলিম বিজয়ের পরে বস্ত্র সামগ্রীর উৎপাদনে ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে মার্কো পলো বাংলার সুতার বাণিজ্যিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন[৮] এবং ১৩৪৫ সালে ইবনে বতুতা এখানকার সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্রের প্রশংসা করেন।[৯] ১৪১৫ থেকে ১৪৩২ সাল পর্যন্ত চীনা কুটনীতিকরা বাংলার সূক্ষ সুতি বস্ত্র (মসলিন), গালিচা, বিভিন্ন বর্ণের নিকাব, মিহি পর্দা (ফারসি, শানা-বাফ), পাগড়ির সামগ্রী, নক্সা করা সিল্ক এবং বুটিদার টাফেটা (পাতলা, চকচকে কাপড় বিশেষ) উৎপাদনের কথা লিখেছেন।[১০] এক শতাব্দী পর, ১৫০৩ থেকে ১৫০৮ সাল পর্যন্ত গৌড়ে অবস্থানকারী লুদোভিকো ডি ভার্থেমা লিখেন, 'এখানে প্রতিবছর ৫০টি জাহাজে সুতি ও সিল্ক সামগ্রী বোঝাই করা হয়।---- এসব সামগ্রী তুরস্ক, সিরিয়া, ইরান, আরব উপদ্বীপ, ইথিওপিয়া ও সমগ্র ভারতে চালান দেওয়া হয়।[১১] কয়েক বছর পরে টম পিরেস ভারত মহাসাগরের পূর্বপাড়ের বন্দরগুলোতে বাঙলার বস্ত্র সামগ্রীর রফতানির কথা উল্লেখ করেছেন।[১২] স্পষ্টত, বাংলা এশিয়ার বাণিজ্য ও উৎপাদনের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

আশরাফ ও আতরাফ সমাজ

ত্রয়োদশ শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত বাংলায় মুসলিম সমাজ ছিল পুরোপুরি শহুরে, সালতানাতের পর্যায়ক্রমিক রাজধানী নগরীসমূহ—১২০৪ সাল থেকে লক্ষ্ণৌতি,

---

৮. The Book of Marco Polo, trans., and ed. Yule and Cordier, 2: 115.

৯. Ibn Battuta, *Rehla 235*.

১০. Rockhill, "Notes on the Relations," 439-40, 443-44.

১১. Ludovico di Varthema, *The Travels of Ludovico di Varthema—A.D. 1503-1508*, trans. John W. Jones (Hakluyt Society Publications, 1st Ser., no. 32, 1863; reprint, New York: Burt Franklin, n.d.) 212.

১২. টম পিরেস (Tome Pires) লিখেছেন, "বছরে একবার এবং কোন কোন সময়ে দুবার একটি জাঙ্ক (সমতল পাটাতন বিশিষ্ট চীনা নৌকা) বাংলা থেকে মালাক্কা যায়। প্রতিটি আশি থেকে নব্বই ক্রুজাডো মূল্যমানের সামগ্রী বহন করে। সেগুলো মসৃণ সাদা কাপড়, সাত ধরনের সিনাবাফো, তিন ধরনের চৌটারেস, বিয়াটিলহা, বেইরামেস ও অন্যান্য চালজাত সামগ্রী বহন করে। তারা বিশ ধরনের মতো সামগ্রী বহন করে। তারা ইস্পাত, অত্যন্ত সুন্দর পর্দার মতো সকল রঙের টুকরা কাপড়ের উন্নতমানের বিছানার চাঁদোয়া বহন করে---। এসব লোক প্রতিবছর মালাক্কা বা পাসেতে চার বা পাঁচটি জাহাজ নিয়ে যায় এবং এখনো তা ব্যাপকভাবে করা হয়। মালাক্কায় বাংলার কাপড়ের উচ্চমূল্য হয়ে থাকে, কারণ প্রাচ্যের সর্বত্র এর বাণিজ্য হয়।" Pires, *Suma Oriental*, 1: 92. ষোড়শ শতকে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য দেখুন Sanjay Subrahmanyam, "Notes on the Sixteenth-Century Bengal Trade," *Indian Economy and Social History Review* 24, no. 3 (1987): 265-89.

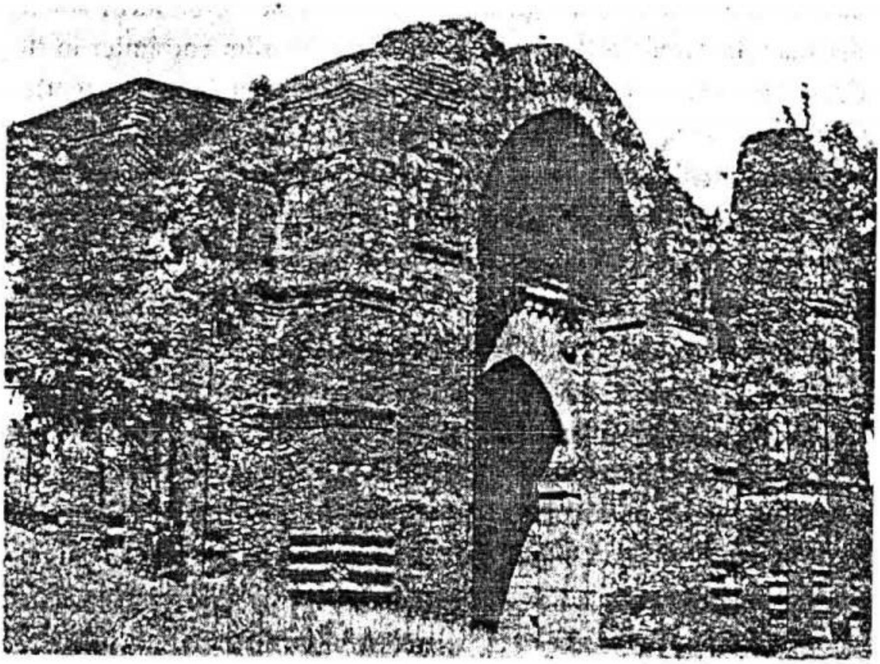

চিত্র ১৪। দাখিল দরজা (আনুমানিক ১৪৩৩-৫৯), গৌড়ের নগরদুর্গের অভ্যন্তর থেকে দেখা।

প্রায় ১৩৪২ সাল থেকে পাণ্ডুয়া, প্রায় ১৪৩২ সাল থেকে গৌড় এবং প্রাদেশিক শহর সাতগাঁও, সোনারগাঁও ও চট্টগ্রামে কেন্দ্রীভূত ছিল তাদের বসতি। যদিও অভ্যন্তরভাগে নিয়মিতভাবে নতুন নতুন সেনাছাউনি শহর গড়ে উঠতো, মুদ্রা ও পদক এবং লিখিত প্রমাণে যা দেখা যায় (দেখুন মানচিত্র ২), তবুও যেখানেই তাদের ভূমি বরাদ্দ করা হোক না কেন, আঞ্চলিক আভিজাত্যের কারণে রাজধানী নগরীগুলোতে বসবাস অব্যাহত রাখাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হতো।[১৩] বিশেষভাবে গৌড় ছিল সকল দিক থেকেই জাঁকজমকপূর্ণ নগরী (দেখুন চিত্র ১৪ ও ১৫)। ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে ৪০ হাজার জন অধ্যুষিত নগরীটি অবলোকন করে লুদোভিকো ডি ভার্থেমা[১৪] বলেন, 'এখন পর্যন্ত আমার দেখা নগরীগুলোর মধ্যে অন্যতম'।[১৫] ১৫২১ সালে উক্ত পর্তুগীজ

১৩. অধিকন্তু, এসব অভিজাত ব্যক্তির কারো মৃত্যু হলে তার অর্ধেক সম্পদ সুলতানের কাছে ফিরে যেত। এর ফলেও সুলতানের হাতে এবং সেই সূত্রে রাজধানীতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত থাকতো। *Voyage dans les deltas du Gange*, 326.

১৪. Varthema, *The Travels of Ludovico di Varthema*, 211.

১৫. Pires, *Suma Oriental*, বিপরীতক্রমে সেই সময়ে আধুনিক কলকাতার উত্তরে অবস্থিত প্রধান সমুদ্রবন্দর সাতগাঁও-এর জনসংখ্যা ছিল দশ হাজার। প্রাগুক্ত, ৯১।

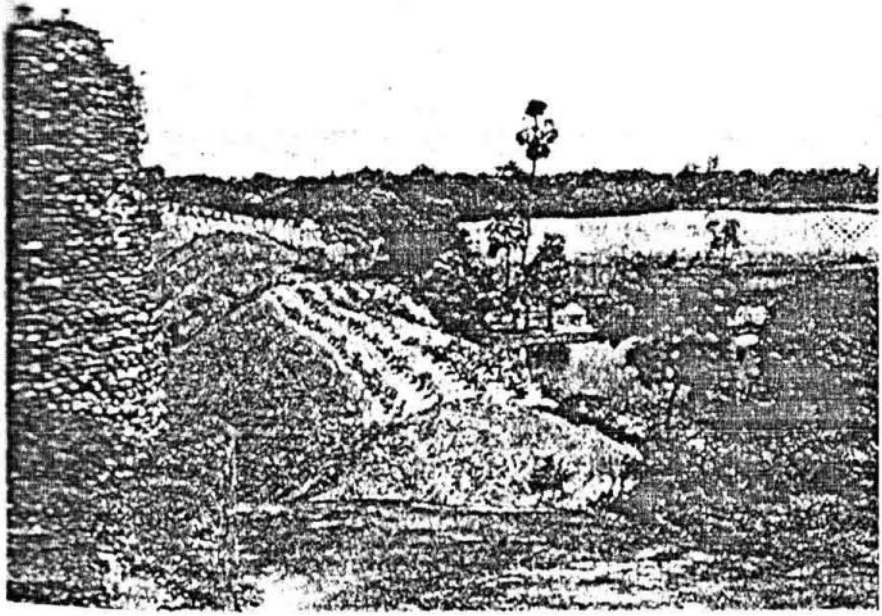

চিত্র ১৫। গৌড় নগরদুর্গের বিধ্বস্ত ধ্বংসাবশেষ, দাখিল দরজা থেকে দেখা।

পর্যটক নগরীটিকে এভাবে বর্ণনা করেছিলেন: খুবই বড়, নদীর পাড়ে চার লিগ বিস্তৃত এবং বলা হয়, অভ্যন্তরভাগে এতো সম্প্রসারিত হচ্ছে যে, ছয় লিগের পরেও ঘরবাড়ি দেখা যায়...। শহরটি বিশাল সমভূমিতে অবস্থিত যা আশেপাশের এলাকার মতো সমান। মহাসড়ক ও সড়কগুলোতে লিসবন নিউ স্ট্রিটের মতো ইট বিছানো। সর্বত্রই বাজার রয়েছে এবং সেখানে খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী সবই প্রচুর পরিমাণে এবং খুবই সস্তায় পাওয়া যায়। মহাসড়ক ও মোড়গুলো লোকজনে এতো পরিপূর্ণ থাকতো যে, গণ্যমান্য ব্যক্তিরা রাস্তা দিয়ে প্রাসাদে যাওয়ার সময় প্রহরিরা বাঁশ হাতে মানুষদের সরিয়ে তাদের জন্য পথ করে দিত।[১৬]

সালতানাতের রাজধানীতে বসবাসকারী দূরপাল্লার বণিকদের সম্পদে বিদেশীরা বেশ অভিভূত হয়ে যেত। ১৪১৫ সালে একজন চীনা দূত লিখেন, পাণ্ডুয়ায় মানুষরা 'সাদা সুতির পাগড়ি এবং লম্বা সাদা সুতির জামা পরে। তারা তাদের পায়ে পরে স্বর্ণের সুতায় বোনা ভেড়ার চামড়ায় তৈরি জুতা। অপেক্ষাকৃত কেতাদুরস্তরা তাতে নকশা করাকে সঠিক কাজ মনে করতো। তাদের প্রত্যেকেই ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল, যার মূলধন হতে পারে ১০ হাজার স্বর্ণখণ্ড।'[১৭] ১৫০৮ সালের দিকে ভার্থেমা গৌড়ে 'আমার দেখা সবচেয়ে ধনী সওদাগরদের' দেখতে পান।[১৮] ১০ বছর পর, দুয়ার্তে

১৬. *Voyage dans les deltas du Gange*, 323.
১৭. Rockhill, "Notes on the Relations," 442-43.
১৮. Varthema, *Travels of Ludovico di Varthema*, 212.

বারবোসাও ধনী আরব, ইরানি, আবিসিনিয়া ও গৌড়ের ভারতীয়দের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেন:

সম্মানিত মুসলমানরা গোড়ালি পর্যন্ত নামানো অত্যন্ত সূক্ষ্ম সুতি বস্ত্রের আলখেল্লা পরতো, তার নীচে কাপড়ের কোমরবন্ধ, মাথায় সিল্কের টুপি, মর্যাদা অনুযায়ী কোমরে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত খাপে ছোরা রাখতো।... তারা ছিল বিলাসী; ভাল খেত, অকৃপণভাবে ব্যয় করতো এবং তাদের কেউ কেউ হয়তো অপচয়কারীও ছিল। তাদের বাড়িতে থাকা বিশাল বিশাল চৌবাচ্চায় তারা গোসল করতো। সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকে তিন/চারটি করে স্ত্রী রাখতো।[১৯]

উপরে বর্ণিত সম্ভ্রান্ত ও ব্যবসায়ী ব্যক্তিবর্গ ছিলেন মুসলমান অভিজাত তথা আশরাফ শ্রেণীভুক্ত, তাদের মধ্যে শহুরে দরবেশ, ধর্মীয় কর্মকর্তা (আলেম-উলামা), এবং বিদেশী বংশোদ্ভূত সৈনিক ও প্রশাসকরাও ছিলেন। বাস্তবিকই, বিদেশী উৎস তা যদি এমনকি কারো পূর্বপুরুষও হয়ে থাকে, আশরাফ পরিচয়ের ক্ষেত্রে সংজ্ঞায়িত না হলেও, গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে থাকে। ১৪৯৫ সালের দিকে কবি বিপ্রদাস সাতগাঁও -এর মোল্লা-মৌলভি ও কাজিদের (বিচারক) 'সৈয়দ', 'মোগল' ও 'পাঠান', হিসেবে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ– তাঁরা আরব, মধ্যএশিয়া বা আফগান বংশোদ্ভূত হিসেবে দাবি করেছেন।[২০] প্রায় একশত বছর পর দক্ষিণ-পশ্চিম বদ্বীপের স্থানীয় কবি মুকুন্দরামও (আনুমানিক ১৫৯০) বিপ্রদাসের মতো শহুরে মুসলমানদেরকে বাংলার পশ্চিম দিক থেকে আগত মানুষ হিসেবে অভিহিত করেছেন।[২১] ধর্মীয় অনুভূতিও আশরাফ মুসলমানদের পশ্চিম দিক থেকে আগত হিসেবে দেখতে আগ্রহী ছিল। ১৫০৫ সালে সোনারগাঁও-এ একটি মসজিদের পৃষ্ঠপোষক গর্বভরে নিজের পরিচয় উল্লেখ করেছেন। তিনি মক্কা ও মদিনা যিয়ারত, মহানবী (সা)-এর দুই পদচিহ্ন সফর করেছেন।[২২] একইভাবে ১৫৬৭ সালে পূর্ব মালদহের জামে

১৯. Duarte Barbosa, *The Book of Duarte Barbosa*, trans. M.L. Dames (1921; reprint, Nendoln/Liechtenstein: Kraus Reprint, 1967), 2: 135-39, 147-48.

২০. Cited in Abdul Karim, *Social History of the Muslims of Bengal* (down to A. D 1538) Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1959), 153-54.

২১. *মুকুন্দরাম, কবিকঙ্কন চণ্ডি*, সম্পাদনা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী (কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪), ৩৪৩-৪৪। একজন সমাজবিজ্ঞানীর মন্তব্য ছিল, "আভিজাত্য নির্ধারিত হতো সময়ের হিসেবে কত কাছাকাছি সময়ে অভিবাসন ঘটেছে এবং বাংলা ও আরবের মাঝামাঝিতে পশ্চিমের কত দূরত্ব থেকে হয়েছে তার মাধ্যমে।" Abdul Majed Khan,: "Research about Muslim Aristocracy in East Pakistan," in P. Bessaignet, ed., *Social Research in East Pakistan* 2d ed., (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1964), 22.

২২. Shamsud-Din Ahmed, ed., and trans., *Inscriptions of Bengal*, 4 : 170-71.

মসজিদের শিলালিপিতে এই পবিত্র ইবাদতগাহকে দ্বিতীয় কাবা (ছানি কাবা) হিসেবে অভিহিত করে তাকে মক্কার পবিত্র স্থানের সাথে তুলনা করেছেন।[২৩] বাংলা ও আরবে অবস্থিত ইসলামের পবিত্র স্থানগুলোর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টিকারী দীর্ঘ ও বিপদসংকুল সমুদ্র যাত্রাজনিত সমস্যা থেকে ইবাদতকারীদের প্রশমিত করার জন্য এসব উক্তি কাজে আসতো।

আশরাফদের মধ্যে খ্যাতিমান ছিলেন বিচারক বা কাজিগণ, তাঁরা মুসলমানদের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসায় ইসলামী আইনে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। তাদের নীচে ছিল মোল্লা-মৌলভিদের স্থান, তাঁরা ছিলেন সর্বত্রগামী সাধারণ ধর্মপ্রচারক এবং মুসলিম সমাজে ন্যূনতম শিক্ষিত সদস্য। ১৫২৯ সালে সাতগাঁও-এর একটি জামে মসজিদে উৎকীর্ণ লিপিতে আশরাফ শ্রেণীভুক্ত এ দুই সদস্যের মধ্যকার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছে:

মোল্লা-মৌলভি এবং ভূ-স্বামীরা (আরবাব) যদি সরকারি সম্পদ আত্মসাৎ করে, তবে তারা খোদার গজবে পতিত হবে। তাই গভর্নর এবং কাজিদের জন্য এটা বাধ্যতামূলক এবং প্রয়োজন যে, হাশরের দিন যাতে তারা আজাবে পতিত না হয়, সেজন্য এ ধরনের জালিয়াতি বন্ধ করা।[২৪]

এতে বোঝা যায়, সরকারকে নির্ধারিত সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার মোল্লাদের জালিয়াতি বন্ধে রাজদরবার কাজি এবং গভর্নরদের উপর নির্ভরশীল ছিল। মুসলমান, অমুসলমান নির্বিশেষে সবার কাছে কাজিরা ছিলেন সবচেয়ে দৃশ্যমান রাজকীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি, কারণ তাঁরা সাধারণভাবে আইনশৃংখলা রক্ষার দায়িত্বেও নিযুক্ত থাকতেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া শহরে একটি হিন্দু সম্প্রদায় তাঁদের আধ্যাত্মিক সংগীতের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছিল, তখন স্থানীয় মুসলমানরা শহরের কাজির কাছে নালিশ করেছিল। কাজি যদিও সেই বিশেষ বিশৃঙ্খলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, তবে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছিলেন, ভবিষ্যতে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার মাধ্যমে বিশৃঙ্খলাকারীদের শাস্তি দেওয়া হবে।[২৫]

সামাজিকভাবে আশরাফ সমাজ-বহির্ভূতরা ছিল শহুরে কারিগর সম্প্রদায়, যারা বাংলার ক্রমবর্ধমান শিল্প-শ্রমিক হিসেবে গড়ে উঠেছিল। নির্দিষ্ট পেশার সাথে সম্পৃক্ত পৃথক অন্তর্বিবাহ সম্প্রদায় (জাত-জাতি) হিসেবে তারা চিহ্নিত হতো, যা ছিল বদ্বীপের

২৩. প্রাগুক্ত, ২৫৯।

২৪. প্রাগুক্ত, ২২৫। অনুবাদ।

২৫. কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, *শ্রী চৈতন্য-চরিতামৃত*, সম্পাদনা ও অনুবাদ A.C. Bhaktivedanta Swami (New York: Bhaktivedanta Book Trust, 1974), ch. 17 text, 123-128; 3 : 323-26.

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় হিন্দু সমাজের সংগঠনের সমান্তরাল, যা উক্ত সমাজ থেকে তাদের উদ্ভবের কথা প্রকাশ করে। মুকুন্দরাম তার সময়ে একটি আদর্শ বঙ্গীয় শহরে বসবাসকারী ১৫টি মুসলিম জাতের কথা উল্লেখ করেছেন; তাঁতী (জোলা), গাড়িয়াল (মুকেরি), পিঠা বিক্রেতা (পিঠারি), মৎস্য ব্যবসায়ী (কাবেরি), স্থানীয় জনগণ থেকে ধর্মান্তরিত (গরসাল), তাঁত প্রস্তুতকারী (শনকার), খৎনাকারী (হাজম), ধনুক প্রস্তুতকারী (তিরাকার), কাগজ প্রস্তুতকারী (কাগজি), মুসাফির দরবেশ (কলনূর), টেলর (দরজি), মোটা দড়ি প্রস্তুতকারী (বেনাতা), রংকারক (রংরেজ), উচ্ছিষ্ট ব্যবহারকারী (হালান), গোশত বিক্রেতা (কসাই)।[২৬] ষোড়শ শতকের শেষভাগে মুকুন্দরাম যখন লিখছিলেন, তখন এসব সম্প্রদায় বাঙালি সমাজের সাথে এতো গভীরভাবে মিশে গিয়েছিল, হিন্দুজাতির এক দীর্ঘ তালিকার পাশাপাশি মুসলিম শ্রমিক সম্প্রদায়ের এক পরিপূরক তালিকা ছাড়া কোন শহরের কথা কল্পনা করা ছিল অসম্ভব।[২৭]

অধিকন্তু এসব সম্প্রদায়ই বাঙালি মুসলমানদের সর্বপ্রথম পরিচিত শ্রেণীটি গঠন করেছিল। তাদের পাঁচটি–জেলা, শনকার, দরজি, বেনাতা ও রংরেজ–পুরোপুরি ক্রমবর্ধমান বস্ত্রশিল্পের সাথে সম্পর্কিত এবং সম্ভবত এ পেশায় আগে থেকে জড়িত বিদ্যমান হিন্দু জাত থেকে নিয়োগ করা হয়েছিল কিংবা আগে কৃষিকাজ বা অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে ছিল, এমন শ্রমিকরা শ্রম চাহিদায় সাড়া দিয়ে সম্প্রসারমান শিল্পটিতে যোগ দিয়েছিল।[২৮] সম্ভবত সরকারি চাহিদার কারণে বিদ্যমান মুসলমান কারিগরদের পাশাপাশি অন্যান্য সম্প্রদায়কে আনা হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তিরাকাররা (ধনুক প্রস্তুতকারক) রাজ্যের সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্রের যোগান দিত, অন্যদিকে কাগজিরা আমলাদের ফাইল প্রস্তুত এবং আলেম-উলামাদের পুস্তক তৈরির সরঞ্জামের আঞ্জাম দিত। বস্তুত মুকুন্দরামের তালিকায় থাকা মুসলিম জাতগুলোর প্রায় অর্ধেকই পারসো-আরবি নামধারী, এতে মনে করা যেতে পারে, তুর্কী বিজয়ের পরই কেবল তাদের আবির্ভাব ঘটেছে।[২৯]

২৬. মুকুন্দরাম, *কবিকঙ্কন চণ্ডি*, ৩৪৫-৪৬।

২৭. কবির বর্ণিত বাংলার আদর্শ "গুজরাট" নগরীর মুসলমান ও হিন্দু সমাজের ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করেছেন, Edward C. Dimock, jr., and Ronald B. Inden, "The City in Pre-British Bengal," in Edward C. Dimock, jr., *The Sound of Silent Guns and Other Essays* (Delhi: Oxford University Press, 1989), 121-25.

২৮. ১৫১৮ সালে দুয়ার্তে বারবোসা যখন রাজধানী নগরী গৌড়ের ধর্মান্তরিত মুসলমানের উপস্থিতির কথা লিখছিলেন, তখন তাঁর সম্ভবত এসব গ্রুপের কথা মনে ছিল। দেখুন *The Book of Duarte Barbosa*, 2: 148.

২৯. এসব গ্রুপের মধ্যে ছিল *হাজম* (আরবি শব্দ *হাজ্জাম* থেকে), *তিরাকার* (পারসি *তিরগার* থেকে), *কাগজি* (আরবি-পারসি *কাঘজি* থেকে), *কালান্দার* (পারসি *কলান্দার* থেকে), *দরজি* (পারসি *দরজি* থেকে), *রংরেজ* (পারসি *রংরিজ* থেকে) এবং *কসাই* (আরবি *কস্যাব* থেকে)।

হিন্দু সমাজ বিজয়ের প্রতিক্রিয়ায়

ইন্দো-তুর্কী শাসনের আত্মপ্রকাশের অর্থ হয়েছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পুরোহিত হিসেবে সেন সরকারের সেবাদানকারী ব্রাহ্মণ, জ্যোতির্বিদ, মন্ত্রী, উপদেষ্টা বা অর্থ কর্মকর্তাদের প্রতি বিদ্যমান সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার আকস্মিক অবসান। সন্দেহ নেই যে, তাদের অনেকেই ১২০৪ সালে বা এর পরপরই সেন রাজন্যবর্গের সাথে তাদের পূর্বাঞ্চলীয় পশ্চাদভূমিতে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় অধিকাংশ ব্রাহ্মণই নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি তাদের প্রাথমিক ঘৃণা বা তাচ্ছিল্যকর অবস্থান থেকে সরে গিয়ে এক ধরনের অস্বস্তিকর সহাবস্থানে মানিয়ে নিয়েছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে প্রচলিত মত ছিল, ম্লেচ্ছদের' (দূষিত বহিরাগত) সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক না থাকলে সরকারি চাকুরি ক্লেদমুক্তভাবেই করা সম্ভব।[৩০] এদিকে ব্রাহ্মণ এবং সালতানাতের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের পারস্পরিক অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল; প্রথমোক্তদের ঐতিহাসিকভাবেই পৃষ্ঠপোষক এবং জীবিকার জন্য শাসকশ্রেণীকে প্রয়োজন ছিল, অন্যদিকে শাসন কাজ পরিচালনার জন্য যে প্রশাসনিক প্রতিভার প্রয়োজন, ঐতিহাসিকভাবেই ব্রাহ্মণদের তাতে একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছিল, তাই শেষোক্তদের তাদের দরকার ছিল। এ কারণে ১৪১৫ সালের আগে সালতানাতে কর্মরত ব্রাহ্মণদের সংখ্যা হাতে গোণা কয়েকজন থাকলেও রাজা গণেশের অভ্যুদয়ের পর দৃশ্যপটের নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। সেই গোষ্ঠীপতির আপন ধর্মান্তরিত পুত্র সুলতান জালালউদ্দিন মুহাম্মদ ব্রাহ্মণ কবিদের সম্মানিত করার মাধ্যমে পরিবর্তনের ইঙ্গিত ঘোষণা করেন। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে অনেক ব্রাহ্মণ রাজদরবারে চাকুরি গ্রহণ করেছিলেন।

সালতানাতে চাকুরি করা কায়স্থদের জন্য অপেক্ষাকৃত কম কষ্টকর ছিল, তুর্কী বিজয়ের আগে তারা ছিল প্রভাবশালী ভূস্বামী শ্রেণী এবং মুসলিম শাসনের অধীনে তারা তাদের ভূমিকা অব্যাহত রাখে।[৩১] বস্তুত বিজয়ের পর কায়স্থরা বাংলার পুরানো রাজবংশগুলোর সেন, পাল, বর্মণ এবং আরও অনেক- অবশিষ্টাংশ আত্মভূত করে নেয় এবং অঞ্চলটির ক্ষত্রিয় বা 'যোদ্ধা' শ্রেণীর প্রতিভূ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৩২] মাওলানা মোজাফফর শামস বলখির পত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যায়, যিনি ১৩৯৭ সালে হিন্দুদের ক্ষমতা ভোগের ব্যাপারে তিক্ত অভিযোগ করেছিলেন। মুসলিম

৩০. Ronald B. Inden, *Marriage and Rank in Bengali Culture: A History of Caste and Class in Middle-Period Bengal* (Berkely and Los Angeles: University of California Press, 1976), 75-76.

৩১. ১৫৯৫ সালের দিকে আবুল ফজল লিখেন যে, বাংলার জমিদারদের অধিকাংশই কায়স্থ এবং পাল রাজবংশ এবং এমনকি তারও আগে তারা বাংলার শাসক শ্রেণীর সদস্য ছিল। আবুল ফজল আল্লামি, *আইন-ই আকবরি* (লক্ষ্ণৌ সম্পাদিত) ২: ৮২, ১১৩; অনুবাদ, ২: ১৪১, ১৫৮-৫৯।

৩২. N.K. Dutt, *Origin and Growth of Caste in India* (Calcutta: Firma K.L.M., 1965), 2: 58-63, 97.

শাসকরা একেবারে প্রথম পর্যায় থেকেই কায়স্থদের ভূস্বামী এবং রাজনৈতিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তাদের প্রাচীন ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। বাংলার হিন্দু সমাজের দিকে সার্বিকভাবে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে বর্ণপ্রথা– প্রাচ্যবিদদের দীর্ঘদিনের ধারণা অনুযায়ী তা ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন ও অপরিবর্তিত না থেকে, ১২০০-১৫০০ সময়কালে আধুনিকরূপে কিছুটা পুনর্গঠিত হয়। এই প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল, রোনাল্ড আইডেন যেভাবে দেখিয়েছেন, হিন্দু রাজত্বের অবসান। তুর্কী বিজয়ের পূর্বে সেন রাজা সম্পদ বন্টন এবং তাঁর দরবার ও তাঁর ধর্মাচারগতভাবে সামাজিকভাবে উঁচু ও নীচু ভেদাভেদের মাধ্যমে তা রক্ষা করতেন। তুর্কী বিজয়ের প্রেক্ষাপটে হিন্দু রাজত্বের অবসানের ফলে দরবারের প্রথাগুলো বিশাল হিন্দু সামাজিক ব্যবস্থার উপর চেপে বসে, এসব প্রথা বর্ণ পরিষদের বিধিবদ্ধভাবে জাতভিত্তিক অন্তর্বিবাহ এবং পণ্ডিতদের নির্ধারিত বংশতালিকা সংরক্ষণের মাধ্যমে তা হতে থাকে।[৩৩] পশ্চিমাঞ্চলীয় বদ্বীপে এসব প্রক্রিয়ার ফলাফল কবি মুকুন্দরাম উল্লিখিত হিন্দু সম্প্রদায়গুলোর বিস্তারিত তালিকা থেকে সহজেই বোঝা যায়, তিনি পেশাগতভাবে বিভাজিত অন্তর্বিবাহ বর্ণের (জাত) ৪টি ধাপের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম ধাপে ছিল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য বা সনাতন চিকিৎসকগণ। দ্বিতীয় ধাপে ছিল উৎপাদক শ্রেণী যথা চাষী, রাখাল, কামার, কুমার, তাঁতী, মালী, ক্ষৌরকার, মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী (ময়রা), মসলা ব্যবসায়ী, তাম্রকার, স্বর্ণব্যবসায়ী ইত্যাদি। এরপর তৃতীয় ধাপে ছিল ধর্মাচারগতভাবে আরো নীচু জাত: জেলে, কুলু, কাঠুরে, ধোপা, দরজি, গুড় প্রস্তুতকারক, কাঠমিস্ত্রি, ফেরিওয়ালা ও ভিক্ষুক। তালিকার সর্বনিম্ন স্থানে অবস্থানকারীরা কবির কাল্পনিক শহরের বাইরে অবস্থান করতো, তারা ছিল ঘাস কর্তনকারী, চর্মকার, পতিতা এবং ঝাড়ুদার ও মৃতদেহ পরিষ্কারের কাজে নিয়োজিত ডোম সম্প্রদায়।[৩৪]

হিন্দু ধর্ম : শিব-শাক্ত জটিলতা

ভারতের অন্যান্য স্থানের মতো বাংলায়ও পুরুষ দেবতাদের প্রাধান্যপূর্ণ বৈদিক ধর্মকে নারী দেবীতে প্রাধান্য বিশিষ্ট স্থানীয় ধর্মবিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়েছিল। এর একটি ছিল প্রচলিত শৈব ধর্মবিশ্বাসের সামঞ্জস্য বিধান, তুর্কী বিজয়ের আগে প্রথাটিতে ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্যে তা হতো এবং প্রথমদিককার সেন আমলে, যাদের কাছে শিব ছিলেন অতিলৌকিক জগতের মহাপ্রভু, রাজারা উদারভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতো। শিব ও শক্তির অতিলৌকিক পুনর্মিলন-অর্থাৎ পুরুষ নীতিনিষ্ঠতার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিশুদ্ধ সচেতনতা এবং নারী নীতিনিষ্ঠতার সাথে সম্পর্কিত নির্ভেজাল কর্মশক্তির সমন্বয়-ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়ন্ত্রিত মন্দিরে বিশেষভাবে

৩৩. Ronald B. Inden, *Marriage and Rank, 71-77; Imagining India* (Cambridge, Mass: Basil Blackwell, 1990), 49-84.
৩৪. মুকুন্দরাম, *কবিকঙ্কন চণ্ডি*, ৩৫৫-৬১।

ঠাঁই পায়। অবশ্য ইন্দো-তুর্কী বিজয়ের পর সরকারি ধর্মমতটির উপর থেকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অবসান ঘটে, যার উপর এটি পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল।

বিজয়ের আগে এবং পরে দেবীর অকুণ্ঠ মহিমাগাঁথা সম্বলিত অসংখ্য জনপ্রিয় লোকজ ধর্মবিশ্বাস বিকশিত হয়েছিল। মঙ্গল-কাব্য নামে সাহিত্যের একটি শাখায় সম্মান প্রদর্শন করা এসব ধর্মবিশ্বাস ইন্দো-আর্য সংস্কৃতিকে ন্যূনতম স্পর্শকারী এবং ব্রাহ্মণদের প্রচারিত ক্রমতান্ত্রিক ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাথে সর্বাপেক্ষা কম সম্পৃক্তদের মাঝেই বেশি বিকশিত হয়েছিল। বদ্বীপে এসবই ছিল প্রাচীনতম, সবচেয়ে প্রাণবন্ত এবং সর্বাপেক্ষা নির্ভুল বাঙালি ধর্মীয় ঐতিহ্যসমূহের অন্যতম। দেবী পূজার আদিমতম ধরনটি ছিল নারীদের প্রাচীন ঘরোয়া ধর্মাচার, তাতে ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্য করতে হতো না, সর্পদেবী মনসার পূজায় যা দেখা যায়, এই মূল গল্প মহিলারাই আবৃত্তি করেছে এবং ঘরোয়া অর্চনা হিসেবে মহিলাদের কাছেই তার স্বীকৃতি।[৩৫] কিন্তু ১২০০-১৬০০ এই সময়কাল জুড়ে এবং নিঃসন্দেহে তারও কিছু সময় আগে, ব্রাহ্মণ আদর্শ লোকজ ধর্মবিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ব্রাহ্মণ্য দেবতা শিবের প্রতিপক্ষ অতিলৌকিক, নারী শক্তিকে, তার সকল প্রকাশকেই দেবী শক্তি, বা নির্ভেজাল ক্ষমতা, হিসেবেই চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেয়। তাই শিবকে বোঝানো হতো ধর্মের পুত্র; চণ্ডি/দুর্গা, কালী/গঙ্গা ও শীতলার স্বামী; মনসা ও নেতোর পিতা; অসংখ্য নাথ সন্ন্যাসীর গুরু/পিতা; দক্ষিণ রায়ের প্রভু/পিতা; এবং স্বস্তির শ্বশুর। এই সম্পর্ককে লক্ষ্য করে ডব্লিউ. এল. স্মিথ সঙ্গত কারণেই বলেছেন, শিবকে 'কেন্দ্র করেই বাঙালি অতিলৌকিক দেবদেবীদের মূল্যায়ন হয়েছে।'[৩৬] তবে এসব লোকজ দেবীদের ব্রাহ্মণ্যবাদী গোঁড়ামিতে খাপ খাওয়ানোর জন্য অনেক বিপত্তির মুখে পড়তে হয়েছিল, ব্রাহ্মণ পৃষ্ঠপোষকতার পূর্ণ আশীর্বাদ নিয়ে হিন্দু দেবমণ্ডলে পুরোপুরি জায়গা না হয়ে বরং শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের দ্বিধাগ্রস্ত গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল।

সর্পদেবী মনসাকে নিয়ে সৃষ্ট পৌরাণিক কাহিনী ও ধর্মাচারের উৎস ৫০০-১০০০ সালের দিকে হলেও অন্তত ১০০০ সালে তা ব্যাপকতা লাভ করে এবং তুর্কী বিজয়ের সময়ে, যদি আগে নাও হয়ে থাকে, সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।[৩৭] যদিও এই ধর্মমতটি বর্ধমানের নিম্নশ্রেণীর উপজাতীয়দের মধ্যেই প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেছিল, ব্রাহ্মণিক সাহিত্যে তা পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা পায়নি এবং গোঁড়া শৈবরা একে কিছুটা প্রতিরোধও করেছিল। শিবের সাথে মনসা সন্তোষজনক সম্পর্কও গড়তে পারেনি। অন্যান্য লোকজ দেবীর মতো, তারও মহাদেবের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল তার ক্ষেত্রে এক কন্যা হিসেবে কিন্তু সে শিবের স্ত্রী হিসেবে চিহ্নিত অন্যান্য দেবী, বিশেষ করে তার

৩৫. William L. Smith, *The One-eyed Goddess: A Study of the Manasa-Mangal*, Oriental Studies, No. 12 (Stockholm: Almquist & Wiksell, 1980), 134.
৩৬. Ibid., 51
৩৭. Ibid., 132-33.

প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, চণ্ডি দেবীর সাথে কখনো তুলনীয় হয়নি। পৌরাণিক কাহিনীটির মূল প্রতিপাদ্য হলো এই ধর্মবিশ্বাসটির পূর্ণ স্বীকৃতি লাভের সংগ্রাম। জেলে ও গোয়ালার মতো নীচু জাতের মধ্যে অনুসারী পাওয়ার পর মনসা উপলব্ধি করলো, শিবের একান্ত অনুগত ও উচ্চবর্ণের সওদাগর চাঁদের বশ্যতা আদায় করতে না পারলে সে সার্বজনীন পূজা পাবে না। যদিও চাঁদ প্রথমদিকে মনসাকে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেন এবং তাকে নিম্নতর মর্যাদাসম্পন্ন হিসেবে দেখে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত (যদিও অনিচ্ছাকৃতভাবে) মনসার জনপ্রিয়তাকে স্বীকৃতি দেয় এবং তার ধর্মমতের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে।[৩৮] অর্থাৎ গল্পটিতে ধর্মমতটির সামাজিক মর্যাদা ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হওয়ার কথা হচ্ছে: গোয়ালা থেকে জেলে, তাদের কৃষক, তাদের থেকে উঁচু বর্ণের মহিলা, সেখান থেকে উঁচু বর্ণের পুরুষ এবং শেষে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা অনুসারী হচ্ছে।[৩৯]

মনসার ধর্মমতটি যদি আমাদের সময়ে উঁচু বর্ণের বাঙালিদের মধ্যে সীমিত বা অনিচ্ছাকৃত গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে থাকে, তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ করে বদ্বীপের অপেক্ষাকৃত স্বল্প আর্যকৃত পূর্বদিকে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হয়েছিল। কবি বৃন্দাবন দাস নিজে যদিও মনসা ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু তবুও ১৫৪০ সালে তাঁর লেখনীতে সেটির জনপ্রিয়তা দেখা যায়:

সকল 'ধর্মপ্রাণ' মানুষ শুধুমাত্র এটা জানে:

তারা জাগরণে (দেবী চণ্ডির উৎসবের শেষরাতে) মঙ্গল চণ্ডির গান গায়।

ধূমধামে কেউ কেউ বিষহরিকে (মনসা) পূজা দেয়, অন্যদের মহা আড়ম্বরে পুতুল নাচ প্রদর্শন করে।[৪০] চট্টগ্রাম বিশ্বাবিদ্যালয় জাদুঘরে সংরক্ষিত পাথরের খোদাই মূর্তিতে দেবী মনসার পরিচিতি সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। এগুলোর দুটি কয়েক ফুট উঁচু এবং দেবীর মাথায় ফণা তোলা ৭টি সাপ, তার বাঁ হাতে আরেকটি সাপ ধরা, তার দেবী প্রতিমার মূল প্রতীক, পবিত্র পাত্র, তার পায়ে রাখার বিষয়টি এতে চিত্রিত হয়েছে (চিত্র ১৬ ও ১৭)।[৪১] এ ধরনের নিবেদিত মূর্তি যা স্পষ্টতই তার পূজার জন্য

---

৩৮. ডব্লিউ. এল স্মিথ উল্লেখ করেন, চাঁদের দেবীকে প্রথমে স্বীকৃতি জ্ঞাপনে অস্বীকৃতি এবং পরে তাঁর ধর্মমতটি গ্রহণ করার প্রকৃতির মধ্যে "উচ্চ বর্ণের সীমাবদ্ধতা, অনীহা এবং গ্রহণের উৎসাহের অভাবটি প্রতিফলিত হয়।" Smith. *One-eyed Goddes*, 142.

৩৯. P.K. Maity, *Historical Studies in the Cult of the Goddes Manasa* (Calcutta: Punthi Pustak, 1966), 169-82. T.W. Clark, "Evolution of Hinduism Medieval Bengali Literature: Siva, Candi, Manasa." *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 17, no. 3 (1955): 507-15.

৪০. বৃন্দাবন দাস, *শ্রী-শ্রী চৈতন্য-ভগবত* (৪র্থ সংস্করণ, কলকাতা), ১১। উদ্ধৃতি Smith, *One-eyed Goddes*, স্মিথের অনুবাদ।

৪১. এসব প্রতিমাসাদৃশ চিত্রগুলোকে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমে প্রাপ্ত মনসার খোদাই করা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মূর্তির সাথে তুলনা করা যেতে পারে। দেখুন Jitendra Nath Banerjea, *The Development of Hindu Iconography* (Calcutta: University of Calcutta, 1956), 360.

সাধারণ খড়ের তৈরি মন্দিরে স্থাপনের জন্য নির্মিত, যেখানে সেবায়েত পুরোহিত নিয়োগ, তারা ব্রাহ্মণ নাও হতে পারে, তা মনসা ধর্মমত ঘরোয়া অর্চনা থেকে একটি প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতে পরিণত হওয়ার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে অধিকতর সমর্থনপুষ্ট এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রাক-আধুনিক বাঙালি দেবমণ্ডলীতে যে-কোন ধর্মমতের চেয়ে বেশি সমর্থনপুষ্ট ছিল দেবী চণ্ডির ধর্মমত। প্রতিদ্বন্দ্বী মনসার মতো চণ্ডি ছিল বনের দেবী, যার ধর্মমত বিকশিত হয়েছিল বদ্বীপটির আদিবাসী সমাজে। তবে মহাদেব শিবের স্ত্রী হিসেবে চণ্ডির পরিচিতি তাকে নোংরা ও সুবিধাবাদী মনসার চেয়ে অনেক বেশি নমনীয় ও উদার হিসেবে উপস্থাপন করে।[৪২] অধিকন্তু, চণ্ডির ধর্মমতের সাহিত্য অনেক বেশি প্রাচীন হলেও সুলতানি আমলের শেষদিকেই শুধুমাত্র তার লিখিত রূপ আত্মপ্রকাশ করে, তার সবচেয়ে পরিচিত গ্রন্থ হচ্ছে মুকুন্দরামের চণ্ডিমঙ্গল (আনুমানিক ১৫৯০)।[৪৩] সম্ভবত ধর্মমতগুলোর বিবর্তনের অনেক পরে পৌরাণিক কাহিনীগুলোর লিখিত রূপ আত্মপ্রকাশিত হওয়ায় মুকুন্দরামের সাহিত্যকর্মে চণ্ডি ইন্দো-আর্য দেবমণ্ডলে এবং ব্রাহ্মণিক মূল্যবোধে এতো বেশি আত্মীভূত হয়ে পড়েছিল। উদাহরণ হিসেবে বলো যায়, তাকে চিত্রিত করা হয়েছে, দেবতা ও ব্রাহ্মণদের পৃথিবীতে তাদের নির্দেশনা বলবৎ করার আদিম বিশৃঙ্খল সময়ের অবসানকারী হিসেবে। অধিকন্তু সে শুধুমাত্র বনের প্রাণীদের রক্ষাই করতো না, সেই সাথে তাদের প্রতিফলন হিসেবেই বিবেচনা করা যায়। আর পরিশেষে, ধর্ম বা সঠিক বিধান অনুযায়ী সমাজ পরিচালনার জন্য পারস্পরিক সহিংসতা পরিত্যাগের শর্ত হিসেবে সে জীবজন্তু সংরক্ষণ করেছিল।

পৌরাণিক গল্পটির ধাবাহিকতা অষ্টম শতাব্দী পরবর্তী সময়ে ধর্ম ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্কের হিন্দু ধারণাকেও ফুটিয়ে তোলে। যে জগতে দেবতা ও রাজা উভয়েই তাদের কর্তৃত্বের পরিধি সম্প্রসারণে একান্ত আগ্রহী, কোন দেবতা কোন নিযুক্তি রাজার কাছে জাগতিক সার্বভৌমত্ব 'অর্পণ' করে এই শর্তে যে সে মানবসমাজে সেই দেবতার ধর্মমত প্রচার ও প্রসার করবে। ভারতীয় দেবতাদের অধিকাংশের মতো মানব-পূজার কামনায় ব্যাগ্র চণ্ডি পৃথিবীতে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। বর্ণনায় দেখা যায়, কালকেতু নামের এক নিম্নবর্ণের শিকারিকে দেবী তার বনের রাজ্যের সার্বভৌমত্ব প্রদান করে। এর বিনিময়ে, শিকারি অবশ্যই শিকার পরিত্যাগ

৪২. ব্রাহ্মণ-নিয়ন্ত্রিত হিন্দু দেবমণ্ডলে আরো সহজে স্থান পাওয়া দেবীদের অনেক বেশি কোমল বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হিসেবে দেখানো হয়েছে। দেখুন Lawrence A. Babb. *The Divine Hierarchy: Popular Hinduism in Central India* (New York: Columbia University Press), 221-26.

৪৩. চণ্ডি-মঙ্গলের একটি চমৎকার বিশ্লেষণ দেখা যায় Bhattacharya বিরচিত "La Deesse" গ্রন্থে।

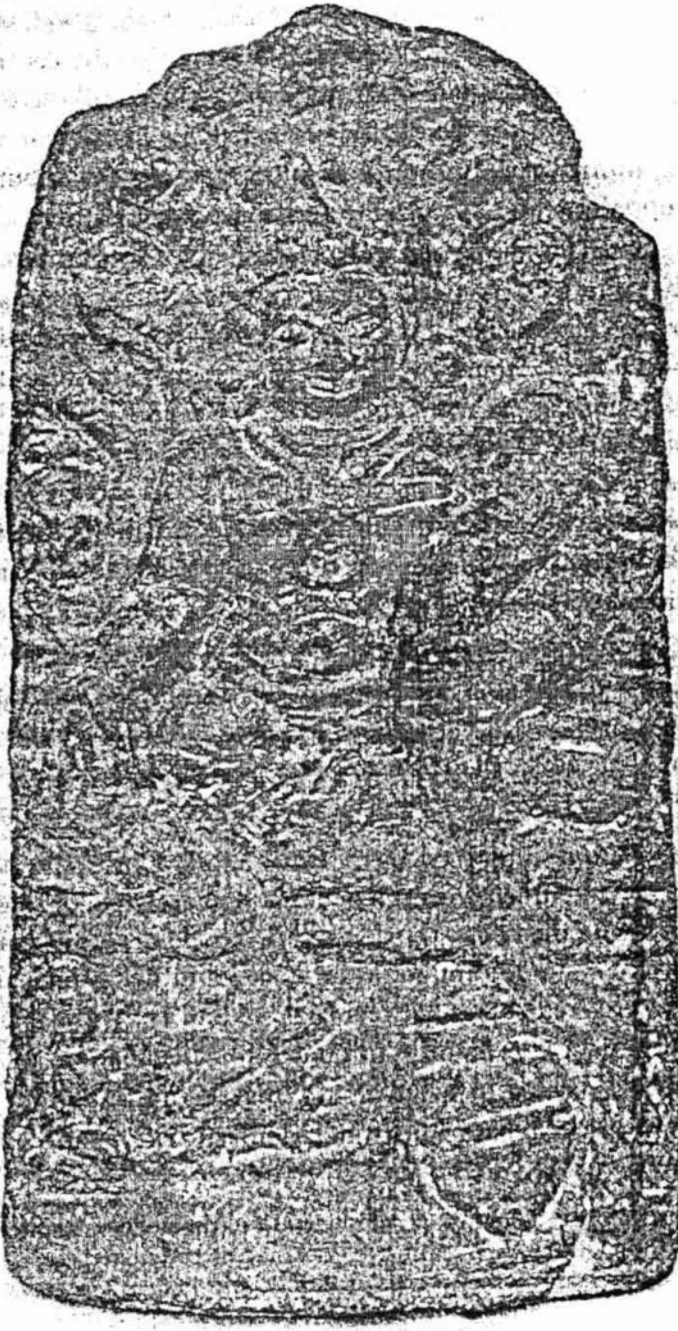

চিত্র ১৬। মনসা দেবীর প্রস্তর ভাস্কর্য। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর, নম্বর ৬৫৭।

চিত্র ১৭। মনসা দেবীর প্রস্তর ভাস্কর্য। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর, নম্বর ৬৫৯।

করবে, বনে একটি নগর নির্মাণ ও তাতে জনবসতি গড়বে, তাকে উৎসর্গ করা একটি জাঁকজমকপূর্ণ মন্দির নির্মাণ করবে, আর এভাবেই চণ্ডির ধর্মমত মানুষের মাঝে বিস্তৃত হবে। বন সাম্রাজ্যে তার ও তার অনুগ্রহভাজনের যৌথ সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে দেবীর মৌলিক রাজনৈতিক ভূমিকাকে স্পষ্ট করে। চণ্ডির জাগতিক প্রতিনিধি কালকেতু শাসন করে দেবীর পক্ষে, যার পেছনে রয়েছেন রাজত্বের অতিলৌকিক মহাপ্রভু-তার স্বামী শিব।[৪৪] তার সকল ধার্মিক ফাঁদ ও ইন্দো-আর্য দেবমণ্ডলের সর্বোচ্চ দেবতার সাথে তার সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও চণ্ডি বনেই থেকে গেল-অর্থাৎ জীবজন্তু ও অনার্য গোত্র পূর্ণ জঙ্গলে-ব্রাহ্মণ ও তাদের ধর্মাচারের যথার্থ এলাকা নগরে নয়।[৪৫] অধিকন্তু চণ্ডির অনুগ্রহভাজন একজন শিকারি, যে বাংলার আদিবাসী গোত্রসমূহের বৈশিষ্ট্যসূচক সহিংসতা ও অপরিচ্ছন্ন জীবিকায় ব্যস্ত, তাদের মাঝেই পৌরাণিক কাহিনীটি প্রথমত বিকশিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য কোন সংশোধনীতেই দেবী এবং অনার্য, আদিম বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা গোপন করেনি।[৪৬]

এটাও উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, সালতানাতের বিরুদ্ধে পরিচালিত একমাত্র জ্ঞাত স্থানীয় বিদ্রোহ হয়েছিল পুরোপুরি বাঙালি দেবী এবং বনের রক্ষাকর্ত্রী চণ্ডির নামে। ১৪১৭-১৮ সালের তারিখ সম্বলিত এবং চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও ও ছোট পাণ্ডুয়ায় তথা বদ্বীপের জঙ্গলাকীর্ণ দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলীয় পশ্চাদভূমিতে মুদ্রিত মুদ্রাগুলোতে দনুজমর্দন দেব ও তার পুত্র মহেন্দ্র দেব সংস্কৃত হরফে লেখে, শ্রী চণ্ডি চরণ পরায়ণ,' দেবী চণ্ডির পদতলে নিবেদিত।' প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ সব সময়েই গুরুতর ব্যাপার এবং আমরা নিশ্চিত হতে পারি বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ সাধারণ মানুষের সমর্থন লাভের জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী ও সবচেয়ে সম্ভাবনাময় মাধ্যম বিবেচনা করেই এ ধরনের অতিলৌকিক বিষয়কে বেছে নিয়েছিলেন। বিদ্রোহকালে দেবরাজাদের মুদ্রায় চণ্ডির আবির্ভাব সুস্পষ্টভাবে তার ব্যাপক জনপ্রিয়তার এবং তার সংরক্ষণ শক্তির প্রতি বিশ্বাসের প্রমাণ দেয়।

হিন্দু ধর্ম– বৈষ্ণব জটিলতা

লিখিত, শৈল্পিক ও সাহিত্যিক প্রমাণ– বিশেষ করে ত্রয়োদশ শতকে কবি জয়দেব রচিত গীত গোবিন্দ নামক সাংস্কৃতিক কবিতা–থেকে আমরা জানতে পারি, বিজয়ের

৪৪. এক সময়ে কালকেতু বলেন, আমার রাজ্যের রাজা হলেন *মহেশ ঠাকুর* (শিব), আমি *মহাপতি* (মুখ্যমন্ত্রী, এবং চণ্ডি হলো *অধিকারী* (মালিক)। মুকুন্দরাম, *কবিকঙ্কন চণ্ডি*, ৪১৩।

৪৫. Charles Malamoud, "Village et foret dans lideologie de l'Inde brahmanique," *Archives europeennes de sociologie* 17, no. (1976), 3-14.

৪৬. রাজ্যটির দায়িত্ব গ্রহণের পর কালকেতু তার এক সময়ের প্রাণী হত্যার কাজটি পুরোপুরি পরিত্যাগ করে তাদের প্রত্যেকের রক্ষকে পরিণত হয়। পৌরাণিক কাহিনীটিতে এভাবে লিখিত রূপ দেওয়াটা ছিল, স্পষ্টতই ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভাবিত, পেশাদার হত্যাকারীদের মাধ্যমে রাজার ধর্মাচারে অশুদ্ধ হয়ে যাওয়ার ভারতীয় রাজা হওয়ার ধারণার চিরায়ত সমস্যার সমাধানের প্রয়াস।

আগে থেকেই বিষ্ণু ধর্মমত রাজকীয় আনুকূল্য পেয়ে আসছিল। তুর্কী শাসনের প্রথম কয়েক শতাব্দীতে শিবের মতো এই জনপ্রিয় ধর্মমতও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়।[৪৭] এটা এরপর পৌরোহিত্যের ধর্মাচার বা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাবিহীন জনপ্রিয় ভক্তিবাদ আন্দোলন হিসেবে বদ্বীপীয় বাংলায় আবির্ভূত হয় এবং বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার হিসেবে দেশীয় সাহিত্যে গৌরবোজ্জ্বলভাবে আত্মপ্রকাশ করে। পঞ্চদশ শতকের কোন সময়ে কীর্তিবাস পণ্ডিত রামের কাহিনী সম্বলিত বিখ্যাত মহাকাব্য রামায়ণ বাংলায় অনুবাদ করেন।[৪৮] তবে বাঙালি বৈষ্ণবদের মূলধারা হিসেবে যা প্রাধান্য পায়, তা রাম নয়, বরং কৃষ্ণ শিশুদেবতা, সর্পরাজ কালিয়ার হত্যাকারী, গোয়ালা গোপী রমণীদের প্রলুব্ধকারী, বিশেষ করে রাধার প্রেমিক। নতুন কৃষ্ণ সাহিত্য জনপ্রিয়তার কৃতিত্ব, অংশত, দেওয়া যায় গৌড়ের মুসলিম রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতাকে। ১৪৭৩ থেকে ১৪৮০ সালের মধ্যে সুলতান রোকনউদ্দিন বারবাকের (শাসনকাল ১৪৫৯-৭৪) পৃষ্ঠপোষকতায় কায়স্থ কবি মালাধর বসু রচনা করেন শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়। এর কিছু পরে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (শাসনকাল ১৪৯৩-১৫১৯) বর্তমানে বিলুপ্ত যশোরাজ খানের কৃষ্ণ-মঙ্গল রচনায় পৃষ্ঠপোষকতা করেন।[৪৯] কৃষ্ণের গল্পের প্রথমদিকের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিতা ছিল শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন। সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে[৫০] চণ্ডি দাস রচিত এই কবিতায় গোয়ালিনী রাধার মন জয়ের জন্য কামুক তরুণ কৃষ্ণকে নানা ছলনাময় কৌশল প্রণয়নের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মন জয়ের পর দেবতা কৃষ্ণের জন্য রাধার আবেগময় ভালবাসা বাঙালি ভক্তিবাদের কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্যে পরিণত হয়।

এই আন্দালন ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে পশ্চিমবঙ্গে একটি একক, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সন্ন্যাসী ও মরমী পুরুষ চৈতন্যকে (মৃত্যু ১৫৩৩) কেন্দ্র করে সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে। ১৪৮৬ সালে ব্রাহ্মণ হিসেবে জন্মগ্রহণকারী চৈতন্য তদানিন্তন ব্রাহ্মণ্যবাদী শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র নদীয়ায় শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন, তবে ১৫০৮ সালে বিহারে সফরকালে কৃষ্ণের এক ভক্তের সাক্ষাৎ পান এবং এই ঘটনায় তাঁর জীবনে সিদ্ধান্তসূচক পরিবর্তন আসে। এই ধর্মমতে দীক্ষালাভের পর চৈতন্য তাঁর সাবেক জীবন পরিত্যাগ করে কৃষ্ণের রূপে বিষ্ণুর

৪৭. বৈষ্ণব সাহিত্য ও শিল্পকলার কিছু কিছু অংশ পঞ্চদশ শতকের শেষভাগেও বিষ্ণুপুরে স্থানীয়ভাবে সৃষ্টি হওয়া অব্যাহত ছিল। দেখুন Jeremiah P. Losty, *The Art of the Book in India* (London: British Library, 1982), 62.

৪৮. Sukumar Sen, *History of Bengali Literature* 3d ed. (New Delhi: Sahitya Akademi, 1979), 63-64.

৪৯. Ibid., 66.

৫০. Dusan Zbavitel, *Bengali Literature*, vol. 9, fasc. 3 of A *History of Indian Literature*, ed. Jan Gonda (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1976), 149.

সিদ্ধিলাভের পূজক হন। বাংলায় ফিরে কৃষ্ণের প্রশংসাসূচক নাচ-গানের (কীর্তন) মাধ্যমে পরমানন্দ লাভের ভক্তিবাদী পূজারীদের প্রতিষ্ঠিত একটি ধারার কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। চৈতন্য ও তাঁর অনুসারীরা নদীয়ার রাস্তায় রাস্তায় ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে কীর্তন গেয়ে নাম জপতে থাকায় এই প্রথা দ্রুত জনপ্রিয়তা পায়। তাদের তৎপরতা জন-শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করায় সালতানাতের কর্মকর্তাগণ তাদের কিছুটা দমন করলেও,[৫১] বর্ধিষ্ণু নব্য-বৈষ্ণব আন্দোলনের আসল প্রতিপক্ষ ছিল চণ্ডি ও মনসার ধর্মমতের সমর্থক ব্রাহ্মণরা—স্থানীয় মুসলমান বা গৌড়ের রাজদরবার নয়। প্রকৃতপক্ষে সেখানে বৈষ্ণব সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করা হতো। উল্লিখিত ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিতে প্রথমত সাম্প্রদায়িক সংগীত তথা কীর্তনের বৈষ্ণব প্রথাটি শুধুমাত্র শান্তিরই ব্যাঘাত ঘটাতো না, বরং তাতে ধর্মগ্রন্থ ভিত্তিক নির্দেশনারও অভাব ছিল। দ্বিতীয়ত চৈতন্য নিজেকে ঈশ্বর (গৌড়হরি') হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। তৃতীয়ত তিনি মন্ত্র ব্যবহারে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব খর্ব করেছিলেন। এবং পরিশেষে, অভিযোগ আনা হয়, তাঁর ধর্মমত নিম্নবর্ণ থেকে সমর্থক আকর্ষণের উদ্যোগ নিয়েছিল, এটা এই সময়ের প্রধান প্রধান হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক ভিত্তির ইঙ্গিত দেয়।[৫২] যেহেতু দেবী ধর্মমত পৃষ্ঠপোষক হিসেবে শাক্ত ব্রাহ্মণরা নিম্নবর্ণের মানুষদের তাদের প্রকৃতিগতভাবে নিজস্ব প্রভাবাধীন এলাকা বিবেচনা করতো, যদিও অনেক সময় তারা এসব ধর্মমতের প্রসারে দ্ব্যর্থবোধকতার পরিচয় দিত। চৈতন্যের আন্দোলন তাই তাদের ধর্মীয় অনুসারীদের হাতছাড়া হওয়ার হুমকি সৃষ্টি করেছিল।

আন্দোলনটি প্রতিরোধে ব্রাহ্মণদের প্রাথমিক প্রয়াস এবং পরে বৃহত্তর ব্রাহ্মণ্যবাদী কাঠামোর আওতায় আত্মীকরণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস সত্ত্বেও বৈষ্ণববাদ আত্মরক্ষা এবং বদ্বীপটির ধর্মীয় মানচিত্রে স্বকীয় পরিচিতি বজায় রাখতে সক্ষম হয়। উচ্চবর্ণের একচেটিয়া অধিকারের বিপরীতে অ-ব্রাহ্মণদের অন্তর্ভুক্তি, ধর্মাচারের স্থানে ভক্তি, সংস্কৃতি বাদ দিয়ে বাংলা ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করে আন্দোলনটি বিভিন্ন দেবী ধর্মমতের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্রাহ্মণ সমর্থিত শিব আন্দোলনের একটি প্রকৃত বিকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ষোড়শ শতকে রচিত ভক্তিমূলক ও সাধু পুরুষদের জীবনীমূলক সাহিত্য কৃষ্ণের প্রেমের মাধ্যমে মুক্তির নিশ্চয়তাকে নাটকীয়তা দান করে এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তি চৈতন্যকে কৃষ্ণ ও তাঁর প্রেমিকা রাধা উভয় হিসেবে চিহ্নিত করা না হলেও তিনি যে অত্যন্ত ঐশ্বরিক শক্তিতে উদ্দীপ্ত তা নিশ্চিত করা হয়।[৫৩]

---

৫১. Krasnadasa, *Sri Caitanya-Caritamrita*, trans. Bhaktivedanta, ch. 17. text, 124-28; 324-26.

৫২. প্রাগুক্ত, গ্রন্থ, ২০৪-১২; ৩: ৩৬৩-৬৬.

৫৩. এ ধরনের সৃষ্টিগুলোর প্রধান হচ্ছে বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্য-ভগবত*, আনুমানিক ১৫৪০ সালে রচিত; লোকান দাসের *চৈতন্য-মঙ্গল*, মধ্য ষোড়শ শতকে রচিত; চূড়ামনি দাসের *গৌড়াঙ্গ-বিজয়*,

এমনকি তাঁর জীবদ্দশায়, বিশ্বস্ত অনুরাগীরা চৈতন্যকে দেবতা হিসেবে বিবেচনা করতে থাকে এবং উক্ত শতকের শেষ নাগাদ তাঁর দেবত্ব ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়ে পড়ে, তখনকার সমসাময়িক কবিতার ভনিতায় যেসব ঈশ্বরের নামে প্রশংসা করা হতো, তাঁর নাম তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়।[৫৪]

বৈষ্ণব পূজা নাটকীয়ভাবে সমগ্র বাঙালি হিন্দু সমাজে বিস্তৃত হয়। কবি মুকুন্দরাম তাঁর বাঙালি রাজত্বের আদর্শ চিত্রে নগরীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে বৈষ্ণবদেরও অন্তর্ভুক্ত করেন, তাদেরকে ভক্তিমূলক সংগীতে মগ্ন বাড়িওয়ালা কিংবা সোনালী চূড়া ও পতপত করে উড়তে থাকা পতাকায় সজ্জিত সৌন্দর্যমণ্ডিত বিষ্ণু মন্দিরের মধ্যে বসবাসকারী সমৃদ্ধ নগরবাসী হিসেবে উল্লেখ করেন।[৫৫] এতে ধারণা করা যায়, ষোড়শ শতকের শেষদিকে যখন চৈতন্যের ভক্তিবাদ আন্দোলনের পরমানন্দের উদ্দীপনায় প্রাণবন্ত ছিল, তখন উচ্চবর্ণের লোকেরা প্রচলিত ব্যবস্থার সাথে একে পুনঃ সংজ্ঞায়িত করে আন্দোলনটির সাথে ইতিমধ্যেই মিত্রতা স্থাপন শুরু করেছে। শহরে সূচিত হলেও পরবর্তী শতকগুলোতে বৈষ্ণব ভক্তিবাদ বাংলার হিন্দু কারিগর ও চাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ১৮৯৩ সালে জেমস ওয়াইজ লেখেন, 'এটা নির্ভুল সত্যের সাথে বলা যায়, শৈব ও অন্যান্য হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের থেকে কোন না কোনভাবে বাইরে থেকেও বৈষ্ণববাদ বাংলার কৃষি, শিল্প ও মৎস্যজীবী গোত্রগুলোর ধর্ম।[৫৬]

সংক্ষেপে বলতে গেলে, সালতানাত আমলে হিন্দু সমাজে দুটি মুখ্য ধর্মীয় ধারার প্রাধান্য ছিল—বিভিন্ন দেবী ধর্মমত এবং বৈষ্ণব ভক্তিবাদ—ব্রাহ্মণরা দুটিকেই অনুমোদন করার কৌশল অবলম্বন করেছিল। ভৌগোলিক অবস্থার প্রেক্ষিতে, বৈষ্ণববাদ আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীভূত ছিল, অন্যদিকে দেবী আরাধনার ধর্মমতগুলো বদ্বীপ জুড়ে বিশেষ করে দক্ষিণ ও পূর্বে কেন্দ্রীভূত ছিল, যেখানে চণ্ডির নামে বিদ্রোহী হিন্দু রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল। তুর্কী বিজয়ের পর দরবারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহারজনিত সমস্যা থেকে শৈব ধর্মমত আর কখনও দাঁড়াতে না পারলেও শাক্ত ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে মহাদেবকে আদিবাসী ধর্মমতে প্রতিস্থাপিত করে, বিশেষভাবে তা চণ্ডিদেবীর প্রতি নিবদ্ধ হয়। একইভাবে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণরা একই সময়ে চৈতন্যের আন্দোলনের অসংযত আবেগবাদও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।

১৫৬০ সালের আগে রচিত; এবং কৃষ্ণ দাসের রচিত চৈতন্য-চরিতামৃত, আনুমানিক ১৫৭৫-৯৫ সালে রচিত। এগুলোর মধ্যে কৃষ্ণদাসের সৃষ্টিটিই সবচেয়ে প্রামাণিক হিসেবে বিবেচিত। দেখুন Zbavitel, *Bengali Literature*, 172-75. Sen *History of Bengali Literature*, ch. 8.

৫৪. Sen, *History of Bengali Literature*, 94.

৫৫. মুকুন্দরাম, *কবিকঙ্কন চণ্ডি*, ৩৪৮, ৩৫০।

৫৬. James Wise, "The Hindus of Eastern Bengal." *Journal of the Asiatic Society of Bengal* 62, no. 3 (1893), 8. চৈতন্য পরবর্তী বাংলায় বৈষ্ণব দেবতার বিকাশ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন Ramakanta Chakrabarty, *Vaisnavism in Bengal, 1486-1900* (Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar, 1985), 275-304

এই প্রেক্ষাপটেই এসব ধর্মীয় ধারায় ইসলামী ভক্তিবাদ বাংলা বদ্বীপে তার নিজস্ব পথ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। আমরা এ পর্যন্ত মুসলমানদের শাসক, সৈন্য, সূফী-সাধক, বণিক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা বিচারক হিসেবে দেখেছি। কিন্তু আমরা এখনো আধুনিক বাংলার গ্রামাঞ্চলে পরিব্যাপ্ত সাধারণ কৃষকদের ভূমিকা দেখিনি। বাস্তবিকই, বাঙালি মুসলমান চাষীরা পৃথিবীতে অন্যতম বৃহত্তম মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিত্তি প্রস্তুত করেছে। এটা ইসলামী করা এবং ইসলামে ধর্মান্তরকরণের আলোচিত বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নের উপর উদ্রেক করে।

৫ ইসলামে গণ–ধর্মান্তর : তত্ত্ব এবং প্রধান কাহিনী

১৮৭২ সালের আদমশুমারিতে প্রকাশিত সবচেয়ে কৌতূহলজনক তথ্যটি হলো বাংলার নিম্নাঞ্চলে বিপুল সংখ্যক মুসলমানের বাস — পুরাতন রাজধানীগুলোর আশেপাশে নয়, বরং বদ্বীপটির পলল সমভূমিতে।

—জেমস ওয়াইজ (১৮৯৪)

ভারতে ইসলামীকরণের চারটি সনাতন তত্ত্ব

ভারতে ইসলামের বিকাশের ব্যাখ্যার তত্ত্বগুলোকে চারটি মৌলিক আকারে বিভক্ত করা যায়। কোনটিই সন্তোষজনক নয়। প্রথমটিকে আমি বলবো অভিবাসন তত্ত্ব, এটা আসলে মোটেই ধর্মান্তরকরণ তত্ত্ব নয়, কারণ এই তত্ত্বে ইসলামীকরণকে বিশ্বাসের নয়, বরং মানুষের পরিব্যাপ্তিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় মুসলমান হলো ইরানি মালভূমি থেকে স্থলপথে কিংবা জলপথে আরব সাগর পাড়ি দিয়ে আসা অভিবাসী মুসলমানদের বংশধর। যদিও নিঃসন্দেহে এই প্রক্রিয়া ভৌগোলিকভাবে ইরানি মালভূমি বা আরব সাগর সংলগ্ন দক্ষিণ এশিয়ার সেসব এলাকায় ইসলামীকরণে কিছু অবদান রেখেছে, তবে তা বাংলায় গণ-ইসলামীকরণের ব্যাখ্যায় ব্যবহার করা হবে না।

ভারতে ইসলামীকরণের সবচেয়ে প্রাচীন তত্ত্বটিকে আমি তরবারির ধর্মতত্ত্ব হিসেবে অভিহিত করবো, যাতে ভারত ও অন্যত্র ইসলামের ব্যাপ্তিতে সামরিক শক্তির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অন্তত ক্রুসেডের সময়কাল থেকে বিদ্যমান এই তত্ত্বটি ঊনবিংশ শতকে মুসলমান জনগোষ্ঠীর উপর ইউরোপীয়ান সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের জোয়ারে এবং এর পরপরই বিংশ শতকের শেষভাগে বিশ্বব্যাপী ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ব্যাপক প্রচারণা পায়। এর সাধারণ সুরটি ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের অনেক প্রাচ্যবিদের ব্যাখ্যায় সপ্তম শতকে আরবে ইসলামের উত্থানের বিষয়টি দেখা যায়, যেমনটি ১৮৯৮ সালে উইলিয়াম ম্যুরের কলম ভয়ংকর যেসব তথ্য দিয়েছিল:

যুদ্ধের গন্ধই আরব গোত্রগুলোর চাপা ক্রোধকে এখন ব্যাগ্র আনুগত্যের দিকে চালিত করলো। যোদ্ধার পর যোদ্ধা, সারির পর সারি, তাঁদের নারী ও শিশুদের উত্তরাধিকারের মাধ্যমে গোত্রগুলো যুদ্ধে এগিয়ে আসতে লাগলো। নগরগুলো জয়ের পর চমকপ্রদ গল্প মানেই হিসাবের বাইরের ব্যাপক লুটপাট, যুদ্ধক্ষেত্রেই তরুণীদের

ভাগাভাগি, 'প্রতিটি পুরুষের জন্য একটি বা দুটি যুবতী'----- নতুন নতুন গোত্র এলো এবং চলে গেল। সম্মুখে ধাবিত হলো এবং ধাবিত হতেই থাকলো, মৌচাক থেকে মৌমাছিরা যেভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসে, কিংবা ভূমি অন্ধকার করা পঙ্গপালের রাশি, গোত্রের পর গোত্র সামনে এগুলো এবং দ্রুত উত্তরমুখী ধাবিত হলো, পূর্ব ও পশ্চিমে বিপুল জনগোষ্ঠীর উপর বিস্তৃত হলো।[১]

পরিশেষে বজ্রগম্ভীর খুরগুলো চলে গেল এবং ধূলা পড়ে গেলেও আরব বিজয়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমাদের জন্য ম্যূর সারমর্ম রেখে গেলেন খুব সামান্যই। বরং তিনি স্রেফ বলে গেলেন আরবদের 'যুদ্ধের গন্ধ' প্রীতি, তাদের 'ধর্ষণের' আকাঙ্ক্ষা এবং 'একটি বা দুটি যুবতী'র প্রতিশ্রুতির কথা। যুদ্ধ ও যৌনতার সাথে ইসলামের সম্পৃক্ততার প্রাচীন ইউরোপীয়ান ধারণার অতিরিক্ত হিসেবে জঙ্গী ও বিদ্রোহ ইসলাম সংক্রান্ত ম্যূরের দৃষ্টিভঙ্গি ভয়াবহ উন্মাদনার সৃষ্টি করে এবং ঔপনিবেশিকরা আশংকা করতে থাকে, ইউরোপের নিজস্ব মুসলমান প্রজারা হয়তো পঙ্গপালের মত বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং ইউরোপীয়ানদের ইউরোপে ফেরত পাঠাবে। সর্বোপরি স্যার উইলিয়াম ম্যূর নিজে ছিলেন ঔপনিবেশিক ভারতে একজন সিনিয়র বৃটিশ কর্মকর্তা এবং একই সাথে সেখানে খ্রিস্টান মিশনারি আন্দোলন বেগবান করার এক অক্লান্ত কর্মী।[২]

ঔপনিবেশিক কর্মকর্তাগণ যদি কল্পনা করে থাকেন, ইসলামের উত্থানের কারণ সহজাতভাবেই জঙ্গী প্রকৃতিসম্পন্ন, তবে তাঁরা সহজেই ভারতে তাঁদের সম্প্রসারণের ব্যাখ্যাও একইভাবে করতে পারেন। পিটার হার্ডি যেমনটি দেখেছেন, যারা যুক্তি দেখান ভারতীয় মুসলমানদের বলপূর্বক ধর্মান্তর করা হয়েছে, তাঁরা সাধারণভাবে শক্তি বা ধর্মান্তরকরণের[৩] সংজ্ঞা দিতে ব্যর্থ এবং এটিই ধরে নিতে বলেন যে, গলায় তরবারি চেপে ধরেই কোন সমাজের ধর্মীয় পরিচিতি পরিবর্তন করা যায় বা করা হয়। এই কৌশল তাত্ত্বিক নাকি বাস্তবিক কোন্‌ভাবে করা হয়, তাঁর সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা কখনো দেওয়া হয়নি। অধিকন্তু এই তত্ত্বের প্রবর্তকরা দৃশ্যত উত্তর ভারতে ১২০০ সাল থেকে ১৭৬০ সময়কালে তুর্কী-ইরানি শাসনকালীন সময়ে ইসলামে ধর্মান্তরকরণ নিয়ে বিভ্রান্তিতে রয়েছেন, সম্ভবত ভারতে 'ইসলামী' বিজয়ের বর্ণনা সংক্রান্ত প্রাথমিক পারসি ভাষ্যগুলোর অনুবাদ থেকে এসব বিভ্রান্তির সৃষ্টি।

---

১. William Muir, *The Caliphat: Its Rise, Decline, and Fall* (London, 1898: reprint, Beirut: Khayats, 1963), 45.

২. Richard M. Eaton, *Islamic History as Global History* (Washington, D.C. American Historical Association, 1990), 13.

৩. Peter Hardy. "Modern European and Muslim Explanations of Conversion to Islam in South Asia: A Preliminary Survey of the Literature," in *Conversion to Islam*, ed. Nehemia Levtzion (New York: Holmes & Meier, 1979), 75

ইউহানান ফ্রিডম্যানের মতে, এসব ভাষ্যে প্রায়ই দ্ব্যর্থবোধক কিছু বাক্য, যেমন 'তারা ইসলামে দাখিল হলো,' বা 'তারা ইসলামের অধীনে আসলো,' দেখা যায়, এখানে 'ইসলাম' মানে হয়তো ধর্ম, মুসলিম রাষ্ট্র বা 'ইসলামের সেনাবাহিনী'। কিন্তু এ ধরনের বাক্যের প্রাসঙ্গিক পঠনে সাধারণভাবে শেষের দুটি ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, বিশেষ করে, এসব সূত্র প্রায়ই ইন্দো-তুর্কী সেনাবাহিনীকে 'লস্কর-ই-ইসলাম' বা 'ইসলামের সেনাবাহিনী' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে এবং 'লস্কর-ই-তুরকান' বা 'তুর্কী সেনাবাহিনী'[৪] হিসেবে নয়। অন্য কথায়, এটা ছিল ইন্দো-মুসলিম রাষ্ট্র এবং সহজভাবে বললে, ইসলামী বিশ্বাসের প্রতি নয়, বরং তার সামরিক বাহিনীর প্রতি মানুষকে আনুগত্য প্রকাশ করতে বলা হতো। দক্ষিণ এশিয়ার ধর্মীয় ভূগোলও এই তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইসলামীকরণ যদি কখনো সামরিক বা রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে কাজ করতো, তবে আশা করা যেত, মুসলিম রাজবংশগুলো যেসব এলাকায় সর্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে ও দীর্ঘতম সময়ে শাসন করেছিল অর্থাৎ যেসব এলাকায় 'তরবারি' সর্বাত্মকভাবে দেখা গিয়েছিল, সেখানে অবশ্যই মুসলমানদের সর্বাধিক সংখ্যায় দেখা যেত। কিন্তু বিপরীতক্রমে দেখা যাচ্ছে, যেসব অঞ্চলে ইসলামীকরণের সর্বাপেক্ষা নাটকীয়তা দেখা যায়, যেমন পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাঞ্জাবে, তা ইন্দো-তুর্কী শাসনের প্রান্তসীমায় অবস্থিত, সেখানে 'তরবারি' ছিল সবচেয়ে দুর্বল এবং সেখানে পাশবিক শক্তি সবচেয়ে কম প্রভাব সৃষ্টি করতে পারতো। এ ধরনের এলাকায় প্রথম নির্ভুল আদমশুমারিতে মোট জনসংখ্যার ৭০ থেকে ৯০ শতাংশ দেখা যায় মুসলমান, অন্যদিকে মুসলিম শাসনের কেন্দ্রভূমি, দিল্লী দুর্গ ও তাজমহল সমৃদ্ধ উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি– যেখানে মুসলিম শাসন সবচেয়ে ব্যাপক ও সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল, সেখানে মুসলমান জনসংখ্যা মাত্র ১০ থেকে ১৫ শতাংশ। অন্য কথায় সার্বিকভাবে উপমহাদেশে মুসলিম রাজনৈতিক অনুপ্রবেশের মাত্রা এবং ইসলামীকরণের মাত্রার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক দেখা যায়। এমনকি বাংলাতেও এই নীতি প্রযোজ্য। ১৯০১ সালে ভারতের আদমশুমারিতে বলা হয়:

এসব (পূর্বাঞ্চলের) জেলার কোনটিই মুসলিম শাসনের সদর দফতর হিসেবে প্রসিদ্ধ নয়। ঢাকা ছিল প্রায় একশত বছর নবাবের আবাসস্থল, কিন্তু ফরিদপুর ছাড়া এর আশেপাশের জেলাগুলোর তুলনায় এখানে মুসলমান জনসংখ্যা কম। মালদহ ও মুর্শিদাবাদ ছিল প্রাচীন রাজধানী, যা প্রায় সাড়ে চারশত বছর মুসলমান শাসনের কেন্দ্র ছিল, কিন্তু সংলগ্ন দিনাজপুর, রাজশাহী ও নদীয়ার তুলনায় সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক কম।[৫]

---

৪. See Yohanan Friedmann, "A Contribution to the Early History of Islam in India," *in Studies in Memory of Gaston Wiet*, ed. Myrian Rosen-Aylon (Jerusalem: Institute of Asian and African Studies, 1977), 322.

৫. Census of India, 1901, vol. 6, *The Lower Provinces of Bengal and Their Feudatories* (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1902), 156.

বাস্তবিকই, একথাও বলা যায়, মুসলিম রাজনৈতিক শাসনের নৈকট্য ইসলামীকরণের সম্ভাবনা বৃদ্ধির পরিবর্তে তাতে বরং অনেক ক্ষেত্রে বাধারই সৃষ্টি করেছে। এস. এল. শর্মা ও আর. এন. শ্রীবাস্তবের মতে, রাজস্থানের মিউ সম্প্রদায়ের ন্যূনতম ধর্মান্তরে মোগলদের শাস্তি প্রদানের ফলে মিউদের মধ্যে ইসলামী পরিচিতি মজবুত করার বদলে বরং ইসলাম প্রতিরোধে তাদের শক্তি বাড়িয়েছে।[৬]

ভারতে ইসলামীকরণে তৃতীয় তত্ত্বকে আমি বলবো, 'পৃষ্ঠপোষকতার ধর্ম' তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রাক-আধুনিক সময়ে শাসক শ্রেণীর নিকট থেকে ধর্ম-বহির্ভূত কিছু সুবিধা পাওয়া যেমন কর মওকুফ, আমলাতন্ত্রে পদোন্নতি ইত্যাদির জন্য ভারতীয়রা ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে। পশ্চিমা প্রশিক্ষিত ধর্মনিরপেক্ষ সমাজবিজ্ঞানীরা সব সময়েই এই তত্ত্বকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, তারা সব ধর্মকে কোন-না-কোন ধর্ম-বহির্ভূত সংস্থা বিশেষ করে সামাজিক উন্নয়ন বা মর্যাদা বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষার প্রতি কম-বেশি নির্ভরশীল দেখতে অভ্যস্ত। এই তত্ত্বের সমর্থনে ভারতীয় ইতিহাসের অনেক ঘটনাই তুলে ধরা হয়। চতুর্দশ শতকের প্রথমদিকে ইবনে বতুতা উল্লেখ করেন, ভারতীয়রা নিজেদের নও-মুসলমান হিসেবে খলজি সুলতানদের কাছে উপস্থাপন করে এবং বিনিময়ে তাদের মর্যাদা অনুসারে সম্মানসূচক আলখেল্লা দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।[৭] ঊনবিংশ শতকের আদমশুমারিগুলোতে দেখা যায়, উত্তর ভারতের অনেক ভূস্বামী পরিবার রাজস্ব অনাদায়জনিত কারারুদ্ধতা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কিংবা পরিবারের পৈতৃক ভূমি রক্ষার জন্য নিজেদের মুসলমান ঘোষণা করছে।[৮] এই তত্ত্বটি আরও শক্তিশালী হয়, যখন দেখা যায়, আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মান্তরিত না হয়েও মুসলমান শাসকদের নিযুক্ত অনেককে ইসলামী সংস্কৃতিতে অনেকাংশে একাত্ম হতে দেখা যায়। গাঙ্গেয় সমভূমিতে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়, মহারাষ্ট্রে পারাসনি, সিন্ধুতে আমিলদের সরকারি কেরানি ও প্রশাসনিক কর্মচারির চাহিদা পূরণের সময় ইসলামী সংস্কৃতি অনুসরণ করতে দেখা যায়, যে প্রক্রিয়াকে আজিজ আহমেদ এক সময়ে ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের 'পশ্চিমাকরণের' সাথে তুলনা করেছিলেন।[৯] বন্দী সৈন্য ও দাসদের নতুন সংস্কৃতি গ্রহণ সম্ভবত এই তত্ত্বের আরেকটি মাত্রা যোগ করে। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তাদের আদি বাসভূমির সাথে স্থায়ী কোন সামাজিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক না থাকায় এসব লোকের তাদের পৃষ্ঠপোষকদের সাংস্কৃতিক বলয়ে পতিত হওয়া বিস্ময়কর

---

৬. See S. R. Sharma and R. N. Srivastava, "Institutional Resistance to Induced Islamization in a Convert Community an Empiric Study in Sociology of Religion," *Sociological Bulletin* 16, no. 1 (March 1967): 77.

৭. Ibn Battuta, *Rehla*, trans Mahdi Hussain, 46.

৮. Hardy, "Modern European and Muslim Explanations," 80-81.

৯. Aziz Ahmad, *Studies in Islamic Culture in the Indian Environment* (Oxford: Clerendon Press, 1964), 105.

নয়।[১০] যদিও এই তত্ত্ব ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্রভূমিতে তুলনামূলক স্বল্প ইসলামীকরণের ব্যাখ্যায় কিছুটা সাহায্য করে, কিন্তু রাজনৈতিক প্রান্ত সীমানায়, যেমন পাঞ্জাব বা বাংলায়, ব্যাপকভাবে ধর্মান্তর ঘটেছে, তার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে না। তরবারির প্রভাবের মতো রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাও পৃষ্ঠপোষকদের কেন্দ্র থেকে যতদূর যাওয়া হবে, ততই বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস পেতে থাকে। আমাদের এমন কোন তত্ত্বের প্রয়োজন যা মুসলিম শাসনের পরিমণ্ডলে শুধু কেন্দ্রভূমিতে নয়, এবং তা শুধু শহুরে অভিজাতদের মধ্যে নয়, লাখ লাখ চাষীর মধ্যে, গণ ইসলামীকরণে যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দেবে।

এরপর আমরা চতুর্থ তত্ত্ব, যা আমি 'সামাজিক মুক্তির ধর্ম' তত্ত্ব হিসেবে অভিহিত করতে পারি। বৃটিশ নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের সৃষ্ট ও পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী অনেক ব্যক্তি এবং দক্ষিণ এশিয়ার বিশেষত মুসলমান অসংখ্য সাংবাদিক ও ঐতিহাসিকের অভিমত পুষ্ট এই তত্ত্বটি দীর্ঘদিন ধরেই উপমহাদেশে ইসলামীকরণের ব্যাখ্যায় সবচেয়ে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। এই তত্ত্বে স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেওয়া হয়, হিন্দু বর্ণ প্রথা কালের পরিক্রমায় অপরিবর্তিত রয়েছে এবং তার নিজের নিম্ন শ্রেণীর প্রতি অত্যন্ত বৈষম্যমূলক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বলা হচ্ছে, নিম্নবর্ণের লোকেরা উচ্চবর্ণের হিন্দু বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের নির্যাতন ও জুলুমের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে। তারপর যখন ভারতীয় উপমহাদেশে সূফী-সাধকদের (তত্ত্বটির অধিকাংশ ভাষ্যে) প্রচারিত সামাজিক সাম্যের মুক্তির বার্তা নিয়ে ইসলামের "আগমন" ঘটলো, তখন এসব নির্যাতিত সম্প্রদায় ব্রাহ্মণিক নিষ্পেষণ ও তাদের প্রতি সামাজিক সাম্য প্রদর্শনে অস্বীকৃতির জোয়ার থেকে মুক্তির জন্য গণহারে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়।

ইসলামের ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত এবং হিন্দু সমাজের দুষ্কর্মের দৃষ্টান্ত পাশাপাশি রেখে এটা উপলব্ধি করা যায় যে, 'সামাজিক মুক্তির ধর্ম' তত্ত্বটি মুসলমান দৃষ্টিভঙ্গিতে ধমান্তরের উদ্দেশ্য চিহ্নিতকরণের উদ্যোগটি অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু সমস্যা হলো এই তত্ত্বের সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই। অধিকন্তু এটা অত্যন্ত অযৌক্তিক। প্রথমত বর্তমানকালে মূল্যবোধ অতীতের মানুষের উপর আরোপ করা ঐতিহাসিক পশ্চাদপদতা। এর মাধ্যমে মুসলমানদের সাথে যোগাযোগের আগে ভারতের নিম্নবর্ণের মানুষ, যা জ্যাঁ-জ্যাক রুশো বা থমাস জেফারসনের রচনায় বেশ পরিচিত, নিপীড়নকারী ব্রাহ্মণ্য জুলুমে অস্বীকৃত সকল মানুষের জন্য মৌলিক সাম্যের সহজাত ধারণার সাথে পরিচিত ছিল বলে ধারণা করে নেওয়া হয়। ভারতীয় ধর্মসমূহের সাথে

---

১০. ভারতের বাইরে, সমসাময়িক উসমানিয়া সাম্রাজ্যে জানেসারিদের কথা বিবেচনা করা যায়, বলকানের খ্রিস্টান বালকদের এই সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করানোর আগে তাদের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকরা তাদেরকে তুর্কী কৃত ও ইসলামীকরণ করা হতো।

ইসলামের সম্পর্কের বিষয়টি বিবেচনার সময় প্রাক-আধুনিক মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ হিন্দুদের অসাম্য সংক্রান্ত ব্যবস্থার বিপরীত তাদের ধর্মের সামাজিক সাম্যের আদর্শের প্রতি গুরুত্ব দেননি, বরং হিন্দু বহু-ঈশরবাদ বিরোধী ইসলামের একেশ্বরবাদকে তুলে ধরেছিলেন।[১১] অর্থাৎ তাদের চিন্তাধারায় এই দুই সভ্যতার তুলনাটা হয়েছে তাত্ত্বিক, সামাজিক নয়। বস্তুত, ইসলামের সামাজিক সাম্যের ধারণার বিকাশ (ধর্মীয় সাম্যের বিপরীতে) একটি সাম্প্রতিক ধারণা, শুধুমাত্র অজ্ঞতামুক্তির (Enlightenment) সময় এবং আরো বিশেষভাবে ফরাসি বিপ্লবের পরে উনবিংশ শতকের মুসলমান সংস্কারকদের মধ্যে তা দানা বাঁধতে থাকে।[১২]

দ্বিতীয়ত, এমনকি যদি ভারতীয়রা মানবজাতির মৌলিক সাম্যে বিশ্বাসী থাকতো, এবং এমনকি ইসলাম যদি তাদের কাছে একটি সামাজিক সাম্যের আদর্শ হিসেবে উপস্থাপিত হতো, যদিও দুটিই ভুল হতে বাধ্য- তবুও ইসলামীকরণের পরও ভারতীয় সম্প্রদায়গুলো তাদের সামাজিক উত্তরাধিকারের মর্যাদা উন্নত করতে পারেনি বলে যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। বিপরীতক্রমে হিন্দু সমাজে থাকার সময়কালীন জন্মগত পদবিগুলো তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজেও বহন করেছে।[১৩] বাংলায় এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ১৮৮৩ সালে জেমস ওয়াইজের বর্ণনায় দেখা যায়: 'ভারতের অন্যান্য স্থানে চাকরের কাজগুলো করে অচ্ছুৎ হিন্দুরা, কিন্তু বাংলায় যেকোন ঘৃণ্য বা হীন পেশাগুলোতে মুসলমানরা জড়িত। বেলদার (ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারকারী ও মৃতদেহ অপসারণকারী) মুসলমান পল্লীতে থাকে, যা হিন্দুদের মধ্যে ভূঁইমালি এবং এটা অসম্ভব নয় যে তার পূর্বপুরুষ এই নিম্নবর্ণের ছিল।[১৪]

পরিশেষে, তরবারি ও পৃষ্ঠপোষক তত্ত্বের মতো সামাজিক মুক্তি তত্ত্বও ভৌগোলিক বাস্তবতায় প্রত্যাখ্যাত। ১৮৭২ সালে যখন সর্বপ্রথম নির্ভরযোগ্য আদমশুমারি হলো, মুসলিম জনসংখ্যার সর্বোচ্চ ঘনত্ব দেখা গেল পূর্ব বাংলায়, পশ্চিম পাঞ্জাবে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ও বেলুচিস্তানে। অবাক করা বিষয় হলো, উল্লিখিত এলাকাগুলো শুধু মুসলিম রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্র থেকে দূরেই নয়, ইসলামের সাথে সংস্পর্শের আগে সেখানকার আদিবাসী মানুষজন হিন্দু বা বৌদ্ধ কোনটারই

১১. See Yohanan Friedmann, "Medieval Muslim Views of Indian Religions," *Journal of the American Oriental Society* 95 (1975): 214-21.

১২. See Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age*, 1798-1939 (London: Oxford University Press, 1962), 75-79, 99, 138, 155-56, 164-70, 173, 182, 238. Bernard Lewis, "The Impact of the French Revolution on Turkey: Some Notes on the Transmission of Ideas," *Journal of World History* 1 no. 1 (July 1953): 105-25.

১৩. See, e.g., *Caste and Social Stratification among the Muslims*, ed. Imtiaz Ahmed (Delhi: Manohar Book Service, 1973).

১৪. James Wise, *Notes on the Races, Castes and Traders of Eastern Bengal*, 2 vols. (London: Harrison & Sons, 1883), 1: 40.

সামাজিক ব্যবস্থায় পুরোপুরি অঙ্গীভূত হয়নি। বাংলায় ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে প্রধানত রাজবংশী, পোদ, চণ্ডাল, কুচ ও অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠী যারা ব্রাহ্মণিক সংস্কৃতির খুব কমই সংস্পর্শ পেয়েছিল এবং পাঞ্জাবের ক্ষেত্রেও সত্য যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশাল অংশ এসেছিল বিভিন্ন জাট গোত্র থেকে।[১৫]

তবে এটা সামান্যই বিস্ময়কর। শেষদিকের বৈদিক গ্রন্থ বৌধ্যায়ণ-ধর্মসূত্র (খ্রিস্টপূর্ব ৫ম-৬ষ্ঠ শতকে) এ স্বঘোষিত 'শুদ্ধ' বর্ণের মূল্যবোধের প্রতিফলন দেখা যায়, উপমহাদেশকে তিনটি সমকেন্দ্র বৃত্তে ভাগ করে প্রত্যেকটিকে একেকটি বিশিষ্ট সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় হিসেবে দেখানো হয়েছে। এগুলোর প্রথমটি আর্যাবর্ত বা আর্যদের আবাসভূমি, উত্তর-মধ্য ভারতের গঙ্গা-যমুনার উজানের এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যবাদী ঐতিহ্যের 'শুদ্ধতম' উত্তরাধিকারীরা বাস করতো, মানুষ হিসেবে তাদেরকে উঁচু বর্ণ ও ধর্মাচারগতভাবে শুদ্ধ বিবেচনা করতো। দ্বিতীয় বৃত্তটি ছিল বহির্ভাগ (অবন্তি, অঙ্গ-মগধ, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, উপবর্ত ও সিন্ধু-সৌবির) তথা মালওয়া, পূর্ব ও মধ্য বিহার, গুজরাট, দাক্ষিণাত্য ও সিন্ধু। এসব অঞ্চল ইন্দো-আর্য বসতির নিয়ন্ত্রণের মধ্যে, তবে সেখানে 'মিশ্র উৎসের' লোকজন বাস করতো, যারা প্রথম অঞ্চলের মতো ধর্মাচারগত মাত্রায় বিশুদ্ধ নয়। এবং তৃতীয় এলাকাটি হলো সেসব বাইরের অঞ্চল যেখানে 'অশুদ্ধ' গোত্রগুলো বাস করে, এবং তা এতো দূরে যে সেখানে কেউ সফর করলে তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। এই তৃতীয় বৃত্তে বসবাসকারী লোকদের পাঞ্জাবে আরাত্তা, দক্ষিণ পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে সৌবির, উত্তর বাংলায় পুণ্ড্র এবং মধ্য ও পূর্ব বাংলায় বঙ্গ বলে অভিহিত করা হয়।[১৬]

এখন সামাজিক মুক্তির তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় আগে থেকেই সেখানে কঠোর ও নির্যাতনকারী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পৌরোহিত্যে একটি অত্যন্ত বিভাজিত হিন্দু সামাজিক ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। তত্ত্বটি যদি সঠিক হয়ে থাকে, তবে যেসব এলাকা তথা আর্যাবর্তের মূল অঞ্চলে যেখানে ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক ব্যবস্থা কঠোরভাবে অনুসৃত হচ্ছিল, সেখানেই তথা আর্যাবর্তে ইসলামে ধর্মান্তরের ঘটনা সবচেয়ে বেশি হওয়াই যৌক্তিক। বিপরীতক্রমে, ব্রাহ্মণ্যবাদী সভ্যতা যেখানে সবচেয়ে কম দৃষ্টিগোচর

১৫. See, Richard M. Eaton, "The Political and Religious Authority of the Shrine of Baba Farid," in *Moral Conduct and Authority: The Place of Adab in South Asian Islam*, ed. Barbara D. Metcalf (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1984), 333-56.

১৬. *Baudhayana-Dharmasutra* 1. 1.9-14, in Georg Buhler, trans., *Sacred Laws of the Aryas as Taught in the Schools of Apastamba, Gautama, Vasishtha, and Baudhayana*, part 2, *Vasishtha and Baudhayana*, vol. 14 of Sacred Books of the East, ed. F. Max Muller (Oxford: Clarendon Press, 1882), 137-48. See also *History of Bengal*, ed. R.C. Majumder, 2nd ed. (Dacca, 1963), 8, 290.

হয়েছিল অর্থাৎ বৌধ্যায়ণ-ধর্মসূত্রে বর্ণিত তিনটি সমকেন্দ্রিক বৃত্তের সবচেয়ে বাইরেরটিতে তথা সেই ব্রাহ্মণিক সভ্যতার আওতার বাইরে ইসলামের সাফল্য সবচেয়ে কম হওয়ার কথা। কিন্তু সেই বাইরের বৃত্তেই ব্রাহ্মণিক– যা ১৯৪৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে গঠিত পাকিস্তানের এলাকার সাথেই মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ –সেখানেই দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের সবচেয়ে বড় অংশ বাস করে। দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের আধুনিক বিভাগ-পূর্ব অবস্থা সেই তত্ত্বের বিপরীত বিষয়েরই ইঙ্গিত দেয়–অর্থাৎ যেখানে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার উপস্থিতি কম ছিল, সেখানে ইসলামীকরণ ঘটেছে বেশি। ভারতের 'পরিমণ্ডলে' বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠী যদি প্রথম ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে লীন হয়ে না থাকে, তবে হিন্দু সামাজিক নির্যাতন এড়ানোর বিষয়টি যৌক্তিকভাবে উত্থাপিত হয় না; অন্তত অভিজ্ঞতা থেকে তা বলা যায় না।

বাংলায় ইসলামীকরণের তত্ত্বসমূহ

বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যার পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি ইংরেজরা অবগত হয় তুলনামূলকভাবে অনেক পরে। বৃটিশদের তৎপরতা হিন্দু প্রাধান্যবিশিষ্ট দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে তথা কলকাতায় কেন্দ্রীভূত থাকায়, ঔপনিবেশিক কর্মকর্তারা ঊনবিংশ শতকের অধিকাংশ সময়ই বাংলার পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোকে তাদের কাছে সাধারণভাবে অপরিচিত সংস্কৃতি সমৃদ্ধ একটি বিশাল ও অত্যন্ত প্রত্যন্ত পশ্চাৎভূমি হিসেবে বিবেচনা করতো। কিন্তু ১৮৭২ সালে প্রদেশটিতে পরিচালিত প্রথম সরকারি আদমশুমারিতে যখন দেখা গেল চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, পাবনা ও রাজশাহী জেলাসমূহে ৭০ শতাংশ এবং বগুড়া জেলায় ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ মুসলমান, তখন তারা পুরোপুরি হতবাক হয়ে গিয়েছিল (দেখুন মানচিত্র ৩)।[১৭] প্রদেশটি সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সরকারি কর্মকর্তা জেমস ওয়াইজ ১৮৯৪ সালে লিখেন, '১৮৭২ সালের আদমশুমারিতে প্রকাশিত সবচেয়ে কৌতূহলজনক তথ্যটি হলো, বাংলার নিম্নাঞ্চলে বিপুল সংখ্যক মুসলমানের বাস-পুরাতন রাজধানীগুলোতে নয়, বরং বদ্বীপটির পলল সমভূমিতে।' তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করেন, 'নিম্ন ও পূর্ববঙ্গে মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের বিস্তৃতির ইতিহাস বর্তমানকালে এতোবেশি গুরুত্বপূর্ণ যে, এজন্য বিষয়টি নিয়ে সতর্ক পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন।'[১৮]

বিষয়টির অবশ্যই পর্যালোচনা হয়েছিল। ১৮৭২ সালের আদমশুমারি উত্তপ্ত বিতর্কের সৃষ্টি করে এবং তা ঊনবিংশ শতকের বাকি সময় এবং একই সাথে বিংশ শতকেও অব্যাহত থাকে। প্রথম গোলাটি ছোড়েন আদমশুমারি রিপোর্টটির

১৭. H. Beverly, *Report on the Census of Bengal*, 1872 (Calcutta: Secretariat Press, 1872), 12-15.

১৮. James Wise, "The Muhammadans of Eastern Bengal," *Journal of Asiatic Society of Bengal* 63 (1894): 28.

সংকলক হেনরি বেভারলি নিজে। মুসলিম প্রাধান্যের সাবেক কেন্দ্রগুলোতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার আপাত অসামঞ্জস্যের কথা উল্লেখ করে বেভারলি মন্তব্য করেন, বাংলায় মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য দেশটিতে মোগল রক্ত প্রবেশের চেয়ে হিন্দুবাদের কঠোর অসহিষ্ণু বর্ণব্যবস্থাই সাবেক অধিবাসীদের ধর্মান্তরকরণের জন্য বেশি দায়ী।[১৯] সংক্ষেপে অভিবাসন তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করেন এবং সামাজিক মুক্তির তত্ত্বে প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন করেন। এরপর থেকে এই তত্ত্বটি প্রদেশটির ইসলামীকরণের ব্যাখ্যায় বৃটিশদের চিন্তা চেতনায় প্রাধান্য বিস্তার করে এবং পরিণতিতে অধিক সংখ্যক মুসলমান এর দিকে ধাবিত হয়।

কিন্তু বেভারলির ব্যাখ্যা চ্যালেঞ্জবিহীন যায়নি। ১৮৭২ সালের আদমশুমারির তথ্য প্রকাশের পরপর মোমেনমাহী জেলার সম্ভ্রান্ত মুসলমান আবু এ গজনভি তাঁর জেলার কালেকটরের কাছে জমা দেওয়া একটি রিপোর্টে গণ-ধর্মান্তরের বেভারলির যুক্তির বলিষ্ঠভাবে বিরোধিতা করে তিনি দাবী করেন, 'আধুনিক মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ চণ্ডাল বা কৈবর্তদের বংশধর নয়, বরং বিদেশি বংশোদ্ভূত, যদিও অনেক ক্ষেত্রে তা কমবেশি মাত্রায়।'[২০] গজনভি তাঁর যুক্তির পক্ষে বলতে গিয়ে তুর্কী শাসনের আগে আরব অভিবাসন, সুলতান হোসেন শাহের বিদেশীদের ভূমিদান, মোগল বিজয়ের পর 'প্রতিটি পল্লীতে' আফগানদের ছড়িয়ে পড়া, মুসলমানদের মধ্যে বহুবিবাহ ও বিধবা বিবাহের রীতির কারণে জন্মহারের ব্যাপকতা, তাদের আয়ু বেশি হওয়া, মুসলমানদের মধ্যে বর্ণব্যবস্থা বা কৌমার্যব্রত গ্রহণকারী সন্ন্যাসীর অনুপস্থিতির কথা উল্লেখ করেন।[২১] যদিও 'কিছু' ধর্মান্তরের কথা স্বীকার করেও গজনভি দৃঢ়তার সাথে বলেন, তা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে হয়নি। তিনি প্রশ্ন করেন, 'আমরা কেন শুধুমাত্র নিম্নবর্ণের হিন্দুদের কথা বলছি? আমরা কেন বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে মোমেনশাহিতে মুসলমান রাজপুত দেওয়ান,----একইভাবে সিলেটের মজুমদার, ফরিদপুরের রাজা সাহেব, বিক্রমপুরের গাঙ্গুলি এবং আরো অনেকের কথা ভুলে যাচ্ছি।'[২২]

গজনভি এখানে ইসলামীকরণের অভিবাসন তত্ত্বের রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন, যা ছিল সমগ্র ভারতে আশরাফ শ্রেণীর অনুকূলপ্রাপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি। আর স্থানীয় ধর্মান্তর যদি হয়েও থাকে, তবে গজনভির মতে তা অচ্ছুৎ নিম্নবর্ণ থেকে নয়, বরং হিন্দু সমাজের উঁচু স্তর থেকে। বিংশ শতকের দিকে, কিছু ঘটনায় দেখা যায়, মোগল আমলে

---

১৯. Beverly, *Report*, 132.
২০. Abu A. Ghuznavi, "Notes on the Origin, Social and Religious Divisions and Other Matters Touching on the Mahomedans of Bengal and Having Special Reference to the District of Maimensing" (India Office Library, London, European MSS., E 295., vo. 17 [n.d.], 3.
২১. Ibid., 4-12.
২২. Ibid., 14.

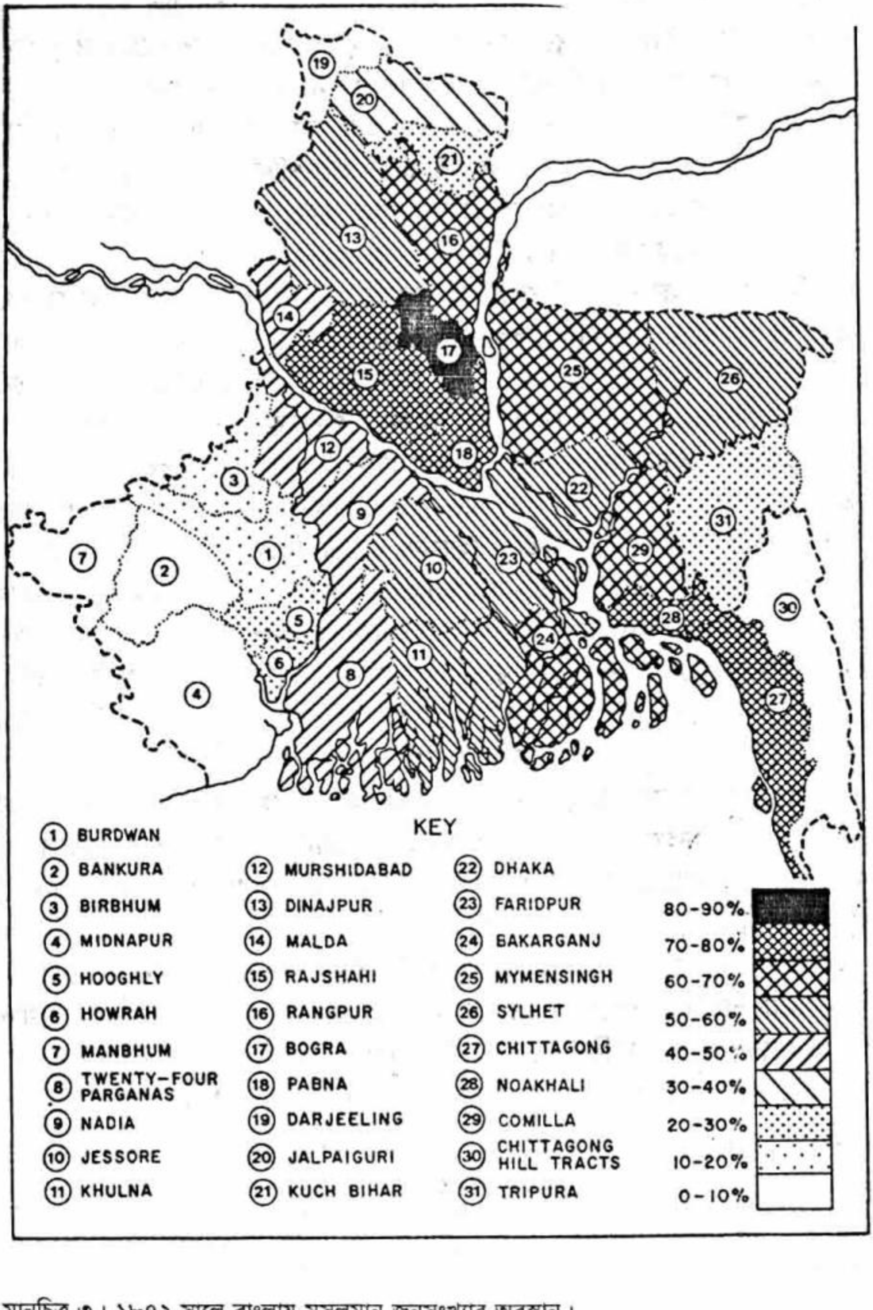

মানচিত্র ৩। ১৮৭২ সালে বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যার অবস্থান।

বাংলার ভূস্বামী অভিজাতদের কেউ কেউ এবং এমনকি পুরোহিত শ্রেণীও ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে। আকবরের এক সেনাপতির হাতে পরাজিত খরগপুরের (মুঙ্গের জেলা) রাজারা তাদের পারিবারিক ভূসম্পত্তি রক্ষার শর্তে ইসলাম গ্রহণ করেছিল; উত্তর বিহারের দারভাঙ্গার পরসৌনির রাজা পুরদিল সিং মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পর প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে মুসলমান হন, ত্রিপুরার পরগনা সরাইল, মোমেনশাহির হায়বতনগর ও জঙ্গলবাড়ির মুসলমান দেওয়ান পরিবারগুলো এক সময়ে ব্রাহ্মণ ছিল; দারভাঙ্গার মাজৌলির পাঠানরা নরহানের রাজার পরিবার থেকে সৃষ্ট।[২৩] অবশ্য এসব উদাহরণ, মোট মুসলমান জনসংখ্যার একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র এবং তা দিয়ে আদমশুমারিতে প্রাপ্ত লাখ লাখ মুসলমান কৃষকের উপস্থিতির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

এদিকে উনবিংশ শতকের শেষ দশকগুলোতে বৃটিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে ইসলামীকরণ সম্পর্কে একটি ঐকমত্য সৃষ্টি হতে থাকে। এখানে আমরা জেমস ওয়াইজের রচনার পরীক্ষা করতে পারি। এই অভিজ্ঞ কর্মকর্তা দশ বছর ঢাকায় সিভিল সার্জন হিসেবে কাজ করেছেন এবং তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি 'পূর্ববাংলার মুসলমান' (The Muhammadans of Eastern Bengal) (১৮৯৪) শীর্ষক এক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন।[২৪] গজনভির মতো আশরাফ মুখপাত্রদের অনুকূলপ্রাপ্ত অভিবাসন তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করে ওয়াইজ মত প্রকাশ করেন, 'মুসলমানদের ইতিহাসে উত্তর ভারত থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলমানের অভিবাসনের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। এবং আমরা জানি, আকবরের শাসনকালে বাংলার আবহাওয়াকে মোগল আগন্তুকদের কাছে অস্বস্তিকর মনে হতো এবং এখানে প্রেরণকে নির্বাসনের শাস্তি হিসেবে বিবেচনা করা হতো।'[২৫] ওয়াইজ তারপর বাঙালি জনগোষ্ঠী কিভাবে এবং কেন মুসলমান হলো তার কয়েকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রথমত, তিনি কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই তরবারি ধর্মতত্ত্বের প্রচার করে বলেন, 'ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে অত্যুৎসাহী সৈন্যরা বাংলার ভীরু গোত্রগুলোর মধ্যে ইসলামের প্রচার করেছে এবং পূর্ব সীমান্তের ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করেছে, সিলেটের গ্রামগুলোতে আল-হেলাল উড়িয়েছে।' চট্টগ্রাম অঞ্চলটি আরবদের উপনিবেশ ছিল বলেও তিনি স্বীকার করে নেন। তিনি আবারো কোন প্রমাণের উল্লেখ ছাড়াই বলেন, আরব বণিকরা চট্টগ্রাম উপকূল জুড়ে ব্যাপক

২৩. E.A. Gait, "The Muhammadans of Bengal," in *Census of India*, 1901, vol. 6, *The Lower Provinces of Bengal and Their Feudatories*, pt. 1 "Report" (Calcutta: Bengal Secratariat Press, 1902), 170.

২৪. Wise, "The Muhammadans of Eastern Bengal," 28-63.

২৫. Ibid., 29, অধিকন্তু তিনি আরো বলেন, সুবেদারগণ এবং অভিজাত প্রশাসকগণ সাধারণত যত বেশী পরিমাণে সম্ভব সম্পদ সংগ্রহ করে বিরূপভাবাপন্ন প্রদেশটি ত্যাগ করতেন এবং "শুধুমাত্র কিছু কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত সৈন্য স্থানীয় পরিবারে বিবাহ করে সেখানে থেকে যেতেন এবং নতুন বাসা-বাড়িতে স্থায়ী হতেন।"

বাণিজ্যের পাশাপাশি 'তাঁরা জনগণের মধ্যে তাঁদের ধর্মীয় আদর্শ প্রচার করেছে।' অধিকন্তু তাঁর মতে, বেপরোয়া ও নিঃস্ব পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের দাস হিসেবে মুসলমানদের কাছে বিক্রি করায় পূর্ব বাংলার গ্রামগুলো থেকে সংগৃহীত দাসরা মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি করে। তিনি আরও বলেন, 'খুন বা ব্যভিচারের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যও হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হতে পারে, কেননা এটা যে-কোন অপরাধের একমাত্র পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে বিবেচনা করা হতো।'[২৬] এসবই নিছক অনুমান।

তবে ওয়াইজের প্রধান যুক্তিটি সরকারি মহলে ব্যাপকতম গ্রহণযোগ্যতা পায়। তিনি লিখেন, মুসলমান সেনাবাহিনী যখন বাংলায় প্রবেশ করলো, এটা বিশ্বাস করা কষ্টকর যে, বনের কাঠুরে এবং জেলেরা এবং হতাশায় নিমজ্জিত চণ্ডাল ও কৈবর্তরা সকল মানুষের সাম্যের কথা ঘোষণাকারী ধর্ম এবং যে সম্প্রদায়ের ধর্ম তাদের সাবেক নির্যাতনকারীদের বশে রেখেছিল, তখন আনন্দিতভাবে বরণ করে নেয়নি। হিন্দুবাদ অচ্ছুৎদের একই গ্রামে বসবাস নিষিদ্ধ করে, দ্বিজ ব্রাহ্মণরা তাঁকে সবচেয়ে ঘৃণ্য ও কঠিন পেশা নিতে বাধ্য করে এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁকে নিম্নস্তরের প্রাণী হিসেবে অভিহিত করে; কিন্তু ইসলাম ঘোষণা করে, ধনী ও গরিব, দাস ও তার প্রভু, কৃষক ও রাজপুত্র সবাই আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান। সর্বোপরি, ব্রাহ্মণরা সর্বাধিক গুণসম্পন্ন দাসদেরও ভবিষ্যৎ জগতের কোন আশা দেখাতে পারে না, অন্যদিকে মোল্লারা শুধুমাত্র এই পৃথিবীরই পরম সুখের নিশ্চয়তা দেয় না, সেই সাথে পরবর্তী দুনিয়াতেও চিরন্তন ঠিকানার কথা বলে।[২৭]

এটা অন্য সব জায়গায় দ্রষ্টব্য সামাজিক মুক্তি তত্ত্বেরই বলিষ্ঠ সমর্থন এবং উক্ত তত্ত্বের সকল প্রয়োজনীয় উপাদানই এতে দেখা যায়: আগে থেকে সেখানে অত্যন্ত স্তরীভূত হিন্দু সামাজিক বিন্যাস, ঘৃণ্য কাজে জড়িত অচ্ছুৎ নির্যাতিত একটি শ্রেণী, ব্রাহ্মণদের একটি নির্যাতনকারী শ্রেণী এবং ইসলামকে একটি সামাজিক সংস্কারের আদর্শবাদ হিসেবে উপলব্ধি যার কারণে গণমানুষের 'আনন্দচিত্তে' তাঁকে বরণ। কিন্তু বাংলার আশরাফ মুসলমানরা এ ধরনের যুক্তি গ্রহণ করেনি। এমনকি ব্রাহ্মণদের নির্দয় নির্যাতনকারী হিসেবে চিহ্নিতকরণে ওয়াইজের সাথে একমত হওয়ার প্রবণতা থাকলেও তারা বাংলার মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বদ্বীপের অধিবাসী হিসেবে মেনে নেয়নি। ওয়াইজের প্রবন্ধ প্রকাশের পরের বছর তথা ১৮৯৫ সালে খন্দকার ফজলি রাব্বি তাঁর 'The Origin of the Musalmans of Bengal' প্রকাশ করেন। পূর্বসূরী আবু গজনভির মতো রাব্বিও 'এই দেশের স্থানীয় মানুষ কোন সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বলপূর্বক বা স্বেচ্ছায় ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার'

২৬. প্রাগুক্ত, ২৮-৩০।
২৭. প্রাগুক্ত, ৩২।

বক্তব্য অস্বীকার করেন।[২৮] তিনি বরং দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'এদেশের বর্তমান মুসলমানদের পূর্বপুরুষগণ অবশ্যই সাবেক শাসকের শাসনকালে আগত বৈদেশিক মুসলমান।'[২৯] বস্তুত, রাব্বির দৃষ্টিভঙ্গিতে বদ্বীপটির ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এই প্রক্রিয়ার একটি প্রমাণ হিসেবে যুক্তি প্রদর্শন করে বলা হয়, অঞ্চলটি 'সব সময়েই বৈদেশিক আগ্রাসন থেকে নিরাপদ থেকেছে এবং পরিণতিতে এটা মুসলমানদের জন্য একটা বড় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।'[৩০] তবে যে প্রাকৃতিক সীমান্ত মুসলমানদের বৈদেশিক আক্রমণকারীদের থেকে রক্ষা করেছে, তা কেন মুসলমান আক্রমণকারীদের থেকে বাঙালিদের রক্ষা করেনি, সে ব্যাখ্যা রাব্বি দেননি। সম্ভবত তিনি মুসলমানদের আক্রমণকারী নয় বরং স্রেফ অভিবাসী বসতি স্থাপনকারী হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

রাব্বি বাংলার 'সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের নিষ্কর ভূমিদানের (আয়মা) অনেক ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, এগুলো বিদেশী বসতি স্থাপনের ভিত্তিতে পরিণত হয়। তিনি লিখেন, 'বাংলার তিনটি প্রাচীন বিভাগকে তথা রাঢ় (দক্ষিণ-পূর্ব), বরেন্দ্র (উত্তর) ও বঙ্গ (পূর্ব) বিবেচনায় আনলে দেখা যায়, আয়মা অধিকাংশ প্রদান করা হয়েছে রাঢ়ে, বরেন্দ্রতে তুলনায় কম এবং বঙ্গে বিরল।'[৩১] কিন্তু এই যুক্তির জটিলতা হলো মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যেসব এলাকায় দেখা যায়, রাব্বির ভাষায় সেখানে নিষ্কর ভূমিদান ঘটেছে সবচেয়ে কম। তাছাড়া ভূমি চাষে অস্বীকৃতিকারী উচ্চবংশের অভিবাসীদের বংশধররা কিভাবে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ কৃষক সম্প্রদায় সৃষ্টি করলো, গ্রন্থকার সেই জটিল প্রশ্নের ব্যাখ্যা দিতেও সমস্যায় পড়েছেন। তিনি অনুমান করেছেন, 'তাদের সম্পদ শেষ হওয়ায়' কিংবা তাদের মধ্যে যারা সৈনিক ছিল তারা যখন সামরিক চাকুরি পেল না, তখন কৃষিকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। এর পরপরই কৃষিজ উৎপাদনশীলতার উন্নতি হয় এবং বাংলায় শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করতে থাকে, এই শ্রেণীর মুসলমান চাষীর সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়।[৩২]

রাব্বির পুস্তকটি প্রকাশের পরপরই ১৯০১ সালের বিতর্কিত 'ভারতের আদমশুমারী' প্রকাশিত হয় এবং তাতে গজনভি ও রাব্বির প্রতিক্রিয়াই পুনর্ব্যক্ত করা হয়। এই আদমশুমারির রিপোর্টে ই.এ. গেইট উপসংহার টানেন যে, বর্ণ জানতে চাওয়া হলে বাঙালি মুসলমান চাষীদের স্থানীয় উৎস সত্ত্বেও সম্ভবত নয়-দশমাংশ

২৮. Khondkar Fuzli Rubbee, *The Origin of the Musalmans of Bengal* (1895: 2nd ed., Dacca: Society for Pakistan Studies, 1970), 4041.

২৯. Ibid., 43.

৩০. Ibid., 17.

৩১. Ibid., 59.

৩২. Ibid., 87-94.

নিজেদের গৎবাঁধা জবাব দিয়েছে-'শেখ'।[৩৩] বদ্বীপের বাইরের এলাকা থেকে অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও অভ্যন্তরে মুসলিম বসতির কোন ধরনের তাৎপর্যমণ্ডিত অভিবাসন হয়েছিল কিনা, সে ব্যাপারেও গেইট সন্দেহ প্রকাশ করেন। বাংলার মুসলমানরা সাধারণভবে পুরাতন রাজধানীগুলোর কাছে ব্যাপক মাত্রায় বসতি স্থাপনের বিষয়টি লক্ষ্য করে তিনি বলেন, 'তারা সম্ভবত কখনো নোয়াখালি, বগুড়া ও বাকেরগঞ্জের ধানক্ষেতে বসবাস করতে আগ্রহী ছিল না।'[৩৪]

চলমান বিতর্কে গেইটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল তার এই উপলব্ধি যে, বাংলার ব্যাপক মুসলমান জনসংখ্যা সরলতম সামাজিক সংগঠন তথা বর্ণের ন্যূনতম বিস্তৃতিতে সম্পর্কযুক্ত। পূর্বাঞ্চলের মুসলমানদের সাথে পোদ ও চণ্ডাল সম্প্রদায়ের এবং উত্তরাঞ্চলের আদিবাসী রাজবংশী ও কুচ সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করে গেইট মন্তব্য করেন, 'দেশের এসব অঞ্চলে হিন্দুদের অন্যান্য বর্ণের উপস্থিতি সব সময়েই খুব কম ছিল। উত্তরবঙ্গের প্রধান বর্ণগুলো হচ্ছে রাজবংশী (কুচসহ) এবং পূর্ববঙ্গে অনার্য উৎসের চণ্ডাল ও অন্যান্য বর্ণ।[৩৫] এই পর্যবেক্ষণ হয়তো অস্পষ্ট ও পক্ষপাতমূলক চিন্তাধারার অবসান ঘটায় এবং বিতর্কের একটি বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। যেখানেই জাতিভেদের স্বল্পতা থাকবে, সেখানে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য থাকবে কম এবং তাই অচ্ছ্যুৎদের নির্যাতনও হবে কম। আর সে ধরনের নির্যাতন ছাড়া 'সামাজিক মুক্তি তত্ত্ব' নস্যাৎ হয়ে যায়, কারণ ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজ না থাকলে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য 'নিম্নশ্রেণীর' আত্মরক্ষার প্রয়োজন পড়ে না।

তবে গেইট নিজে তাঁর পর্যবেক্ষণ নিয়ে অগ্রসর হননি; বস্তুত, মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ স্থানীয় উৎসের, এই বক্তব্য বিবৃত করা ছাড়া তিনি ইসলামীকরণের কোন সুস্পষ্ট তত্ত্ব প্রদান করেননি। কিন্তু যেহেতু তাঁরা 'ভারতের আদমশুমারি' প্রকাশের দায়িত্বে ছিলেন, তাই এসব মন্তব্য যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। এর পরপরই 'Settlement Reports' ও ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তাকারী 'Bengal District' যা বিংশ শতকের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হতে থাকে, তাতে অনুরণিত হতে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, নোয়াখালি জেলা গেজেটিয়ারে (১৯১১) বলা হয়, 'শেখদের (অর্থাৎ মুসলমান চাষী) বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং সম্প্রদায়ের নিম্নতর শ্রেণীসমূহ জেলার আদিবাসী সম্প্রদায়ের বংশোদ্ভূত' অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে চণ্ডাল।[৩৬] একইভাবে বগুড়া ও পাবনা জেলার সেটেলমেন্ট রিপোর্টে (১৯৩০) বলা হয়, এসব জেলায় মুসলমান সম্প্রদায়ের 'হিন্দু থেকে ধর্মান্তরের ঘটনাটি তুলনামূলক সাম্প্রতিক' হওয়ার প্রমাণ

৩৩. Gait, Muhammadans," in *Census of India*. 1901, 6: 169.
৩৪. Ibid., 166.
৩৫. Ibid., 169
৩৬. J.E Webster, *East Bengal and Assam District Gazetteers: Noakhali* (Allahabad: Pioneer Press, 1911), 39.

দেখা যায় এবং জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ 'উত্তরবঙ্গের আদিবাসী তথা কুট বংশোদ্ভূত।'[৩৭]

১৯৪৭ সালের আগের দশকে তিনটি নৃতাত্ত্বিক জরিপে প্রাপ্ত তথ্যে সরকারি মহলে একটি ঐকমত্যের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। যদিও পদ্ধতিগত, নমুনা চয়ন এবং বদ্বীপের মধ্যকার অঞ্চল নির্বাচনে পার্থক্য ছিল কিন্তু তবুও সবকটিতে ঐকমত্য দেখা যায় যে, বাঙালি মুসলমানরা বহিরাগত নয়, আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর বংশধর। প্রথমটিতে ১৯৩৮ সালে চব্বিশ পরগনাতে জরিপ চালিয়ে এইলিন ম্যাকফারলেন উপসংহার টানেন, 'বজবজের মুসলমানদের ব্লাড-গ্রুপের উপাত্ত সুস্পষ্টভাবে স্থানীয় অন্যান্যের মতো এবং অনুপাতটি বর্তমানকালে তাদের কিছু প্রতিবেশীদের প্রায় সমান হওয়ায় এসব মানুষ নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত।'[৩৮] তিন বছর পর সেই চব্বিশ পরগনায় বি.কে. চ্যাটার্জি ও এ.কে. মিত্র পরিচালিত আরেকটি জরিপে শুধুমাত্র নিম্নবর্ণের বাঙালি হিন্দুদের সাথে পল্লীর মুসলমানদের ব্লাড-গ্রুপের সাথেই নয়, সেই সাথে শহুরে মুসলমান ও অ-বাঙালি মুসলমান উভয়ের সাথেই তুলনা করা হয়। জরিপে দেখা যায়, পল্লীর মুসলমান ও তাদের নিম্ন-বর্ণের হিন্দু প্রতিবেশী মহিষ্য ও বাগদির মধ্যে সামঞ্জস্য আছে এবং আরো দেখা যায়, শহুরে বাঙালি মুসলমানের ব্লাড-গ্রুপ পল্লীর বাঙালি মুসলমানদের চেয়ে দূরবর্তী ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠানদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এর মাধ্যমে শহুরে মুসলমানদের বিদেশী অভিবাসী হিসেবে বাংলায় আগতদের বংশধর হওয়ার দাবিকেই প্রতিষ্ঠা করে।[৩৯]

পরিশেষে ডি. এন. মজুমদার ও সি. আর. রাও ১৯৪৫ সালে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গ থেকে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে ১৯৬০ সালে তাদের জরিপ রিপোর্ট প্রকাশ করেন; উপাত্ত সংগ্রহ পর্বের পরপরই ১৯৪৭ সালে প্রদেশটির বিভক্তিজনিত কারণে জনসংখ্যার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। গোষ্ঠিগত বৈচিত্র্য সংজ্ঞায়িত করার জন্য এই গবেষকদ্বয় দৈহিক কাঠামো, মুখাবয়বের প্রশস্ততা এবং নাসিকা-উচ্চতা লক্ষ্য করে উপসংহার টানেন, 'বাংলার মুসলমান জনসংখ্যার সম্ভাব্য উৎসের জন্য আমাদের বাংলার উপজাতীয় ও তফসিলি বর্ণের অমুসলমান হিন্দু গ্রুপগুলোর দিকে নজর দিতে হবে।--- বাংলার (বিভাগ-পূর্ব) মুসলমান জনগোষ্ঠীর রক্ত সম্পর্কিত তত্ত্বে একই

৩৭. D. MacPherson, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the Districts of Pabna and Bogra, 1920-29* (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1930), 31, 32.

৩৮. Eileen W. E. Macfarlane, "Blood-Group Distribution in India with Special Reference to Bengal," *Journal of Genetics* 36, no. 2 (July 1938): 230, 232.

৩৯. B. K. Chatterji and A. K. Mitra, "Blood Group Distributions of the Bengalis and Their Comparison with Other Indian Races and Castes," *Indian Culture* 8 (1941-42): 197, 201, 202.

দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়, অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানরা ভারতের বহিরাগতদের এবং এমনকি উত্তর প্রদেশের শিয়া ও সুন্নি মুসলমান থেকে ভিন্ন। ব্লাড-গ্রুপ প্রমাণই যদি আসল হয়, তবে তা মুসলমানদের স্থানীয় উৎসেরই ইঙ্গিত দেয়।'[৪০] গ্রন্থকারদ্বয় আরো গুরুত্বপূর্ণ নৃতাত্ত্বিক নির্দেশনা (মাথার উচ্চতা ও প্রশস্ততা, নাকের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ) বিবেচনা করে দেখতে পান, পূর্ববঙ্গ গ্রুপ, মুসলমান ও অমুসলমান উভয়ই, পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে মৌলিকভাবে ভিন্ন।[৪১] এই শেষ আবিষ্কারটি এমনকি পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকেও হ্রাস করে।

বিংশ শতকের প্রথমদিকে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলো যখন বেগবান হচ্ছিল এবং বিশেষ করে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার পর বৃটিশ ভারতে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক 'আবাসভূমি' দাবি ক্রমাগত উচ্চারিত হচ্ছিল, তখন ইসলামীকরণের পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন তত্ত্ব আরো তীব্র হয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা মোটের উপর বিষয়টি এড়িয়ে যেতে থাকে, কারণ ভারতীয় সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশের কোন ধরনের বৈদেশিক উৎস কিংবা সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে অতীত ইসলামীকরণের স্বীকৃতিতে সকল ভারতীয় মানুষের মৌলিকভাবে ঐক্য ও সমজাতীয়তা সংক্রান্ত জাতীয়তাবাদীদের অবস্থান দুর্বল হয়ে যায়। মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের প্রচারিত 'সামাজিক মুক্তি তত্ত্ব'ও হিন্দুদের পক্ষে মেনে নেওয়া সহজ ছিল না, কারণ এতে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নির্যাতনকারী ধিকৃত ভূমিকায় ফেলে দেয়।[৪২]

অন্যদিকে অনেক মুসলমানের কাছে ভারতীয় উপমহাদেশে পৃথক মুসলিম সম্প্রদায় ইস্যুটি ছিল মৌলিক, কারণ এতে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র পাকিস্তানের ঐতিহাসিক ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করে। এর ফলে 'অভিবাসন তত্ত্ব' ত্যাগ করা আরো কঠিন হয়ে যায়, এমনকি যদিও, বিশেষ করে বাংলায় পর্যাপ্ত নৃতাত্ত্বিক তথ্যে দেখা যাচ্ছে, মুসলমান জনসাধারণের পূর্বপুরুষরা ত্রয়োদশ শতকের অনেক আগে থেকেই বদ্বীপটিতে বসবাস করছিল। এর ফলে অনেককে দ্রুত বিকশিত তত্ত্ব তথা 'অভিবাসন' ও 'সামাজিক মুক্তির ধর্ম' উভয় তত্ত্বের সমন্বয়কে গ্রহণ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি আশরাফ অভিবাসীরা

৪০. D. N. Majumder and C. R. Rao, *Race Elements in Bengal* (Calcutta: Asia Publishing House, 1960), 96, 98, 114.

৪১. প্রাগুক্ত, ৯৬।

৪২. এই অবস্থানের একজন ব্যতিক্রম ছিলেন নীহাররঞ্জন রায়। তিনি ১৯৪৫ সালে লিখেন, "হিন্দুদের নিম্নতর শ্রেণীর অনেকের কাছে সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইসলামের আবেদন ছিল অনেক বেশি গণতান্ত্রিক এবং ধর্ম প্রশ্নে সহজতর ধর্মাচারের সাথে সাথে ক্ষমতাসীন শ্রেণীর কাছে টানার প্রলোভন ও তাদের ধর্মান্তরিত করার আকাঙ্ক্ষা, মুক্তির রাস্তা খুলে দেওয়া, অন্যদিকে অন্তত সীমিত সংখ্যকের জন্য হলেও উচ্চবর্ণের ধর্মীয় ও সামাজিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে স্বর্গ হিসেবে পরিগণিত হয়।" Ray, "Medieval Bengali Culture," 49.

এখানে বসতি স্থাপন করে এবং প্রকৃতিগতভাবে বাঙালিতে পরিণত হয়, অন্যদিকে একই সময়ে বাঙালি জনগোষ্ঠী ইসলামের সাম্যবাদী মূল্যবোধে আকৃষ্ট হয়। এই পারস্পরিক সমন্বয় আশরাফ ও সাধারণের মধ্যকার সামাজিক পার্থক্য মুছে ফেলার তত্ত্বটি ১৯৪৭ উত্তর মুসলিম সরকারের জন্য আদর্শগত ভিত্তিতে পরিণত হয়, যা তাদের সীমান্তের মধ্যে বসবাসকারী সকল মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করার উপর জোর দেয়।[৪৩]

ঐতিহাসিকভাবে, ঔপনিবেশিক যুগের পরিণাম এবং স্বাধীনতা আন্দোলন হিন্দু ও মুসলমানদের বিশিষ্ট ও এমনকি শত্রুতাপূর্ণ শ্রেণীতে মেরুকরণ করে, যা এসব শ্রেণীকে অতীতে ফেলে প্রাক-আধুনিক বাংলার ইতিহাসকে একে অন্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনাকারী হিসেবে চিত্রিত করে। এখানে ১৯৬৩ সালে প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক এস. কে. চ্যাটার্জির লেখা তুর্কী বিজয়ের বীভৎস বর্ণনা দেওয়া হলো:

এসব নির্মম বিদেশীদের বাংলা জয় ছিল ভয়ংকর হারিকেনের মতো যা দেশকে নিশ্চিহ্ন করেছিল, শান্তিপ্রিয় মানুষ অকল্পনীয় সন্ত্রাস ও মারাত্মক অত্যাচার পাইকারি ধ্বংসযজ্ঞ, অপহরণ এবং নারী-পুরুষদের ক্রীতদাসে পরিণত করা, মন্দির, প্রাসাদ, বিগ্রহ ও পাঠাগার ধ্বংস এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের শিকার হয়। মেক্সিকো, পেরু ও আমেরিকার অন্যান্য স্থানে স্পেনিশ ক্যাথলিকদের বিজয়ের মতো মুসলমান তুর্কীরা শয়তানের কর্ম বিবেচনা করে সেখানকার সংস্কৃতি ও ধর্ম ধ্বংস করতে চেয়েছে।[৪৪]

---

৪৩. এই তত্ত্ব স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে বাঙালি ইতিহাসবিদদের মধ্যে অন্যতম প্রভাবশালী আবদুল করিমের মাধ্যমে পরিস্ফুটিত হয়। তিনি লিখেন, "বস্তুত, মুসলমানরা এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিল, এর ভাষা শিখেছিল, স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মিলেমিশে ছিল, স্থানীয় মহিলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিল এবং তাদের খাদ্যাভ্যাস ও বসতবাড়ির ব্যাপারে তারা স্থানীয়ভাবে প্রাপ্তিসাধ্য উপকরণের উপর নির্ভর করেছিল, এসব তথ্যই প্রমাণ করে যে তারা বাংলাকে তাদের স্বদেশরূপে বিবেচনা করেছিল। এর পাশাপাশি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। সুতরাং এ রকম ইঙ্গিত করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, বাঙালি মুসলমান সমাজ ইতিমধ্যে তার গঠনশীল পর্যায় অতিক্রম করে নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল এবং দেশে সহিষ্ণুতা, সাম্য ও বিশ্বপ্রেমেও এক নতুন চেতনা এত বেশী মাত্রায় সঞ্চার করেছিল যার ফলে জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং এমন কি তৎকালীন হিন্দু ধর্মও গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। খোদ ব্রাহ্মণ সমাজের পুনর্গঠন এবং প্রধানত চৈতন্য-আন্দোলনের বর্ণহীন সমাজের মতো মত অন্য কোন কোন ব্যাপারে এই প্রভাবের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়।" আবদুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস,* ২৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা। অভিবাসন তত্ত্বের সাথে সামাজিক মুক্তি আন্দোলনের পদ্ধতির নতুন সাম্প্রতিক প্রকাশের জন্য দেখুন, Muhammad Mohar Ali, *History of the Muslims in Bengal* (Riyadh: Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, 1985), 1B: 750-88.

৪৪. Suniti Kumar Chatterji, *Languages and Literatures of Modern India* (Calcutta: Bengal Publishers, 1963), 160-161.

এছাড়া বিখ্যাত ভারতীয় বাঙালি ঐতিহাসিক আর. সি. মজুমদার প্রাক-আধুনিক বাংলায় ইসলামের সম্প্রসারণকে বর্ণনা করেছেন এভাবে:

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় পাশাপাশি অবস্থানরত দুটি শক্ত প্রাচীর ঘেরা দুর্গে ছিল, প্রতিটিরই শুধুমাত্র একটি দরজা অর্থাৎ হিন্দুদের জন্য নির্গমনের এবং মুসলমানদের জন্য প্রবেশের। স্পর্শ ও বিশুদ্ধতার বিধিমালার সামান্য বিচ্যুতিও হিন্দুকে সমাজচ্যুত করতো পুনঃ অন্তর্ভুক্তির কোন সুযোগ না দিয়েই এবং একবার তারা ইসলামের দুর্গে প্রবেশ করলে নবাগতদের জন্য দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যেত। এটা হতো বলপূর্বক ধর্মান্তর, এবং জাগতিক লাভ বা সুবিধার প্রলুব্ধকরণের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ উভয়ভাবে, কমই সহজাতভাবে, ফলে হিন্দুরা ধীরে ধীরে ইসলামের আওতায় চলে যেতে থাকে, মধ্যযুগে এটাই হিন্দু সমাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে।[৪৫]

চ্যাটার্জির অতি উত্তপ্ত বাগম্বড়তায় ইঙ্গিত দেওয়া এবং মজুমদারের দুর্গ ও দরজার সামরিক কল্পনায় সুস্পষ্টভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ধর্মগুলোর চিরকালীন বৈশিষ্ট্য ছিল বদ্ধ, আত্মসংযত ও পারস্পরিক বর্জনশীল। অবশ্য, এ ধরনের অনৈতিহাসিক ও নিয়মাত্মক ধারণা আধুনিক যুগে সীমিত নয়, এটা বিংশ শতক জুড়ে বিশেষভাবে বিস্তৃত হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) থেকে উত্তর প্রদেশের নিকটস্থ অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংস (১৯৯২), ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক-উত্তর রাজনীতিবিদগণ ধারণাটিতে উৎসাহিত হয়েছেন ও কার্যকরভাবে ব্যবহার করেছেন। ধর্মের এই অপরিহার্যতা ধারণা থেকে ঐতিহাসিকগণ নিরাপদ ছিলেন না, চ্যাটার্জি এবং মজুমদার যা বিনির্মাণ করেছেন, সময়ের আলোকে তা পশ্চাদপদ এবং বাংলার প্রাক-আধুনিক ইতিহাসকে স্থানচ্যুত করে।[৪৬]

বাঙালি মুসলমান কৃষকদের আত্মপ্রকাশ

বাংলায় ইসলামীকরণের ইতিহাসের সবচেয়ে হতবাক করা বিষয় হলো উপরিল্লিখিত তত্ত্বসমূহে অভিবাসন, তরবারি, পৃষ্ঠপোষকতা, সামাজিক মুক্তি খুব কমই মূল প্রমাণের দিকে ধাবিত হয়েছে। তাদের কেউই ঠিক কখন এবং কোথায় ইসলাম গণধর্মে পরিণত হয়েছে তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেননি। যে কোন প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক

৪৫. R. C. Majumder, *History of Medieval Bengal* (Calcutta: G. Bharadwaj & Co., 1973), 196-97.

৪৬. প্রকৃতপক্ষে, স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের উপস্থাপিত সাম্প্রদায়িক ঐক্যের, তাঁর মতে, অসমর্থিত দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে মজুমদার নিজেকে একমাত্র সঠিক পথের পথিক হিসেবে দেখেছেন। তিনি লিখেন, "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু থেকে এর সফলতার জন্য পূর্ণাঙ্গ হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হতে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে পরিকল্পিতভাবে ভারতের ইতিহাস নতুন করে লেখা হতে থাকে, যাতে হিন্দু ধর্মের প্রতি মুসলমান শাসকদের গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণু আচরণ ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলা না হলেও বেশ ব্যাপক মাত্রায় পরিশীলিত করা হয়।" প্রাগুক্ত, vi.

পুনঃ নির্মাণ অবশ্যই ভৌগোলিক ও সময়পঞ্জির প্রতিষ্ঠিত তথ্যের উপর ভিত্তিশীল হতে হবে, ইসলামে গণধর্মান্তরের ব্যাখ্যার আগে আমরা, অবশ্যই প্রথমে প্রমাণ করবো, সম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে, ঠিক কখন এবং কোথায় বাঙালি মুসলমান কৃষক সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করেছিল।

বদ্বীপটিতে ইসলামী প্রভাব প্রথম আবির্ভূত হওয়ার বিষয়টি জানতে ভারতীয় মহাসাগরের মানচিত্রের দিকে নজর দিলে মধ্যপ্রাচ্যের সাথে সামুদ্রিক যোগাযোগের বিষয়টি চোখে পড়বে। এটা সত্য যে, সুলায়মান তাহির (মৃত্যু ৮৫১), ইবনে খুদাদাদবিহ (মৃত্যু আনুমানিক ৮৫০), মাসুদি (মৃত্যু ৯৫৬) ও ইদ্রিসির (মৃত্যু আনুমানিক ১১৫০) মতো আরব ভৌগোলিকের কাছে বাংলা ছিল পরিচিত এবং তাঁদের অন্যতম মাসুদি স্পষ্টভাবে মুসলমানদের —বস্তুত দূরপাল্লার সামুদ্রিক বণিক— দশম শতাব্দীতে সেখানে বসবাসের কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৭] চন্দ্র রাজবংশের (আনুমানিক ৮৩৫-১০৩৫) আমলে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় স্থানীয় মুদ্রার ঐতিহ্য এবং লালমাই অঞ্চলে আব্বাসীয় মুদ্রা আবিষ্কার সামুদ্রিক বাণিজ্যে আরব মুসলমানদের আধিপত্যের সময়ে ভারত মহাসাগরীয় বৃহত্তর পরিমণ্ডলের সাথে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সংযোগের বিষয়টি আরো ভালভাবে প্রকাশ করে।[৪৮] অবশ্য সুন্নি ইসলামের চারটি স্বীকৃত মাযহাবের— হানাফি, শাফি, মালেকি ও হাম্বলি— বিশ্বব্যাপী অবস্থান পরীক্ষা করলে মনে হবে ইসলামীকরণ সমুদ্রপথে সংঘটিত হয়নি। ইসলামী বিশ্বে সাধারণভাবে ধর্মান্তরিতরা যে মাযহাবের ধারকরা সে অঞ্চলে ইসলাম নিয়ে এসেছে, তাই গ্রহণ করার প্রবণতা দেখিয়েছে। দশম শতাব্দী থেকে আরবের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল তথা ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী উপদ্বীপটির অংশে শাফি মাযহাবের প্রাধান্য ছিল। পরবর্তী শতকগুলোতে উপকূলীয় পূর্ব আফ্রিকা, ভারতের মালাবার উপকূল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপ সবই শাফি আরবদের সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগের মাধ্যমে ইসলামীকরণের আওতায় চলে যায়। এবং ১৫০০ সাল নাগাদ এসব অঞ্চল শাফি মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। বাংলাও যদি শাফি প্রাধান্যপূর্ণ সমুদ্রগামী আরবদের কিংবা সে ধরনের আরবদের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী সমুদ্রে চলাচলকারী মুসলমানদের মাধ্যমে ইসলামীকরণ হতো, তবে আশা করো যেত, বাংলাও শাফি মাযহাব অনুসরণ করতো। কিন্তু ১৫০০ সাল এবং তার পরবর্তীকালেও বাঙালি মুসলমানরা প্রধানত হানাফি, এখনকার মতো তখনো গাঙ্গেয় সমভূমির ক্রমাগত উঁচু

---

৪৭. *The History of India as Told by Its Own Historians*, trans. and ed. H.M. Elliot and John Dowson (Allahabad: Kitab Mahal, 1964), 1: 5, 13-14, 25, 90. Masudi, *Prairies dor,* 1: 155.

৪৮. F.A. Khan, *Mainamati* (Karachi, 1963), 25-27. Citd in Tarafdar, "Trade and Society," 277.

এলাকায় এবং পুরো মধ্য এশিয়ায় উক্ত মাযহাবেরই প্রাধান্য ছিল।[৪৯] স্পষ্টত এটা বাংলায় ইসলামীকরণে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ভূমিবাহিত উৎসের ইঙ্গিত দেয়।

কিন্তু কখন এবং কিভাবে হা হলো? বাঙালি মুসলমানদের ব্যাপকতার সুদূর অতীতের উৎসের দাবি সত্ত্বেও তা প্রমাণের স্বপক্ষে প্রাথমিক সূত্রে কিছু পাওয়া যায় না, অন্তত জনসংখ্যার একটি বড় অংশ তথা কৃষকদের সম্পর্কে কিছু নেই। তবে একটি মাত্র ব্যতিক্রম ব্যতীত প্রাক-ষোড়শ শতকে বিদেশী সূত্রে বাঙালি মুসলমানদের উল্লেখে শুধুমাত্র অভিবাসী বা শহুরে মুসলমান তথা আশরাফ সমাজের কথা বলা হয়েছে। ব্যতিক্রমটি হলো ইবনে বতুতার বর্ণনা, যিনি ১৩৪৫ সালে প্রখ্যাত দরবেশ শাহজালালের সাথে সাক্ষাতের জন্য সিলেট ভ্রমণ করেছিলেন। এই প্রখ্যাত আরব পর্যটক পরে লিপিবদ্ধ করেন, 'এসব পার্বত্য এলাকার অধিবাসীরা তাঁর (শাহজালাল) হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং এজন্যই তিনি তাদের মাঝে থাকেন।'[৫০] কিন্তু তার মানে এটা সুস্পষ্ট নয় যে, ইবনে বতুতা এখানে একটি কৃষক জনসংখ্যার কথা উল্লেখ করছেন। এতে, যেমনটি তিনি বলেছেন, শাহজালালের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণকারীরা সমভূমির নয়, পার্বত্য এলাকার। এসব পাহাড়ি মানুষ সম্ভবত জুম চাষ করতো, কারণ নিম্ন এলাকায় ধান চাষে নিয়োজিতদের তিনি সুস্পষ্টভাবে হিন্দু হিসেবে অভিহিত করেছেন, তাদের থেকে এরা ছিল ভিন্ন।[৫১] বাংলায় মুসলমানদের উপস্থিতি লক্ষ্যকারী পরবর্তী বিদেশী হলেন চীনা কর্মকর্তা মা হুয়ান। তিনি ইবনে বতুতার প্রায় ৯০ বছর পর ১৪৩৩ সালে বদ্বীপে পৌছেন। সে সময় সবেমাত্র রাজা গণেশের গোলযোগপূর্ণ রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ শেষ হয়েছে এবং সুলতান জালালউদ্দিন মুহাম্মদ বাংলার পরিবেশের সাথে ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত ইসলামী সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেছেন। চীনা পর্যটক চট্টগ্রাম থেকে সোনারগাঁও হয়ে পাণ্ডুয়ায় ভ্রমণের সময়ে একটি ঘনবসতিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ জনসংখ্যা দেখেছেন। তবে জনসাধারণের গোষ্ঠীগত বা ধর্মীয় পরিচিতি সম্পর্কিত মন্তব্য এসেছে শুধুমাত্র পাণ্ডুয়ার প্রেক্ষাপটে, সেখানে তিনি লক্ষ্য করেছেন, 'সমগ্র নগরীতে রাজার প্রাসাদ এবং অভিজাতদের ছোট ও বড় প্রাসাদ ও উপাসনালয় রয়েছে। তারা সবাই মুসলমান।'[৫২] বিদেশী কর্তৃক বর্ণিত মুসলমানরা নগরবাসী, কৃষক নয়।

১৪৯৮ সালে ভারতে ভাস্কো ডাগামার সমুদ্রযাত্রার পর ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে আমরা বাংলা ও তার জনসাধারণ সম্পর্কে প্রথম ইউরোপীয়ান ভাষ্য পাই। কিন্তু এখানেও, বদ্বীপটির মুসলমান হিসেবে এসব লেখক দৃশ্যত শুধুমাত্র নগরবাসী

৪৯. See Francis Robinson, *Atlas of the Islamic World since 1500* (Oxford: Phaidon Press, 1982), 29.

৫০. Ibn Battuta, *Rehla*, 239.

৫১. প্রাগুক্ত, ২৪১।

৫২. Ma Huan in P. C. Bagchi. "Political Relations." 117.

হিসেবেই জানতো, পল্লীর অধিবাসী হিসেবে নয়। ১৫০৩ থেকে ১৫০৮ সালের মধ্যে কোন এক সময়ে সফরকারী লুদোভিকো ডি ভার্থেমা গৌড়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেন, 'আমার এযাবৎকালের দেখা অন্যতম সেরা নগরী এবং খুবই বিশাল এলাকা,' এবং দুলাখ জনশক্তি সমৃদ্ধ সুলতানের পুরো সেনাবাহিনী মুসলমান।[৫৩] স্পষ্টত বাংলা সফরকারী বণিক বা জাহাজের ক্যাপ্টেনদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে ১৫১২ থেকে ১৫১৫ সালে টম পিরেস উল্লেখ করেন, এদেশের রাজা 'একজন খুবই ঈমানদার মুসলমান' এবং 'এই রাজ্যের রাজারা তিন শত বছর আগে মুসলমান হয়েছে`।'[৫৪] কিন্তু পিরেসের বর্ণনায় ব্যাপক অর্থে জনসাধারণের ধর্মের কোন উল্লেখ নেই।

পিরেসের সমসাময়িক দুয়ার্তে বারবোসার বাংলা সম্পর্কিত লেখনী প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ নয়, অন্যান্য পর্যটকদের ভাষ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত, তাতে গৌড়ের 'সম্মানিত ম্যুর'দের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তারা 'সুতির সাদা দামি আলখাল্লা কাপড়ের কোমরবন্ধ, সিল্কের পাগড়ি, রৌপ্য ও স্বর্ণ নির্মিত খাপে সজ্জিত ছোরা' নিয়ে হাঁটছে। তাল তাদের ভাল খাবার, তাদের মুক্ত হাতে ব্যয় এবং 'আরো অন্যান্য অপব্যয়' এর বর্ণনা স্পষ্টতই ধনী ব্যবসায়ীর ইঙ্গিতবাহী, পল্লী সমাজের নয়। বস্তুত বারবোসা বর্ণিত গৌড় 'আরব, পারস্য, আবিব্সি ও ভারতীয় আগন্তুকদের' নিয়ে সাদা মানুষ অধ্যুষিত একটি শহর।[৫৫] এ ছাড়াও তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য' এই অংশের পৌত্তলিকরা তাঁদের শাসকদের নিকট থেকে আনুকূল্য লাভের জন্য প্রতিদিন মুসলমান হচ্ছে'- সমসাময়িককালের এই একটি মাত্র প্রমাণ ইসলামীকরণে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা তত্ত্বের সমর্থন হিসেবে বিবেচ্য হয়।[৫৬] কিন্তু তিনি রাজধানী নগরী ভিন্ন অন্য কোথাও মুসলমানদের উল্লেখ করেননি। বারবোসার ইসলামীকরণের উল্লেখ, কৃষকদের নয়, বরং হিন্দু কারিগর সম্প্রদায়, যারা সালতানাতের শহুরে শ্রমিক সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল।

---

৫৩. Ludovico di Varthema, *Travels*, 211.

৫৪. Pires, *Suma Oriental*, 89. পিরেস অবশ্য ত্রিপুরার রাজার মতো "পৌত্তলিক" শাসকদের সম্পর্কে প্রশংসাসূচক কথা বলেছেন। বাংলার রাজারা ত্রয়োদশ শতকের প্রথমদিকে "মুসলমান হয়েছে" বলে যে মন্তব্য করেছেন, তা বেশ কৌতূহল উদ্দীপক, কারণ এর মাধ্যমে মনে হয় তিনি বাংলার সালতানাতকে সেন বা প্রাক-তুর্কি আমল থেকে তার সময় পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন হিসেবে দেখেছেন। পিরেস কি বাংলার সুলতানদের তুর্কী, আফগান ও আরব বংশোদ্ভূতের বিষয়টির ব্যাপারে অসচেতন ছিলেন? স্পষ্টত, হোসেন শাহির রাজদরবারে বাঙালি সংস্কৃতি এতো বেশি একীভূত হয়ে গিয়েছিল যে, পর্তুগীজ কর্মকর্তাটি রাজদরবার এবং তার রাজার মধ্যে বৈদেশিকতার কোনই আলামত খুঁজে পাননি, তিনি বরং তার বদলে তিন শত বছর আগে ইসলামে ধর্মান্তরিত বাঙালি রাজবংশের অবিচ্ছিন্ন শাসন দেখেছেন।

৫৫. Duarte Barbosa, *The Book of Duarte Barbosa*, 135-39, 147.

৫৬. প্রাগুক্ত, ১৪৮।

পল্লী প্রসঙ্গে এখন পর্যন্ত, শুধুমাত্র ষোড়শ শতকের শেষদিকে এবং বিশেষভাবে মোগল বিজয়ের (১৫৭৪) পর বাংলার যে কোন স্থানে মুসলমান কৃষক জনসাধারণের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সংক্রান্ত সর্বপ্রথম বর্ণনাটি দিয়েছেন ভেনেশীয় পর্যটক সিজার ফেডেরিসি, যিনি ১৫৬৭ সালে উল্লেখ করেন, চট্টগ্রামের বিপরীতে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত বাংলার অন্যতম বৃহৎ দ্বীপ সন্দ্বীপের পুরো জনসংখ্যাই মুসলমান এবং তার নিজস্ব মুসলমান 'রাজা'ও আছে। ফেডেরিসি সন্দ্বীপের কৃষিজ উন্নতিতেও বিস্মিত হয়ে একে 'সমগ্র বিশ্বের উর্বরতম দ্বীপ' হিসেবে অভিমত প্রকাশ করেন।[৫৭] ফেডেরিসির সফরের খুব বেশি পরে নয়, ১৫৯৯ সালের এপ্রিলে ফ্রানসিস ফারনানদেজ নামক জনৈক জেসুইট মিশনারি খ্রিস্টধর্ম প্রচারের এক মিশনে পূর্ববাঙলার মেঘনা নদীপথে ভ্রমণ করার সময় স্থানীয় জনসাধারণের প্রথা সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করেন এবং তাদেরকে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার সম্ভাব্যতা মূল্যায়ন করেন। ঢাকার নারায়ণগঞ্জের কাছাকাছি এলাকায় পৌঁছে ফারনানদেজ লিখেন, 'আমি খ্রিস্টধর্মের প্রচারের কোন সুযোগ আছে কিনা, তা পরীক্ষা করতে শুরু করলাম, কিন্তু আমি দেখলাম প্রায় সকল অধিবাসীই মুসলমান।' বদ্বীপটির গুরুত্বপূর্ণ স্থানের প্রাণকেন্দ্রে মুসলমান কৃষক সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন উল্লেখ এটাই সর্বপ্রথম।[৫৮]

সপ্তদশ শতকে বেশ কয়েকজন পর্যটক বাংলার পল্লী এলাকায় মুসলমানের অস্তিত্বের ব্যাপারে একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন এবং উল্লেখ করেছেন, মোগল বিজয় থেকে যার সূচনা। বদ্বীপটিতে মোগল শাসন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে ১৬২৯ সালে অগাস্টিনীয় খ্রিস্টান ভিক্ষু সিবাসটিয়াও মানরিক বলেন, 'আগের দিনে বাংলা রাজ্যের সবাই পৌত্তলিক ধর্মে বিশ্বাসী ছিল, যেমনটি বৃহত্তর অংশে এবং এমনকি বর্তমানেও তাদের অধিকাংশ তা করে। অবশ্য কিছু বাদে, যারা এই অঞ্চলটি মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর নরকে যাবার কঠিনতর পথ পৌত্তলিকতা বর্জন করে আল কুরআন বর্ণিত প্রশস্ত ও সহজতর পথ ধরেছে।'[৫৯] ১৬৬৬ সালে ফরাসি পর্যটক জ্যাঁ ডি থেভেনট একই বিষয় তুলে ধরেছেন সেই সাথে একই ধরনের মুসলিম বিরোধী পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছেন, যা সপ্তদশ শতকে ইউরোপীয়ানদের জন্য ছিল গৎবাঁধা।

(আমি বলতে চাচ্ছি) মুসলমান ও মোগলরা এর প্রভু হওয়ার আগে দেশটি (অর্থাৎ বাংলা) পাঠান রাজাদের অধীনে অনেক ভাল অবস্থায় ছিল, কারণ, তারা একই ধর্ম

৫৭. Federici, "Extracts," 137:

৫৮. H. Hosten, "Jesuit Letters from Bengal, Arakan and Burma (1599-1600)," *Bengal Past and Present* 30 (1925): 59.

৫৯. Manrique, *Travels* 1: 67. Emphasis mine.

অনুসরণ করে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, মুহাম্মদীয় ধর্মের সাথে বিশৃঙ্খলা আসে এবং তার বাহকদের মধ্যে দুর্নীতির আগমন ঘটে।[৬০]

মানরিকের মতো থেভেনটও উপলব্ধি করেছেন, প্রাক-মোগল আমলে বাংলা ছিল প্রাক-মুসলমান এবং বিশ্বাস করতেন, শুধুমাত্র মোগল বিজয়ের পরেই বাংলায় ইসলাম অন্যদের ছাপিয়ে উঠেছে, যা ঘটেছে তার লেখার পূর্ববর্তী আনুমানিক একশত বছরেরও কম সময়ের মধ্যে। এটাও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার যে, ইউরোপীয়রা বদ্বীপের পূর্বার্দ্ধেই শুধুমাত্র মুসলমান কৃষকদের ব্যাপকতা দেখেছেন, এবং অপেক্ষাকৃত পুরাতন হিন্দুকৃত পশ্চিমাঞ্চলে নয়। ১৬৯৯ সালে, ঢাকার পল্লী অঞ্চলে ফারনানদেজের মুসলমানদের সাক্ষাৎ পাওয়ার ঠিক একশত বছর পর অপর জেসুইট ফাদার মার্টিন, এস. জে, আমরা যতটুকু জানি তিনি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের হুগলি এলাকা সফর করেছিলেন, উল্লেখ করেন, 'প্রায় পুরো দেশই পৌত্তলিকতায় পরিপূর্ণ।'[৬১]

সমসাময়িক অন্যান্য তথ্য মানরিক ও থেভেনটের সাধারণ উপলব্ধিকে সমর্থন করায় বোঝা যাচ্ছে মোগল বিজয়ের আগে পর্যন্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামীকরণ হয়নি। এই বিষয়টি স্পর্শ করা প্রাচীনতম পারসি সূত্রটি ১৬৩৮ সালের, যখন বাংলার মোগল সুবেদার ইসলাম খান মাসহাদি, আরাকানের রাজার কাছে নোয়াখালি উপকূলে পর্তুগীজ হামলার অভিযোগ করেন। তাতে সুবেদার লিখেন, পর্তুগীজরা 'মুসলমান অধিবাসীদের উপর লুটপাট' চালাচ্ছে।[৬২] ১৬৬০-এর দিকে আরেকটি মোগল সূত্র কাজিম বিন মুহম্মদ আমিলের আলমগীর-নামা'য় বলা হয়, ঘোড়াঘাটের বা বর্তমান উত্তরবঙ্গের রংপুর অঞ্চলের অধিকাংশ কৃষক মুসলমান।[৬৩]

সারাংশ

ব্যাপক সংখ্যক পল্লী মুসলমানের উপস্থিতির বর্ণনা ষোড়শ শতকের শেষ নাগাদ বা তার শেষের পূর্ব পর্যন্ত দেখা না যাওয়ায় আমরা আপাত বিরোধী সত্যের মুখোমুখি হই যথা, এমন এক শাসনকালে তথা মোগলদের অধীনে গণ-ইসলামীকরণ হয়েছে যে, যাদের ইসলামী ধর্মবিশ্বাসে ধর্মান্তরকরণে আগ্রহের কোন কর্মপন্থাই ছিল না। পুরোপুরি

৬০. Surendranath Sen, ed., *Indian Travels of Thevenot and Careri* (New Delhi: National Archives, 1949), 96.

৬১. M. L. Aime-Martin, ed., *Lettres edifiantes et curieuses concernant l'Asie, 'Afrique et l'Amerique* (Paris: Societe due Pantheon Visitation of Bengal, 1712-1715." *Bengal Past and Present* 6 (1910): 217.

৬২. S. H. Askari, "The Mughal-Magh Relations Down to the Time of Islam Khan Mashhadi," *in Indian History Congress, Proceedings*, 22d session, Gauhati. 1959 (Bombay: Indian History Congress, 1960), 210.

৬৩. "Jami kathir az saghir o kabir-i ra'aya-yi anja ki akthar Musalman budand." Munshi Amin Kazim b. Muhammad Amin, *Alamgir-nama*, ed. Khadim Hussain and 'Abd al-Hai (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1868), 677.

কৃষিজ উৎপাদনের উপর ভিত্তিশীল বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনায় মোগল কর্মকর্তাদের প্রাথমিক আগ্রহ ছিল ভূমির উদ্বৃত্ত সম্পদ যত বেশি সম্ভব নিংড়ে নেওয়ার জন্য কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং সেই সম্পদ প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে অনুগত লোক সৃষ্টির জন্য রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করা। যদিও রক্ষণশীল 'আলেমগণ' বরাবরই হিন্দু 'পৌত্তলিকদের' ইসলামে ধর্মান্তরকরণের সম্রাটের 'দায়িত্বের' ব্যাপারে জোর দিতেন, কিন্তু বাস্তবে বাংলায় এ ধরনের কোন কর্মপন্থা বাস্তবায়িত হয়নি, এমনকি রক্ষণশীল সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনকালেও (১৬৫৮-১৭০৭) নয়।

আমাদের মনোযোগ তাই বাংলায় মোগল আমলের দিকে নিবদ্ধ হবে। মোগল শাসনের সূচনার পর বদ্বীপে মুসলমান কৃষকদের ব্যাপকতা কি স্রেফ কাকতালীয় ব্যাপার ছিল নাকি দুইয়ের মধ্যে সংযোগকারী গভীর কোন শক্তি নিহিত ছিল?

দ্বিতীয় খণ্ড

মোগল শাসনে বাংলা

৬ মোগল শক্তির উত্থান

বাংলা নামক দেশটি এমন একটি অঞ্চল, যেখানে আবহাওয়ার কারণে অসন্তোষের ধুলা সব সময় উড়তেই থাকে।

আবুল ফজল আল্লামি (১৫৭৯)

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে সাধারণভাবে মোগল নামে পরিচিত চাগতাই তুর্কীদের একটি রাজবংশ বাংলাকে তাদের বিশাল ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, ফলে উত্তর ভারত থেকে বদ্বীপটির দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে।[১] বারটি প্রদেশের স্রেফ একটি হিসেবে বাংলা এখন পরিচালিত হতে লাগলো নিয়মিতভাবে সমগ্র সাম্রাজ্যে পর্যায়ক্রমিক দায়িত্ব পালনরত এক শ্রেণীর রাজকীয় কর্মকর্তার মাধ্যমে, যারা তাদের রাজনৈতিক মিশনে সর্ব-ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। অবশ্য, সালতানাতের সাবেক শাসকদের বিপরীতে বাংলা ও তার সংস্কৃতির সাথে নতুন শাসক শ্রেণীর সম্পর্ক দৃঢ় ছিল না। এর ফলে বিজয়ের পর বদ্বীপে আগত বহিরাগতদের নতুন স্রোত যাদের আশরাফ মুসলমান হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, তাদের সাথে অ-আশরাফ মুসলমান তথা ক্রমবর্ধমান হারে স্থানীয় বাঙালি মুসলমান হিসেবে চিহ্নিতদের মধ্যকার ব্যবধান বেড়ে যায়। অর্থনৈতিকভাবে, মোগল শাসন সূচিত হওয়ায় বাংলায় তৈরি সামগ্রীর উৎপাদন বিশেষ করে উত্তর ভারতের রাজদরবারে রফতানি ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। এ ছাড়াও এই বিজয়ের ফলে বাংলার জঙ্গলাকীর্ণ পশ্চাৎভূমিতে অনুসন্ধান এবং বসতি স্থাপন বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়ার ফলে বদ্বীপের সামাজিক মানচিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। এইসব প্রক্রিয়া এবং বিশেষ করে শেষেরটি, বাংলায় ইসলাম ও মুসলমান সমাজের বিবর্তনে স্থায়ী তাৎপর্যের সৃষ্টি করে।

আফগান আমল, ১৫৩৭-১৬১২

বাংলায় মোগল বিজয় একবারে সম্পন্ন হয়নি। যদিও ১৫৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর মোগল বাহিনীর বাংলার রাজধানীতে প্রবেশ চূড়ান্ত হিসেবে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু

১. তৈমুরের (মৃত্যু ১৪০৫) বংশধর হওয়ায় রাজবংশটি নিজেদের অভিহিত করতো তৈমুরি হিসেবে। যেহেতু মোগলরা ভারতে ক্ষমতা লাভকারী তৈমুরি বংশের শাখা ছিল, তাই তাদের যথাযথভাবে বলা উচিত ইন্দো-তৈমুরি। দেখুন, Marshall G. S Hodgson, *The Venture of Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1974), 3 : 62-63, n. 2.

বিজয়টি সুসম্পন্ন হতে প্রকৃতপক্ষে পৌনে একশত বছর লেগে যায়, ১৫৩৭ সালে শুরু হয় এবং তা ১৬১২ সাল পর্যন্ত চলে। অন্তর্বর্তী সময়কে আফগান আমল বলা যেতে পারে, চূড়ান্তভাবে আফগানিস্তানের হলেও কিছু আগে উত্তর ভারতের এসব অভিবাসীই গ্রামবাংলার অনেক বা অধিকাংশ এলাকার কার্যকর শাসক ছিলেন। পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে আফগানরা দিল্লী সালতানাতের ক্ষমতাসীন শ্রেণী হিসেবে তুর্কীদের স্থলাভিষিক্ত হয়। কিন্তু ১৫২৬ সালে মধ্য এশিয়ার অপর তুর্কী বাবর দিল্লীর শেষ আফগান শাসক পরিবারকে উৎখাত করেন এবং তাঁর নিজস্ব পরিবার ইন্দো তৈমুরি বা মোগলদের প্রতিষ্ঠিত করেন। পরিণতিতে হাজার হাজার আফগান উদ্বাস্তু গাঙ্গেয় সমভূমি দিয়ে বিহার ও বাংলায় নেমে আসে এবং সেখানে তারা যুদ্ধে পারদর্শী গোষ্ঠীপতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে (দেখুন মানচিত্র ৪)।

বাংলার সুলতান নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ (১৫১৯-৩২) বাবরের দিল্লী বিজয়ের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য উপলব্ধি করে তাঁর নিজের ও নবপ্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্যের মাঝখানে একটি সম্ভাব্য 'বাফার' (Buffer) অঞ্চল হিসেবে বিহারে আফগানদের শক্তিবৃদ্ধিতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু সুলতানের ছোট ভাই ও উত্তরসুরি মাহমুদ শাহ (১৫৩২-৩৮) তেমন বুদ্ধিমান ছিলেন না। ১৫৩৩ সালে নতুন সুলতান তাঁর ভাইয়ের মৃত্যু-পরবর্তী সৃষ্ট উত্তরাধিকারের লড়াই মীমাংসার লক্ষ্যে তাঁর এক গভর্নরকে শাস্তি প্রদানের জন্য বিহারে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। এই গভর্নর অবশ্য সে আমলের অন্যতম মেধাবী যোদ্ধা আফগান গোষ্ঠীপতি শের খান সুরের (মৃত্যু ১৫৪৫) সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে ১৫৩৫ সালে শের খান উত্তর-পশ্চিম বদ্বীপে সুলতানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এড়িয়ে সোজা রাজধানী গৌড়ে উপনীত হন। সেখানে তিনি সাহসিকতার সাথে মাহমুদের মোকাবেলা করেন এবং সুলতানকে রাজমহলের পশ্চিমের সকল ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে এবং বার্ষিক নয় লাখ *তংকা* কর দিতে বাধ্য করেন।[২] দু'বছর পর সুলতান যখন তাঁর বার্ষিক কর দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং এমনকি আফগান কর আদায়কারীকে নির্মমভাবে হত্যা করেন, তখন শের খান, তিনি তখন স্বঘোষিত শের শাহ, বদ্বীপে তাঁর সেনাবাহিনী পাঠান এবং মাহমুদের গদি উচ্ছেদ করেন।[৩]

প্রায় একই সময়ে, ১৫৩৮ সালে, বাবরের পুত্র ও উত্তরসুরি হুমায়ুন উত্তর ভারতে আফগানদের শক্তি-বৃদ্ধি প্রতিহত করার জন্য গাঙ্গেয় সমভূমিতে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে নেমে আসেন। কিন্তু শের শাহ শুধুমাত্র বিহারের অভ্যন্তরে গুটিয়ে গিয়ে

২. Iqtidar Husain Siddiqui, *Mughal Relations with the Indian Ruling Elite* (New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1983), 78-86.

৩. Ibid., 88-89. মুদ্রাতাত্ত্বিক প্রমাণে দেখা যায়, শের খান ১৫৩৫ সালে প্রথম নিজেকে শের শাহ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। প্রাগুক্ত, ৮৩-৮৪।

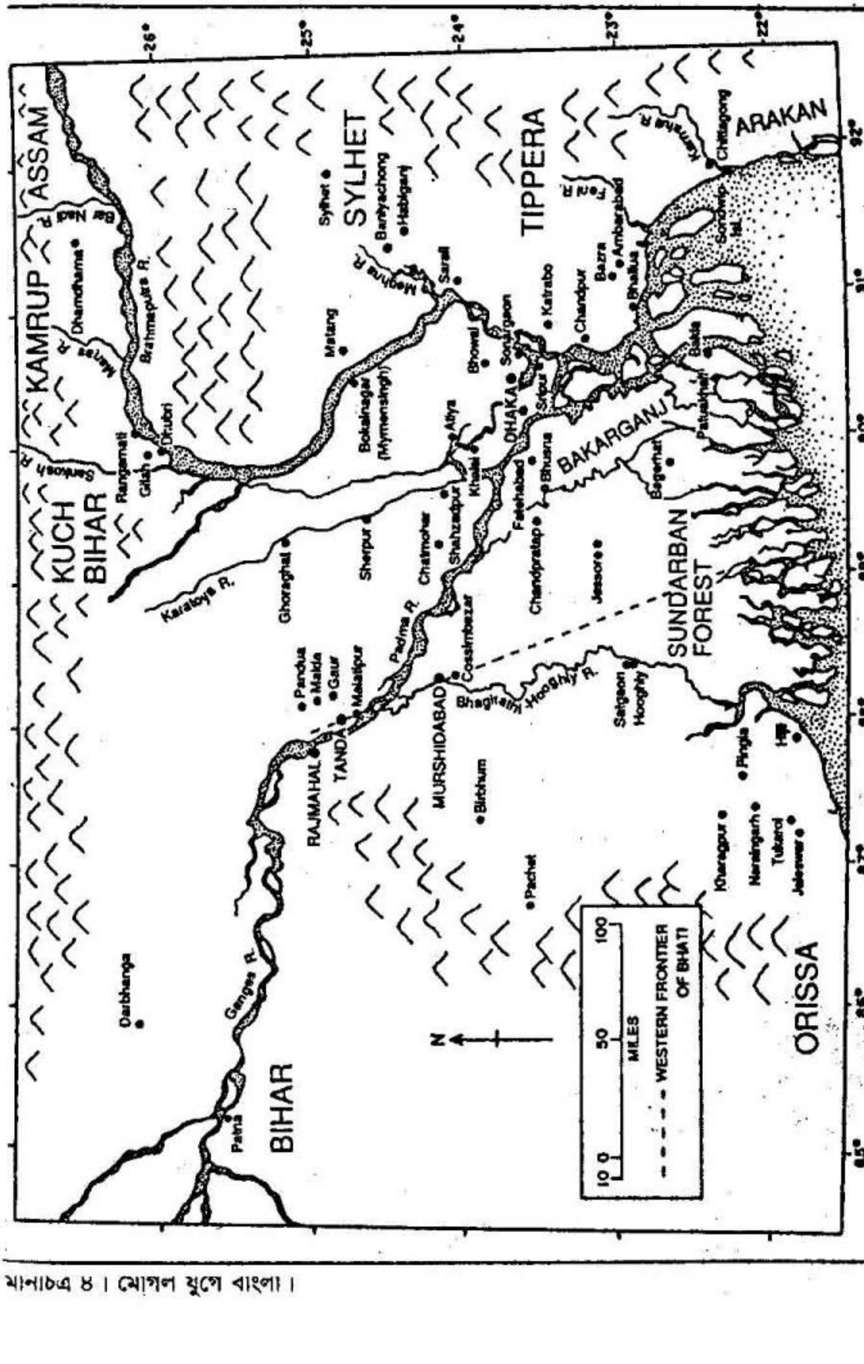

মানচিত্র ৪। মোগল যুগে বাংলা।

হুমায়ুনকে সহজে বাংলার রাজধানী দখলের সুযোগ করে দেন।[৪] পরের বছর হুমায়ুনের কাছে যখন তাঁর নিজের রাজধানীতে বিদ্রোহের আশংকার খবর পৌঁছলো, তখন বদ্বীপের অধিকাংশ এলাকা মওসুমী বৃষ্টিপাতে ডুবে যাওয়া সত্ত্বেও সম্রাট নতুন বিজিত প্রদেশটি অধীনস্থ কর্মকর্তাদের কাছে সমর্পণ করে দ্রুত উত্তর ভারতে রওয়ানা হন। শের শাহ এই সুযোগটি গ্রহণ করে হুমায়ুনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং পশ্চিম বিহারের চৌসার যুদ্ধে (১৫৩৯ সালের ৭ জুন) সম্রাটকে পুরোপুরি পরাজিত করেন। সেখান থেকে আফগান নেতা শুধুমাত্র বাংলা থেকে নয়, দিল্লী থেকেও মোগলদের উৎখাত করেন এবং অসহায় হুমায়ুনকে ভারত থেকেই তাড়িয়ে দেন। পরবর্তী ১৬ বছর বাংলাসহ পুরো উত্তর ও পূর্ব ভারত আফগান শাসনে চলে যায়।

অবশ্য ১৫৫৬ সালে হুমায়ুন শের শাহের উত্তরসুরিদের নিকট থেকে দিল্লী পুনরায় জয় করতে সক্ষম হন। আবারো বিপুল সংখ্যক আফগান উত্তর ভারত থেকে বাংলায় আশ্রয় চায়, যেখানে তখন শের শাহের ভগ্ন রাজবংশ ক্ষমতায় ছিল এবং তারপর ১৫৬৪ থেকে তা হস্তান্তরিত হয় আরেক আফগান নেতা তাজ খান কররানির হাতে (১৫৬৪-৬৫)।[৫] ১৫৬০ সালের দিকে মোগল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা আকবরের (১৫৬৫-১৬০৫) মেধাবী নেতৃত্বে উত্তর ভারত জুড়ে সম্প্রসারণ শুরু হলে পরিস্থিতি চরমে পৌঁছে। বাংলায় মোগল হুমকির অনিবার্যতায় সতর্ক হয়ে তাজ কররানির উত্তরসুরি সুলতান সুলায়মান কররানি (১৫৬৫-৭২) পরাক্রমশালী সম্রাটের প্রতি বাহ্যিক আনুগত্য প্রকাশ করেন তাঁর মুদ্রায় আকবরের নাম মুদ্রণ ও মসজিদে খুতবায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে।[৬] এদিকে তাঁর বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন প্রধানমন্ত্রী লোদি খান মোগলদের উপহার প্রদান ও ভোজোৎসবের ব্যবস্থা করেন।

এসব যখন হচ্ছিল, তখন সুলতান সুলায়মান তাঁর চারপাশে আরো আফগানকে সমবেত করেন এবং সম্পদ ও হাতি সংগ্রহ করেন। ১৫৬৮ সালে তিনি তদানীন্তন উত্তর ভারতের শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজ্য উড়িষ্যায় অভিযান পরিচালনা করেন এবং পূর্বভারতের বৃহত্তম ও সবচেয়ে সম্পদপূর্ণ হিন্দু মন্দির তথা পুরীর জগন্নাথ মন্দির লুণ্ঠন

৪. Abul Fazl Allami, *Akbarnama*, ed. Abdur Rahim (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1873-87), 1: 151-53. Translated by Henry Beveridge under the title *The Akber Nama of Abu-l-Fazal* (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1897-1921; reprint, New Delhi: Ess Ess Publications, 1979), 1: 332-35.

৫. কাকার গোত্রের এক আফগান গোষ্ঠীপতি সুলতান তাজ খান কররানির কাছে নিম্নলিখিত আবেদন জানান, "আমাদের পশ্চাতে মোগল সেনাবাহিনী, যারা আফগান গোত্রগুলোকে বন্দী করছে ও দাস বানাচ্ছে। আপনিও একজন আফগান। তাই আপনার নিরাপত্তায় আমাদের থাকাটা জরুরি।" Khwajah Nimat Allah, *Tarikh-i-Khan Jahan wa makhzan-i-Afghani*, ed. S.M. Imam al-Din (Dacca: Asiatic Society of Pakistan Publication No. 4, 1960), 1: 411.

৬. Ibid., Abul Fazl Allami, *Akbar-nama*. Trans. 2: 338; text, 2: 219.

করেন।[৭] রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মন্দির লুণ্ঠনের ঘটনাটি ছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলার মুসলমান শাসকদের অমুসলিম স্থাপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কার্যকর নীতির বিচ্যুতি। অবশ্য, সুলতান সুলায়মানের উদ্দেশ্য ছিল সুস্পষ্টভাবে রাজনৈতিক, ধর্মীয় নয়। অভিযানটি পরিচালনার সামান্য আগে উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দ দেব (১৫৫৭-৬৮) সুলায়মানের বাহ্যিক ন্যূনতম প্রভু এবং প্রকৃতপক্ষে তার চরম শত্রু আকবরের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। অধিকন্তু রাজা বাংলার সিংহাসনের জন্য সুলায়মানের তিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ইব্রাহিম সুরকে আশ্রয় দেন এবং আকবরের দূতকে বলেন, বাংলা জয়ে তাঁর উচ্চাভিলাষ পূরণের জন্য তিনি ইব্রাহিমকে খুশিমনে সাহায্য করবেন।[৮] সুলতান সুলায়মানের পক্ষে তাঁর রাজত্বের একেবারে লাগোয়া কোন স্থান থেকে অস্থিতিশীলতার হুমকি সহ্য করা কঠিন ছিল, তাই মুকুন্দ দেবকে শাস্তি প্রদানের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর উড়িষ্যা অভিযানের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা যায়। অধিকন্তু জগন্নাথ মন্দিরটি সাধারণ কোন মন্দির ছিল না। উড়িষ্যার রাজাদের গজপতি রাজবংশের অকুণ্ঠ সমর্থনপুষ্ট এই স্থাপনাটি উক্ত রাজবংশের অব্যাহত ও অবিচ্ছেদ্য শাসনের স্থাপত্য প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত হতো।[৯] এটার ধ্বংস তাই ছিল অত্যন্ত বাস্তববাদী ও পরিকল্পিত রাজনৈতিক পদক্ষেপ। ভারতে সাধারণভাবে মুসলমান ও হিন্দু শাসকদের মতো কররানিরাও মনে করতেন, রাষ্ট্রীয় মন্দির– সাধারণত রাজার প্রধান রাজধানীতে একটি একক ও সমৃদ্ধ স্থাপনা– রাজবংশটির গৌরব ফুটিয়ে তুলতো এবং কোন হিন্দু রাজবংশের পুরোপুরি ধ্বংসের জন্য এটির বিধ্বস্তকরণ বা লুণ্ঠন ছিল যৌক্তিক ও প্রয়োজনীয়।[১০]

তবে উড়িষ্যা অভিযানই হয় বাংলার কোন স্বাধীন শাসকের পরিচালিত শেষ বিদেশ অভিযাত্রা। ১৫৭২ সালে সুলায়মান মারা যান এবং আকবর প্রায় অনুচিত দ্রুততার সাথে আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করেন। সম্রাটের সরকারি ঐতিহাসিক আবুল ফজল সাধারণত মোগল শক্তির সম্প্রসারণকে তাঁর পৃষ্ঠপোষকের মানবজাতির প্রতি আশীর্বাদ হিসেবে দেখতেন, তিনি এই সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে লিখেন, 'যেহেতু

৭. ঐতিহাসিক নিয়ামতউল্লাহের মতে, যিনি উক্ত ঘটনার প্রায় চল্লিশ বছর পর কলম ধরেছিলেন, সুলায়মান স্বর্ণ ও পদ্মরাগমনিতে সজ্জিত কৃষ্ণদেবতার একটি জাঁকজমকপূর্ণ মূর্তিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে মলাধারে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার সৈন্যরাও বিভিন্ন দেবদেবীর সাতশত মূর্তি নিয়ে যায়। Nimat Allah, *Tarikh*, 413-15.

৮. Abul Fazl Allami, *Akbar-nama*, Trans. 2: 381-82, 480; text, 2: 254-55, 327.

৯. A. Eschmann, H. Kulke, and G.C. Tripathi, eds., *The Cult of Jagannath and the Regional Tradition of Orissa* (New Delhi: Manohar, 1978), 200-208.

১০. See Richard H. Davis, "Indian Art Objects as Loot," *Journal of Asian Studies* 52, no. 1 (February, 1993): 22-48.

(বাঙালি) কৃষকরা দুর্বৃত্ত আফগানদের শাসনে নির্যাতিত হচ্ছে।'[১১] তবে আরো সম্ভাবনাময় যুক্তি পাওয়া যায়, সুলায়মানের মৃত্যুর পরপরই গৃহীত আক্রোশপূর্ণ ও আত্মবিধ্বংসী ভ্রাতৃহত্যার ঘটনায় সৃষ্ট রাজনৈতিক শূন্যতা যা থেকে সুবিধা আদায়ে মোগলদের বিরত রাখা যায়নি। অধিকন্তু আবুল ফজলের বর্ণনা অনুযায়ী, সুলায়মান যেখানে অন্তত আকবরের প্রতি 'বশ্যতার চাদর' পড়ার কৌশল অবলম্বন করেছিল, সেখানে তাঁর পুত্র দাউদ সরকারের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ লাভের পরপরই এমনকি এই 'কপটতার চাদর' ছিঁড়ে ফেলে।[১২] পিতার নীতি পরিত্যাগ করে দাউদ নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ ও খুতবা পড়ার ব্যবস্থা করেন, যার উভয়টিই ছিল আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার সামিল।

এর প্রতিক্রিয়ায় আকবর ১৫৭৪ সালে ব্যক্তিগতভাবে একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে গাঙ্গেয় সমভূমি দিয়ে নেমে আসেন এবং পাটনায় আফগান প্রতিরোধকারীদের পুরোপুরি পরাস্ত করেন। তারপর তিনি বাংলায় অভিযান পরিচালনার জন্য ২০ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীকে অভিজ্ঞ সেনাপতি মুনিম খানের কাছে ন্যস্ত করেন এবং তিনি দ্রুত গঙ্গার ভাটিতে নেমে আসতে থাকলে ভগ্নহৃদয়ে প্রতিরোধে অনিচ্ছুক আফগানরা রাজধানী টান্ডায় পালিয়ে যায়।[১৩] এখানেও তারা কোন ধরনের প্রতিরোধ করেনি। ১৫৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুনিম খান যখন বিজয়ী বেশে টান্ডায় প্রবেশ করেন, বলা যেতে পারে তখন বাংলায় মোগল শাসনের সূচনা হলো। আবুল ফজল গর্বিতভাবে লিখেন, 'বিশ্ব-আকাঙ্ক্ষিত রাজপুরুষের কথা কাজে পরিণত হলো, আসমানি সহযোগিতা প্রতিদিন বাড়তে লাগলো।[১৪]

বাংলায় প্রাথমিক মোগল অভিজ্ঞতা, ১৫৭৪-১৬১০

কিন্তু রাজধানী জয় আর ভূমির অধিকার লাভ দুটি ভিন্ন বিষয়। মুনিম খান এবং আকবরের অর্থমন্ত্রী রাজা টোডরমল যখন সব-বিজিত প্রদেশের রাজস্ব প্রশাসন পুনঃ সংগঠিত করছিলেন, তখন হাজার হাজার আফগান জঙ্গলাকীর্ণ বাংলার পশ্চাদভূমিতে মিশে যায় এবং পরবর্তী চল্লিশ বছর তারা নতুন শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অব্যাহত রাখে। তারা সেখানে ভিন্নমতাবলম্বী মুসলমান ও হিন্দু *জমিদার*, পর্তুগীজ দলত্যাগী এবং উপজাতীয় গোষ্ঠীপতিদের কাছে টেনে নেয়, তাদের সবাই

১১. Abul Fazl Allami, *Akbar-nama*, Trans., 3 : 5-6, 57; text, 3 : 4, 40.

১২. Ibid., Trans., 3: 96; text, 3: 70.

১৩. গৌড়ের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিশাল জনসংখ্যার বসবাস সম্ভব নয়, একথা স্বীকার করে সুলতান সুলায়মান কররানি নিকটস্থ টান্ডায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। Ghulam Hussain Salim, *Riyazu-s-Salatin*, 152.

১৪. Abul Fazl Allami, *Akbar-nama*, Trans., 3 : 143; text, 3 : 109.

উত্তর ভারত থেকে আগত চাগতাই তুর্কীদের বিদেশী ও জবরদখলকারী হিসেবে বিবেচনা করতো।[১৫]

অবশ্য আবুল ফজলের রাজকীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ১৫৭৪ সালে পরবর্তী বছরগুলো ছিল 'বিরোধিতার জঞ্জাল ও আগাছা' (খাস-ও-খাশাস-ই-মুখালিফ) পরিষ্কারের দায়িত্ব পালন।[১৬] টান্ডা জয়ের পর মোগল বিজয়ীরা চারটি পথে আফগানদের পশ্চাদ্ধাবন করে: উত্তরে ঘোড়ারঘাট, দক্ষিণে সাতগাঁও, পূর্বে সোনারগাঁও এবং দক্ষিণ-পূর্বে ফতেহবাদ (বর্তমান ফরিদপুর শহর)।[১৭] এসব প্রাথমিক অভিযানকালে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ ও রক্তপাতের ঘটনা ঘটে, বিশেষ করে দক্ষিণ মেদিনিপুরের (৩ মার্চ, ১৫৭৫), তুকারোই-এর যুদ্ধে টোডরমল ও মুনিম খান সুলতান দাউদ খানের বিরুদ্ধে বিস্ময়কর জয় পান। এখানে মোগলরা ত্রাস সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন করে 'দর্শকদের জন্য হুশিয়ারী' হিসেবে তাদের নিহত শত্রুদের খুলি দিয়ে আটটি মিনার তৈরি করে।[১৮] প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের সহিংসতার ঘটনা ব্যতিক্রমই বলা যায়। অপরিচিত জঙ্গলের জলকাদায় তাদের ঘোড়াগুলোর পা আটকে যাওয়ায় এবং বাড়ি থেকে অনেক দূরে যুদ্ধ করতে তাদের সৈন্যদের আগ্রহের অভাব থাকায় মোগলরা পাশবিক শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে তাদের শত্রুদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন, ঘুষ প্রদান, স্তোকবাক্যের কূটনীতি এবং সামরিক শক্তির জাঁকজমক প্রদর্শনের নীতি গ্রহণের দিকে বেশি আগ্রহ দেখায়।[১৯]

এ ধরনের নীতি শুধুমাত্র সুবিধাজনকই ছিল না। ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারা হিসেবে রাজকীয় সার্বভৌমত্বের আকবরের তত্ত্ব অনুযায়ী শত্রুকে পুরোপুরি

---

১৫. তুকারোই-এর যুদ্ধে মোগল জয়ের (মার্চ, ১৫৭৫) পরপরই আবুল ফজল লিখেন, "দেশটির ভবঘুরেরা" উড়িষ্যার দাউদ খানের সুবেদার খান জাহান লোদির চারপাশে জড়ো হলো এবং একটি কনফেডারেশন গঠন করলো। এরা ছিলেন সম্ভবত বাঙালি ভূস্বামী, যাঁরা সুলতানদের অধীনে সাবেক ব্যবস্থার সাথে পরিচিত ছিলেন এবং মোগল প্রাধান্যে কী ঘটতে পারে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকায় তাঁরা আফগানদের সাথে তাঁদের জড়িয়ে ফেলেছিলেন। Ibid., Trans., 183; text, 129.

১৬. Ibid., Trans. 143, 169, 376; text, 102, 118, 259.

১৭. Ibid., Trans., 169; text, 118-19.

১৮. Ibid., Trans., 180; text, 127.

১৯. মধ্য বাংলায় টোডরমলের অভিযান সম্পর্কে আবুল ফজল লিখেন, " খোদার প্রতিনিয়ত অনুগ্রহ বৃদ্ধির ফলে গোলযোগের ধুলা শান্ত হলো" ("গুবার-ই ফিতনা ফিরো-নিশাস্ত")। আফগানদের একটি গ্রুপকে শান্ত করার পদ্ধতির ব্যাপারে টোডরমল মুনিম খানের কাছে বলেন, "গ্রুপটিকে সংযত করার পদ্ধতি ছিল অনুগত ও সুবক্তা কাউকে দিয়ে অর্থ পাঠানো।" গ্রন্থকার "স্বর্ণ দিয়ে দাসদের শান্ত" করার এই পদ্ধতির সফলতায় খুশি হয়েছিলেন। প্রাগুক্ত, অনুবাদ, ১৭০, ১৭৩। text, 120, 121. আঁদ্রে উইনক যুক্তি প্রদর্শন করেন, শত্রুদের মধ্যে প্রথমে বিভেদ সৃষ্টি এবং তারপর তাদের অভ্যন্তরীণ অনৈক্যের (ফিতনা) সুবিধা গ্রহণ করা ছিল ভারতে মোগল শক্তির সম্প্রসারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ গতিশীল উপাদান। দেখুন, Andre Wink, *Land and Sovereignty: Agrarian Society and Politics Under the Eighteenth-Century Maratha Svarajya* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).

ধ্বংস না করে বরং বিজয়ী সম্রাটের একক সার্বভৌমত্বের প্রতি স্বীকৃতি আদায়ের মাধ্যমে তাঁকে বিনীত থাকার লক্ষ্যে প্রণীত। তাই অব্যাহত প্রতিরোধের ব্যর্থতা উপলব্ধি করে ১৫৭৫ সালের ১২ এপ্রিল সুলতান দাউদ খান যখন মুনিম খানের কাছে হাযির হয়ে আনুষ্ঠানিক 'বিরোধ মীমাংসার ভোজসভায়' অংশ নিলেন, তখন মোগল শিবিরে মহা উল্লাস দেখা যায়। এটা ছিল রাজনৈতিক অনুষ্ঠান, একীভূত হওয়ার ধর্মাচার, যাতে প্রতীকীই ছিল সবকিছু। এজন্য বিশেষ ব্যবস্থায় তৈরি উৎসবের তাঁবুতে পাতা কার্পেটের প্রান্তভাগে এসে মোগল সেনাপতি তাঁর উষ্ণ ভালবাসা প্রকাশ করেন। সেখানেই তিনি পরাজিত সুলতানকে অভ্যর্থনা জানান। দাউদ কোমরবন্ধ থেকে তাঁর তরবারি বের করে পাশে রাখেন। মুনিম খান তখন আফগান অধিপতিকে একটি মোগল তরবারি, একটি কারুকার্যমণ্ডিত কোমরবন্ধ ও একটি আলখাল্লা উপহার দেন। আকবর প্রকৃতপক্ষে সেই আলখাল্লা পরিধান করে থাকুন আর নাই থাকুন, দাউদ খান তা পরিধানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্রাটের দেহের সাথে 'অঙ্গীভূত' হলেন-বাংলার শাসক এই রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ভালমতোই উপলব্ধি করলেন, কারণ গৌড়ে তাঁর পূর্বসূরীরাও একই ব্যবস্থার অনুসরণ করেছিলেন।[২০] মোগল রাজকীয় সাজে সজ্জিত হয়ে দাউদ তখন আকবরের রাজধানী ফতেহপুর সিক্রির দিকে মুখ ফেরালেন এবং শান্তভাবে বশ্যতা স্বীকার করলেন।[২১] তাঁর স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হলো এবং দাউদ ও তাঁর রাজত্ব তখন সম্রাটের হয়ে গেল।

অবশ্য, বেশ কিছু ঘটনা নতুন প্রদেশটিকে সাবলীলভাবে মোগল সাম্রাজ্যের সাথে মিশে যেতে বাধা প্রদান করে। তুকারৌই থেকে উত্তরবঙ্গে প্রত্যাবর্তনের পরপরই মুনিম খান সুলায়মান কররানির সময় হতে (১৫৬৫) বাংলার রাজধানী হিসেবে বিরাজমান টান্ডা থেকে সরকারের আসন প্রাচীন নগরী গৌড়ে ফিরিয়ে নেন।[২২] এই সিদ্ধান্ত বিপর্যয়কারী হিসেবে প্রমাণিত হয়, কারণ গঙ্গা নদীর প্রধান স্রোতধারার গতি

২০. ১৫২১ সালে একজন পর্তুগীজ কূটনীতিক যখন সুলতান নাসিরউদ্দিন নুশরাত শাহের রাজদরবারে উপস্থিত হলেন, তখন সুলতান, উক্ত বিদেশির ভাষায়, "আমার দিকে ফিরলেন এবং তার পরিধান করা একটি আলখাল্লা আমাকে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।" *Voyage dans les deltas du Gange, 333.*

২১. Abul Fazl Allami, *Akbar-nama*, Trans., 3: 185, text, 3: 130-31.

২২. আবুল ফজলের ভাষ্য অনুযায়ী, তখনো আফগান বিদ্রোহ অব্যাহত থাকা ঘোড়ারঘাটের কাছাকছি হওয়ায় সেখানে মোগল শক্তি সন্নিবেশিত করার লক্ষ্যে এবং মুনিম খান গৌড়ের চমৎকার দুর্গ ও জাঁকজমকপূর্ণ ভবনরাজির প্রশংসায় মুগ্ধ থাকায় এই পরিবর্তন আনা হয়। অবশ্য আরেকটি সম্ভাবনাও আছে, নতুন মোগল শাসকরা সবেমাত্র গড়ে তোলো টান্ডার চেয়ে আরো প্রাচীন বৈধ কর্তৃত্বসমৃদ্ধ নগরীর সাথেই নিজেদের সম্পৃক্ত করতে চেয়েছে। গৌড় শুধুমাত্র কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন ইন্দো-তুর্কি শাসনের সাথেই সম্পর্কিত ছিল না, বরং তারও আগের সেন শাসনের সময়কালীন প্রাচীন লক্ষ্মৌতির সাথেও সম্পর্কিত ছিল। Ibid., Trans., 226; text, 160.

পরিবর্তনের ফলে এক সময়ের স্রোতস্বিনী প্রবাহটি বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হওয়ায় তা সংক্রমণশীল রোগের উর্বর প্রজনন ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়। পরিণামে ১৫৭৫ সালের এপ্রিলের কয়েক মাস পরে প্লেগের প্রাদুর্ভাবে কয়েক হাজার মোগল কর্মকর্তা ও সৈন্য মারা যায়, হাজার হাজার বেসামরিক লোকের কথা উল্লেখ করা হলো না। প্লেগের বিপর্যয় মোগল সেনানায়ক ও সৈন্যদের মনোবল গুড়িয়ে দেওয়ার প্রেক্ষাপটে আবুল ফজল লিখেন, 'প্রত্যেকের মনে মৃত্যুর চিন্তা উদয় হলো।' এদের অনেকে বাংলার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলো এবং নিজস্ব তল্পিতল্পা গুটিয়ে স্থান ত্যাগ করলো।[২৩] ১৫৭৫ সালের প্লেগে ঠিক কতজন মারা গেছে বা কতজন দেশটি ত্যাগ করে, তার প্রকৃত কোন হিসাব আমাদের কাছে নেই। বাংলায় মোগল যুগের একেবারে সূচনায় এই ঘটনাটি ঘটায়, বদ্বীপটি সম্পর্কে মোগল ধারণা গড়ে উঠার সন্ধিক্ষণে, এই বিপর্যয় নিশ্চিতভাবেই একটি গৎবাঁধা ধারণার সৃষ্টি হয়– যা শীঘ্রই পুরো রাজকীয় বাহিনীতে ছড়িয়ে পড়ে– বাংলা একটি প্রতিকূল ও বিদেশভূমি। এখানে হয়তো সাময়িকভাবে দায়িত্ব পালন করা যায়, কিন্তু কখনোই স্থায়ীভাবে বসবাস করা যায় না। উত্তর ভারতের মোগল কর্মকর্তাদের মনে এই ধারণা শতাব্দীর পর শতাব্দী স্থায়ী হয় এবং বদ্বীপ প্রদেশটি সম্পর্কে বৈরি ধারণা ব্যাপকতর হওয়ায় আশরাফ মুসলমানদের পরবর্তী প্রজন্মসমূহ আধুনিক সময় পর্যন্ত তা লালন করেছে।[২৪]

এ ধরনের বিষাদপূর্ণ পরিবেশে ১৫৭৫ সালের অক্টোবরে মুনিম খান ইন্তেকাল করেন। সুবেদারের মৃত্যুর পর মোগল কর্মকর্তাদের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ মনোভাব বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান দাউদ খানকে আকবরের প্রতি তাঁর বশ্যতা পুনর্বিবেচনায় উৎসাহিত করে এবং বদ্বীপ থেকে মোগলদের বিতাড়িত করার দ্বিতীয় প্রয়াস চালানোর লক্ষ্যে তিনি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আফগানদের পুনরায় একত্রিত করেন। এমতাবস্থায় আকবর আরেক জাঁদরেল মোগল সেনাপতি খান জাহানকে নব-বিজিত প্রদেশটির দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। অভিজ্ঞ রাজা টোডরমলের সমভিব্যাহারে নতুন গভর্নর নভেম্বরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত রাজধানী টান্ডায় পৌছেন এবং পরের জুলাই মাসে মধ্যবাংলায় পদ্মার তীরে দাউদের বাহিনীর মোকাবেলা করেন। আবারো আফগানরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। তাদের সেরা সেনানায়করা যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হয় এবং দাউদের ঘোড়া বর্ষণসিক্ত কাদামাটিতে আটকে গেলে তিনি জীবিত ধরা পড়েন। এবার মোগলরা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নির্মম হয়। দাউদকে 'তার মাথার বোঝা থেকে অব্যাহতি দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ খান জাহান সাবেক রাজার শিরশ্ছেদ

---

২৩. Ibid., Trans., 227-28: text, 160-61. বিপর্যয়টি এতো ভয়াবহ ছিল যে, তার মাত্র পঁয়ষট্টি বছর পর জনৈক পর্যটক সে সময়কার অবস্থা বর্ণনা করেছেন পুরোপুরি পরিত্যক্ত হয়ে পড়া বিধ্বস্ত মহানগরী হিসেবে। Manrique, *Travels* 2: 124-28.

২৪. See, Rafiuddin Ahmed, *Bengal Muslims, 1871-1906: A Quest for Identity* (Delhi: Oxford University Press, 1981), 8-17, 22-24, 124, 184.

করেন এবং তাঁর দেহ টান্ডায় ঝুলিয়ে রাখেন; মাথাটি পুরস্কার হিসেবে আকবরের কাছে পাঠানো হয়।[২৫] রাজকীয় আধিপত্যের সাবলীল হস্তান্তর আগের চেয়ে এখন আরো নিশ্চিত মনে হয়। ঠিক এই সময়টাতেই আকবরের রাজকীয় বাহিনীতে একটি মারাত্মক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। বাংলা বিজয়ের এক বছর আগে সম্রাট বেতনভুক অশ্বারোহীসহ ঘোড়ার সংখ্যা নির্ভুলভাবে হিসাবের জন্য সেগুলোকে চিহ্নিত করা এবং রাজকীয় মূল্যায়নের জন্য উপস্থিত করতে তাঁর মনসবদারদের– মোগল সামরিক কর্মকর্তাদের অভিজাত অংশ নির্দেশ দেন। তিনি সাম্রাজ্যের রাজস্ব ভিত্তি কেন্দ্রীভূত করার জন্য মনসবদারদের কাছে জমার পরিবর্তে ভূমি রাজস্ব সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে দেওয়ার নির্দেশ দেন।[২৬] কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের এ ধরনের নির্দেশনা স্বাভাবিকভাবেই অনেক কর্মকর্তার মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে, যখন অসন্তুষ্ট মনসবদারদের বাংলায় পাঠানোর সম্রাটের নীতির প্রতিক্রিয়ায় দিল্লী থেকে দূরবর্তী এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য পরিচিত একটি অঞ্চলে সম্ভাব্য বিদ্রোহীরা সন্নিবেশিত হয়। ১৫৭৯ সালে ঠিকই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বাবা খান কাকশাল ও বিহার থেকে বাংলার বিদ্রোহে যোগ দিতে আসা মনসবদার মাসুম খান কাবুলির নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা টান্ডায় সরকারি দুর্গ দখল ও লুণ্ঠন করে, আকবরের হতভাগা সুবেদারকে হত্যা এবং নিজেদের মধ্যে একটি 'বিপ্লবী সরকার' গঠন করে।[২৭] বদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমের হিন্দু জমিদারগণ মোগলদের প্রতি তাদের আনুগত্য দ্রুত ছুড়ে ফেলে, এদিকে বিহারের বিক্ষুব্ধ মনসবদারগণ বাংলার আন্দোলনে যোগদান করে।[২৮] দুই বছর বদ্বীপটি পুরোপুরি রাজকীয় কর্তৃত্বের বাইরে থাকার পর ১৫৮২-৮৩ সালে আকবরের বিশাল বাহিনী শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ নির্মূল করতে সক্ষম হয়।[২৯] শুধুমাত্র অনুতপ্তহীন উচ্চপদস্থ মোগল কর্মকর্তা মাসুম খান কাবুলি ১৭ বছর পর তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত মোগল কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তিক্ত যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে যান।

১৫৮৩ সালে যখন রাজকীয় বাহিনীর মধ্যকার গোলযোগ প্রশমিত হয়, সাম্রাজ্যবাদীরা আবার বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিরোধ আন্দোলন দমনের দিকে তাদের মনোযোগ দেন। অবশ্য, ১২০৪ সাল থেকে মুসলিম শাসিত স্থান উত্তর-পশ্চিমে নয়, বরং মোগলদের কাছে সাধারণভাবে 'ভাটি' হিসেবে পরিচিত পূর্ববঙ্গে বেশি মনোযোগ দিতে হয়। আবুল ফজল লিখেন, 'ভাটি নামে অভিহিত দেশটির পূর্বাংশকে এই

২৫. Abul Fazl Allami, *Akbar-nama*, Trans., 3: 252-56, text, 3: 180.83.
২৬. Ibid., Trans., 95; text, 69
২৭. Ibid., Trans., 442-51; text, 299-305.
২৮. Ibid., Trans., 469, 475: text, 330, 324.
২৯. Ibid., Trans., 567, 589-93; text, 384, 398-401.

প্রদেশের একটি অংশ ধরা হয়।'[৩০] অন্য একটি অংশে তিনি পরস্পর ভিন্ন অঞ্চল হিসেবে 'বাঙালা' ও 'ভাটি' কে চিহ্নিত করেন, এই স্বাতন্ত্র্যসূচক চিত্রটি ছিল বদ্বীপটির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য: ভাটি শব্দটির সাধারণ অর্থ 'নিম্নগামি স্রোতের পথ।' আবুল ফজল লিখেন, ভাটি একটি নীচু দেশ এবং বাংলা অপেক্ষাকৃত উঁচু হওয়ায় তার উক্ত নাম হয়েছে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রায় ৩০০ ক্রোশ। এই দেশটির পূর্বে সাগর ও হাবশাদের দেশ। পশ্চিমের পার্বত্যদেশে কাহিন উপজাতীয়দের বাস। দক্ষিণে টান্ডা। উত্তরেও সমুদ্র এবং পার্বত্য দেশ তিব্বতের সমাপ্তি।[৩১] ষোড়শ শতকে ও সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে মোগলদের ব্যবহৃত 'ভাটি'র মধ্যে ভাগিরথি-হুগলি করিডোরের পূর্বদিকে বদ্বীপটির পুরো এলাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাস্তবিকই, পশ্চিম সীমানা টান্ডা থেকে শুরু হয়ে বর্তমানের দক্ষিণ-পশ্চিম খুলনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল,[৩২] মোগলদের কাছে যা ছিল 'ভাটি' ও 'বাঙালা'র সীমানা, প্রায় সেটাই বর্তমানে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যকার সীমানা। তাই পূর্বও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যকার বর্তমান পার্থক্য অন্তত মোগল যুগের প্রথমদিক থেকেই সূচিত।

এবার মোগল-বিরোধী প্রতিরোধ প্রখ্যাত বাঙালি গোষ্ঠীপ্রধান ঈশা খানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠলো বদ্বীপের পূর্বাঞ্চলীয় নদী বেষ্টনীতে প্রাচীন নগরী সোনারগাঁও-এর

---

৩০. আরো সঠিকভাবে, ভাটিকে বলা হতো *বিলায়াত* ("অঞ্চল") এবং বাংলাকে *মুলক* ("দেশ")। "আফতাব বার আয়াদ ওয়ালিয়াত্তিস্ত ভাটি নাম, আজ ইন মুলক শুমারা কুনান্দ।" Abul Fazl Allami, *Akbar-nama*, (Lucknow ed.), 2: 73; Trans., 2: 130.

৩১. Abul Fazl Allami, *Akbar-nama*, Trans., 3: 645-47; text, 432. এখানে আবুল ফজল বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান নির্ধারণে ঘড়ির কাঁটার দিকে ৯০ ডিগ্রি ভুল করেছেন; কেউ যদি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ক্রমাগত ঘুরতে থাকেন, তবে উল্লিখিত সকল স্থানকেই সঠিক জায়গায় পাওয়া যাবে: দক্ষিণে সীমান্তে পাবে বঙ্গোপসাগর ও "হাবশাদের" দেশ: টান্ডা পাবে পশ্চিমে, উত্তরে পাহাড়ি অঞ্চল, এবং পূর্বে হিমালয় অঞ্চলের ধারাবাহিকতার অবসান। আবুল ফজলের এই ভৌগোলিক ভ্রান্তির সংশোধন করেছেন ইরফান হাবিব তাঁর *"এন এটলাস অব দি মোগল এম্পায়ার"* গ্রন্থে (দিল্লী: অক্সফোর্ড ইউনিভারিসিটি প্রেস, ১৯৮২), ১০৪।

৩২. আবুল ফজলের বর্ণিত 'হাবশা'র পরিচয় নির্ণয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়, কারণ স্থানটি বলতে ইথিওপিয়া বোঝানোর কারণে তা চিহ্নিতকরণ অসম্ভব। তবে, যদিও কলকাতা ও লক্ষ্ণৌ উভয় সংস্করণেই স্থানটির নাম দেওয়া হয়েছে "হাবশা" কিন্তু অন্তত একটি পাণ্ডুলিপিতে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, পারসিয়ান এস এম ২৩৬ একে "যশর (Jasor) " হিসেবে বলা হয়েছে। অবশ্য ষোড়শ শতকে উল্লিখিত স্থানটি বর্তমানকালের যশোর (Jessore) শহর নয়, বরং আরো দক্ষিণের একটি বসতি, যা আধুনিককালের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় খুলনা জেলার ঈশ্বরিপুর হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। দেখুন, Abul Fazl Allami, *Akbar-nama*, Trans., 3: 646 n. 2; Habib, Atlas, 104 and 105. জেমস ওয়েস্টল্যান্ড লক্ষ্য করেছেন, যশোর (Jessore, বর্তমানের) নামটি যশোর (Jessore) জমিদারির শাসনকেন্দ্রের উপর্যুপরি অবস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ষোড়শ শতকে তা ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম খুলনায়। দেখুন Westland, *Report on the District of Jessore* (Calcutta: Bengal Secretariat, 1871), 24; List of Ancient Monuments in Bengal (Calcutta: Government of Bengal, 1886), 148.

কাছে কাত্রাবো শহরে ছিল তাঁর সদরদফতর। ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সৃষ্টির সম্ভাব্যতা জরিপের জন্য আগত বণিক রালফ ফিচ ১৫৮৬ সালে বাংলার পূর্বাঞ্চলগুলো সফর করেন এবং লিখেন, 'তারা প্রায় সবাই রাজা জেবালদিন ইচেবরের (জালালউদ্দিন আকবর) বিরুদ্ধে বিদ্রোহী: এখানে অসংখ্য নদী ও দ্বীপ থাকায় তারা একটি থেকে আরেকটিতে পালিয়ে যায়, আর অশ্বারোহীরা তাদের ধরতে পারে না। ---- এসব দেশের প্রধান রাজাকে বলা হয় ইসাকান (ঈশা খান), এবং তিনি অন্য সকল রাজার প্রধান, এবং তিনি সকল খ্রিস্টানের একজন পরম বন্ধু।'[৩৩] ফিচের বর্ণিত 'অন্য সকল রাজা' হলেন অন্যান্য ইউরোপীয়ান কথিত ও বহুল প্রচারিত বাঙালি লোককাহিনীর 'বার ভূঁইয়া'(বার জন গোষ্ঠীপতি)। ১৬০০ সালের ডিসেম্বরে গোয়ার জেসুইট মিশনের বার্ষিক চিঠিতে বাংলার সাবেক আফগান শাসকদের বিরুদ্ধে মোগলদের অভিযান সম্পর্কে মন্তব্যে বলা হয়,

পরলোকগত রাজার নামে ১২টি প্রদেশ পরিচালনাকারী ১২ জন রাজপুরুষ, যাদের বলা হয় বোয়োন (ভূঁইয়া), ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রেহাই পেয়ে যান। তারা মোগলদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ এবং জোটবদ্ধতার কারণে প্রত্যেকে নিজের এলাকা পরিচালনা করেন। অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী বাহিনীর অধিকারী হিসেবে তারা রাজার মতো আচরণ করে; সিরিপুরের (শ্রীপুর) প্রধানকে বলা হয় কেদারায় (কেদার রায়), এবং চাঁদকান (যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য), তবে তাদের সেরা মানসোনদোলিন (মসনদ-ই আলা, ঈশা খানের উপাধি)। পাঠানরা (আফগান) সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এবং তারা বোয়োনদের প্রজা।'[৩৪]

এখন ঈশা খানের অধীনে থাকা বার ভূঁইয়ার সবাই ছিলেন সাবেক বাংলা সালতানাতের গভর্নর।[৩৫] ১৫৮৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঈশা খান মোগল সুবেদারকে

৩৩. Federici, "Extracts," 184.

৩৪. Hosten, "Jesuit Letters," 53-54. এই রিপোর্টটির তারিখ ছিল ১লা ডিসেম্বর, ১৬০০, যা বাংলা ও গোয়ার জেসুইট মিশনের মধ্যকার যোগাযোগের শিথিলতার ইঙ্গিত দিচ্ছে; কারণ এই রিপোর্টটি লেখার সময়ে ঈশা খান জীবিত ছিলেন বলে প্রতীয়মান হলেও ১৫৯৯ সালের সেপ্টেম্বরেই তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন।

৩৫. অবশ্য জেসুইট মিশন বার ভুঁইয়ার পরিচিতি সুস্পষ্টভাবে দেয়নি, তবে উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে-বাকলা (বাকেরগঞ্জ), শ্রীপুর (দক্ষিণ-পূর্ব ঢাকা) ও চান্দেকানের (যশোর) তিনজন ছিলেন হিন্দু, এবং বাকিরা মুসলমান। কয়েক বছর আগে এন.কে. ভট্টশালী 'বার ভুঁইয়ার পরিচিতি এবং তাঁদের নিয়ন্ত্রিত এলাকা নির্ধারণের প্রয়াস চালান, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: বোকাইনগরের (মোমেনশাহী শহর) উসমান খান; পাবনার চাটমোহরের মাসুম খান কাবুলি; পশ্চিম ঢাকার জাফরগঞ্জের নিকটস্থ খালসির মধু রায়; পূর্ব পাবনার শাহজাদপুরের রাজা রায়; ঢাকার মানিকগঞ্জের চন্দ্রপ্রতাপের নবুড় (বা 'মদন') রায়; ঢাকার ভাওয়ালের বাহাদুর গাজি, সোনা গাজি ও আনোয়ার গাজি; দক্ষিণপশ্চিম সিলেটের মাতাং এর পাহলোয়ান; দক্ষিণ-পূর্ব বাকেরগঞ্জের বাকলা; এবং আধুনিক ফরিদপুরের তথা ফতেহাবাদের মজলিস কুতুব। ঈশা খান নিজে কুমিল্লা, ঢাকার অর্ধেক, পশ্চিম

নৌযুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন,[৩৬] এবং বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে সব সময়েই আকবরকে তাত্ত্বিকভাবে তার প্রভু হিসেবে স্বীকার করা সত্ত্বেও পরবর্তী ১৫ বছর বদ্বীপের পূর্বাঞ্চলে এই 'ক্ষুদে রাজা'র শাসন ছিল চূড়ান্তভাবে অনিয়ন্ত্রিত।[৩৭] তার বিচক্ষণতায় মোগলরা বদ্বীপের পূর্বাঞ্চলে ভূঁইয়াদের বহুল ব্যবহৃত নৌ-কৌশল ধীরে ধীরে আয়ত্ত করার নির্দেশনা পায়। বাস্তবিকই, ১৫৮৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাজকীয় সেনানায়কগণ চট্টগ্রাম পর্যন্ত সকল জঙ্গল ও নদীপথে ধেয়ে আসে এবং সেই ঘটনায় নগরীর আরাকানী শাসক মোগলদের কাছে হাতি উপহার পাঠান। ঈশা খানও আপোসমূলক ভূমিকা পালন করেন।[৩৮] এসব আঘাত অপরিহার্য অভিযান হলেও মোগলরা এই পুরো সময়ে 'ভাটির জমিদার'[৩৯] হিসেবে ঈশা খানের মর্যাদার কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয় এবং নিয়মিত প্রশাসনের মতো কোন কিছু পূর্বদিকে সুসংহত করতে মোটামুটি অসমর্থ হয়।

এই অবস্থা নিরসনে আকবর ১৫৯৪ সালের প্রথমদিকে তার অন্যতম জাঁদরেল সেনাপতি রাজপুত গোষ্ঠীপতি রাজা মানসিংহকে বাংলার সুবেদার হিসেবে প্রেরণ করেন। বদ্বীপটির উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে রাজমহলে তাঁর প্রাদেশিক রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে নতুন সুবেদার ১৫৯৫ সালের শেষদিকে ভাটিতে এক বিশাল বাহিনীর নেতৃত্ব দেন।[৪০] ফরিদপুর জেলার ভূষণার জমিদার কেদার রায় এবং কুচবিহারের রাজার চাচাতো ভাই পাটকুনবরের মতো শক্তিশালী হিন্দু গোষ্ঠীপতিরা মোগলদের বশ্যতা স্বীকার না করে ঈশা খানের আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৪১] ১৫৯৭ সালের আগস্ট মাসে ঈশা খান দলত্যাগী কট্টর মোগল বিরোধী মাসুম খান কাবুলির বাহিনীর সাথে যোগ দেন এবং যৌথভাবে তাদের বাঙালি রণতরী নিয়ে মোগল নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেন এবং পরিণতিতে মোগলদের আরেকটি পরাজয় ঘটে, যাতে মানসিংহের নিজের পুত্র

মোমেনশাহি, এবং সম্ভবত রংপুর, বগুড়া ও পাবনার অংশবিশেষ নিয়ন্ত্রণ করতেন। দেখুন N.K. Bhattasali, "Bengal Chiefs' Struggle for Independence in the Reigns of Akbar and Jahangir," *Bengal Past and Present* 35 (January-June 1928): 1 30-36.

৩৬. Abul Fazl Allami, *Akbar-nama*, Trans., 3: 659; text; 3: 439.

৩৭. ১৫৮৫ সালে ঈশা খান এমনকি মোগলদের কাছে প্রতিশ্রুতি দেন, তিনি দলছুট মোগল ব্যক্তিত্ব মাসুম খান কাবুলিকে মক্কায় হজ্জে যেতে বাধ্য করবেন ইন্দো-মুসলমান ইতিহাসে রাজনৈতিকভাবে কাউকে শেষ করার একটি বিশেষ পন্থা ছিল এটি– এবং যদিও তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেননি, তবে বিদ্রোহীকে সংযত রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। Ibid., Trans., 696-97; text, 461.

৩৮. Ibid., Trans., 721-22; text, 479.

৩৯. Ibid., Trans., 1031; text, 672.

৪০. Ibid., Trans., 1042-43; text, 696.

৪১. Ibid., Trans. 1059, 1068; text, 711, 716.

নিহত হয়।[৪২] তবে এটা ছিল ঈশা খানের সৌভাগ্যের সর্বোচ্চ অবস্থান; দু বছর পর তিনি দৃশ্যত স্বাভাবিকভাবেই ইন্তেকাল করেন।[৪৩] ঈশা খানের অনুসারীরা তাঁর এক পুত্র দাউদের নেতৃত্বে এবং কেদার রায় মেঘনার মোহনায় মগ হিসেবে পরিচিত বাঙালি জনপথ লুণ্ঠনকারী আরাকানি জলদস্যুদের নিয়ে মোগল কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অব্যাহত রাখেন।

১৬০২ সালে বিদ্রোহপ্রবণ এসব উপাদান নস্যাৎ করার জন্য মানসিংহ ঢাকাকে পূর্বদিকে সামরিক কার্যক্রমের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৪] শীঘ্রই তা বাংলার প্রধান নগরীতে পরিণত হয়। তবে মোগলরা এই নগরীটি একেবারে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেনি। অন্তত পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়কালে স্থানটি মুসলিম বসতি স্থাপনকারীদের একটি সীমান্ত চৌকি ছিল[৪৫] এবং একজন মোগল কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন, গৌড়, রাজমহল ও ঘোড়াঘাটের মতো ঢাকাও বাংলার 'প্রাচীন দুর্গ।'[৪৬] তাই ধারণা করা যায়, ১৫৭৪ সালে মুনিম খান দায়িত্ব গ্রহণের পর কৌশলগত

৪২. Ibid., Trans., 1093; text, 733.

৪৩. ঈশা খানের জীবনী বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। তিনি কোন সমাজপতি কিংবা কোন প্রাচীন পরিবারের বংশধর না হওয়ায় ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার তাকে "মর্যাদাবান জমিদার" হিসেবে সম্মানিত করার ধারণা বাতিল করে দেন এবং "প্রদেশের শান্তির পথে হুমকি" হিসেবে অভিহিত করেন। তবে এ ধরনের মূল্যায়ন মোগল রাজকীয় দৃষ্টিভঙ্গির অনুকরণ এবং "শান্তির" মোগল সংজ্ঞা গ্রহণের নামান্তর। বাস্তবিকই, যদুনাথ সরকারের মানদণ্ড অনুযায়ী, সাধারণ উৎস থেকে উদ্ভূত যেকোন মহান শাসককে-উদাহরণ হিসেবে শের শাহ বা আলাউদ্দিন হোসেন শাহ-একইভাবে বাতিল করা যায়। এমনকি সমসাময়িক পর্যবেক্ষক আবুল ফজলও যদুনাথের বিশ্লেষণের সাথে একমত নন। ঈশা খানকে "একজন মহান ভূস্বামী" হিসেবে অভিহিত এবং তাঁর মৃত্যুকে "বিক্ষোভের কণ্টকাকীর্ণ ঝোপের অবসান" হিসেবে ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে মোগল সরকারি ঐতিহাসিক পরোক্ষভাবে রাজকীয় সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিরোধীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পূর্ববঙ্গে তাঁর কার্যকর কর্তৃত্বের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। এতে ধারণা করা যায়, পরবর্তীকালে লোকগাথায় তাঁকে মোগল শক্তি প্রতিরোধে স্থানীয় বাঙালি প্রতীক হিসেবে অভিহিত করার সম্মানটি ঈশা খান তাঁর জীবদ্দশাতেই পেয়েছিলেন। দেখুন Jadunath Sarkar, ed., *History of Bengal*, 213, 226. Abul Fazl Allami, *Akbar-nama*, Trans., 3: 1140; text, 3: 763. Dinesh Chandra Sen ed. trans., *Eastern Bengal Ballads*, Mymensingh (Calcutta: University of Calcutta, 1923-28), 2: 301-75.

৪৪. Abul Fazl Allami, *Akbar-nama*, Trans., 3: 1214-15; text, 3: 809.

৪৫. ১৪৫৬-৫৭ সালে, সুলতান প্রথম নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের আমলে (১৪৩৩-৫৯) জনৈকা "মোহাম্মদ বখত বিনাত, মারহামাদের কন্যা" বর্তমানের পুরাতন ঢাকায় একটি মসজিদ নির্মাণের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কয়েক বছর পর, ১৪৫৯ সালে সুলতান নিজেই সম্ভবত আরেকটি মসজিদের প্রবেশদ্বারের সংস্কার করেন। যদিও প্রবেশদ্বারটির কোন অংশই এখন আর টিকে নেই, কিন্তু তবুও ১৪৫৯ সালে *মেরামতের* বিবৃতিতে উল্লিখিত সময়ের আগে থেকেই সুলতানের ঢাকায় উপস্থিতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। Shamsud-Din Ahmed, ed. and trans., *Inscriptions*, 4: 57-58, 62-63.

৪৬. Nathan, *Baharistan*, text, fol. 19b. trans., 1: 57.

কারণে মোগলদের সর্বপূর্বের সীমান্ত ঢাকাকে একটি থানার বা সামরিক শাখার সদর দফতর করা হয়। কিন্তু তবুও সেখানে মোগল কর্তৃত্ব অনিশ্চয়তার মধ্যেই থাকে, কারণ ১৫৮৪ সালে ঢাকার থানাদার বা সামরিক প্রশাসককে ঈশা খান গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করেন।[৪৭]

অবশ্য রাজা মানসিংহ যখন ঢাকায় নিজের ঘাঁটি গাড়েন, তখন শক্তির ভারসাম্য মোগলদের অনুকূলে চলে গেছে। সুবেদার তার নতুন সদর দফতর থেকে ১৫৯৯ সালে ঈশা খানের ইন্তেকালের পর সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে 'বার ভূঁইয়াদের' অবশিষ্টাংশের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করেন। প্রথমে তিনি ঈশা খানের পুত্র দাউদের অনুগত আফগানদের উপর এবং তারপর কেদার রায় ও আরাকানীদের উপর চড়াও হন। এই সকল অভিযানে সুবেদার পুরোপুরি সাফল্য লাভ করেন; তিনি দাউদকে সোনারগাঁও-এ ফেরত যেতে বাধ্য করেন, কেদার রায়কে পরাজিত ও হত্যা করেন, নিম্ন বদ্বীপ থেকে আরাকানীদের বহিষ্কার করেন এবং অবশিষ্ট আফগানদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী উসমান খানকে মোমেনশাহির জঙ্গলে তাড়িয়ে দেন। ১৫৯৯ থেকে ১৬০৩ সালের সময়কালে পূর্ববঙ্গে মোগল শক্তির অবস্থান সংহত করে, আবুল ফজল লিখেন, 'রাজার মন এখন নরম হলো এবং যোগ্য লোকদের হাতে থানার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে তিনি ঢাকা গেলেন।'[৪৮] তবে সুবেদার বেশিদিন নগরীটিতে অবস্থান করতে পারেননি; ১৬০৫ সালের প্রথমদিকে মৃত্যু ঘনিয়ে আসা অসুস্থ সম্রাটকে দেখতে আগ্রা যাত্রা করেন। সেই বছরই আকবর মারা যান এবং তার উত্তরসুরি হন তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর।

জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালেই (১৬০৫-২৭) বাংলা বিদ্রোহীদের বিতাড়নের খণ্ডকালীন অবস্থা থেকে নিয়মিত প্রশাসনের আওতায় আসে। প্রথমদিকে আফগান গোষ্ঠীপতিদের বশ মানাতে সম্রাটের প্রয়াস অকার্যকর প্রমাণিত হয়, বিশেষ করে দুর্ধর্ষ উসমান খান বাংলার সর্ব পূর্বপ্রান্তের জেলাগুলোতে দৃঢ়তার সাথে বহাল থাকেন। কিন্তু এসব উপাদান চিরতরে অবসান করার জন্য ১৬০৮ সালের মে মাসে জাহাঙ্গীর তুলনাহীন যোগ্যতাসম্পন্ন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেনানায়ক আলাউদ্দিন ইসলাম খানকে সুবেদার নিযুক্ত করেন।[৪৯] এ সময় প্রায় ৩৭ বছর বয়স্ক ইসলাম খান সম্রাটের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন-দুধভাই হিসেবে দুজনে একই সাথে শৈশবে বেড়ে ওঠেন এবং আত্ম-সংযমে উল্লেখযোগ্য সামর্থ্যের অধিকারী ছিলেন।[৫০] সম্রাটের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে

৪৭. Abul Fazl Allami, *Akbar-nama*, Trans., 3: 659; text 3: 439.

৪৮. Ibid., Trans., 1215, 1235-36; text, 809, 824.

৪৯. Jahangir, *Tuzuk*, 1: 142-43, 208.

৫০. সম্রাট তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেন, "ইসলাম খান একজন সাহসী ও সুদর্শন তরুণ, এবং তাঁর পরিবারের উর্ধ্বে উঠা এক মর্যাদাবান লোক। এখন পর্যন্ত সে কখনো বিষাক্ত মদ পান করেনি এবং আমার প্রতি তার আন্তরিকতা এতো বেশি ছিল যে আমি তাকে আমার পুত্রের পদবি দিয়েছি। প্রাগুক্ত, ৩২।

তিনি অশ্বারোহী, কামান ও হাতির বিশাল বাহিনী এবং রণতরীর বিরাট বহর নিয়ে গাঙ্গেয় সমভূমিতে নেমে আসেন। বাংলায় প্রবেশ এবং রাজমহলে বিরতি নেওয়ার পর তার সেনাবাহিনী মধ্য বদ্বীপের জঙ্গল কেটে পথ বের করতে থাকে, গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থার দুই তীরের বিদ্রোহী গোষ্ঠীপতিদের বশ মানাতে থাকে এবং পরিশেষে ১৬১০ সালে ঢাকায় পৌছে।

মোগল কর্তৃত্বের সুসংহতকরণ, ১৬১০-১৭০৪

ইসলাম খানের অবতরণের সাথে সাথে বাংলার ইতিহাসে মোগল যুগের কার্যকর সূচনা হলো। বদ্বীপটিতে পৌছে নতুন সুবেদার উত্তর-পশ্চিমে মুসলমান আমলের অন্যান্য সাবেক রাজধানীর মতো স্থাপিত রাজমহল থেকে বাংলার পশ্চাদভূমির গভীরে অবস্থিত ঢাকায় সরিয়ে নেন। এর ফলে যেসব অঞ্চল উত্তর ভারতীয় শাসকদের নাগালের বাইরে ছিল এবং গৌড়ের সুলতানদের সামান্যমাত্র স্পর্শ পেয়েছিল, তাই মোগল সংস্কৃতি ও কর্তৃত্বের প্রত্যক্ষ কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হলো।

১৬১০ থেকে ১৭১৫ সাল পর্যন্ত মোগলরা বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকদের তাদের সামাজিক ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অঙ্গীভূত করতে এবং তখনো ঘন জঙ্গলাকীর্ণ 'ভাটি' বা বদ্বীপের পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা উর্বরা জমিতে পরিণত করতে ঢাকাকে ভিত্তিভূমি হিসেবে ব্যবহার করে। অধিকন্তু ঢাকা পদ্মা-গঙ্গা নদী ব্যবস্থার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করায় নগরীটি একই সাথে বঙ্গোপসাগর ও গৌড়-টান্ডা অঞ্চলে অবস্থিত মুসলিম শক্তির পুরাতন কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সংযোগকারী, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মধ্যবর্তী স্থান, বাংলা ও উত্তর ভারতের সংযোগকেন্দ্র এবং বাংলা ও উপসাগরের বাইরের বৃহত্তর জগতের মধ্যকার নৌ-বাণিজ্যের আদর্শ আড়তের স্থান হিসেবে পরিচিতি পায়। বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় পশ্চাদভূমিতে মোগল প্রভাবের ভূখণ্ডগত সম্প্রসারণের সময়টাতেই সমুদ্রপথে এই অঞ্চলে পর্তুগীজ, ডাচ ও ইংরেজ বাণিজ্যিক স্বার্থ আত্মপ্রকাশ করায় সাবেক পশ্চাৎপদ অঞ্চলটি এখন যুগপৎভাবে দুটি বহুজাতিক ও সম্প্রসারণশীল রাজনৈতিক অর্থনীতি, মোগল ও ইউরোপীয়ান, অঙ্গীভূত করে নেয়।

ইসলাম খান পূর্ববঙ্গের কেন্দ্রে প্রাদেশিক রাজধানী স্থাপন করলেও তার দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল সম্পর্কে হয়তো অবগত ছিলেন না। তার আশু লক্ষ্য ছিল দীর্ঘদিন রাজকীয় কর্তৃত্বের বাইরে থাকা ধ্বংসকারী উপাদানগুলোকে বশ মানানো। ১৬১৩ সালে দায়িত্ব পালনকালে ইন্তেকালকারী ইসলাম খান সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য শাসনকাজে নিয়োজিত থাকলেও ইস্পাতকঠিন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী এই ব্যক্তিটি তাঁর অধীনস্থদের কাছে তার নিজের প্রতি এবং মোগল স্বার্থের প্রতি, যা তিনি দৃঢ়ভাবে

চিহ্নিত করেন, সংশয়হীন আনুগত্য দাবি করতেন।[৫১] তিনিই ১৬১২ সালে এক রক্তাক্ত যুদ্ধে উসমান খানকে পরাজিত ও হত্যা করেন, ফলে বদ্বীপ মোগল শক্তির বিরুদ্ধে আফগানদের শেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ নস্যাৎ হয়ে যায়। এবং তিনিই স্থানীয় প্রভাবশালীদের মোগল স্বার্থের সাথে সংযুক্ত করে রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। তিনটি উপাদান বদ্বীপে মোগলদের তাদের শক্তি সুসংহত করতে সহায়তা করেছিল; তাদের আরো কার্যকর সামরিক শক্তির ব্যবহার, ইসলাম খানের কূটনীতি এবং হিন্দু বণিক-ব্যাংকারদের অর্থনৈতিক সহযোগিতা।

অনেক ঐতিহাসিক যুক্তি প্রদর্শন করেন, বারুদ-প্রযুক্তি শুধুমাত্র মোগল সাম্রাজ্য নয়, তাদের সমসাময়িক সাফাভি ও উসমানীয়দের সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করেছিল এবং তাই এমনকি এই তিন রাষ্ট্রকে 'বারুদ সাম্রাজ্য' হিসেবে অভিহিত করা যায়।[৫২] কিন্তু বাংলায় মোগল বিজয়ে বারুদ কতটা গুরুত্বপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল? ইসলাম খান ও তার উত্তরসুরিদের সুবেদারির সময়ে বেশ কিছু অভিযানে অংশ নেওয়া নিম্নপদস্থ মোগল কর্মকর্তা মির্জা নাথান মন্তব্য করেন, 'কামান, আড়ধনু, হাউই এবং এ ধরনের অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র ভারতে খুবই আগ্রাসী-আগ্নেয়াস্ত্র।'[৫৩] এই কর্মকর্তা সুস্পষ্টভাবে 'ভারতে' তথা মোগল হিন্দুস্তানে বারুদ-আগ্নেয়াস্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং এর বিপরীতে বাংলার সর্ব উত্তর-পূর্ব সীমান্তের (যার প্রেক্ষাপটে মন্তব্যটি করা হয়েছে) মানুষের এ ধরনের আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যাপারে দুর্বলতা ছিল। এসব অস্ত্রের মধ্যে ১৫৭৪ সালে[৫৪] মুনিম খানের অভিযানের

৫১. উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁর ব্যক্তিগত অনুমতি ছাড়া কেউই বাংলায় প্রবেশ বা ত্যাগ করতে পারবে না। এ ধরনের বিধিবিধান প্রয়োগে তাঁর দৃঢ়তা দেখা যায় জনৈক শেখ হোসাইনের সাথে সম্পর্কিত একটি ঘটনায়, উক্ত ব্যক্তি রাজমহলে ছিলেন এবং সরাসরি দিল্লী যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই শেখ এবং সুবেদার শৈশব থেকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা এবং ভ্রাতৃসুলভ ভালবাসার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছিলেন, ফলে উক্ত বিধানটি এমনকি তাঁর বেলায়ও সুবেদার প্রয়োগ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, একথা জানার পর তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। উক্ত শেখকে আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য করার জন্য ঢাকায় তাঁদের সাক্ষাতের সময় সুবেদার তাঁর সহকারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, "শেখ যখন আমার সাথে মোলাকাত করতে অগ্রসর হবে, তখন তোমরা তার ঘাড় জোর করে নামিয়ে দেবে এবং তাকে আমার পায়ের কাছে ফেলে দেবে।" ইসলাম খান তখন লোকটির দাড়ি ধরলেন এবং জোরপূর্বক তাঁর পায়ের কাছে টেনে আনলেন এবং তাঁর কাঁধে কয়েকটি জোরালো আঘাত করলেন। সম্ভবত সবচেয়ে লজ্জাজনক শাস্তি হিসেবে সুবেদার তখন তাঁর লোকদের নির্দেশ দিলেন শেখের দাড়ি তাঁর পায়ের নীচে রাখতে; এই প্রক্রিয়ায় শেখকে আরেক দফা পেটানো হয়। Nathan, *Baharistan*, text, fol. 53a-b; trans., 1: 132-33.

৫২. Hodgson, *Venture of Islam*, 3: 17-18. William H. McNeill, *The Pursuit of Power: Technology, Armed Force, and Society Since AD 1000* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 95-98.

৫৩. Nathan, *Baharistan*, text, fol. 230a: trans., 2: 508; "az adawat-i atishbazi-yi Hindustan ast.

৫৪. Nathan, *Baharistan*, trans. 3: 97; text, 3: 70.

সময়ে মোগলদের বাংলায় নিয়ে আসা ভারি ধরনের কামানই ছিল না, সেই সাথে খাঁজবিহীন নলযুক্ত গাদা বন্দুক এবং ১৬০০ সালের প্রথমদিকে পদাতিক সৈন্যদের কাঁধে করে বহনযোগ্য এবং অশ্বপৃষ্ঠ থেকে গোলা ছুড়তে সক্ষম হালকা কামান আসে।[৫৫]

কিন্তু মোগল রাষ্ট্রকে 'বারুদ- সাম্রাজ্য' হিসেবে চিত্রিত করার মধ্যে কিছু সমস্যাও আছে। প্রথমত মোগলরা ভারতে কামান বা গাদা বন্দুকের প্রবর্তন করেনি; মোগল যুগের প্রায় এক শত বছর আগেও, পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যে উভয়টিই দেখা গেছে।[৫৬] দ্বিতীয়ত অশ্বারোহীদের তীর ছোড়া সমাপ্তির অব্যবহিত পরই মোগলরা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার করতো না। মোগল যুদ্ধবিদ্যায় গাদা বন্দুক, কামান ও তীরের সমন্বিত ব্যবহারের চূড়ান্ত ভূমিকা পালন অব্যাহত ছিল।[৫৭] বদ্বীপটিতে মোগল শক্তি সুসংহতকরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দশক ১৬০৮ থেকে ১৬১৮ সময়কালে ১০টি প্রধান রাজকীয় অভিযানে মোগলরা সব সময়ে মিশ্র বাহিনী কাঠামো ব্যবহার করেছে, গড়ে প্রতিটি অভিযানে চার হাজার গাদা বন্দুকধারী, ২১ শত অশ্বারোহী তীরন্দাজ ও তিন শত রণতরী ছিল।[৫৮] অন্যদিকে দিল্লীর সুলতানদের মতো বাংলার শাসকরা তাদের সামরিক বাহিনীতে প্রধান অস্ত্র হিসেবে রণ-হাতির উপর নির্ভরশীল ছিল।[৫৯] জনৈক ইউরোপীয়ান পর্যটক একবার উল্লেখ করেন, সুলতান নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহ ৯১৪টি রণ-হাতি পালন করেন যেগুলো 'তাদের শুঁড়ে তরবারি ধারণ করে এবং শুঁড় দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করে যুদ্ধে পারদর্শী করে তোলা হয়; তারা এভাবে অনেককে হত্যা ও আহত করতে পারে।'[৬০] বাংলার অভ্যন্তরে মোগলদের প্রথম বড় ধরনের অভিযানকালে সংঘটিত তুকারোই-এর যুদ্ধে (১৫৭৫) সুলতান

---

৫৫. Nathan, *Baharistan*, text, fol. 216b; trans., 2: 468.

৫৬. Iqtidar Alam Khan, "Early Use of Cannon and Musket in India: AD 1442-1526, *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 24, no. 2 (1981), 146-64.

৫৭. সপ্তদশ শতকের ফরাসি পর্যটক ফ্রঁসোয়া বারনিয়ার উল্লেখ করেছেন, মোগল অশ্বারোহী তীরন্দাজরা একজন গাদা বন্দুকধারীর দুবার গোলা নিক্ষেপের বিপরীতে ছয়টি তীর ছুড়তে পারে। দেখুন Douglas Streusand, *The Formation of Mughal Empire* (New Delhi: Oxford University Press, 1989), 53.

৫৮. Nathan *Baharistan*, text, fols, 20b, 40b, 49b, 53a, 64a, 162b, 163b, 192b, 231a; trans., 1: 60, 97, 121, 131, 163, 316, 319, 405; 2: 510.

৫৯. সিমন ডিগবি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, দিল্লী সালতানাতের শক্তির উৎস ছিল হাতি ও যুদ্ধ-অশ্বের নির্ভরযোগ্য সরবরাহে তার একচেটিয়া সুবিধা। সামরিক বাহিনীর প্রধান অস্ত্রই ছিল হাতি এবং রাজ্যের আকার প্রতিফলিত হতো হাতির আস্তাবলের আকারের মাধ্যমে। Digby, *War Horse and Elephant in the Delhi Sultanate* (Oxford: Oxford University Monographs, 1971), 23-82.

৬০. *Voyage dans les deltas du Gange*, 326.

দাউদের হাতিগুলো রাজকীয় অশ্বারোহী বাহিনীতে আতংকের সৃষ্টি করেছিল।[৬১] অবশ্য শেষ পর্যন্ত রাজকীয় বাহিনী সেই যুদ্ধে জয়ী হয়, তবে তারা তাদের এই বিজয় পেয়েছিল বারুদের কারণে নয়, অশ্বারোহী তীরন্দাজদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে।

অধিকন্তু, শ্রেয়তর আগ্নেয়াস্ত্রের দিক থেকে মোগলদের অধিকতর সুবিধা প্রাপ্তি অন্তত আংশিকভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় তাদের প্রতিপক্ষদের মধ্যে বারুদ প্রযুক্তির প্রসারের মাধ্যমে। ১৫৮৪ সালে ঈশা খান মোগলদের সাথে নৌযুদ্ধে গোলন্দাজ বাহিনী ও গাদা বন্দুক মোতায়েন করেন এবং উসমান খান নৌ ও স্থলযুদ্ধে নিয়মিত গোলন্দাজ (তোপ ও তোফাং) বাহিনীর ব্যবহার করতেন।[৬২] ১৬০৯ সালে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে যখন বন্দী করে ইসলাম খানের নিকট নিয়ে আসা হয়, তখন তিনি ২৫ হাজার পদাতিক, পাঁচশত রণতরী এবং এক হাজার মণ (৪১ টন) বারুদ সমর্পণ করতে সম্মত হন।[৬৩] এতো বিপুল পরিমাণের সরবরাহের অধিকারী হওয়াটা ইঙ্গিত দেয় মোগলদের প্রতিপক্ষ বাহিনীই অধিক মাত্রায় বারুদ আয়ত্তে এনেছিল।[৬৪] বিপরীতপক্ষে, বদ্বীপটির প্রান্তে বিশেষ করে সর্ব উত্তরে বসবাসকারী উপজাতীয় বা প্রায় উপজাতীয় জনসাধারণ বারুদ প্রযুক্তিতে প্রাথমিকভাবে পিছিয়েছিল বলেই মনে হয়। কামরূপের যোদ্ধারা ছিল স্রেফ তীরন্দাজ এবং কুচবিহারের যোদ্ধারা বিষাক্ত তীর ব্যবহারকারী হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।[৬৫] যদিও এমনকি ১৬১২ সাল নাগাদ মোগল শাসনের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিদ্রোহে এসব প্রান্তবর্তী মানুষ প্রতিরক্ষা প্রাচীর থেকে কামানের গোলা ও আড়ধনু (তোপ ও সানডাক ও তির হাই তাকশ) ছুড়েছিল বলে বলা হয়েছে।[৬৬]

সম্ভবত মোগল শাসন সুসংহতকরণে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল 'বার ভূঁইয়া' ও অন্যান্য স্থানীয় *জমিদারদের* সাথে ইসলাম খানের নিপুণ

---

৬১. Abul Fazl Allami, *Akbar-nama*, Trans., 3: 176; text, 3: 123.

৬২. Ibid., Trans., 3: 659, 1214; text, 438, 809. Nathan, *Baharistan*, text, fols, 67a, 72b, Trans., 1: 174, 189.

৬৩. Nathan, *Baharistan*, text, fols, 9a, Trans., 1: 28.

৬৪. ঈশা খান ও তাঁর মিত্ররা অনেক সময়ে মোগল আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ লুণ্ঠন করতেন কিংবা পর্তুগীজ ভাড়াটে সৈন্যদের নিয়োগ করতেন, এসব পর্তুগীজ মোগল ও মোগল প্রতিপক্ষ উভয়ের হয়েই ভাড়ায় খাটতো। ১৫৮৩ সালে দৃশ্যত দলত্যাগী প্রায় তিন হাজার পর্তুগীজ পূর্ববঙ্গে মোগল বিরোধী বাহিনীতে কাজ করছিল। দেখুন Abul Fazl Allami, *Akbar-nama*, Trans., 3: 228, 620; text, 3: 161, 417; Nathan, *Baharistan*, text, fols, 280b, Trans., 2: 656. See also Maria Augusta Lima Cruz, "Exiles and Renegads in Early-Sixteenth-Century Portuguese India," *Indian, Economic and Social History Review* 23, no. 3 (July 1986), 259.

৬৫. Nathan, *Baharistan*, text, fols, 152a, 163a; trans., 1: 289, 317.

৬৬. Ibid., text, fols, 177a; Trans., 1: 359.

রাজনীতি। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে জয়ের জন্য যথাযথ হিসাবি কূটনৈতিক চাল হিসেবে তাদের জাঁকালো প্রদর্শনীর বিপরীতে অস্ত্রের প্রকৃত ব্যবহার হয়েছে সামান্যই। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো বর্তমান যশোর সীমান্তে ফরিদপুরের ২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ভূষণার রাজা সত্যজিতের প্রতি ইসলাম খানের আচরণ। মির্জা নাথান উল্লেখ করেন, সুবেদার তাঁর এক সেনাপতিকে এই শক্তিশালী গোষ্ঠীপতির সাথে আলোচনার জন্য পাঠানোর সময় এই নির্দেশনা দেন যে, 'সত্যজিৎ যদি সৌভাগ্যবশত বশ্যতা স্বীকার করে, তবে তাকে তার এলাকা জায়গির হিসেবে মঞ্জুরের আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে এবং সেই মর্যাদা অনুযায়ী ইসলাম খানের কাছে নেওয়া হবে; অন্যথায় তাকে তার কাজের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে এবং তার দেশ রাজকীয় কারোরির (রাজস্ব সংগ্রাহক) ঘোড়ার শিকার হিসেবে রাখতে হবে।'[৬৭]

এটা ছিল মূলা ঝোলানো ও লাঠির ব্যবহারের হুমকিপূর্ণ বিচক্ষণতা। রাজার অবস্থান থেকে, বশ্যতার প্রস্তাবটি ছিল ভূষণার অবস্থার চেয়ে অনেক বিস্তৃত ক্ষেত্রের সাথে আত্মীকরণ এবং এমনকি জায়গির বা রাজস্ব আদায়ের আকারে তিনি তাঁর সাবেক এলাকা বহাল রাখতে পারছেন। সাম্রাজ্যের একজন জায়গিরদার হিসেবে তিনি তাঁর সাবেক প্রজাদের নিকট থেকে রাজস্ব সংগ্রহ অব্যাহত রাখতে পারেন, তবে সেই রাজস্ব এখন রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহার্য সৈন্য ও ঢাকায় রাজকীয় কর্মকর্তাদের নির্ধারিত সংখ্যক সৈন্যের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয়িত হবে। যদিও সুবেদারের ইচ্ছানুসারে যেকোন সময় তাঁকে ও তাঁর সৈন্যদের তার সামনে উপস্থিত করতে হবে, তবুও সাম্রাজ্যের জায়গিরদার একজন রাজার মর্যাদাতেই তাঁর সাবেক প্রজাদের অনুষ্ঠানাদিতে সভাপতিত্ব করবেন। রাজা যদি এই নতুন রাজনৈতিক ভূমিকা পালনে সম্মত হন, তবে সুবেদারের সামনে তার ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে, মর্যাদার সাথে এই সমঝোতা অনুমোদন করা হবে। কিন্তু তিনি যদি প্রতিরোধ করেন এবং পরাজিত হন, তবে রাজকীয় রাজস্ব কর্মকর্তাগণ তাঁর ভূখণ্ড মূল্যায়ন করে সেখান থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করবেন, আর তিনি নিজে যুদ্ধে যদি বেঁচে যান, তবে তাকে কারারুদ্ধ হতে হবে।[৬৮]

সাধারণভাবে, গোষ্ঠীপতি যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবেন, যত দ্রুত আনুগত্য প্রকাশ করবেন, ইসলাম খান তাঁকে মোগল শাসনের প্রতি বশ্যতা স্বীকারের বিনিময়ে আরো বেশি পুরস্কারের প্রস্তাব দেন। বাংলার 'বার ভূঁইয়াদের' অন্যতম শক্তিশালী যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের সাথে সুবেদারের সমঝোতার বিষয়টি বর্ণাঢ্যভাবে ফুটে উঠে। মির্জা নাথান লিখেন, 'অন্যান্য জমিদারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এবং বাংলার

৬৭. Ibid., text, fols, 6a; Trans., 1: 18.

৬৮. প্রাথমিকভাবে মোগল চাপ প্রতিহত করার পর রাজা সত্যজিৎ ইসলাম খানের সাথে শান্তি স্থাপন করেন এবং পূর্ববঙ্গে অন্যান্য গোষ্ঠীপতির বিরুদ্ধে অসংখ্য মোগল অভিযানে যোগ দেন।

জমিদারদের মধ্যে উল্লিখিত রাজার উচ্চ মর্যাদার কথা বিবেচনা করে ইসলাম খান তাঁকে অপরিসীম সম্মানিত করেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দেন ও উৎসাহিত করেন।'[৬৯] ছোট নেতারা প্রতাপাদিত্যের মতো বড় নেতার নিকট থেকে নেতৃত্ব কিংবা অন্তত নির্দেশনার দিকে তাকিয়ে থাকে, তা উপলব্ধি করে সুবেদার এই গোষ্ঠীপতিকে জায়গির হিসেবে শুধুমাত্র তাঁর নিজের সাবেক বিষয় সম্পত্তিই বহাল রাখা নয়, বরং পূর্বদিকে আরো ভূমিদানের প্রতিশ্রুতি দেন। সমঝোতা চূড়ান্ত করার জন্য সুবেদার তাঁকে একটি বিস্ময়কর মোগল রাজকীয় পোশাক, একটি তরবারি, রত্নখচিত একটি তরবারির খাপ, একটি কর্পূরদানি, পাঁচটি উচ্চ-শ্রেণীর ঘোড়া, তিনটি হাতি ও একটি রাজকীয় নাকাড়া দিলেন।[৭০]

অন্যদিকে মোগল কর্তৃপক্ষ নব্য-সৃষ্ট জায়গিরদারদের নিকট থেকে কোন ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা বরদাস্ত করতো না। ইতিপূর্বে আনুষ্ঠানিক বশ্যতা স্বীকার সত্ত্বেও প্রতাপাদিত্য ইসলাম খানকে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তার সেনাবাহিনী দিতে ব্যর্থ হলে সুবেদার তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যশোরে বিশাল সেনা ও নৌবাহিনী প্রেরণ করেন। প্রতাপাদিত্যের বাহিনীকে পরাজিত করার পর সুবেদার রাজাকে কারারুদ্ধ করেন ও তার এলাকা অঙ্গীভূত করে নেন।[৭১] তারপর প্রাদেশিক প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তাকে রাজার সাবেক এলাকায় পাঠানো হয় 'যশোরের যথাযথ রাজস্ব জরিপ এবং ঢাকায় সরকারি রেকর্ড অফিসে খাজনা-তালিকা (মাসখা) নিয়ে আসার জন্য।'[৭২] স্পষ্টতই, রাজকীয় শাসন প্রতিরোধের মাধ্যমে তাঁর সাবেক রাজত্ব জায়গির হিসেবে বহাল রাখার সুযোগ হারালেন এবং তিনি তাঁর সাবেক প্রজাদের মোগল রাজস্ব কর্মকর্তাদের পুনর্মূল্যায়নের মুখে ফেলে দিলেন।[৭৩] প্রতাপাদিত্য যদি প্রতিরোধ না করতেন, তবে তিনি তার নিজের এজেন্টদের মাধ্যমে কর ও খাজনা ধার্য ও আদায় করা অব্যাহত রাখতে পারতেন। তবে এর চেয়েও বড় পুরস্কার ছিল ঈশা খানের আরেক পুত্র মূসা খানের বশ্যতা স্বীকারে। মসনদ-ই আলা তথা 'মর্যাদাসম্পন্ন সিংহাসন' রাজকীয় পদবিধারী মূসা খান ভাটির প্রধান শাসক হিসেবে তার পিতার অবস্থানের উত্তরসুরি হন। এই বাঙালি শাসকের সাত শত রণতরীর, যার অনেকগুলো ছিল কামান সজ্জিত,

৬৯. Ibid., text, fols, 9a; Trans., 1: 27.

৭০. Ibid., text, fols, 9a: Trans., 1: 28.

৭১. Ibid., text, fols, 49b, 54b, 57b; Trans., 1: 121, 134-38 143.

৭২. Ibid., text, fols, 57b; Trans., 1: 144.

৭৩. মির্জা নাথান লিখেন, "যশোহরের রাজস্ব পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য সেখানে প্রেরিত খাজা মুহাম্মদ তাহির উক্ত এলাকার রায়ত (তথা কৃষক) ও রাজকীয় খাজাঞ্চিখানার সন্তুষ্টি সহকারে প্রস্তুত একটি তালিকাসহ ইসলাম খানের কাছে ফিরে আসেন। এটা চৌধুরী ও কানুনগোদের (অর্থাৎ মধ্যবর্তী ভূস্বামী ও তাদের কেরানি) স্বাক্ষর সহযোগে ইসলাম খানের কাছে উপস্থাপন করা হয়, যাতে রায়ত ও জায়গিরদারদের উপর এসব বিধিবিধান বলবৎ করা যায়।" Ibid., text, fols, 5a, 19b, 21a; Trans., 2: 503-4.

বিশাল নৌবহর থাকা সত্ত্বেও মোগলরা ১২ হাজার নাবিক চালিত নিজস্ব ২৯৫টি রণতরী নিয়ে তাকে মোকাবেলা করে এবং তাকে বশ মানায়।[৭৪] মূসা খান যখন বিদ্রোহ করেন এবং আবার তাকে বশ মানানো হয়, তখন সুবেদার তাকে ঢাকায় আটকে রাখেন।[৭৫] অবশ্য কাশিম খান সুবেদার হওয়ার পর এই বাঙালি গোষ্ঠীপতিকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং উত্তর ও পূর্ব সীমান্তে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে অংশ নিতে অনুমতি দেওয়া হয়।[৭৬] বাস্তবিকই, ত্রিপুরার রাজার বিরুদ্ধে পাঁচ হাজার গাদা বন্দুকধারী ও ৫০টি হাতির এক সেনাবাহিনীর সহ-সেনাপতি করা হয় তাঁকে এবং তিনি রাজাকে বন্দী করেন ও ব্যক্তিগতভাবে বন্দী রাজাকে ঢাকায় নিয়ে আসেন।[৭৭] ইব্রাহিম খানের সুবেদারির সময় (১৬১৭-২৪) মির্জা নাথানের 'মূসা খান ও ভাটির বার ভূঁইয়ার' পূর্ব বাংলা জুড়ে মোগল অভিযানে সম্পৃক্ত থাকার উক্তিতে ইঙ্গিত দেয় এই সময়ের মধ্যে সাবেক স্বাধীন গোষ্ঠীপতিদের সবাই রাজকীয় বাহিনীতে একীভূত হয়ে গেছে।[৭৮]

এই সকল রাজনৈতিক তৎপরতার কেন্দ্র ছিল ঢাকা তথা সরকারিভাবে পরিচিত 'জাহাঙ্গীরনগর', যা সপ্তদশ শতাব্দীতে শক্তি ও প্রভাবের দিক থেকে সর্বোচ্চ অবস্থানে উঠে এসেছিল। ১৬৪০ সালে সেখানে অবস্থানকারী সেবাসতিয়াও মানরিক স্থানটিকে দুলক্ষাধিক জন অধ্যুষিত 'গাঙ্গেয় বাণিজ্যকেন্দ্র' হিসেবে বর্ণনা করেন।[৭৯] ১৫১৫ সালের দিকে সালতানাতের ক্ষমতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকার সময়ে গৌড়ের জনসংখ্যা যেখানে ছিল মাত্র ৪০ হাজার, সেই হিসাবে ইসলাম খানের আগমনের পরের ৩০ বছরে মোগল রাজধানীর দ্রুত সম্প্রসারণের বিষয়টি ফুটে ওঠে। মানরিক নগরীটির সম্পদে বিশেষভাবে মোহিত হয়েছিলেন। তিনি লিখেন:

এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ ও উর্বরা মাটিতে মাত্রাতিরিক্ত উৎপাদিত, ব্যাপক বৈচিত্র্যপূর্ণ সামগ্রীর বিশাল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এই নগরীতে অনেক অদ্ভুত জাতি বসবাস করে। এর ফলে নগরীটিতে বৈশিষ্ট্যময় বিশাল সম্পদের সৃষ্টি করে, বিশেষ করে যখন কেউ দেখে প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রধানত কাটারির (খত্রি) বাড়িতে, যা এতো বেশি যে, গণনা করা কষ্টকর দেখে সাধারণভাবে তা ওজন করা হয়।[৮০] মানরিকের বর্ণনায় সম্পদশালী খত্রিদের (পাঞ্জাবের ব্যাংকার, মহাজন ও বণিকদের একটি হিন্দু বর্ণ)[৮১] উল্লেখে বণিক, ব্যাংকার ও মহাজন হিন্দু সম্প্রদায়টির প্রাধান্য ফুটে উঠে, যারা সম্পদ ও সফলতার জন্য তাদের মোগল পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গী হয়েছিল।

৭৪. Ibid., text, fols, 5a, 19b, 21a; Trans., 1: 15, 56-57, 62.
৭৫. Ibid., text fols, 41b; Trans., Trans., 2: 503-4.
৭৭. Ibid., text, fols, 231a, 271a; Trans., 2: 511, 628.
৭৮. Ibid., text, fol. 273a; Trans., 2: 636.
৭৯. Manrique, Travels, 1: 45.
৮০. Ibid., 44.
৮১. Abdul Karim, *Dacca, the Mughal Capital* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1964), 70, ভুলক্রমে তাদেরকে রাজস্থানের মাড়োয়ারি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বাস্তবকই, খত্রি ও মোগলরা বাংলা জয়ে পরস্পরের সহযোগী হয়েছিল। মোগলরা যখন খত্রিদের তাদের ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য অপরিহার্য রাজনৈতিক নিরাপত্তা দিচ্ছিল, তখন তারা সমগ্র উত্তর ভারতে বসবাসকারী তাদের গোত্রীয় সদস্যদের নিয়ে গড়া নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মোগলদেরকে অর্থনৈতিক মূলধনের যোগান দিচ্ছিল।[৮২] তাত্ত্বিকভাবে রাজকীয় কর্মকর্তাগণ তাদের নির্ধারিত জায়গির বা রাজস্ব ইউনিট হিসেবে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থেকে সংগৃহীত অর্থই শুধুমাত্র তাদের সামরিক অভিযানে ব্যয় করতে পারতো। কিন্তু বাস্তবে, কর্মকর্তাদের তাদের সংগৃহীত রাজস্বের চেয়েও বেশি অর্থের প্রয়োজন হতো এবং সেক্ষেত্রে তারা মহাজনদের দ্বারস্থ হতো। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৬২১ সালের দিকে মির্জা নাথান তার জায়গির থেকে প্রায় এক হাজার অশ্বারোহীর ব্যয়ভার বহনের মতো পর্যাপ্ত রাজস্ব পেতেন, কিন্তু উত্তরবঙ্গে সৈন্য পরিবহন ও সরবরাহের লক্ষ্যে নৌকা ক্রয় বা ভাড়ার জন্য তিনি এক লাখ রুপি ঋণ গ্রহণ করেন 'জাহাঙ্গীরনগরের বণিক-রাজপুতের (মুল্লক-ই-তুজারান) নিকট থেকে।[৮৩] এর কিছু আগে এবং একই উদ্দেশ্যে আরো উত্তরের কুচ অঞ্চলের মোগল চৌকি গিলায় তিনি হিন্দু মহাজনদের নিকট থেকে ৩০ হাজার রুপি কর্জ করেন। এটা ইঙ্গিত দেয় যে, মোগল বাহিনীকে অনুসরণ করে এসব ব্যাংকিং পরিবার এমনকি রাজকীয় সম্প্রসারণের দূরতম সীমান্তেও পৌছে গিয়েছিল।[৮৪] অধিকন্তু নাথানের এই খোলামেলা বক্তব্যে ধারণা করা যায়, এ ধরনের লেনদেন ছিল নিয়মিত ব্যাপার। এতে এটারও ইঙ্গিত মেলে যে, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে দৃষ্ট হিন্দু বণিক-ব্যাংকার ও মোগল কর্মকর্তাদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি বাংলার সাথে মোগলদের সম্পর্কের প্রথমদিককার দিনগুলোতেও বিদ্যমান ছিল।[৮৫]

---

৮২. সামরিক বাহিনীর লোকজন এবং ব্যবসায়ী উভয়ের ঢাকার প্রতি আকর্ষণের বিষয়টি মানরিকের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি লিখেন, এর জনসংখ্যার অনেকে "এখানে প্রাপ্ত বিশাল সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য এসেছে, *মার্সের* (রোমানদের রণদেবতা) অনুসারীরা (অর্থাৎ সৈনিকরা) উচ্চতর মাহিনা, তথা সেইসব সীমান্তে প্রদান করা মাসিক বেতন ও ভাতার আকর্ষণে এসেছে।" Manrique, *Travels* 1: 45.

৮৩. Nathan, *Baharistan*, text, fol. 276a-b; Trans., 2: 644. উক্ত ঋণের সময়ে নাথানের রাজস্ব কত নির্ধারিত ছিল, তা আমাদের জানা নেই, তবে উক্ত ঋণের আগে এবং পরে উভয়বারই জাহাঙ্গীর অতিরিক্ত ১৫০টি ঘোড়া দিয়ে তাঁর আয় বাড়িয়েছেন, এবং শাহজাহানের রাজত্বের প্রথমদিকে তা বাড়িয়ে ১৫০০ ঘোড়া করা হয়। Ibid., text, fols, 272a, 284a, 305a; Trans., 2: 632, 666, 723.

৮৪. Ibid., text, fol, 264a-b; Trans. 2: 607.

৮৫. মোগল বাংলার শেষ সময়ে হিন্দু মহাজন ও সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যকার সম্পর্কের আলোচনার জন্য দেখুন Sushil Chaudhury, "Merchants, Companies and Rulers in Bengal in the Eighteenth Century," *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 31 (February 1988): 90-109.

সারাংশ

ইসলাম খানের বাংলায় পৌঁছার অব্যবহিত পরেই মোগলরা প্রদেশটির অভ্যন্তরে সুলতানি আমল থেকে বিস্তৃত প্রধান প্রধান গোষ্ঠীপতিদের বিরুদ্ধে জয়ী হয় বা তাদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে। অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীপতি বা জমিদাররা রাজকীয় শাসনের আনুগত্য প্রকাশের পরও সেই পর্যায়ের বাইরে নতুন শাসকরা তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কতটুকু বিস্তৃত করতে পেরেছিলেন, সেই প্রশ্ন তোলা অযৌক্তিক হবে না। ১৬২৯-৩০ এবং আবার ১৬৪০ সালে বাংলায় অবস্থানকারী অগাস্টিয়ান মিশনারি সেবাসটিয়াও মানরিক শিকদারের সামর্থ্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, রাজকীয় প্রশাসনের সর্বনিম্ন ইউনিট পরগনার নির্দিষ্ট রাজস্ব সংগ্রহে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ এবং এমনকি কর দানে ব্যর্থ কৃষকদের দাস বানানোর নির্বাহী ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন এই মোগল কর্মকর্তা।[৮৬] অবশ্য আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী সাক্ষ্য দিচ্ছে, যতদিন পর্যন্ত কৃষকরা আইনসম্মত ব্যবস্থায় তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করতো, সরকারও তাতে সাড়া দিত। ১৬৬৪ সালে কুচবিহারের রাঙামাটির পদস্থ রাজস্ব কর্মকর্তা (আমিন) কৃষকদের নির্যাতনের অভিযোগে তার এক খাজনা সংগ্রাহককে (চৌধুরী) বরখাস্ত করেন। অধিকন্তু এই পদস্থ কর্মকর্তা নতুন কোন আদায়কারী নিয়োগের আগে তার প্রার্থিতার ব্যাপারে কৃষকদের লিখিত অনুমোদন নিতেন।[৮৭] নয়দিন পর নতুন আদায়কারী একটি লিখিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ঘোষণা করতো, 'আমি বালচাঁদ... স্বীকার করছি এবং প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি এতো পরিশ্রম সহকারে দায়িত্বটি পালন করবো যাতে চাষযোগ্য জমি বৃদ্ধি পায় এবং আমি কাউকে নির্যাতন করবো না।'[৮৮]

সংক্ষেপে, বৈদেশিক পর্যবেক্ষক ও সমসাময়িক রাজস্ব দলিলপত্র উভয়ই সাক্ষ্য দিচ্ছে, সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ মোগলরা পুরো বদ্বীপে ক্ষমতা ও

৮৬. Manrique, Travels, 1:53.

৮৭. তাদের আবেদনে বলা হয়, "আমরা পরগনা খোরলার কৃষকরা বলছি যে, পশুপতির নির্যাতনে আমরা ধ্বংস হয়ে গেছি। আমরা তাই অত্যন্ত ঐকান্তিকতা ও সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের মতানুযায়ী বালচাঁদকে (তার নিয়োগকে) গ্রহণ করছি যেখানে তার পক্ষ থেকে হাজির-জামিন থাকবেন সুরুজ চাঁদ কানুনগো। আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি, সে যখন চৌধুরীর সনদ লাভ করবে, আমরা অবশ্যই আগের মতো খাজনা পরিশোধ করবো।" S. Z. H. Jafri, "Rural Bureaucracy in Cooch Behar and Assam under the Mughals: Archival Evidence," Indian History Congress, Proceedings, 49th session, Karnataka University, 1988 (Delhi, 1989), 280.

৮৮. Ibid.

বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারা এটা অর্জন করে বারুদপূর্ণ অস্ত্রের সাথে অশ্বারোহী তীরন্দাজ ও নৌশক্তির কার্যকর সমন্বয়পূর্ণ একটি সামরিক কৌশলের সাথে চলমান ও সম্পদশালী খত্রি ব্যাংকারদের অর্থনৈতিক সেবার মাধ্যমে। সামরিক ও কূটনীতি উভয় ক্ষেত্রেই সফলতাই জন্ম দেয় সফলতার। এসব সফলতা প্রত্যক্ষকারী বাঙালি গোষ্ঠীপতিগণ ক্রমবর্ধমান হারে বুঝতে পারলো, প্রতিরোধকারীদের চাইতে নতুন ব্যবস্থায় যোগদানকারীরাই বেশি লাভবান হচ্ছে। সর্বোপরি, মোগল যুগ ইতিপূর্বেকার গৌড়ের মতো স্রেফ প্রহরীর পরিবর্তন ছিল না, কিংবা আগের মতো অপর একটি শাসক শ্রেণীকে অপসারণকারী নিছক একটি সামরিক দখলদারিত্ব ছিল না। কিংবা মোগল শাসনের পরিবর্তন বলতে শুধুমাত্র বড় বড় কামান, আরো জাঁকালো রাজদরবার কিংবা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর স্থাপনার মধ্যেই সীমিত ছিল না। বরং পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে দেখা যাবে, এই বিজয়ের সাথে অঞ্চলটির অর্থনৈতিক অবকাঠামোতে, তার সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এবং তার সাংস্কৃতিক অবয়বে, দরবার ও পল্লী এলাকা উভয় স্থানেই, মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

৭ মোগল সংস্কৃতি ও তার বিস্তৃতি

নিমকের প্রতি বিশ্বস্ততা অপেক্ষা গুরুভার কোন বোঝা নেই মুসলমানের স্কন্ধে।
--মির্জা নাথান (১৬১২)

বাংলায় মোগল সংস্কৃতির রাজনৈতিক ভিত্তি

সপ্তদশ শতকের মোগল রাজদরবারের ক্ষুদ্রকায় চিত্রকর্মগুলোতে (মিনিয়েচার) অভিজাত ব্যক্তিবর্গদের পরিপাটিভাবে বিন্যস্ত হয়ে ও মর্যাদা অনুযায়ী সারিবদ্ধভাবে অবস্থানের বৈশিষ্ট্যসূচক দৃশ্যে দেখা যায়, তাদের চোখ উঁচু বেদিতে আসন গ্রহণকারী সম্রাটের দিকে নিবদ্ধ, অন্যদিকে মাথাকে ঘিরে থাকা উজ্জ্বল চন্দ্রালোকের প্রতিচ্ছবিতে তিনি সমবেতদের প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন (দেখুন চিত্র ১৮)। মোগল সংস্কৃতির মূল বক্তব্য পুনর্নির্মাণের প্রয়াসে আমরা এ ধরনের চিত্রকর্মগুলোতে বিদ্যমান বিন্যাস ও প্রাধান্যপরম্পরা ভালমতোই বিবেচনা করতে পারি। ষোড়শ শতকের পরিক্রমায় বিবর্তিত মোগল সংস্কৃতি সর্বোপরি ছিল একটি দরবারি ও রাজকীয় সংস্কৃতি এবং সেসব ক্ষুদ্রাকার চিত্রকর্মগুলোর একটি লক্ষ্য ছিল সম্রাটের ব্যক্তিত্ব ও মহিমা ফুটিয়ে তোলা।

প্রথমদিককার দিল্লী সুলতানদের প্রবণতা ছিল অধীনস্থ ভারতীয় জনগণকে বিদেশী হিসেবে শাসন করা, কিন্তু আকবরের সময়কাল (১৫৫৬-১৬০৫) থেকে মোগলদের পরিকল্পনা ছিল উত্তর ভারতের অসংখ্য ধর্মীয় গোষ্ঠীগত সম্প্রদায়কে একটি একক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আবদ্ধ করা। ১৫৮০ সালের দিকে রাজদরবারকে একটি নজিরবিহীন সজ্জাকরণ, এমনকি রাজনীতির চিন্তাচেতনায় সমন্বয় করার প্রবণতায় সম্রাটের 'ইসলামের বাদশাহ'[১] পদবিটি ব্যর্থভাবে পরীক্ষার প্রেক্ষাপটে এই নীতি দানা বাঁধে।[২] আকবরের প্রধান ভাবাদর্শবাহক আবুল ফজলের বিস্তারিত বর্ণনায় মোগল

---

১. আকবরের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নীতির বিকাশের জন্য দেখুন Iqtidar Alam Khan, "The Nobility under Akbar and the Development of His Religious Policy, 1560-80," *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, pts. 1 and 2 (1986): 29-36.

২. এটা সর্বজনবিদিত যে, আকবর গরু জবাইসহ হিন্দুদের জন্য পীড়াদায়ক তৎপরতা নিষিদ্ধ করেছিলেন। তিনি হিন্দু তীর্থযাত্রীদের উপর আরোপিত করসহ বিভিন্ন বৈষম্যমূলক শুল্ক বাতিল করেন, তাঁর অন্দরমহলে হিন্দু ঋষিপুরুষদের প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন, এবং রাজপুত সমাজপতিদের তাঁর

রাজদরবার থেকে বিচ্ছুরিত রাজকীয় কর্তৃত্বের মডেলটিতে রাজত্ব সম্পর্কে ভারতীয় ও পারস্য-ইসলামী উভয় ধারণারই কাছাকাছি দেখা যায়। এটা রাজকীয় কর্তৃত্বের সাসানীয় পারসি মডেল থেকে সংগৃহীত, যাতে সৈনিক-প্রশাসক তথা মনসবদারদের প্রাধান্য পরম্পরার রাজনৈতিক ও আদর্শগতভাবে সমর্থিত সর্ব-দয়ালু ও প্রায় অতিলৌকিক সম্রাটের নিকট থেকে সবদিকে শ্রেষ্ঠত্ব ও শৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে।[৩] প্রায় যেকোন আধুনিক মুসলিম শাসকদের মতোই ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহকে পৃষ্ঠপোষকতা করলেও ভারতীয় রাজ-রাজড়াদের বা হিন্দু দেব-দেবীদের মূর্তি জনসম্মুখে প্রদর্শনে (দর্শন) ব্যবহৃত ঐতিহ্য অনুসরণ করা হতো, সম্রাটের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত উঁচু বেদিতে (ঝরোকা) জনসম্মুখে (দরবার) সেভাবে উপস্থিত হয়ে আকবর তার প্রজাদের কাছে নিজেকে দীপ্তভাবে ভারতীয় মহারাজা হিসেবেই উপস্থাপন করতেন। ফলে ভারতীয় সভাসদরা যখন উপবিষ্ট সম্রাটের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো, তখন তারা তার মাঝে নিশ্চিতভাবেই দুটি কল্পনার অন্তত একটি করতো, তিনি হয় একজন ধার্মিক মুসলমান সুলতান অথবা স্বর্গীয় ক্ষমতাপুষ্ট একজন সনাতন মহারাজা কিংবা একই সাথে উভয়টিই।

দিল্লী, আগ্রা বা লাহোরের রাজদরবারগুলোর রাজকীয় কর্তৃত্বের এই জমকালো প্রদর্শনী মোগল প্রদেশগুলোতেও ক্ষুদ্রাবয়বে দ্রুত নকল হতে থাকলো। ঢাকায় ইসলাম খান ঝরোকাসহ জাহাঙ্গীরের রাজদরবারের একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি নির্মাণ করেন। সুবেদারের প্রাসাদের লাগোয়া ভেতরের বাগানে স্থাপিত ঝরোকায় একটি জানালা এবং ভূমি থেকে প্রায় ১২ ফুট উপরে বেষ্টনি দেওয়া একটি বেদি ছিল। জানালার পেছনে এবং নীচে বাগানে অবস্থানকারীদের উপরে উপবিষ্ট হয়ে সুবেদার দরবার তথা ব্যক্তিগত বা সরকারি কাজে আগতদের সাক্ষাৎ দিতেন।[৪] রাজনৈতিক ধর্মাচার মঞ্চস্থ করার স্থান হিসেবে ঝরোকা তাই মোগল রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু প্রকাশ করতো তা হলো: রাষ্ট্রের সকল সেবক (রাজকীয় নিযুক্ত ও রাজকীয় জায়গিরদার হিসেবে একীভূত বাঙালি জমিদার সবাই) সুবেদারের অধীন, শাসক শ্রেণীতে সবার সুসংহতভাবে অবস্থান, রাষ্ট্রীয় চাকুরিতে ক্রমিকধারাপূর্ণভাবে অন্যের তুলনায় প্রতিটি সদস্যের সূক্ষ্ম অবস্থান। জাহাঙ্গীরের দরবারের অনুকরণে আনুষ্ঠানিক পর্যালোচনার সময়ে কর্মকর্তাগণ সুবেদারের ঝরোকার কাছে তাঁদের পদমর্যাদা

শাসকশ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থরাজি ফারসি ভাষায় অনুবাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং হিন্দু উৎসবসমূহে অংশ নিতেন। Sri Ram Sharma, *The Religious Policy of the Mughal Emperors*, 2d ed. (London: Asiatic Publishing House, 1962), 19-24.

৩. আকবরের রাজনৈতিক মতাদর্শ গঠনে যেসব উপাদান কাজ করছিল, তা জানার জন্য দেখুন, *The Formation of the Mughal Empire* (Delhi: Oxford University Press, 1989), esp. 123-81.

৪. Nathan, *Baharistan*, texts, fol. 49a, 60b; trnas., 1: 20, 153.

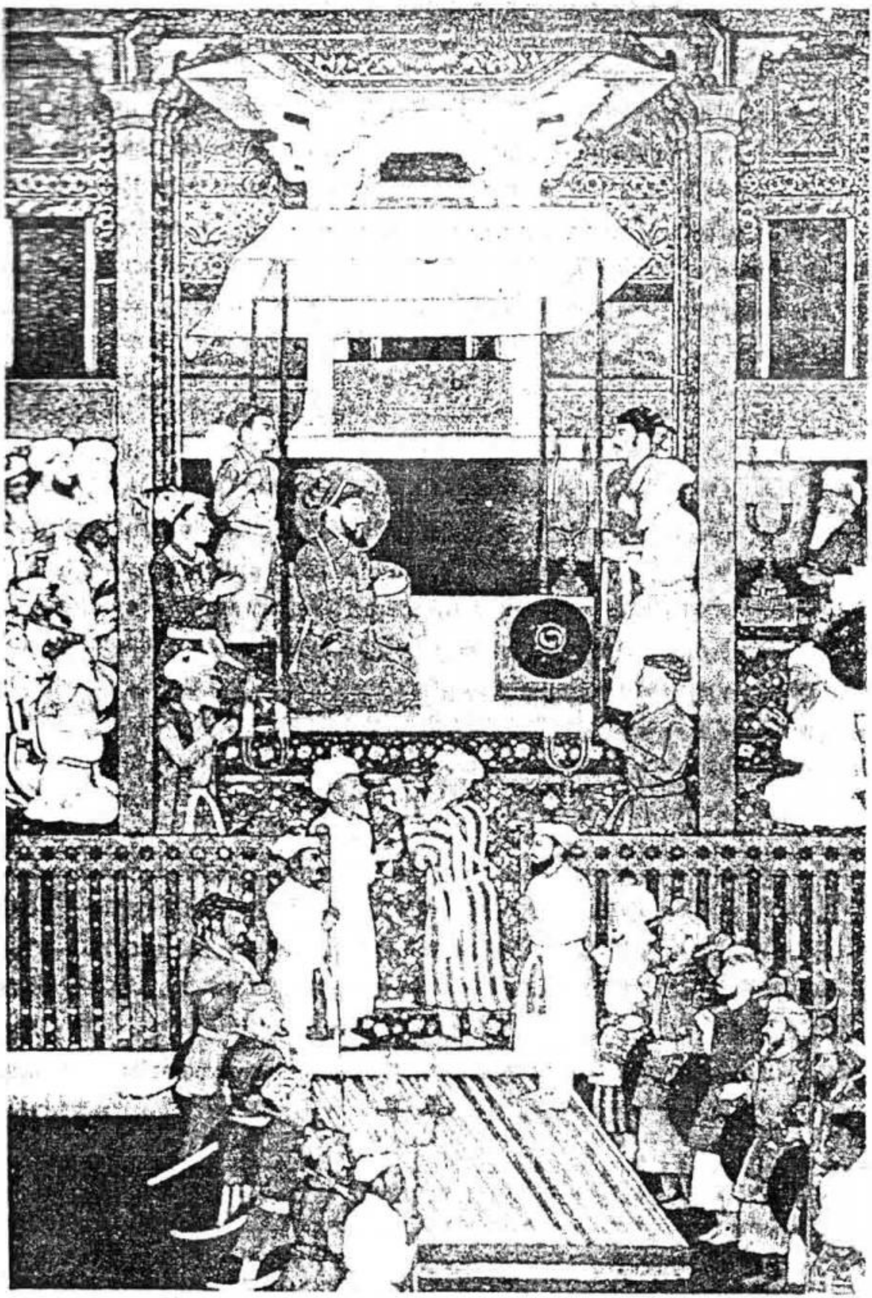

চিত্র ১৮। "Shah Jahan Honors Religious Assembly," From Stuart Cary Welch, Imperial Mughal Painting (New York: George Braziller, 1978), 102, pl. 31. Reprinted by Permission of George Braziller, Inc.

অনুযায়ী, সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা ঝরোকার সবচেয়ে কাছে এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা তা থেকে সর্বাধিক দূরত্বে দাঁড়াতেন।[৫]

মোগল রাজনৈতিক সংস্কৃতি চিন্তার বৈচিত্র্যময় বিন্যাসের মাধ্যমেও প্রকাশ পেত। সম্রাট থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন সেবক পর্যন্ত সবাই 'লবণের' (নুন, নিমক) আদর্শের মাধ্যমে পারস্পরিক বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ থাকতো, শব্দতাত্ত্বিকতার দিক থেকে এই সমৃদ্ধ পরিভাষাটি যুগপৎভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অতিলৌকিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতো এবং নিরাপত্তা ও নির্ভরতার ধারণা প্রকাশ করতো। মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতির সাথে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত এই আদর্শটির অস্তিত্ব প্রাচীন মেসোপটেমিয়ান বিশ্বে দেখা যায়, যেখানে আক্কাইডীয় বাক্য বিন্যাসে '(কোন ব্যক্তির) লবণ খাওয়া' বলতে বোঝাতো তার সাথে একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়া কিংবা অন্য কারো সাথে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা।[৬] প্রাচীন হিব্রুতে মনে করা হতো 'লবণের চুক্তিতে' তারা খোদার কাছে বাঁধা,[৭] এবং এ ধরনের চুক্তি জাগতিক রাজার স্বীকৃতি ও দায়গ্রহণ বোঝাতো।[৮] প্রাচীন পারস্যেও রাজা ও তার সেবকবাহিনীর মধ্যে লবণ প্রতীকীভাবে রাজনৈতিক সমঝোতা প্রকাশ করতো। আরটাক্সেরক্সের (আনুমানিক ৪৬৫-৪২৫) অধীনস্থ কর্মকর্তারা তাদের শাসককে রাজকীয় রাজস্ব সংগ্রহে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেওয়াকে বাধ্যতামূলক মনে করে উল্লেখ করতো, 'আমরা প্রাসাদের লবণ খেয়েছি আর তাই রাজার অসম্মান প্রত্যক্ষ করা আমাদের মানায় না।'[৯] এ ধরনের

---

৫. Ibid., text, fol. 78b; Trans., 1: 205. এসব রাজনৈতিক প্রথা সম্রাটের প্রতি দেয় বৃহত্তর আনুগত্যের বিনিময়ে প্রাদেশিক সুবেদারদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের বিপদও সৃষ্টি করতো। এই আশংকা জাহাঙ্গীরের নিজের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছিল, তাই তিনি একটি ডিক্রি জারি করে সুবেদারদেরকে অন্যদেরকে সালাম বা অভিবাদন করতে বাধ্য করা থেকে বিরত থাকা, *ঝরোকায়* বসে পর্যালোচনা করা, কিংবা এমনকি ভূমি থেকে মানুষের অর্ধেক উচ্চতার বেশি এমন উঁচুস্থানে বসা নিষিদ্ধ করেন। ক্ষমতার সারবত্তা ও প্রতীকীবাদ যুগপৎভাবে সংগঠিত না হলেও একটি অপরটিকে ছাড়িয়ে যায়, এমন একটি রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ভূমি থেকে উঁচুতে এ ধরনের সূক্ষ্ম উত্তরণ অনেক বড় ব্যাপার ছিল। Ibid., text, fol. 103a; Trans., 1:213.

৬. Daniel Potts, "On Salt and Slat Gathering in Ancient Masopotamia," *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 27, no. 3 (October 1984); 228.

৭. আল্লাহ মূসা ও হারুন উভয়কেই ইসরায়েলের জনগণের পবিত্র নিবেদনে লবণ অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেন, "তোমরা তোমাদের খোদার কাছে শস্য নিবেদনের সময় লবণের দায় থেকে অব্যাহতি দিতে দেবে না।" Lev. 2: 13). See also Num. 18:19.

৮. "ইসরায়েলের পরমেশ্বর লবণের চুক্তিকে ইসরায়েলের রাজত্ব চিরদিনের জন্য দাউদ ও তার পুত্রদেরকে প্রদান করেছেন।" (2 Chron. 13:4-5).

৯. Ezra 4: 14. খুব সম্ভবত একাইমেনিড় যুগে (খ্রিস্টপূর্ব ৫৫৩-৩৩০) রচিত দি ব্রাহ্মণ যস্ত *(The Bahman Yast)* গ্রন্থে বলা হয়েছে, জরথুস্ত্রীয় যুগের শেষকালে মানুষ "রুটি আর লবণের প্রতি কোনই কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবে না এবং দেশের প্রতিও তাদের কোন ভালবাসা থাকবে না।"

গভীর ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকায় ব্যাপকভাবে অনুসৃত পারসো-ইসলামী সংস্কৃতিতে সামাজিক-রাজনৈতিক আনুগত্য ও নির্ভরশীলতায় রূপক হিসেবে লবণের ব্যবহার সামান্যই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। আমরা এই অর্থেই পরিভাষাটির ব্যবহার দেখি খোরাসানি মহাকবি ফেরদৌসির (মৃত্যু ১০২০) কবিতায়।[১০] খোরাসান থেকে পারস্য-ভাবাপন্ন তুর্কীরা লবণের আদর্শ উত্তর ভারতে নিয়ে আসে এবং চতুর্দশ শতকের প্রথমদিকে আমির খসরুর (মৃত্যু ১৩২৫) কবিতায় তা দেখা যায়।[১১]

মোগল বাংলায়, কর্মকর্তা ও তাদের অধীনস্থদের আচরণে ক্ষমতাসীন শ্রেণীতে লবণের আদর্শ কতটকু অনুপ্রবেশ করেছিল তা ফুটে উঠে। সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে এক ঘটনায় প্রতিদ্বন্দ্বী দুই কর্মকর্তার তাদের একজনের উপর নির্ভরশীল বার্তাবাহকদের মাধ্যমে ঝগড়া করতে দেখা যায়। বার্তাবাহকরা যখন অপর কর্মকর্তার কাছে গেল, তখন তিনি উল্লেখ করেন, তাদের পৃষ্ঠপোষক ইতিমধ্যেই মর্যাদা হারিয়েছেন এবং জানতে চাইলেন, কেন তারা এখনো তার প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেছে। জবাবে নিম্নপদের সেবকরা বলে, 'আমরাও জানি আমাদের সম্মানও শেষ হয়ে গেছে এবং তা শেষ হওয়া (অব্যাহতভাবে) চলতে থাকবে; কিন্তু আমরা কি করতে পারি? আমরা যে তার কাছে লবণের দায়ে আবদ্ধ'।[১২] এখানে লবণ তার সবচেয়ে সাধারণ, রূপক অর্থটি প্রকাশ করেছে: পৃষ্ঠপোষক তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছে এবং বিনিময়ে তারা তাকে আনুগত্য দিয়েছে।[১৩]

মোগল কর্মকর্তাদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক বা রূপকভাবে যেভাবেই গৃহীত হোক না কেন এবং তা সম্রাটের হাতে খাওয়া হোক আর নাই হোক, লবণকে সারবস্তু হিসেবে

(Pahlavi Texts, trans., E.W. West, vol. 5 of *The Sacred Books of the East*, ed. Max Muller [Oxford: Clarendon Press, 1880], pt. 1, p. 204). এই সূত্রের জন্য আমি সাইদ এ. আরজুমান্দের কাছে ঋণী।

১০. Ali Akbar Dihkhuda, *Lughat-nama* (Tehran: University of Tehran, 1341 solar [1962], 30: 790.

১১. Ibid.

১২. Nathan, *Baharistan*, text, fol. 213b; trans., 2: 460. "মা হাম মিদানিম আবরু বা বাদ রাফতা ওয়া মিরাভাদ, ভালি চি-খুনাম? হুকুক-ই- নমক খুরদাগি দামানগির শুদা।"

১৩. মুসলিম বাংলার মতো আধুনিক ফারসি ভাষাতেও "লবণের" রূপকটি এখনো পৃষ্ঠপোষকতা, আনুকূল্য, আনুগত্য ও বিশ্বাসঘাতকতার মতো পরিব্যাপ্ত ধারণা প্রকাশ করে থাকে। এটা গভীরভাবে প্রোথিত মানবিক সম্পর্কের-বিশেষ করে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে-অত্যন্ত ভঙ্গুরতার এবং কিভাবে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, তা অব্যাহত রাখা বা অবসান হবে, তাই প্রতিফলিত করে থাকে। তাই *"নমক খুরদান"* তথা (কারো) নুন খাওয়া বলতে কোন পৃষ্ঠপোষকের গ্রহণ, স্বীকার এবং সুবিধা নেওয়াকে বোঝায়। বিপরীতপক্ষে, *"নমক-দান শিকাস্তান"* তথা "(কারো) লবণের পাত্র ভাঙ্গা" মানে পৃষ্ঠপোষকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা। একইভাবে, *"নমক শিনাস,* "লবণ প্রাপ্তি স্বীকার করার" মানে দাঁড়ায় কেউ কোন পৃষ্ঠপোষকের অনুগত এবং "নমক না-শিনাস" (কারো) লবণ প্রাপ্তি স্বীকার না করার" মানে দাঁড়ায় কোন পৃষ্ঠপোষকের অনুগত না হওয়া এবং এমনকি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

মনে করা হতো, ঠিক যেমনটি খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতকে পারস্য সম্রাট আরটাক্সেরক্সের দরবারে বিবেচনা করা হতো। রাজকীয় বাহিনীর অনুগত সদস্যরা একে অন্যের প্রতি আনুভূমিকভাবে এবং সম্রাটের দিকে উলম্বভাবে অবস্থানরত অবস্থায় বিশেষভাবে বাহিনীটি যখন মৃত্যুবরণের আশংকার মতো বিপদের মুখে থাকতো, তখন লবণ যৌথ সংহতির প্রকাশ ঘটাতো। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৬১৫ সালে আসামে রাজকীয় অভিযানকালে মোগল সৈন্যরা একবার নিজেদের অহোম রাজার সেনাবাহিনী কর্তৃক পুরোপুরি ঘেরাও অবস্থায় দেখতে পেল। তখন সেনানায়ক ও তাঁর সহকর্মীরা আত্মসমর্পণ না করে মাথায় কাফনের কাপড় মুড়ে মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়ে চিৎকার করে আসামীদের বললো, 'আমরা যেহেতু জাহাঙ্গীরের নুন খেয়েছি, তাই উভয় দুনিয়ার জন্যই শাহাদাত আমাদের কাছে কল্যাণকর।[১৪]

লবণের এই রূপক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে এফ.ডব্লিউ বাকলার তাঁর ১৯২৬ সালের এক প্রবন্ধে মোগল রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনায় 'আত্মীকরণের ধর্মাচারের' গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেন, সম্রাট শাসন ব্যবস্থার এমন একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেন যাতে তিনি শাসনকাজে অংশীদার ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট প্রতীকীর মাধ্যমে তার দেহের মধ্যে তাদেরকে আত্মীকরণ করে নেন। তারা তাঁর দেহের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়, এবং তাদের এলাকায় বা কর্মক্ষেত্রে তারা নিজেরাই রাজ-রাজড়ার সেবক নয়, বরং রাজার বন্ধু বা সদস্য, ঠিক যেমন কারো চোখ তার হয়ে দেখার কাজ করে এবং কান শোনার কাজ করে।[১৫]

এই কল্পনাপ্রসূত কাঠামোতে সম্রাটের লবণ গলাধঃকরণের মানে দাঁড়ায় সম্রাটের দেহের সাথে প্রতীকীভাবে মিশে যাওয়া, যেমনটি কমিউনিয়নের (যিশুখ্রিস্টের শেষ ভোজসভায়) অনুষ্ঠানকে বিবেচনা করে খ্রিস্টানরা। পরিশেষে, রাজকীয় বাহিনীর মুসলমানরা লবণকে সম্রাট এবং ধর্ম উভয়ের সাথে তাদের বন্ধন সৃষ্টিকারী উপাদান হিসেবে বিবেচনা করতো, অর্থাৎ তারা প্রাচীন পারস্যের 'প্রাসাদের লবণের' অনুভূতি এবং প্রাচীন হিব্রু ধারণা অনুযায়ী খোদার 'লবণের সমঝোতা' অনুভূতি উভয়টাই বিবেচনা করতা। ১৬১২ সালে বাংলায় মোগল কর্তৃত্ব প্রতিরোধকারী শেষ আফগান গোষ্ঠীপতিকে পরাজিত করার পর ইসলাম খানের বাহিনী পরাজিত মুসলমান শত্রুর

১৪. Ibid., text, fol. 260b; Trans., 2: 596-97. "চুন নমক-ই জাহাঙ্গীরি খুরদা শাহাদাত-রা সা'দাত ই দারাইনই খুদাইমান মিদানিম।"

১৫. F.W. Bucklar, "The Oriental Despot," *Oberlin Alumni Magazine 22*, no. 5 (February 1926): 15; and 22, no. 6 (March 1926): 14, Reprinted in *Legitimacy and Symbols; The South Asian Writings of FW Bucklar*, ed. M.N, Pearson (Ann Arbor: Center for South and Southeast Asian Studies, No, 26, 1985), 177. রাজকীয় সেবকরা "রাজার চক্ষু ও কর্ণ" হওয়ার ধারণাটি প্রাচীন নিকট প্রাচ্যের রাজনৈতিক ঐতিহ্যে দেখা যায়; ইরানের সাসানীয় রাজবংশের মাধ্যমে পারসো-ইসলামী রাষ্ট্রযন্ত্রে ধারণাটি প্রবেশ করে।

সাথে কেমন আচরণ করা হবে, সেই ভাবনায় পড়ে। মির্জা নাথান লিখেন, 'সিদ্ধান্ত হয়, প্রথম যাত্রাবিরতির স্থানে সকল আফগানকে আতিথেয়তা প্রদান করা হবে এবং তাদের মর্যাদা অনুযায়ী তাদের মধ্যে সম্রাটের লবণ বিতরণ করা হবে: 'কারণ লবণের প্রতি বিশ্বস্ততা অপেক্ষা গুরুভার কোন বোঝা নেই মুসলমানের স্কন্ধে।'[১৬] আবার সেই অধস্তনের তার পৃষ্ঠপোষকের– এখানে স্বয়ং সম্রাট অনুগত হয়, প্রকৃত লবণ বিতরণ ও তা গ্রহণের আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক আচার মাধ্যমে তার 'লবণ' গ্রহণ করে। তবে 'লবণের প্রতি বিশ্বস্ততা অপেক্ষা গুরুভার কোন বোঝা নেই মুসলমানের স্কন্ধে' এই বক্তব্য লবণের আদর্শটি ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং এতে পৃষ্ঠপোষককে খোদা হিসেবে বিবেচনা করা হতে পারে যাতে তার বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়, যেমনটি সম্রাট তাঁর প্রজাদের উপর আরোপ করেন কিংবা নিম্নতর মোগল কর্মকর্তারা তাঁদের নিজেদের অনুগতদের উপর করেন।

মোগলদের আত্মীকরণের আরেকটি ধর্মাচার ছিল কোন প্রজা বা সাবেক শত্রুকে রাজকীয় আলখাল্লা (খিলাত) প্রদান করা। বাকলার বলেন, 'রাজকীয় পোশাক পরার মাধ্যমে শারীরিক সংযোগের দায়াধিকারের ফলে রাজকীয় ব্যক্তির সাথে অঙ্গীভূত হওয়ার ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হতো। সম্মানসূচক আলখাল্লা প্রত্যাখ্যানের অর্থ ছিল কর্তৃত্বের প্রতি বশ্যতা স্বীকারে অস্বীকৃতি, তথা স্বাধীনতা ঘোষণা এবং রাজার সাথে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল।[১৭] বাংলায় মোগল শাসনের সূচনায় এ ধরনের ধর্মাচার নাটকীয়ভাবে মঞ্চস্থ হতে দেখা যায়, যখন ১৫৭৫ সালের এপ্রিলে দাউদ কররানি রাজকীয় বাহিনীর আনুগত্য স্বীকার করেন। ফতেহপুর সিক্রিতে আকবরের রাজধানীর দিকে নতমুখে দাঁড়ানোর আগে বাংলার পরাজিত সুলতানকে আকবরের একটি আলখাল্লা ছাড়াও একটি মোগল তরবারি ও একটি সুসজ্জিত কোমরবন্দ প্রদান করা হয়। এই প্রতীকের মাধ্যমে আকবরের দেহ ও আকবরের সাম্রাজ্যের সাথে দাউদের আত্মীকরণ ঘটে।

নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, রাজনৈতিক প্রতীক হিসেবে *ঝরোকা*, লবণ ও খিলাত প্রাক-মোগল বাংলাতেও উপস্থিত ছিল। চীনা ও পর্তুগীজ উভয় পর্যটকরাই বাংলার রাজধানীতে উঁচু বেদিতে সুলতানের আসন গ্রহণ ও তাঁর কর্মকর্তাদের বক্তব্য শ্রবণের কথা উল্লেখ করেছেন যা সুবেদার ইসলাম খান চিশতির ঢাকা দরবারের সাথে

১৬. Nathan, *Baharistan*, text, fols. 75b-76a; trans., 1: 197. বেরাহের অনুবাদে প্রদত্ত "তাদের মর্যাদা অনুযায়ী" বাক্যটি ফারসি ভাষার গ্রন্থে পাওয়া যায়নি। "সুব-আশ কুচিদা কারার দাদ তা হাম মনজিল-ই আভালিন হামাগি আফগানান-রা মিহমান সাকতা, নমক-ই বাদশাহ-ই দিনপানাহ বা খুরদ-আশান বাদাহাদ, কি আজ হাক-ই নমক বারি জিয়াদা-তার দার গারদান-ই মুসলমান নামিবাশাদ।"

১৭. Bucklar in *Legitimacy and Symbols*, ed. Pearson, 181.

বৈসাদৃশ্যপূর্ণ নয়। আর আমরা ফেরদৌসি ও আমির খসরুর কবিতায় লবণের রাজনৈতিক ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছি। ধরে নেওয়া যায়, প্রথমদিককার বাংলার সুবেদার ও সুলতানগণ লবণের আদর্শসহ রাষ্ট্র পরিচালনা ক্ষমতা ও রাজনৈতিক বৈধতার সেই ধারণা বদ্বীপে নিয়ে এসেছিলো, যা তাদের পারসি ভাবাপন্ন তুর্কী পূর্বপুরুষরা খোরাসান ও উত্তর ভারতে অবগত ছিল। পরিশেষে, রাজকীয় আলখাল্লা বা *খিলাতের* রাজনৈতিক ব্যবহার সম্পর্কেও বাংলার সুলতানগণ অবগত ছিলেন। ১৫২১ সালে এক পর্তুগীজ মিশনের সাথে সাক্ষাতকারের এক পর্যায়ে সুলতান নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ ইউরোপীয়ান ক্যাপ্টেনের সাথে কোলাকুলি করেন, হাসেন এবং তাঁকে আনুকূল্য প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি দেন। ইউরোপীয়ান ব্যাখ্যাকারী বলেন, 'তারপর তিনি আমার দিকে ফিরলেন এবং আমাকে তাঁর ব্যবহৃত একটি আলখাল্লা প্রদানের নির্দেশ দিলেন।'[১৮]

তবে বাংলায় মোগলদের অন্যান্য রাজনৈতিক সংস্কৃতি ছিল সুলতানদের থেকে বেশ ভিন্ন। ষোড়শ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত মোগল শাসক শ্রেণী ছিল প্রধানত অ-ভারতীয়। ১৫৯৫ সালে আকবরের মনসবদারদের মধ্যে ৬১ শতাংশ ছিল জাতিগতভাবে ইরানী বা তুর্কী, যাদের অধিকাংশ সরাসরি অভিবাসন করেছিল। সপ্তদশ শতকে অবশ্য সাম্রাজ্যের বৈদেশিক বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে বিলীন হতে থাকে। উক্ত শতকের শেষ নাগাদ মাত্র এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশি মনসবদার ইরানী বা তুর্কী বংশোদ্ভূত হিসেবে পরিচিত ছিল এবং এদের এক-চতুর্থাংশের কম ছিল বিদেশে জন্মগ্রহণকারী অভিবাসী।[১৯] আর জাহাঙ্গীরের আমলে রাজকীয় বাহিনীতে মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্রমবর্ধমান অংশই দাবি করতো তাদের পৈতৃক পূর্বসূরি খাইবারের বাইরে হলেও তারা ভারতে ভারতীয় মায়ের সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে। এসব ব্যক্তি তাদের 'মাতৃভাষা' হিসেবে স্থানীয় হিন্দী-উর্দুতেই শুধু কথা

---

১৮. *Voyage dans les deltas du Gange*, 333. বিদেশী উৎস হলেও বিভিন্ন পেশা বা সামাজিক অবস্থানের (অর্থাৎ জজমান ও কামিন) মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বাধ্যবাধকতায় ভারতীয় ধ্যান-ধারণার সাথে লবণের আদর্শ যেমন সামঞ্জস্য বিধান করে, ঠিক তেমনি কোন শাসক/ দাতার পরিধেয় পোশাক দানও ধর্মীয় কর্তৃত্বের স্থানীয় ধারণার সমান্তরাল হিসেবে অভিহিত হয়। ভারতের সাধারণ পূজা অনুষ্ঠানে ঈশ্বরভক্তদের পূজার-প্রসাদ গ্রহণের মতো। কোন দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা এইসব অবশিষ্টাংশ দেবতা কর্তৃক স্পর্শ করা, পরিত্যক্ত এবং "নোংরা" হওয়ার পর প্রসাদ হিসেবে তা গলধঃকরণের ধারণার মতোই কোন দাতার পোশাক পরিধান করার মানে দাঁড়ায় দেবতার আনুগত্য প্রকাশ। তাই, নিমক বা নুন এবং খিলা'ত ভারতে বিদেশী হলেও অর্থাৎ একটি ফারসি এবং অপরটি আরবী উভয়টিই ভারতীয় সংস্কৃতির বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে আগে থেকে প্রস্তুত অভ্যর্থনা পেয়েছিল।

১৯. M. Athar Ali, The Apparatus of Empire (Delhi: Oxford University Press, 1985), xx, and id., The Mughal Nobility under Aurangzeb (Bombay: Asia Publishing House, 1966), 16-17. 34-35.

বলতো না, উত্তর ভারতে রাজপুত সংস্কৃতিতে কয়েক শতাব্দী সময়কালে বিকশিত জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কিত ধারণাও গভীরভাবে বিশ্বাস করতো।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এ কারণেই ১৬১৭ সালে ঢাকার কাছে সংঘটিত তীব্র যুদ্ধের পর আসন্ন পরাজয়ের প্রেক্ষাপটে মোগল সেনানায়কদের অনেকে একে অন্যের উপস্থিতিতে নিজ হাতে নিজ পরিবারসমূহকে হত্যার প্রথা অনুসরণের পর সুবেদার কাসিম খান ব্যক্তিগতভাবে তার প্রধান স্ত্রীদের শিরশ্ছেদ করেন।[২০] জুহারের অনুশীলন তথা শত্রু বাহিনীর হাতে বন্দীত্বের লাঞ্ছনার পরিবর্তে মহিলা ও শিশুদের হত্যা করার বিকল্প ব্যবস্থাটি ছিল রাজপুতদের প্রথা যা মোগল বাহিনীতে রাজপুতদের আত্মীকরণ এবং মোগল হেরেমে রাজপুত মহিলাদের অন্তর্ভুক্তির আকবরের নীতির মাধ্যমে মোগল সংস্কৃতিতে রাজপুত প্রথা মিশে যাওয়ার কথা তুলে ধরে। এখন তা বাংলাতেও চলে আসলো। একই সাথে বাংলায় মোগল কর্মকর্তারা চিরন্তন মুসলিম সভ্যতার ঐতিহ্যবাহী ইউনানি বা গ্রীক চিকিৎসা ব্যবস্থা বদলে আয়ুর্বেদিক (কবিরাজি) বা স্থানীয় ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিতে থাকে। একজন ভারতীয় মুসলমান হিসেবে ইসলাম খান নিজে মৃত্যুর মুখে থাকার সময়ে একজন কবিরাজের চিকিৎসা সেবা প্রদানের অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তা না পাওয়ায় সুবেদার অত্যন্ত অনিচ্ছুকভাবে একজন মুসলমান হেকিমকে গ্রহণ করেছিলেন, পরে যার বিরুদ্ধে ভুল চিকিৎসা প্রদান করা এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ আনা হয়।[২১] বিহারের সুবেদারের যখন অর্ধেক দেহ প্যারালাইসিস হয়ে গিয়েছিল, তখন সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারির মধ্য থেকে দুজন কবিরাজকে তাঁর চিকিৎসার জন্য পাঠিয়েছিলেন।[২২] আর মির্জা নাথান যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন তার উপদেষ্টারা একজন কবিরাজ নিয়ে আসলো এবং সে জ্যোতিষতত্ত্বের যথাযথ নমুনা অনুসন্ধান এবং লেবুর রস ও আদার সাথে মিশিয়ে বিষাক্ত ওষুধ সেবন করিয়ে তাকে সুস্থ করে তোলে।[২৩] প্রাণঘাতী রোগের শিকার হয়েও কবিরাজি চিকিৎসার প্রতি এ ধরনের নির্ভরশীলতা এবং যুদ্ধে অত্যাসন্ন পরাজয়ের মুখে রাজপুত প্রথার অনুসরণ উভয়টিই জীবনের প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারী পরিস্থিতি জানিয়ে দিচ্ছে, সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে ভারতীয় মূল্যবোধ কিভাবে মোগল সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করেছিল।

---

২০. Nathan, *Baharistan*, text, fols. 203b-204a; trans., 1: 440.

২১. Ibid., text, fol. 140a; Trans., 1: 256.

২২. Ibid., text, fol. 143a; Trans., 1: 262.

২৩. Ibid., text, fol. 165a; Trans., 1: 323-34. এর আগে মির্জা নাথানের পিতা যখন অসুস্থ হয়েছিলেন, তখন মোমেনশাহি জেলার আলাপশাহি থেকে একজন কবিরাজকে আনা হয়েছিল। সেরকমভাবেই রোগীর কোষ্ঠী গণনা করা হলো, তার নাড়ি দেখা হলো এবং আদা ও লেবুর রস পানিতে মিশিয়ে চোলাই করে ওষুধ বানানো হলো। Ibid., text, fol. 14a-b; Trans. 1: 39.

মোগল সংস্কৃতিতে বাংলার স্থান

রাজকীয় সংস্কৃতি অস্বাভাবিক পন্থায় উত্তর ভারতের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া সত্ত্বেও উত্তর ভারত থেকে বাংলার কয়েক শতাব্দীর বিচ্ছিন্নতার কারণে মোগলরা এখানে নিজেদের পুরোপুরি পরদেশী হিসেবে দেখতে পায়। এর একটি কারণ ছিল বদ্বীপের বৃষ্টিপ্রবণ সিক্ত আবহাওয়া, যা নিয়ে বাংলায় বদলি হওয়া উত্তর ভারতীয় কর্মকর্তারা প্রায়ই অভিযোগ করতো।[২৪] এ ছাড়া সাম্রাজ্য জুড়ে কর্মকর্তাদের নিয়মিত বদলির মোগল নীতির ফলে রাজকীয় সেবকরা বদ্বীপে স্থায়ী হতে তথা একে নিজেদের স্থায়ী দেশ হিসেবে গ্রহণের চাইতে সাময়িক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র হিসেবেই বেশি বিবেচনা করতো। সম্ভবত আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, উত্তর ভারতের সাথে রাজনৈতিক পুনঃ একত্রিকরণের ফলে বদ্বীপে নতুন অভিবাসীদের ঢল। এদের মধ্যে ছিল উত্তর থেকে নিয়োগকৃত সৈন্য, মোগল পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের সঙ্গী ও অর্থনৈতিক সহায়তাকারী খত্রি ব্যবসায়ী, মোগল কর্মকর্তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সামান্য কেরানিকুল এবং মোগল সামরিক সংস্থার সরঞ্জাম ও সরবরাহের সাথে জড়িত কারিগরবৃন্দ। কার্যত বাংলা হয়ে পড়ে বহিরাগতদের কলোনি, যা প্রাক-মোগল যুগের মুসলিম শাসক শ্রেণীর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাঙালি রমণী বিয়ে করা এবং উত্তর থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী বিচ্ছিন্ন থাকার প্রেক্ষাপটে বাংলার পরিবেশের সাথে প্রগতিশীলভাবে মিশে যাওয়ার মুসলিম শাসক শ্রেণীর নীতির কার্যকর বিপরীত।

এই সময়ের সাহিত্য ও স্থাপত্য নিদর্শন উভয়ই প্রকাশ করছে, নতুন শাসক শ্রেণী সুস্পষ্টভাবে বিদেশী-তথা অবাঙালি-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। ১৬২৬ সালে মাহমুদ বলখি নামক এক আফগান রাজমহল সফর করেন এবং লিখেন তার সাথে সাক্ষাতকারী লোকদের পরিবারের উৎস বলখ, বুখারা, খোরাসান, ইরাক, বাগদাদ, আনাতোলিয়া, সিরিয়া ওউত্তর ভারত।[২৫] প্রাদেশিক রাজধানী রাজমহলে থাকার সময়ে আকবরের আমলের প্রাধান্যপূর্ণ সুন্নি আশরাফদের ক্ষয়িষ্ণু অংশ ছিল এরা। কয়েক বছর পরে ১৬২৯ সাল থেকে ১৬৫০ সালে মৃত্যু পর্যন্ত ঢাকায় বসবাসকারী কবি-কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাদিক

২৪. ১৫৮৩ সালে মির্জা আজিজ কোকা, আকবরের প্রথমদিককার একজন সুবেদার, বদ্বীপটির বর্ষণসিক্ত আবহাওয়ায় এতো বেশি বিতৃষ্ণ হয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি বদলির জন্য আবেদন করেন এবং তা লাভ করেন। Ibid., Abul Fazl Allami, *Akbar-nama,* Trans. 3: 594; text, 3: 401. সামরিক ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে অশ্বারোহী কর্মকর্তাগণ উত্তর ভারত থেকে অত্যন্ত ভিন্ন এই অঞ্চলটিতে লোকজন ও সরঞ্জাম চলাচল করাতে বিশেষ সমস্যায় পড়তেন। মির্জা নাথান আশাহত হয়ে যেতেন এটা দেখে যে, বর্ষাকালে দৃশ্যত পুরো বাংলাদেশের জলমগ্ন হয়ে যায়। এ থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় দেখতে পাননি এবং সেই গভীর পানির হতবুদ্ধির ঘূর্ণিতে পড়ে যেতেন।" Nathan, *Baharistan,* text, fol. 15b-16a; trans., 1: 43.

২৫. Mahmud b. Amir Wali Balki, *The Bahr ul-Asrar: Travelogue of South Asia,* ed. Riazul Islam (Karachi: University of Karachi, 1980), 48.

ইসফাহানি সুবেহসাদিক নামে একটি রোজ-নামচা রাখেন এবং তাতে এই নগরীতে তার জানা কয়েক ডজন শিল্পী, কবি, সেনাপতি ও প্রশাসকের কথা উল্লেখ করেন। এসব লোকের অধিকাংশই ছিল শিয়া এবং তাদের পূর্বপুরুষরা মাশাদ, তেহরান, আরদিস্তান, ইসফাহান, মাজানদরান, কাজভিন, তালিকান, শিরাজ, তাবরিজ, হেরাত, বুখারা বা গিলানের মতো দূরবর্তী পারসি সংস্কৃতির কেন্দ্র থেকে অভিবাসন করেছিল।[২৬] এতে ধারণা করা যায়, আকবরের শাসনকালে (১৫৫৬-১৬০৫) রাজধানী যখন রাজমহলে ছিল এবং শাহজাহানের আমলে (১৬২৮-৫৮) যখন ঢাকায় ছিল রাজধানী, তার মধ্যবর্তী সময়ে বাঙলার শহুরে আশরাফদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যক উত্তর ভারতে জন্মগ্রহণ করলেও নিজেদের ইরানীদের বংশধর দাবি করতো।[২৭]

বাংলার ব্যাপারে রাজকীয় মনোভাব সম্পর্কে সবচেয়ে অবাক করা মন্তব্যটি করেছেন আকবরের প্রধান উপদেষ্টা আবুল ফজল। ১৫৭৯ সালে রাজকীয় সেনাবাহিনীর রাজধানী আফগান দখলদারদের উচ্ছেদের সামান্য পরে লিখেন, 'বাংলা এমন একটি দেশ যেখানে জলবায়ুর কারণে বিদ্রোহের ধূলা সব সময়ে উড়তে থাকে। মানুষের শয়তানিতে পরিবারগুলো এবং অঞ্চলগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। এ কারণে পুরাতন লেখাগুলোতে একে বলা হয়েছে বালঘাকখানা (গোলযোগের আবাসভূমি)।'[২৮] এখানে এই 'মোগল ঔপনিবেশিক বিবৃতিতে' আমরা রাজনৈতিক অবমূল্যায়নের একটি উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব পাই: নিস্তেজকারী আবহাওয়া মানুষকে কলুষিত করে এবং কলুষিত মানুষ সার্বভৌম শাসনকে ধ্বংস করে, এর মাধ্যমে আরো শক্তিশালী ও কলুষতামুক্ত বহিরাগতদের মাধ্যমে বদ্বীপটি জয়ের প্রস্তুতির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। বাংলার জলবায়ুকে সম্পৃক্ত মানুষের অধঃপতনের জন্য দায়ী করার আবুল ফজলের এই সামাজিক-রাজনৈতিক অভিনব তত্ত্বটি কয়েক শতাব্দী পরের বৃটিশ উপনিবেশিক কর্মকর্তারাও গ্রহণ করেছিল।[২৯]

২৬. See A. Halim, "An Account of the Celebrities of Bengal of the Early Years of Shahjahan's Reign Given by Muhammad Sadiq," Journal of the Pakistan Historical Society 1 (1953): 355; Nazir Ahmad, "Muhammad Sadiq Isfahani, an Official Bengal of Shah Jahan's Time," Indo-Iranica 24 (1972): 103-25; S.N.H. Rizvi, "Literary Extracts from Kitab Subh Sadiq," Journal of the Asiatic Society of Pakistan 16, no. 1 (April 1971), 1-61.

২৭. অধিকন্তু, ঢাকার মুসলমান অভিজাতরা ছিলেন প্রধানত শিয়া, অথচ রাজমহলের প্রাচীনতর আশরাফ শ্রেণীর সদস্যরা ছিলেন সাধারণভাবে সুন্নি। শাহজাদা শুজার ২১ বছরের সুবেদারির আমলে (১৬৩৯-৬০) বাংলায় শিয়াদের প্রাধান্য আরো সুস্পষ্ট হয়, পরবর্তীকালের জনশ্রুতি অনুযায়ী তিনি তিনশত শিয়া অভিজাত ব্যক্তিকে বাংলায় এনেছিলেন এবং এমনকি নিজেও শিয়া হয়েছিলেন। Halim, "Account" 355-56. See also Jadunath Sarkar, ed., *History of Bengal*, 334-35.

২৮. Abul Fazl Allami, *Akbar-nama*, Trans. Beveridge, 3: 427; text, 3: 390.

২৯. এগুলোর মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হচ্ছে ১৭৬৩ সালে রবার্ট ওরমের লেখা: "প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে দীর্ঘ পরিক্রমায় এই দেশে সুবিধার আশ্চর্যজনক প্রাচুর্যে, জলবায়ুর অনমনীয় পরিবেশে অদ্ভুত

এমনকি অভিবাসী সাধু পুরুষগণও বদ্বীপটি সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করতেন। শাহজাহানের আমলে পাঞ্জাব থেকে মালদহের নিকটবর্তী মালতীপুরে বসতিস্থাপনকারী আশরাফ শ্রেণীভুক্ত শেখ শাহ নিয়ামতউল্লাহ ফিরোজপুরি (মৃত্যু ১৬৬৯) অঞ্চলটি সম্পর্কে দ্রুত ক্লান্তিবোধ (মালুম) করতে থাকেন। কোন রাখঢাক না করে অঞ্চলটি সম্পর্কে তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নোক্ত চার লাইনে কাঠখোট্টা ভাষায় বলেন,

বাংলা একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বেদনাপূর্ণ স্থান;
মৃতদের জন্য প্রার্থনা করো, দেরি করো না।
সেখানে ভূমি বা পানি কিছুই বিশ্রাম নেয় না;
হয় বাঘের থাবায়, নয়তো কুমিরের মুখে থাকতে হবে।[৩০]

তার বেছে নেওয়া নতুন আবাসভূমি সম্পর্কে এ ধরনের মনোভাব সত্ত্বেও শেখ প্রদেশটির ক্ষমতাসীন শ্রেণীর আনুকূল্য লাভ করেন, যাদের জীবনযাত্রা তিনি ও তাঁর পূর্বপুরুষ গ্রহণ করেছেন এবং যাদের নিকট থেকে তিনি বিশাল ভূমিদান (মাদাদ-ই-মাশ) পেয়েছেন।[৩১]

শিথিলতার সৃষ্টি করে, মানবজাতির অপরিহার্য গুণাবলীকে লক্ষ্যচ্যুত করে ফেলে, এবং যদিও ভারতে [মোগল] সাম্রাজ্যের সর্বত্রই চরিত্রের কোমল স্বভাবটি পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে, কিন্তু বাংলার স্থানীয়দের মধ্যে অন্য যেকোন প্রদেশের চেয়ে অনেক দুর্বল গড়ন এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তিহীনতা দেখা যায়।" Orme, *History of the Military Trnasactions of the British Nation in Indostan* (reprint, Madras: Pharoah, 1861), 2: 4-5. প্রাচ্যবাদ কিংবা বৃটিশ 'ঔপনিবেশিক বক্তৃতা'র নমুনা হিসেবে এ ধরনের উদ্ধৃতি প্রায়ই উল্লেখ করা হতো। এশিয়ার জনগণের উপর আধুনিককালে ইউরোপিয়ান শাসন চাপিয়ে দেওয়া কিংবা দান্তে বা এমনকি হোমারের রচনার উৎস সন্ধানে এই বক্তব্যকে মূল ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ইউরোপিয়ানদের স্বকীয়তা হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। অবশ্য, আবুল ফজলের এ ধরনের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, এসবের অন্তত কিছু উপাদান হলেও ইউরোপে নয়, বরং ভারতেই প্রোথিত ছিল এবং বাংলার উল্লেখের মধ্যে মোগল সাংস্কৃতিতে তা প্রকাশিত হতো। 'সহজাতভাবে' ইউরোপিয়ান এমন ভাবধারা বাংলায় আনার চেয়ে ওরমের মতো ব্যক্তিরা বরং ইতিমধ্যেই ভারতে বিদ্যমান মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য ও একীভূত ধারণা নিয়ে এসেছিলেন, এবং তা বাংলার সাবেক ক্ষমতাসীন শ্রেণীর সাথে বিশেষভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। প্রাচ্যবাদের বিতর্কের আলোচনার জন্য দেখুন, Aijaz Ahmad, "Between Orientalism and Historicism: Anthropological Knowledge of India.," *Studies in History* 7, no. 1 (1991): 135-63.

৩০. Imam al-Din Rajgiri, *Manahij al-Shattar* (Khuda Bakhsh Library, Patna, Pers. MSS. Nos. 1848, 1848-A), 2: fol. 383b:
বাঙ্গালা জামিন খারাব ভা দিল-তাং;
রু ফাতাহ খরয়ান ভা মানুমাই দিরাং।
অন্দর বার-ও বাহর জা-ইয়ি আসাইয়িশ নিস্ত,
ইয়া হাস্ত দাহান-ই শির, ইয়া কাম-ই নাহাং।

৩১. উক্ত শেখ প্রদেশের ক্ষমতার সর্বোচ্চ পর্যায়ের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। সুবেদার একবার যখন মালদহ অঞ্চলে শিকার করতে যান, শাহ নিয়ামতউল্লাহ সেখানে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁর

এই ভূমি সম্পর্কে মোগলদের পরদেশি ভাবনার সাথে ছিল এখানকার জনগণের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাদের প্রতি করুণামিশ্রিত অনুভূতি। ভাষা, পোশাক ও খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে এখানে নতুন আগত কর্মকর্তারা উত্তর ভারতের তুলনায় বাংলার সংস্কৃতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখতে পেল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বদ্বীপের মাছ ও ভাতের খাদ্যাভ্যাস পাঞ্জাবের প্রধান খাবার গোশত ও রুটিতে বেড়ে উঠা অনেক অভিবাসীর কাছে সঠিক মনে হয়নি। ১৭৮৬ সালে লিখিত রিয়াজ উস সালাতিন-এ বাঙালি সংস্কৃতি সম্পর্কে আশরাফদের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং 'স্থানীয়দের মধ্যে বেঁচে থাকার বিষয়টি ঔপনিবেশিক বৃটিশ পুস্তকে লিখিতরূপের মতোই অনেকটা দেখা যায়:

এবং এই রাজ্যের স্থানীয়, উচ্চ থেকে নীচু, বাসিন্দাদের খাদ্য হলো মাছ, ভাত, সরিষার তেল এবং দই, ফলমূল ও মিষ্টি। তারা প্রচুর শুকনা মরিচ ও লবণও খায়। এই দেশের অনেক অংশে লবণ দুর্লভ। এই দেশের স্থানীয়দের স্বাদ নোংরা, অভ্যাস নোংরা পোশাকের ধরন নোংরা। তারা আটার রুটি আর বার্লি একেবারে খায় না। ছাগল ও মুরগির গোশত এবং পরিশোধিত মাখন তাদের ব্যবস্থার সাথে খাপ খায় না।[৩২]

মোগল কর্মকর্তারা বাঙালিদের জেলেদের সাথে সম্পর্কিত করতো, যাদেরকে তারা তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতো। ১৬২০ সালের দিকে দুই রাজকীয় সেনাপতি তাদের এক সহকর্মীর সামরিক কৃতিত্বের অবমূল্যায়নের জন্য তাকে টিটকারি দিয়ে বললো: তুমি যেসব বিদ্রোহীকে পরাজিত করেছো, তারা গোয়ালপাড়ায় প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী একদল জেলে ছাড়া আর কেউ কি? জবাবে অপরজন বাংলায় মোগলদের সবচেয়ে প্রবল প্রতিপক্ষ ঈশা খান ও মূসা খানকেও জেলে হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সে বাগাড়ম্বরপূর্ণভাবে জানতে চাইলো 'তোমাকে খুশি করার জন্য আমি কোথায় একজন সুলায়মান কররানির পুত্র দাউদকে পাবো?' এবং কিছুটা বিরক্তি সহকারে সে বললো, একজন মোগল কর্মকর্তা হিসেবে তার দায়িত্ব হলো বাংলায় সকল রাজ-শত্রুকে 'তা সে মৎস্য (জেলে) বা মোগল বা আফগান,' যেই হোক না কেন তাকে বশ মানানো।[৩৩] এই দৃষ্টিবঙ্গি অনুযায়ী মোগল সেনাবাহিনীর সত্যিকারের প্রতিপক্ষ ছিল রাজবিদ্রোহী

আবেদনের প্রেক্ষাপটে তাঁকে চার শত বিঘা জমি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে সম্রাট শাহজাহানের পুত্র এবং ১৬৩৯ থেকে ১৬০০ সাল পর্যন্ত বাংলার সুবেদারের দায়িত্ব পালনকারী যুবরাজ মুহাম্মদ শুজা উক্ত শেখের একজন মুরিদ হন, অন্যদিকে পূর্বপুরুষের মঞ্জুরি থেকে শেখের বংশধরগণ ও তাঁর খাদেমরা এতো সম্পদশালী হন যে, তাঁরা ঘোড়া, হাতি, উট, এবং শিকারি প্রাণী সংগ্রহে সমর্থ হন। Ibid., fols. 384b-385a.

৩২. Salim, *Riyazu-s-Salatin*, Trans. Abdus Salam, 21.

৩৩. Nathan, *Baharistan*, text, fol. 278b; trans., 2: 650-51. Emphasis mine.

বা কররানির মতো আফগানরা; বাঙালিদের গৎবাঁধাভাবে মৎস্যজীবী হিসেবে চিহ্নিত হতো এবং তারা কম শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হতো।

মোগল কর্মকর্তারা তাই নিজেদেরকে বাঙালিদের চেয়ে শুধুমাত্র কর প্রদানকারীর বিপরীতে গ্রহণকারী হিসেবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণই মনে করতো না, সেই সাথে সহজে বশীভূত জেলেদের বিপরীতে উত্তর ভারতীয় যোদ্ধা হিসেবেও বিবেচনা করতো। এক ঘটনায় ইসলাম খানের প্রধান নৌ কর্মকর্তা ইহতিসাম খান অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন সুবেদার একবার তাকে ও তার পুত্রের সঙ্গে 'স্থানীয়দের' মতো আচরণ করেছিলেন।[৩৪] যেহেতু এখানে পারসি শব্দ আহল-ই হিন্দ অর্থাৎ স্রেফ 'ভারতীয়' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তাই কেউ আশা করতে পারে ভারতের বাইরে থেকে অভিবাসনকারী অভিজাতরাই তা ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু ইহতিসাম খান নিজে ছিলেন পাঞ্জাব থেকে আসা ভারতে জন্মগ্রহণকারী মুসলমান,[৩৫] তাই তার মর্যাদাহানিসূচক পরিভাষার ব্যবহারের অনুভূতিতে ধারণা করা যায়, মোগলদের সাথে চাকুরি করায় তার মধ্যে আশরাফসুলভ মনোভাব গড়ে উঠেছিল। আশরাফ মুসলমানরা যে 'স্থানীয়দের থেকে পৃথক বিশেষ সামাজিক অবস্থানে ছিল তা পর্তুগীজ খ্রিস্টান সন্ন্যাসী সেবাসতিয়াও মানরিকও উল্লেখ করেছেন, তিনি ১৬২৯ সালে বাংলার জনসংখ্যাকে তিনটি গ্রুপ পর্তুগীজ, মূর ও দেশের স্থানীয়' হিসেবে বর্ণনা করেন।[৩৬] এই সামাজিক স্তরবিন্যাসে মুসলমানরা এখানে বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত। মানরিকের সাথে সাক্ষাতকারী আশরাফ মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী 'স্থানীয়দের'পক্ষে 'মূর' তথা বাঙালি মুসলমানের অস্তিত্ব কল্পনাপ্রসূতভাবে অসম্ভব।

স্থাপনাসমূহেও মোগলদের বৈদেশিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এখনো টিকে থাকা নতুন ব্যবস্থার সবচেয়ে পুরাতন স্থাপত্য নিদর্শন হচ্ছে ১৫৭৪ সালে বগুড়ার দক্ষিণাংশের শেরপুরের কাকশাল বংশের সদস্যদের নির্মিত খেরুয়া মসজিদ। কাকশালরা ১৫৭৪ সালে মোগল বিজয়ে অংশগ্রহণ করলেও ছয় বছর পর তারা আকবরের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে মনসবদারদের বিদ্রোহে পুরোভাগে তাকে এবং সেসময়েই তারা এই স্থাপনাটি নির্মাণে পৃষ্ঠপোষকতা করে। তবে উত্তর ভারতের আধিপত্যের বিরুদ্ধে কাকশালদের অবস্থান ছিল রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক নয়। তাদের পূর্বেকার আফগানদের মতো স্থানীয় সংস্কৃতি পুরোপুরি আত্মস্থ করার মতো দীর্ঘ সময় বাংলায়

---

৩৪. Ibid., text, fol. 18a; Trans., 1: 51.

৩৫. M. Athar Ali, *The Apparatus of Empire: Awards of Ranks. Officers and Titles to the Mughal Nobility, 1574-1658* (Delhi: Oxford University Press, 1985), 32. Abu-i-Qadir Ibn-I Muluk Shah al-Badani, *Munakhabut-Tawarikh*, trans., and ed. T. Wolseley Haig (1899; reprint, Delhi: Idarah-i Adabiyat-i-Delli, 1973), 2: 300.

৩৬. Manrique, *Travels* 1: 40.

বসবাস না করাটাই সম্ভবত মসজিদটির মোটামুটি সংমিশ্রিত প্রকৃতি গ্রহণের ব্যাখ্যা। এর ইটের বহির্ভাগ, কোণায় অবস্থিত ক্ষুদ্র মিনার এবং বাঁকানো কার্নিস ইত্যাদি প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর সবই বাংলার সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় একশত বছরেরও বেশি সময়ে বিবর্তিত স্থানীয় বাঙালি মসজিদের অনুরূপ। অন্যদিকে তার ভূমি পরিকল্পনা –তিনটি অংশে বিভক্ত একটি একক পথ বিশিষ্ট আয়তক্ষেত্র- যা ছিল পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে দিল্লী অঞ্চলে জনপ্রিয়; এই মসজিদ দিয়ে সূচিত হয়ে বাংলায় মোগল রীতির মসজিদের বৈশিষ্ট্যসূচকে পরিণত হয়। অধিকন্তু স্থাপনাটির খোদাইচিত্র লেখা হয়েছে মোগলদের সরকারি ভাষা পারসিতে, অন্যদিকে বাংলায় প্রাক-মোগল অধিকাংশ খোদাইলিপির ভাষাই আরবি। তাই মসজিদটি হঠাৎ করেই তার পৃষ্ঠপোষকদের সাংস্কৃতিক দ্ব্যর্থবোধকতাকে ফুটিয়ে তুলেছে যার এক পা বাংলায় থাকলেও অন্যটি তখনো ছিল দিল্লীতে।

উত্তর ভারতের সাথে আরো ঘনিষ্ঠ এবং বাঙালি দৃষ্টিভঙ্গিতে আরো ভিনদেশি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হচ্ছে রাজমহলের জামে মসজিদ। রাজা মানসিংহের সুবেদারিত্বের আমলে (১৫৯৪-১৬০৫) আকবরের প্রাদেশিক রাজধানীর প্রধান মসজিদ হিসেবে নির্মিত এই বিশাল স্থাপনাটি (২৫২ x ২১১ ফুট) প্রদেশটির উপর আকবরের দাবির স্থাপত্য দলিল হিসেবে পরিগণিত হয়। এই আমলে অন্য কোন প্রাদেশিক রাজধানীতেই এতো বড় মসজিদ নির্মিত হয়নি।[৩৭] এতে আমরা ফতেহপুর সিক্রিতে অবস্থিত আকবরের রাজধানীতে (আনুমানিক ১৫৭০) ইতিমধ্যেই পরিস্ফুটিত আকবরের বৈশিষ্ট্যসূচক স্থাপত্য নিদর্শনের সাক্ষাৎ পাই: একটি উঁচু স্মারক দরজা, একটি একক যাতায়াত পথ, সম্মুখভাগে অলংকরণ, বহিরাবরণের চারদিকে যুদ্ধসাজ, প্রতি ভাগে প্রকোষ্ঠ সম্বলিত বারান্দাকে দুভাগে বিভক্তিকরণ।[৩৮]

তবে ঢাকাতেই রাজকীয় রীতি সবচেয়ে ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। মুসলমান শাসকদের কয়েক শতাব্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠা বাঙালি স্থাপত্য ঐতিহ্যের বিপরীতে মোগল শাসকরা উত্তর ভারতের কেন্দ্রভূমির অনুরূপ ভবনরাজি নির্মাণ করতে লাগলেন। এই রীতির অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে বড় কাটরা (১৬৪৪), বিশাল এই আবাসিক স্থাপনায় এক সময় কক্ষরাজি, দোকানপাট এবং দক্ষিণে অষ্টকোণী কেন্দ্রীয় কক্ষসহ বহুতল বিশিষ্ট একটি দরজা ছিল।[৩৯] যদিও বড় কাটরা এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, তবে সেই সময়ের বেশ কিছু জাঁকজমকপূর্ণ মসজিদ বিশেষ করে সাত গম্বুজ মসজিদ (আনুমানিক ১৬৬৪-৭৬), হাজি খাজা শাহবাজের মসজিদ (১৬৭৯) ও খান মোহাম্মদ মির্জার মসজিদ (১৭০৪) এখনো টিকে আছে।

---

৩৭. Asher, "Inventory," *in Islamic Heritage of Bengal,* ed., Mitchell, 120.
৩৮. Ibid., 120-21.
৩৯. Ibid., 55.

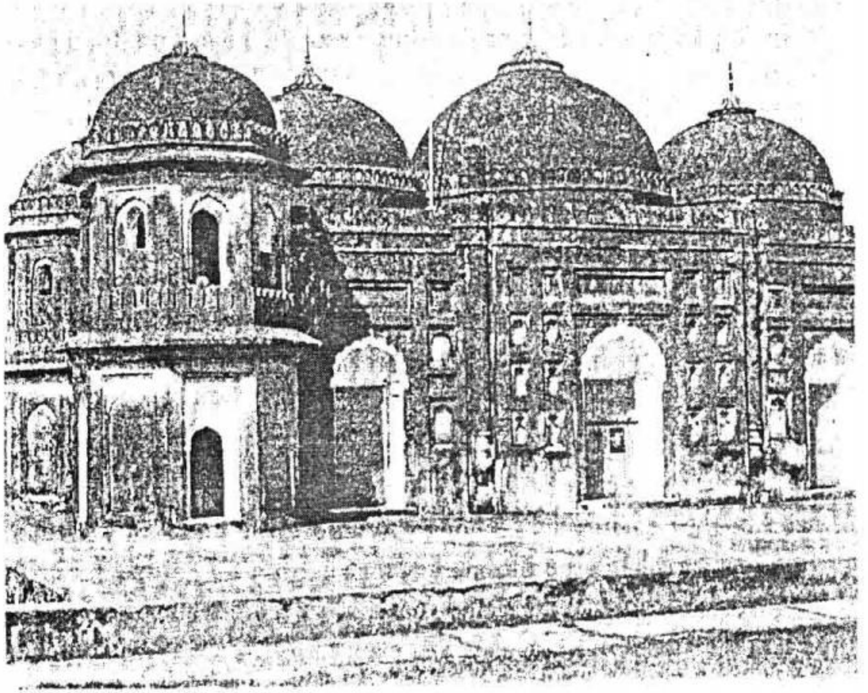

চিত্র ১৯। সাতগম্বুজ মসজিদ, ঢাকা (আনুমানিক ১৬৬৪-৭৬)

এগুলোর যুদ্ধসাজ, ধনুকাকৃতির সরু প্রবেশপথ, বহির্ভাগ ও অভ্যন্তরভাগে ক্রমবর্ধমান সুসজ্জিতকরণ এবং বিশেষ করে সাত গম্বুজ মসজিদের কোণায় ছোট গম্বুজে প্যাভিলিয়ন (দেখুন চিত্র ১৯) সম্বলিত এসব স্থাপনা দৃঢ়তার সাথে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্যবাদের নান্দনিক দর্শন প্রকাশ করছে।[৪০] ঢাকার লালবাগ কেল্লায় (চিত্র ২০) উদ্যান ও স্থাপনার চমৎকার সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয়ে এই দর্শনটি সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এই কমপ্লেক্সে একটি মসজিদ, একটি সমাধি, একটি দরবার হল (দিওয়ানি-খাস), একটি হাম্মামখানা, একটি চৌবাচ্চা ও একাধিক দরজা সম্বলিত বেষ্টনী দেওয়াল রয়েছে।[৪১] লালবাগ কেল্লার মধ্যে দাঁড়ানোর সাথে সাথেই লাহোর, দিল্লী ও আগ্রায় অবস্থিত বিশাল প্রাসাদ-উদ্যান কমপ্লেক্সের কথা মনে পড়বে এবং এর মাধ্যমে এটাও বোঝা যায়, বাংলায় বহিরাগতরাই এটা নির্মাণ করেছে। এই কমপ্লেক্সটির কোন উপাদানই বদ্বীপটির নিজস্ব নয়।

৪০. Catherine B. Asher, "The Mughal and Post-Mughal Period," in The *Islamic Heritage of Bengal*, ed. George Michell (Paris: UNESCO, 1984), 203-4.

৪১. ১৬৪৯ সালের তারিখ সম্বলিত শুধু মসজিদটি ১৬৭৮ থেকে ১৬৮৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে নির্মাণ করা হয়েছিল। Ibid., 200-201.

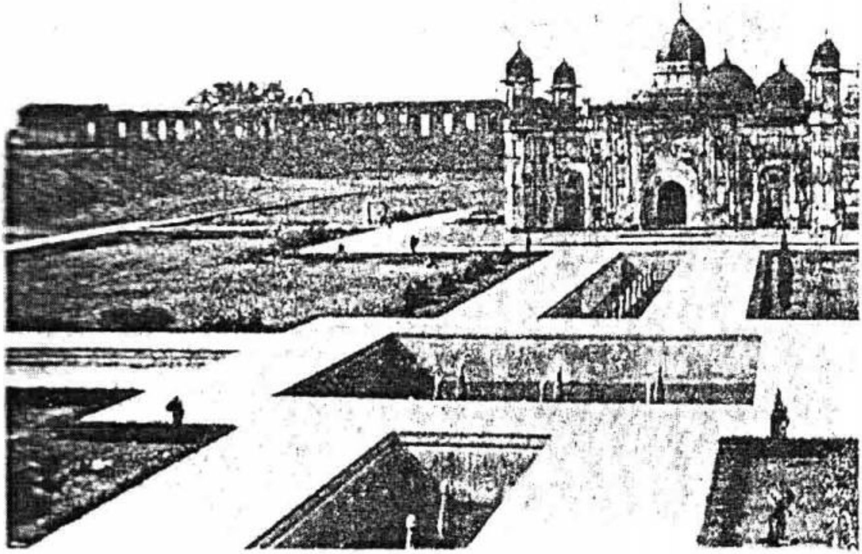

চিত্র ২০। লালবাগ দুর্গ, ঢাকা। সামনের অংশ: ঝর্ণা ও পরিবিবির মাযার (সপ্তদশ শতকের শেষদিকে)। পেছনে: লালবাগ দুর্গের দুই গম্বুজ মসজিদ (১৬৪৯)।

ঢাকায় মোগল শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে বাংলার প্রাক-মোগল মুসলমান রাজনৈতিক ঐতিহ্যের অবশিষ্টাংশকেও পশ্চাদভূমিতে ঠেলে দেয়। এই বিষয়টি টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদে (চিত্র ২১) সবচেয়ে প্রকটভাবে দেখা যায়। ১৬০৯ সালে আফগান পৃষ্ঠপোষকদের মাধ্যমে নির্মিত এই মসজিদে জটিল টেরা-কাটা বহিরাবরণ, এর চক্রাকার প্রান্তিক মিনার, এর বাঁকানো কার্নিস, সুলতানি রীতির ব্যাপক বিবর্তনের পরিস্ফুটন এখন প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থান করতে লাগলো। স্থাপত্যগতভাবে এটা ছিল সাবেক আমলের শেষ নিদর্শন এবং শীঘ্রই তা মোগল স্রোতে বিলীন হয়ে যায়। মোগল একশিলা স্থাপত্যরীতি তার উত্তর ভারতীয় কেন্দ্রভূমি থেকে নতুন প্রদেশগুলোতে অপ্রতিরোধ্যভাবে ছড়িয়ে পড়াটা খুব অবাক হওয়ার বিষয় নয়। বদ্বীপটিতে মোগল অনুপ্রবেশের পর মসজিদের বাঙালি রীতি পশ্চাদভূমিতে কিছুটা পিছু হঠলেও স্থানীয় রীতির নির্দিষ্ট উপাদান- বিশেষ করে অতি বাঁকানো কার্নিস- মোগল ঐতিহ্যে আত্মস্থ হয় এবং দিল্লী ও লাহোরস্থ রাজকীয় রাজধানীসমূহে দেখা যেতে থাকে। তাই মোগল স্থাপত্য রীতির বিবর্তনে একটি নির্দিষ্ট দ্বিমুখী চলাচল দেখা যায়। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব চারদিকে চাপিয়ে দেওয়াকে প্রকাশ করতে একটি নতুন রীতি কেন্দ্র থেকে প্রদেশগুলোর দিকে যেতে থাকে এবং যুগপৎভাবে প্রদেশগুলোর সাথে সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যগুলো রাজকীয় কেন্দ্রে প্রশংসিত হয় এবং তা আত্মস্থ করে একটি নতুন, মিশ

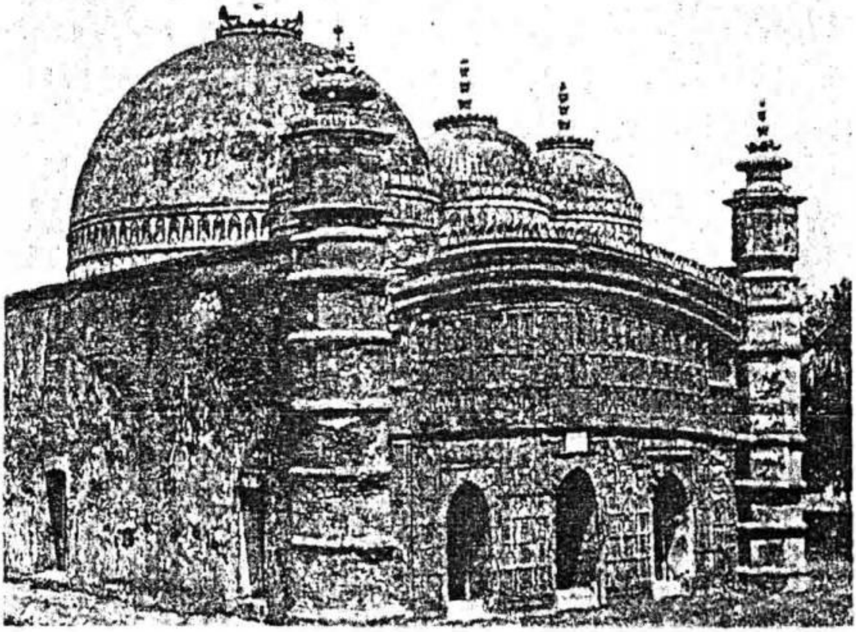

চিত্র ২১। আতিয়া মসজিদ, টাঙ্গাইল, (১৬০৯)।

রীতির আত্মপ্রকাশ ঘটে যা সীমান্তগুলোর কেন্দ্রে মিশে যাওয়াকে প্রকাশ করে।[৪২] মিশে যাওয়া এবং পুনঃ প্রত্যাবর্তনের সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণের এই মডেলটি– এখানে স্থাপত্য রীতিতে প্রতিফলিত–বাংলার ধর্মীয় ব্যবস্থায় ইসলামের বিকাশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে এগিয়েছে, আর এই মূল বিষয়টিই পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচিত হয়েছে।

মোগল সংস্কৃতিতে ইসলামের স্থান

বাংলার মোগল আশরাফদের ধর্মীয় সংস্কৃতি হিসেবে তাদের অন্তত তিনটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দেখা যায়- সর্বভারতীয় চিশতি তরিকার সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক, ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে কল্পনাপ্রসূত ব্যবধান, বাঙালিদের ইসলামে ধর্মান্তরকরণে তাদের অনিচ্ছা। তোগলক আমল থেকে সূফীবাদের চিশতি তরিকা দিল্লীর শাসকদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদায় আসীন ছিল, তারা মহান চিশতি দরবেশদের বংশধরদের জাঁকজমকপূর্ণ মাযার নির্মাণ ও প্রচুর পরিমাণে নিষ্কর ভূমিদানের মাধ্যমে উদারভাবে

৪২. দেখুন, Catherine B. Asher, "The Architecture of Raja Man Singh: A Study of Sub-Imperial Patronage," in *The Power of Art: Patronage in Indian Culture*, ed, Barbara S. Miller (New Delhi: Oxford University Press of India, 1992), 191-96.

পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মির্জা নাথান নিজেকে শেখ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকরের (মৃত্যু ১২৬৫) একজন 'একান্ত বাধ্যগত মুরীদ' (মুরীদ-ই বন্দেগি) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, সম্ভবত তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন পাঞ্জাব থেকে আগত, যেখানে উক্ত দরবেশের মতবাদ বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল।[৪৩] এবং বাংলায় মোগল শাসন সুসংহত করার জন্য সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালনকারী সুবেদার ইসলাম খান ছিলেন আকবরের প্রধান আধ্যাত্মিক গুরু শেখ সেলিম চিশতির[৪৪] নাতি এবং এ কারণেই সম্ভবত সুবেদার একবার সূফীবাদকে 'আমাদের পৈতৃক পেশা'[৪৫] হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।

রাজকীয় পেশায় সূফী-ভক্তি আত্মীকরণের ব্যাপ্তি উপলব্ধি করা যায় মির্জা নাথানের জীবনীতে। ১৬১২ সালের প্রথমদিকে, ইসলাম খান নাথানকে এক মাসের ছুটি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেও কিছু পরেই তাঁকে দক্ষিণবঙ্গে আরাকানি আগ্রাসন প্রতিরোধে সহায়তা করার নির্দেশ দেন। মির্জা নাথান এই নির্দেশের প্রচণ্ড প্রতিবাদ করলেন মাথা ন্যাড়া করে এবং ফকিরের জীর্ণ পোশাক পরে অর্থাৎ তিনি দারিদ্র্যের (ফুকুর) জীবন বেছে নিয়ে জগৎকে পরিত্যাগ করেছেন। অধিকন্তু তাঁর ৪৭০০ যোদ্ধা এবং বিপুল সংখ্যক শিবির অনুসারীও (বাজারিয়ান) একই কাজ করে। তিনি লিখেন, তাদের পৃষ্ঠপোষকের আচরণ অনুকরণ না করলে নির্ধারিত বরাদ্দ পাওয়া যাবে না- এই আশংকায় অনেকে এবং অন্যরা 'সহজ সরল মনে ও তার প্রতি নির্ভেজাল আনুগত্যের কারণে তা করে।'[৪৬] সুবেদারও প্রায় একই সুরে এই কাজের জবাব দেন। তিনি সংবাদবাহকদের মাধ্যমে জবাব দেন,

ঠিক আছে, কেউ যদি জীবনযাপনের কোন পদ্ধতি বেছে নেয়, তবে তাতে কারো কিছু বলার নেই। তবে ফকিরের জীবন বেছে নেওয়া হলে, যা আমাদের পৈতৃক পেশা, আমাদের কাছে এসে আমাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করে তারপর সেই পেশায় নিয়োজিত হওয়াটা আপনার জন্য কল্যাণকর হবে।[৪৭]

অপর এক ঘটনায়, উত্তরবঙ্গে তাঁর এক সামরিক অভিযানকালে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে উত্তেজিত হয়ে নাথান পুনরায় আত্মত্যাগের সূফী মডেলের কথা উল্লেখ করে ইসলামী মরমী ঐতিহ্যের চিরন্তন শহীদ প্রসঙ্গ এনে লিখেন, 'মনসুর হাল্লাজের

৪৩. Nathan, *Baharistan*, text, fol. 302b; trans., 2: 716.
৪৪. আকবরের চিশতি তরিকার পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়টি সবচেয়ে প্রকটভাবে দেখা যায় আজমিরে শেখ মুঈনউদ্দিন চিশতির মাযার প্রতি বছর যিয়ারতে, সম্রাট ১৫৬৮ থেকে ১৫৭৯ সাল পর্যন্ত প্রায় প্রতিবছরই সেখানে যেতেন। Iqtidar Alam Khan, "The Nobility under Akbar," 34, n. 28.
৪৫. "ফকিরি কি কাসব-ই বুজুরগান-ই মান্ত।" Nathan, *Baharistan*, text, fol. 60a: trans., 1: 152.
৪৬. Ibid., text, fol. 60a; Trans., 1: 150.
৪৭. Ibid., text, fol. 60a; Trans., 1: 152.

যা ঘটেছিলো, তা মনে করে তিনি তাঁর বিপদে সান্ত্বনা লাভ করেন'[৪৮] এবং ১৬২৪ সালে যখন তাঁর আনুগত্য সম্রাট জাহাঙ্গীর ও তাঁর বিদ্রোহী পুত্র, পরবর্তীকালের শাহজাহানের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্তভাবে ছিল এবং শেষে উভয়েরই বিরাগভাজন হন, তখন নাথান শেষ পর্যন্ত রাজকীয় চাকুরি পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়ার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁকে 'বিপর্যয়ের কূপে ফেলা হয়েছে', এই অনুভূতিতে বিশ্বাসী হয়ে তিনি পায়ে হেঁটে এবং প্রায় একাকি সোজা মালতীপুরে মীর সৈয়দ আহমদ আল হোসাইনির মাযারে যান এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হতাশাজনকভাবে উক্ত দরবেশের উত্তরসুরির কাছে পতিত হন এবং তাঁর পা চুম্বন করেন।[৪৯]

এতে এটাই বোঝা যায়, সূফীবাদ কিংবা আরো স্পষ্টভাবে বললে ভক্তি প্রকাশের রীতি দুনিয়া-পরিত্যাগের বিধানে পরিণত হয়েছিল এবং দরবেশদের ধর্মমত বাংলায় মোগল চাকুরির বিশেষ মূল্যবোধ সৃষ্টি করছিল। সমসাময়িক চিনের মিং সাম্রাজ্যে যেমন একজন মেন্ডারিন কর্মকর্তা তার কার্যালয়ে হতেন কনফুসীয় এবং বাড়িতে কিংবা অবসর গ্রহণের পর হতেন তাওবাদী, ঠিক তেমনি মোগল বাংলায় সৈনিক-প্রশাসক এবং জগৎ-পরিত্যাগকারী মরমী/সন্ন্যাস অবলম্বনও মিশে গিয়েছিল। সন্ন্যাস ধর্মমত নিয়মিতকরণের মাধ্যমে অনুগত করানো এবং চিশতি তরিকা ও মোগল শাসক শ্রেণীর মধ্যে (ইতিপূর্বে যা ছিল পাণ্ডুয়া ও গৌড়ের সুলতানদের) ঐতিহাসিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মাধ্যমে সূফীবাদের জগৎ-পরিত্যাগের দর্শন একটি সাম্রাজ্য পরিচালনার জাগতিক কাজের সাংঘর্ষিক ধারণা সৃষ্টি না করে বরং তার সাথে পরিপূরক হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত বাংলার ক্ষমতাসীন শ্রেণী ধর্ম সম্পর্কিত ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে পৃথক রেখেছিল। মোগল নগরীগুলোর কার্যক্রমগত বিভাজনে আমরা তা দেখতে পাই। প্রাদেশিক রাজধানী ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে ঢাকা রাজস্ব সংগ্রহ, রাজনীতি ও সামরিক পর্যালোচনার মতো ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়গুলোতে সম্পৃক্ত ছিল। এমনকি এখানকার সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ মসজিদ তথা সাত গম্বুজ মসজিদ (আনুমানিক ১৬৬৪-৭৬) তাদের উত্তর ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকদের ছাপ বহন করছে এবং ভক্তি সৃষ্টির জন্য রাজকীয় শক্তি প্রদর্শনের কাজেও ব্যবহৃত হয়েছিল। শহরটি ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থ তৈরির কাজেও ব্যবহৃত হচ্ছিল। সন্ন্যাসী মানরিক লক্ষ্য করেছিলেন, ঢাকার বণিকরা নগরীটিকে 'স্তম্ভিত করার মতো সম্পদের শীর্ষদেশে' নিয়ে গিয়েছিল।[৫০]

---

৪৮. Ibid., text, fol. 161b; Trans., 1: 133. আব্বাসী সমাজ ও সরকারের জন্য হুমকি সৃষ্টিকারী ভিন্নমার্গী ধর্মীয় চিন্তাধারার জন্য ৯২২ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে প্রকাশ্যে মনসুর হাল্লাজের মৃত্যুদণ্ড কার্যকার করা হয়। অবশ্য, তাঁর মৃত্যুদণ্ডের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যেও খোদার প্রতি তাঁর ভালবাসা বিন্দুমাত্র টলেনি, ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক নির্যাতন সত্ত্বেও পরবর্তীকালে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মুসলমানদের মধ্যে তা খোদার প্রতি আত্মনিবেদনের অবিচল উদাহরণ হিসেবে বিরাজ করেছে।

৪৯. Ibid., text, fol. 328a; Trans., 2: 786.

৫০. Manrique, *Travels* 1: 44.

বিপরীতক্রমে, মোগলদের অধীনে পান্ডুয়া ও গৌড়ের মতো প্রাচীন রাজধানীগুলোর কোন রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল না এবং তার বদলে সেগুলো ইসলামী পবিত্র কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয়। শুরু থেকে ১৭৬০ সাল পর্যন্ত লিখিত সকল মোগল খোদাইলিপির এক-তৃতীয়াংশ পাওয়া গেছে শুধুমাত্র এই দুই শহরের পবিত্র স্থানগুলোতে।[৫১] প্রাথমিককালে গৌড়ের পবিত্রতা নিহিত ছিল কদম রাসূলের উপর, ১৫০৩ সালে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের নির্মিত এই স্মৃতি সংরক্ষণমূলক সৌধে মহানবীর পায়ের চিহ্ন সম্বলিত কালো মার্বেল পাথর ও একটি বেদি রয়েছে।[৫২] তবে মোগলদের সর্বাধিক উদার পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল আরো পুরাতন ও আরো গুরুত্বপূর্ণ দুটি মাযার কমপ্লেক্স- বাংলার চিশতি তরিকার সবচেয়ে খ্যাতিমান দুই দরবেশ শেখ আলাউল হক (মৃত্যু ১৩৯৮) ও শেখ নূর কুতুব আলমের (মৃত্যু ১৪৫৯) মাযার। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নূর কুতুব আলমের মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর মাযারটি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে আসছিল এবং উক্ত শতাব্দীর শেষ নাগাদ সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (শাসনকাল ১৪৯৩-১৫১৯) বার্ষিক যিয়ারতের স্থানে পরিণত হয়।[৫৩] একশত বছর পর ১৬০৯ সালে মির্জা নাথান তাঁর পিতার আরোগ্য লাভের জন্য মাযারটি তিনদিন যিয়ারত করেন।[৫৪] এবং তাঁর নিজের বিয়ের সময় তিনি গৌড়ের কদম রাসূল ও পান্ডুয়ায় শেখ আলাউল হকের মাযার যিয়ারত করেন।[৫৫] আশরাফ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল অমুসলিম ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপ না করার নীতি। সমসাময়িক উসমানিয়া সাম্রাজ্যের খ্রিস্টান সামরিক নিয়োগকৃতদের ক্ষমতাসীন শ্রেণীতে আত্মীকরণের অংশ হিসেবে ইসলামে ধর্মান্তরকরণ করা হলেও বিপরীতক্রমে সাধারণভাবে মোগল ভারতের মতো বাংলাতেও ইসলাম ধর্ম নয়, বরং লবণের মতো প্রতীকীর সাহায্যে কর্মকর্তাদের অঙ্গীভূত করা হতো। অধিকন্তু মোগল কর্মকর্তাদের মধ্যে আনুগত্যের বন্ধন শুধুমাত্র বিদ্যমান সামাজিক অবস্থানের উপরই হতো না বরং তা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরেও অটুট থাকতো। মির্জা নাথান যখন সুবেদার ইসলাম খানের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিবাদ জানাতে সূফীদের পোশাক পরলেন তখন

---

৫১. Shamsud-Din Ahmed, ed. and trans., *Inscriptions*, 4: 256-305.

৫২. Ibid., 163. ১৬০৯ সালে মির্জা নাথান উত্তর-পশ্চিম বাংলায় সামরিক অভিযানের সময়ে মাযারটির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে জানান, "বাংলা এবং এখানে আগত বাইরের প্রতিটি ব্যক্তিই যাতে পবিত্র পদচিহ্নটি চুমু খেয়ে চিরন্তন দোওয়া হাসিল করতে পারে" সেজন্য বাংলার একজন সুলতান শ্বেতপাথরের পদচিহ্নটি আরব থেকে ক্রয় করে এনেছেন। Nathan, Baharistan, text, fol. 58a; trans., 1: 146.

৫৩. Abd Al-Rahman Chishti, *Mirat al-asrar*, fol. 517b; Nizamuddin Ahmad, *Tabaqat-i-Akbari*, text, 3: 270; trans., 3, pt. 1: 42-43.

৫৪. Nathan, *Baharistan*, text, fol. 15a-b; trans., 1: 42-43.

৫৫. Ibid., text, fol. 299b; Trans., 2: 707.

বেশ কয়েকজন হিন্দু কর্মকর্তাও দৃঢ়ভাবে নাথানের পক্ষাবলম্বন করলো এবং তারা তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য কারাবরণ ও চাবুকের প্রহারকেও মেনে নিল। তাদের আচরণ ব্যাখ্যার জন্য তাদেরকে যখন সুবেদারের সামনে হাযির করার পর বৈকুণ্ঠ দাস নামের জনৈক হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তুমি একজন হিন্দু; তুমি কেন এই বিদ্রোহে যোগ দিলে?' সে জবাব দিল, 'ঈশ্বর না করুন! ইহতিসাম খান বা তার পুত্র (মির্জা নাথান) কেউই কখনো কোন বিদ্রোহ করবে না। তবে আমার শৈশব থেকে আমার পিতা, তিনি আবার তাঁর পিতার অনুরোধে, আমাকে তাঁর সেবা করতে বলেছেন এবং আমার ছোটকাল থেকেই আমি তাঁর সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সমানভাবে ভোগ করছি, তাই আমি তার সঙ্গ ত্যাগ করতে পারি না।[৫৬]

অধিকন্তু সংকল্প বা আনুষ্ঠানিক শপথ নেওয়ার সময় রাজকীয় বাহিনীর সদস্যরা তাদের নির্দিষ্ট ধর্মের পরিচিতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত অনুযায়ী তা করতো। এক ঘটনায় দেখা যায়, মোগল কর্মকর্তাদের একটি মিশ্র দলের শপথ গ্রহণের জন্য একটি কুরআন ও একটি শালগ্রাম (বিষ্ণুর প্রতিভূ হিসেবে) আনা হয়েছে। কুরআন হাতে নিয়ে মুসলমান কর্মকর্তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ নিয়েছে এবং হিন্দু কর্মকর্তারা শালগ্রামে হাত রেখে বিষ্ণুর নামে একই কাজ করেছে।[৫৭] স্পষ্টতই ইতিপূর্বেকার বাংলার সুলতানদের মতো মোগল কর্মকর্তারা ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বিবেচনা করতো না।১৬৮০'র প্রথমদিকে ঢাকায় নয়, দিল্লীতে সূচিত,[৫৮] একটি সংক্ষিপ্ত হিন্দু বিরোধী তৎপরতা যা ছিল স্রেফ একটি ব্যতিক্রম ঘটনা, স্থানীয় মোল্লা ও সূফীদের অন্যান্য ধর্মের বিরুদ্ধে ইসলামকে সমর্থন দেওয়ার চাপ সত্ত্বেও বাংলার

---

৫৬. Ibid.,text, fol. 60b; Trans., 1: 153. "তা তু হিন্দু বুদা, চুন মুস্তামাল বার ফাসাদ কামারবাস্ত-ই?"

৫৭. Ibid., text, fol. 219b; Trans., 2: 476-77.

৫৮. সবচেয়ে আলোচিত মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব (শাসনকাল ১৬৫৮-১৭০৭) ১৬৭৯ সালে সাম্রাজ্যের সকল অমুসলমানের উপর ধর্ম-নির্ধারিত *জিজিয়া* কর আরোপ করেন। তাত্ত্বিকভাবে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিনিময়ে অ-মুসলমানদের দেয় এই *জিজিয়া* ইতিপূর্বে কখনও বাংলায় আরোপ করা বা সংগ্রহ করা হয়নি। তবে ১৬৮১ সালের প্রথমদিকে ডাচ পর্যবেক্ষকরা উল্লেখ করেন, রাজকীয় কর্মকর্তাগণ ঢাকার হিন্দুদের নিকট থেকে "খুবই কড়াকড়িভাবে" জিজিয়া সংগ্রহ শুরু করেছে। *Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel nederlandsts-India* (Batavia: C Kolff, 1928) AD 1680: 121. এবং একই সময়ে বাংলার বিকাশমান বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র কাশিমবাজারে কর্মকর্তাগণ হিন্দু রেশম-শ্রমিকদের নিকট থেকে বলপূর্বক জিজিয়া দাবি করেন, ফলে স্থানীয় বস্ত্র উৎপাদন কাজে ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয় ও নগরীর "ক্ষুদ্র জনসংখ্যা" অভ্যন্তরে বিতাড়িত হয়। বাংলার *দেওয়ান* বা প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা অমুসলমান হওয়ায় এমনকি ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আবাসিক ইউরোপিয়ান কর্মকর্তাদের নিকট থেকেও করটি দাবি করেন। *Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1960), 4: 291, 445, 564.

শাসকরা ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপবিহীন অবস্থানে থাকার নীতিতে কঠোরভাবে অটল ছিলেন।[৫৯]

এই নীতির একটি প্রমাণ হলো বাঙালিদের ইসলাম ধর্মান্তরের উদ্যোগ প্রত্যাখ্যান। বাস্তবিকই, বাংলার 'স্থানীয়দের' সম্পর্কে মোগলদের নেতিবাচক অনুভূতির কারণে কারো পক্ষে ভিন্ন কিছু প্রত্যাশা করা ছিল কঠিন। রাজকীয় অভিজাত সমাজের মুসলমানরা উত্তর ভারতের সাথে তাদের ধর্মীয় এবং তাদের পারিবারিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতো এবং অন্তত তাদের মন ধর্মান্তরকরণের মানসিকতায় তারা বদ্বীপের-আদিবাসীদের থেকে তাদের দূরে রাখতো। ইসলাম খান বাঙালিদের ধর্মান্তরকরণকে নিরুৎসাহিত করার জন্য পরিচিত ছিলেন এবং এক ঘটনায় জনৈক বাঙালি হিন্দুকে ধর্মান্তরের জন্য তিনি প্রকৃতপক্ষে তার এক কর্মকর্তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন। ১৬০৯ সালে সুবেদারের সেনাবাহিনী যখন বর্তমান বগুড়ার শত্রুভাবাপন্ন গোষ্ঠীপতিদের বশ মানাচ্ছেন, তখন তাঁর জনৈক কর্মকর্তা তাকমক খান শাহযাদপুরের জমিদারকে পরাজিত করেন। এরপর পরই উক্ত কর্মকর্তা পরাজিত রাজার পুত্রকে তার ব্যক্তিগত চাকরে পরিণত করেন এবং একই সময়ে তাকে ইসলামে ধর্মান্তর করেন। এই সংবাদে সুবেদার এতো অসন্তুষ্ট হন যে, তিনি জায়গির থেকে তাকমক খানকে সরিয়ে দেন।[৬০] স্পষ্টতই, সুবেদার ইসলাম গ্রহণের পুরস্কার হিসেবে সরকারি চাকুরি প্রদানের দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন না। অধিকন্তু শুধুমাত্র ইসলাম খানই ধর্মান্তরকরণের বিরোধিতা করেননি, 'রাষ্ট্রের অন্যান্য কর্মকর্তাও' সাধারণভাবে হস্তক্ষেপমুক্ত নীতি অনুসরণ করতেন।

মোগল আইনে প্রশাসন–পল্লীবাসীর দৃষ্টিভঙ্গি

হিন্দু সমাজে হস্তক্ষেপ না করার মোগল নীতি বহিরাগতরাও বিশেষ করে ১৬২৯-৩০ ও ১৬৪০ বাংলা সফরকারী অগাস্টিয়ান সন্ন্যাসী সেবাসতিয়াও মানরিক উল্লেখ করেছেন।[৬১] মানরিকের বর্ণনায় প্রাঞ্জলভাবে গ্রাম পর্যায়ে এক মোগল আদালতের বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানদের সম্পৃক্ত একটি বিরোধ মীমাংসার কথা এসেছে।

---

৫৯. ১৬৪০ সালে ঢাকায় অবস্থানকারী সন্ন্যাসী মানরিক উল্লেখ করেন, মোল্লা এবং সূফীগণ উভয়ই শূকরের মাংস ও মদপানের উপর আরোপিত ইসলামী নিষেধাজ্ঞা লংঘনের জন্য মুসলমানদের উৎসাহিত করার দায়ে ইউরোপিয়ান খ্রিস্টান মিশনারিদের শাস্তি প্রদানের জন্য ঢাকায় মোগল সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। কিন্তু শাহজাহান এবং সুবেদার উভয়েই সেসব আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। উক্ত সন্ন্যাসী মন্তব্য করেন," [খ্রিস্টান] ভ্রাতৃগণ সম্রাট এবং তার পরপরই নাবাবুর [সুবেদার] সমর্থন পেতে ব্যর্থ হলে এইসব আবেদন সফল হতো।" Manrique, *Travels* 1: 46-47.

৬০. Nathan, *Baharistan*, text, fol. 10b; trans., 1: 32.

৬১. এসব বর্ণনা নেওয়া হয়েছে Manrique, *Travels* 2: 95-115 থেকে।

ঘটনাটি ১৬৪০ সালের এবং উড়িষ্যা উপকূলে মওসুমী ঝড়ে সদ্য জাহাজভাঙ্গার কবলে পড়া মানরিক স্থলপথে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ঘোড়ায় চড়ে এবং একদল মুসলমান অনুচর নিয়ে তিনি দৃশ্যত উত্তর ভারতে যাওয়ার জন্য গঙ্গা নদীর দিকে উড়িষ্যা থেকে বাংলার পশ্চিম করিডোর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার সত্যিকারের কাজ সম্পর্কে অনাকাঙ্ক্ষিত মনোযোগ যাতে আকর্ষিত না হয়, সম্ভবত সেজন্য তিনি একজন মুসলমান বণিকের পোশাক পরিধান করেন। মৌসুমী বৃষ্টিপাত প্রবল বেগে নিম্নবঙ্গ চাপিয়ে দেওয়ায় মানরিক ও তার সঙ্গীরা উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সীমান্তের নিকটবর্তী জলেশ্বরের দশ মাইল উত্তরে কর্দমাক্ত জলাভূমিতে আটকা পড়লেন। সেইদিন আর অগ্রসর হতে ব্যর্থ হয়ে একটি হিন্দু পল্লীর গোয়ালঘরে মশার কামড়ে উত্যক্ত অবস্থায় তারা একটি অস্বস্তিকর রাত কাটালেন। তারা তাদের সফর পুনরায় শুরু করার সাথে সাথেই প্রবল বর্ষণ আবার আরম্ভ হওয়ায় তারা সেখানে পরের দিনও থাকলেন।

বিকেলের ম্লান সময়ে মানরিক যখন ঝিমুচ্ছিলেন, তখন তাঁর এক মুসলমান সহচর ভাল কিছু খাওয়ার লোভে গোয়ালঘরের আশেপাশে বিচরণরত কয়েকটি ময়ুর ধরে জবাই করে।[৬২] কী ঘটেছে তা বুঝতে পেরে, গ্রামবাসীদের কাছে মারাত্মক পাপ হিসেবে বিবেচিত এই কাজের কথা তারা জানলে সম্ভাব্য পরিণতির আশংকায় মানরিক রেগে গেলেন। তাই তিনি তাঁর সহচরদের রাত্রি পর্যন্ত পাখিগুলোকে লুকিয়ে রাখার নির্দেশ দিলেন। তারপর অন্ধকারের সুযোগে তারা তাদের পাখিগুলো রান্না করে খেল এবং অপরাধ গোপন করার জন্য পালকগুলো মাটিতে পুঁতে রাখলো। পরের দিন কিছু পালক বের হয়ে পড়লে গ্রামবাসীদের কাছে ঘটনাটি জানা হয়ে যায় এবং তারা তীর ধনুক নিয়ে মহা আক্রোশে গ্রামের বাইরে এবং রাস্তায় সফরকারীদের ধাওয়া করে। মানরিক গাদাবন্দুক দিয়ে গ্রামবাসীদের মাথার উপর দিয়ে একটি গুলি ছোড়েন, তবে বন্দুকের আওয়াজে তার হিন্দু গাইড আতংকিত হয়ে মূর্চ্ছা যায়, কিন্তু গ্রামবাসীরা মনে করতে থাকে, তারা ভুলক্রমে তীর দিয়ে তাদের নিজেদেরই একজনকে হত্যা করেছে। বিভ্রান্তিকর অবস্থায় মানরিক তার গাইডের জ্ঞান ফিরিয়ে আনেন এবং তাদের নিয়ে তিনি নিকটবর্তী শহর, বর্তমানে মেদিনিপুর জেলায় অবস্থিত নারায়ণগড়ে পৌছেন, সেখানে তাঁর মতো মুসাফিরদের জন্য একটি সরাইখানা ছিল।[৬৩]

---

৬২. মানরিক লিখেছেন, পাখিগুলোকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানদের নিকট এভাবে প্রাণ সংহার করা শরিয়তসম্মত নয়; পাখিগুলোকে খুব সম্ভব ছুরির সাহায্যে জবাই করা হয়েছিল। তবে হয় মানরিকের মুসলমান সহকারী তার কাজের বেশরিয়তি কাজের ব্যাপারে বেখেয়াল ছিল, কিংবা অন্যথায়, তাই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, মানরিক উক্ত ঘটনাটি তাঁর স্মৃতি থেকে ভুলভাবে লিখেছিলেন যে, যথাযথভাবে হত্যা না করে শ্বাসরুদ্ধ করা হয়েছিল।

৬৩. *আইন-ই আকবরিতে* এই শহরটিকে নারায়ণপুর হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বিশাল আয়তন এবং গুরুত্বের বিবেচনায় এটা ছিল *পরগনা* সদরদফতর, আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন, এখানে পাহাড়ের উপর একটি দুর্গ ছিল, যাতে একশত রাজকীয় অশ্বারোহী ও চার হাজার রাজকীয় পদাতিক সৈন্য ছিল। *Ain-i Akbari*, trans., 2: 156.

নারায়ণগড়ে নিরাপদে পৌঁছে সরাইখানায় স্বস্তি ফিরে পেয়ে ময়ূর হত্যার দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ভুলে যাওয়ার জন্য মানরিক তাঁর হিন্দু গাইডকে গোলমরিচ উপহার দেন। কিন্তু ঘুষের এই প্রয়াস ব্যর্থ হয় এবং অন্য এক ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীকে নিয়ে সেই গাইড দ্রুত শিকদারের বাসায় গিয়ে পুরো দলটির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করে। রাজস্ব আদায়ে তদারকি এবং পরগনা পর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মোগল কর্তৃপক্ষের নিযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন শিকদার এবং এ কারণেই ক্ষুব্ধ হিন্দুরা তাঁর কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করে। মধ্যরাতে শিকদারের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে দুজনে উচ্চস্বরে বলতে থাকে তারা ও অন্যান্য গ্রামবাসী বিদেশীদের অত্যন্ত আন্তরিকতা সহকারে গ্রহণ করলেও এই 'ডাকাত' ও 'বিশৃঙ্খল লোকরা' ময়ূর হত্যা করে তাদের ধর্মকে অপমান করেছে। হিন্দুদের কাছে ময়ূর একটি পবিত্র পাখি একথা অবগত থাকায় শিকদার তৎক্ষণাৎ মানরিক ও তার দলকে বেঁধে তার বাড়ির সামনে অন্ধকার কক্ষে আনার নির্দেশ দেন এবং তারা সেখানে সেই রাত ও পরের দিন কষ্ট আর ভয়ে অতিবাহিত করেন। চব্বিশ ঘণ্টা পর পরের দিন মধ্যরাতের দিকে বন্দীদের শিকদারের সামনে হাযির করা হয়, যিনি তখন বিরোধটি মীমাংসার জন্য বিচারালয়ে বসেছিলেন। হুকুম পেয়ে মানরিক উড়িষ্যার মোগল সুবেদারের কাছ থেকে পাওয়া একটি দলিল প্রদর্শন করলেন, যাতে বলা হয়েছে, তিনি একজন হুগলির পর্তুগীজ (মানরিক এখানে তাঁর মুসলমান ছদ্মবেশ ফেলে দিয়েছিলেন) এবং তাঁকে পুরো মোগল সাম্রাজ্যে ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হলো। দলিলটি জোরে পড়া শ্রবণ করে শিকদার সালাম দিলেন এবং মানরিককে আরো কাছে আসতে বললেন। মানরিক বলেন,

তিনি আমাকে পৌত্তলিকদের অভিযোগ বলার পর আমি জবাবে তাঁকে ঘটনা সম্পর্কে সত্য কথা জানালাম। তিনি তখন ময়ূর হত্যার কাজটি আমার কোন্ সহচর করেছে তা জানতে চাইলেন; আমি অপরাধীকে রক্ষার জন্য না বোঝার ভান করে জবাব দিতে ইতস্তত করছিলাম, তখন তার এক সঙ্গী তৎক্ষণাৎ দায়িত্বের সাথে তার নাম বলে দেয়। শিকদার তখন অপরাধীর দিকে তাকান এবং বলেন, 'তুমি না, মনে হচ্ছে, বাঙালি এবং মুসলমান? তবে তুমি কিভাবে কোন হিন্দু এলাকায় একটি জীবন্ত প্রাণী হত্যা করতে সাহস করলে?

হতভাগ্য ব্যক্তিটি তখন ভয়ে জীবিতের চেয়ে মৃতই হয়ে গিয়েছিল এবং জবাব দিতে না পারায় আমি তার হাত ধরে স্বাভাবিক সালাম দিয়ে বললাম, 'সাহেব! একজন ভাল মুসলমান এবং তোমাদের নবী মুহাম্মদের একজন উম্মত হিসেবে সে হিন্দুদের অদ্ভুত ধারণায় ভ্রুক্ষেপ করেনি, যা আপনি নিজেও করেন না। কারণ আল্লাহ তাঁর শেষ পবিত্র গ্রন্থে কোথাও এ ধরনের প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ করেননি; তিনি সব কিছু মানুষের ব্যবহারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর আমরা যদি এই নীতি মেনে

নেই, এই লোকটি আল্লাহর বা তাঁর বিধানের কিংবা আপনাদের কুরআনের বিরুদ্ধে কিছুই করেনি।'[৬৪]

শিকদার ও আরো কয়েকজন শ্রদ্ধেয় মুসলমান কর্মকর্তা মানরিকের প্রাণী জীবন সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শোনলেন। বক্তব্য শেষ হওয়ার পর একে অন্যের প্রতি বিস্ময় ও অনুমোদনসূচক শব্দ ব্যবহার করলেন এবং শিকদার তাঁর সহকর্মীদের লক্ষ্য করে বললেন, 'মহান আল্লাহ ফিরিঙ্গিদের (ইউরোপীয়ানদের) অনেক জ্ঞান দিয়েছেন।'

কিন্তু সন্ন্যাসীর ইসলাম ও ইসলামী ভাবাবেগ সংক্রান্ত আবেদন কোন কাজে লাগেনি। শিকদার মানরিকের দিকে ঘুরলেন এবং বললেন, তিনি এইমাত্র যা বললেন, তা ধর্মীয়ভাবে সত্য হলেও এখন থেকে ৬৫ বছর আগে বাংলা বিজয়ের সময়ে আকবর কথা দিয়েছিলেন যে, 'তিনি এবং তাঁর উত্তরসুরিরা তাদেরকে (বাঙালিদের) তাদের নিজস্ব নিয়ম এবং ঐতিহ্য বহাল রাখতে দেবেন: তিনি (অর্থাৎ শিকদার) তাই তার লংঘন হতে দেবেন না।' ফলে মুসলমান অপরাধীকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো এবং অন্যদেরকে সরাইখানায় ফিরে যেতে দেওয়া হলো; রাত তখন ৩টা। নির্ধারিত শাস্তি ছিল কঠিন। মানরিকের ভাষ্যে জানা যায়, স্থানীয় বিধান অনুযায়ী শাস্তি ছিল চাবকানো এবং ডান হাত কেটে ফেলা। বন্দীর হয়ে করুণাবশত মানরিক পরের দিন তার হয়ে শিকদারের স্ত্রীকে সাদা, গোলাপী ও হলুদ ফুল তোলা একটি সিল্কের চীনা টাফেটা দিয়ে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা করলেন। এবার তার উপহার কাঙ্ক্ষিত কাজে লাগলো। তিনি লিখেন,

তিনি (শিকদারের স্ত্রী) তার স্বামীকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন, নানাভাবে প্রলুব্ধ করে জ্বালাতন করতে লাগলেন আমাদের ইচ্ছানুযায়ী বন্দীর অঙ্গহানি না করার জন্য। সুবেদার যদিও হাত কাটার শাস্তি মওকুফ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কিন্তু তবুও তার মানে এই ছিল না যে, আঙ্গুলগুলো হাত থেকে কাটা হবে না। কিন্তু প্রিয় মুখের শক্তি এতোই বেশি যে এবং তা যদি বিয়ের মাধ্যমে আরো জোরদার করা হয়ে থাকে, পরিণতিতে আঙ্গুল কাটাও মাফ করে দেওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত চাবকানো ছাড়া আর বেশি কিছু করা হয়নি।[৬৫]

এই বর্ণনায় লক্ষণীয় বিষয় এই নয় যে, অপরাধীকে শুধুমাত্র চাবকিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। একজন বাঙালি মুসলমান অভিযুক্তকে একজন মুসলমান বিচারপতি শাস্তি দিয়েছেন এবং তা নির্দিষ্টভাবে হিন্দুদের স্পর্শকাতর একটি বিধান লঙ্ঘনের জন্য, উপরোক্ত ঘটনাটি আধুনিক পাঠকের জন্য লক্ষণীয় হলো লোকটিকে সর্বোপরি শাস্তি পেতে হয়েছে। অধিকন্তু জিজ্ঞাসাবাদের সময় আমরা

৬৪. Manrique, *Travels* 2: 111-12.
৬৫. Ibid., 115.

শিকদারের অভিযুক্তকে বলতে শুনি, 'তুমি কিভাবে কোন হিন্দু এলাকায় একটি জীবন্ত প্রাণী হত্যা করতে সাহস করলে? [৬৬]

শিকদার সুস্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, হিন্দু জনসংখ্যার প্রাধান্যপূর্ণ এলাকাটির বিচার সেখানকার নিজস্ব প্রথা অনুযায়ী হবে, ইসলামী বা অন্য কোন বিধান অনুযায়ী নয়। স্থানীয় প্রথা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, এখানে হিন্দু ভাবাবেগে আঘাতকারী, মুসলমানকেও হিন্দুর থেকে ভিন্নভাবে বিচার হয়নি। এমনকি মানরিক বিচারপতির নিজের ধর্মবিশ্বাসের আলোকে আবেদন জানালেও ইসলাম সম্পর্কে সন্ন্যাসীর জ্ঞানের যথাযথ প্রশংসা করেও শিকদার সাথে সাথেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, অমুসলমানদেরকে তাদের নিজস্ব আইন ও প্রথা অনুসরণ করতে দেওয়ার আকবরের প্রতিশ্রুতির কথা।

এই ঘটনাকে প্রায় ৩০ বছর আগের বশ্যতা স্বীকারকারী বাঙালি বিদ্রোহী ধর্মান্তর ঘটনার উৎসাহিত বা পুরস্কৃত করতে ইসলাম খানের প্রত্যাখ্যানের সাথে তুলনা করা যায়। মোগল সরকার তাঁর সরকারি ঘোষণায় বা আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে সরকারি নীতি বাস্তবায়নে প্রাদেশিক সেনানায়ক বা স্থানীয় জিলা কর্মকর্তা কেউই ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া বা তা বিকাশের ব্যাপারে কোন ধরনের আগ্রহই দেখাননি। পরিশেষে, মোগলরা ইসলামের গৌরবের জন্য নয়, বরং সাম্রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলা জয় করেছিল। আর তারা মনে করেছিল এটা করার জন্য ধর্মীয় গোঁড়ামির চেয়ে সামাজিক সুবিচার অনেক বেশি ফলপ্রসূ। ১৬৪০ সালের আগস্টের এক বর্ষণমুখর রাতে নারায়ণগড়ের সেই ক্ষুদে শিকদার ঠিক এই নীতিই বাস্তবায়ন করেছেন। এক বিদেশীর সাধারণ ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের অনুসরণে বিচারের আবেদন কিংবা শিকদারের স্ত্রীকে ঘুষ দিয়েও সেই নীতি বাস্তবায়ন রোধ করা যায়নি।

সংক্ষেপে, সন্ন্যাসী মানরিকের বর্ণনা ও কয়েকটি ময়ূর মোগল বাংলায় ধর্ম ও রাজনীতি পৃথক থাকার চিত্রই প্রকাশ করেছে। আইনগতভাবে, স্থানীয় আদালতে হিন্দু প্রথা কঠোরভাবে পালনের মাধ্যমে পৃথকীকরণকে প্রকাশ করা হয়েছে। স্থানগতভাবে, কার্যক্রমের দিক থেকে দুটি পৃথক শহরের আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে তা প্রকাশ করা হয়। প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে ঢাকা এবং পবিত্র নগরী হিসেবে গৌড়-পাণ্ডুয়া। মোগল

---

৬৬. মানরিকের নিজের ভাষায় এটি ছিল "একটি হিন্দু পরগনায়" *(en pagana de Indus)*। অনুবাদক মন্তব্য করেছেন, উক্ত সন্ন্যাসী "সেই ঘটনা স্মরণ করার সময়ে অবশ্যই প্রকৃত হিন্দি (অর্থাৎ বাংলা) শব্দ ব্যবহার করেছেন, কারণ *পরগনা* শব্দটির মাধ্যমে তিনি শুধুমাত্র শব্দান্তর হিসেবে ব্যবহার করেননি" (*Travels* 2: 112n.) তবে এটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি যে, মানরিক তাঁর শাস্তিদাতাদের "পৌত্তলিক" (Heathen) বা "অবিশ্বাসী" হিসেবে অভিহিত করেননি, যা তিনি ভারতের অমুসলমান প্রসঙ্গে প্রায়ই ব্যবহার করেছেন, তিনি বরং ব্যবহার করেছেন বাংলা শব্দ "ইন্দু" (Indu)। তাই "একটি হিন্দু পরগনায়" *(em pragana de Indus)* বাক্যটির মাধ্যমে সম্ভবত মানরিকের স্মরণে থাকা শিকদারের কথিত আক্ষরিক ভাষা।

শাসক শ্রেণীতে প্রবেশের জন্য অমুসলমানদের ইসলামে ধর্মান্তরকরণ বাধ্যতামূলক না হওয়ায় রাজকীয় বাহিনীতে মোগল ঐতিহ্য ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাবও এতে প্রতিফলিত হয়। ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যকার এই কার্যকর পার্থক্য সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতক জুড়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, সৌজন্য, পৃষ্ঠপোষকতা এবং স্থাপত্যকৌশলে বৈশিষ্ট্যসূচক মোগল রীতি হিসেবে টিকে থাকে ও বিকশিত হয়। ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যকার কার্যকর পার্থক্যের ফলে বৃহত্তর মোগল শ্রেণীর মধ্যে স্বশাসিত মুসলমান আশরাফ শ্রেণীকে বৃত্তাবদ্ধ শ্রেণী হিসেবে নিজেদের মধ্যে বহাল থাকতেও উৎসাহিত করেছে। ইসলামকে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গর্বিত প্রতীক বিবেচনা করে আশরাফ মুসলমানরা চাইতো না তাদের ধর্ম অমুসলমান 'স্থানীয়' আদিবাসী শ্রেণী, তা পশ্চিমবঙ্গের অনেক বেশি সংস্কৃতিকৃত হিন্দুই হোক বা পূর্ববঙ্গের অপেক্ষাকৃত কম সংস্কৃতিকৃত আধা উপজাতীয়ই হোক, তাদের মধ্যে যথাযথভাবে একীভূত হয়ে যাক। অর্থাৎ মোগলরা সরকারিভাবে সাধারণ মানুষের ইসলামে ধর্মান্তরকরণে উৎসাহিত করতো না। কিন্তু তবুও বদ্বীপের বিভিন্ন অংশের বাঙালিরা ইসলামসহ মোগল শাসনের আগমন এবং মোগল সংস্কৃতির বিকাশকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে গ্রহণ করে। রাজনৈতিকভাবে নির্বিবাদে গ্রহণ থেকে শুরু করে প্রচণ্ড বিদ্রোহের মাধ্যমে; ধর্মীয়ভাবে নিস্পৃহভাবে থেকে নজিরবিহীন মাত্রায় ইসলামীকরণের মাধ্যমে। আমরা এই প্রতিক্রিয়াগুলো আরো ঘনিষ্ঠভাবে দেখবো।

পশ্চিমবঙ্গ: রাজকীয় কর্তৃত্বের আত্মীকরণ

আবুল ফজলের মোগল বাহিনীর শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের 'আগাছা ও আবর্জনা' ছত্রভঙ্গ ও সমগ্র বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠার বারংবার ঘোষণা সত্ত্বেও এটা স্পষ্ট যে, তাঁর লেখার সময়ে (১৫৯৫ সালে) মোগল কর্তৃত্ব বদ্বীপটির পশ্চিমাঞ্চল তথা বর্তমানকালের ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে সীমিত ছিল। ১৫৯৪ সালে রাজা মানসিংহ ও ১৬০৮ সালে ইসলাম খান উভয়কেই প্রদেশের পশ্চিমদিকের নয়, পূর্বদিকের অবাধ্য গোষ্ঠীপতিদের বশ মানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাই ঢাকার পথে ইসলাম খান যখন পশ্চিমবঙ্গ অতিক্রম করছিলেন, তখন ভাগিরথি-হুগলি নদীর পশ্চিমভাগের কৃষিজ এলাকা–বীরভূম, পাচেট ও হিজলির তিন গোষ্ঠীপতির সবাই বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করে।[৬৭] উক্ত নদীর ঠিক পূর্বদিকে অবস্থিত বিশাল ও ঘন বসতিপূর্ণ যশোরের ক্ষেত্রেও

৬৭. গৌড়ের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বীরভূমের জমিদার বীর-হামির দুই হাজার অশ্বারোহী ও চার হাজার পদাতিক সৈন্য সম্বলিত মোগল সেনাবাহিনীর কাছে সাথে সাথেই আত্মসমর্পণ করেন। বর্তমান বাঁকুড়া জেলার দামোদর উপত্যকায় অবস্থিত পচেটের জমিদার শামস খানও একই কাজ করেন। অনেকটা বর্তমান মেদিনিপুর জেলায় অবস্থিত হিজলির জমিদার সলিম খান প্রতিরোধ

একই কথা সত্য। রাজা প্রতাপাদিত্য যখন ইসলাম খানের কাছে তাঁর আত্মসমর্পণের শর্তাবলী পালন করতে ব্যর্থ হলেন, তখন প্রধান প্রাদেশিক রাজস্ব কর্মকর্তার স্থানীয় ভূস্বামী ও কেরানিদের সাথে নতুন ও আরো কঠিন শর্তে ভূমি রাজস্ব আদায়ের লিখিত চুক্তি করতে কোন সমস্যা হয়নি।[৬৮]

ভাগিরথি-হুগলির উভয়দিকে খুব সহজেই ইসলাম খানের মোগল কর্তৃত্ব সুসংহত করার ঘটনায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। পশ্চিমদিকের স্থানীয় কর্মকর্তারা অনেক আগে থেকেই চাষী ও অঞ্চলটির অভ্যন্তরীণ জমিদারদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করছিল এবং দীর্ঘদিন ধরেই গৌড় ও পাণ্ডুয়ার সুলতানদের রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় আত্মীকৃত হয়ে পড়েছিল। তাই পশ্চিমবঙ্গে সুলতানদের নিকট থেকে মোগলদের কাছে প্রশাসন হস্তান্তরিত হওয়ায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যূনতম বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়েছিল। মূল পরিবর্তনটি হয়েছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ে এবং পল্লী এলাকাগুলোতে পুরাতন ও পরিচিত স্থানীয় কর্মকর্তাগণ মোগল কর্মকর্তাদের পাশাপাশি কাজ করতো এবং নগদ রাজস্ব প্রথমে ঢাকায় এবং তারপর দিল্লীতে পাঠানো হতো। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে সন্ন্যাসী মানরিকের অভিজ্ঞতা সেখানকার পল্লী সমাজের মোগল কর্তৃত্ব গ্রহণ করার বিষয়টি তুলে ধরেছে।

মোগল শাসনের সূচনা-লগ্নে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলটিতে হিন্দু সভ্যতা সবচেয়ে গভীরভাবেও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় তারিখ সম্বলিত ইটের মন্দির নির্মাণ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী দেবদেবীদের প্রতি তা উৎসর্গের ঘটনায় তা দেখা যায়, (দেখুন টেবিল ৩) মোগল শক্তির উত্থানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এসব মন্দিরের আবির্ভাব ঘটতে থাকে এবং পুরো সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে তার বিস্তার ঘটতে থাকে। অষ্টাদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত অধিকাংশই বিষ্ণুর এক অবতার বিশেষ করে কৃষ্ণের প্রতি উৎসর্গ করা হয় এবং তারপর শিব বা দেবীকে নিবেদন করা মন্দিরের প্রাধান্য ঘটে।[৬৯] এসব মন্দিরের ভৌগোলিক অবস্থান বিশ্লেষণ করলে দেখা

করার আফগানদের পরামর্শ উপেক্ষা করে মোগল কর্মকর্তাদের উপহার (পেশকাশ) নিয়ে যান এবং তাঁকে "পুরো এলাকার প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।" Nathan, *Baharistan*, text, fol. 6b; trans., 1: 19-20.

৬৮. Ibid., text, fol. 61b; Trans., 1: 156-57.

৬৯. এই সমস্ত ইটের মন্দিরের স্থাপত্য বৈষ্ণব প্রভাবেরও ইঙ্গিতবাহী: বাংলায় চিরায়ত হিন্দু মন্দিরগুলো হয় ছোট, একক-দরজার কাঠামো, যাতে দেবতার মূর্তি স্থাপন ছাড়া জায়গা তেমন থাকে না, অন্যদিকে ষোড়শ শতকের শেষদিক থেকে নির্মিত মন্দিরগুলোর আকার অপেক্ষাকৃত বড়, অনেক দরজা, বারান্দা ও অতিরিক্ত কক্ষ সম্বলিত, যাতে করে বৈষ্ণব ভক্তিবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মীয় আবাহনের জায়গার ব্যবস্থা করা যায়। Hitesranjan Sanyal, "Temple-building in Bengal from the Ffiteenth to the Nineteenth Century," in Perspective in Social Sciences, ed. Barun De, vol. 1 Historical Dimensions (Calcutta: Centre for Studies in Social Science, 1977), 131-32.

টেবিল ৩ : তারিখ সম্বলিত ইটের মন্দির নির্মাণ, ১৫৭০-১৭৬০

	বৈষ্ণব	শৈব	দেবী	মোট
১৫৭০-১৫৮০	১	-	-	১
১৫৮০-১৬০০	৩	৩	-	৬
১৬০০-১৬২০	৩	-	২	৫
১৬২০-১৬৪০	৫	১	-	৬
১৬৪০-১৬৬০	১৫	৩	২	২০
১৬৬০-১৬৮০	১৬	২	২	২০
১৬৮০-১৭০০	১৭	২	৪	২৩
১৭০০-১৭২০	১২	৪	২	১৮
১৭২০-১৭৪০	২৪	২২	৬	৫২
১৭৪০-১৭৬০	১৮	৪০	১০	৬৮

সূত্র: Brick Temples of Bengal; From the Archives of David McCutchion, ed. George Michell (Princeton: Princeton University Press, 1983), 195-254.

টিকা : মিচিলের তালিকায় মন্দিরের হিসাবে মোটামুটি সংরক্ষিত অবস্থায় থাকাগুলোই এসেছে।

যাবে, বদ্বীপটির পশ্চিমাঞ্চল এবং বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সুস্পষ্টভাবে কেন্দ্রীভূত। ১৫৭০ থেকে ১৭৬০ সময়কালে নির্মিতগুলোর মধ্যে এখনো টিকে থাকা মোট ২৩০টি মন্দিরের মধ্যে অর্ধেকের বেশি (১২৭টি) হুগলি, বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত এবং এক-চতুর্থাংশের বেশি (৬২টি) যশোর, হাওড়া, মেদিনিপুর ও বীরভূম জেলায়। অপরদিকে একই সময়ে পূর্ববঙ্গের বগুড়া, ঢাকা ও বাকেরগঞ্জ জেলাগুলোর প্রতিটিতে মাত্র একটি করে মন্দির টিকে আছে এবং চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ফরিদপুর, রাজশাহী, মোমেনশাহি ও সিলেট জেলাগুলোতে একটিও নেই।[৭০] মোগল আমলে মন্দির নির্মাণের গতি পশ্চিম থেকে পূর্বে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই কমতে থাকে।

৭০. অবস্থান ছিল নিম্নরূপ: হুগলি, ৪৯; বর্ধমান, ৪৩; বাঁকুড়া, ৩৫; যশোর, ১৮; হাওড়া, ১৬; মেদিনিপুর, ১৭; বীরভূম, ১২; চব্বিশ পরগনা, ৮; মুর্শিদাবাদ, ৫; নদিয়া, ৬; পাবনা, ৪; খুলনা, ৪; দিনাজপুর, ৪; রংপুর, ৩; পুরুলিয়া, ২; কুষ্টিয়া, ১; বাকেরগঞ্জ, ১; বগুড়া, ১; ঢাকা, ১। George Michell, ed., Brick Temples of Bengal: From the Archives of David McCutchion (Princeton: Princeton University Press, 1983), 195-54.

পশ্চিমবঙ্গের ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের ব্যাপকতা সেখানকার বিস্তৃত জাতিভেদ প্রথার মধ্যেও দেখা যায়। ষোড়শ শতকের শেষ নাগাদ বর্ধমানের অধিবাসী কবি মুকুন্দরাম সর্বোচ্চ পর্যায়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্যপূর্ণ একটি স্তরবিশিষ্ট সমাজের বর্ণনা দিয়েছেন, যেখানে তারা অঞ্চলটির ধর্মাচার এবং গৃহস্থালি কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করতো এবং তাদের পরেই ছিল চাষী ও কারিগরদের এক বিশাল শ্রেণী, প্রত্যেকেই গোঁড়ামিতে পরিপূর্ণ ও প্রত্যেকেই পুরোহিতদের নির্ধারিত জাতের অন্তর্ভুক্ত। তাদের পরে রয়েছে জেলে ও মাঝিদের নিম্নতর জাত এবং সবশেষে অশুদ্ধ অচ্ছুৎ (চর্মকার, ঝাড়ু দার, খলপু ইত্যাদি)।[৭১] শেষোক্তরা প্রধানত দেবীকে তাঁর বিভিন্নরূপে, লোকজ দেব-দেবীতে পূজা করতো, যাদের ক্রোধ ও প্রাণচাঞ্চল্য প্রশমনে রক্তবলির প্রয়োজন হতো।[৭২] মোগল আমলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষক ও কারিগরদের মধ্যবর্তী জাত ছিল প্রধানত কৃষ্ণপূজারী বৈষ্ণব[৭৩] এবং এর প্রধান কারণ ছিল বৈষ্ণব জমিদারদের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা, পরিণতিতে সপ্তদশ শতকে অঞ্চলটিতে বৈষ্ণব মন্দিরের বিস্তৃতি ঘটে। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতর বর্ণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা প্রাথমিকভাবে ছিল শিবের পূজারী, যদিও অনেকে, তাদের চাষী ও কারিগর ভক্তদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হারে কৃষ্ণ ধর্মমত জনপ্রিয় হওয়ায়, বৈষ্ণব হয়ে পড়েছিল।[৭৪] সংক্ষেপে, পশ্চিমবঙ্গ এমন একটি স্থিতিশীল কৃষিজ সমাজ হিসেবে বিদ্যমান ছিল যেখানে বদ্বীপের অন্যান্য অংশের তুলনায় ব্রাহ্মণ্য হিন্দুবাদের পুরোহিততান্ত্রিক মূল্যবোধে তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক আত্মীকরণে অনেক বেশি অগ্রসর ছিল।

পশ্চিম দিকে উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের কিছু বিচ্ছিন্ন এলাকা থাকার প্রমাণ থাকলেও তাদের সামাজিক প্রভাব ছিল উপেক্ষণীয়। এই এলাকা যেহেতু আগে থেকেই উদ্বৃত্ত ধান চাষ ভিত্তিক মুদ্রা অর্থনীতি এবং সেই উদ্বৃত্ত নিংড়ে নেওয়ার জন্য একটি রাজস্ব ব্যবস্থা প্রণীত হয়েছিল, তাই মোগল শাসন প্রবর্তনে সর্বোচ্চ পদে ব্যক্তির পরিবর্তন ভিন্ন অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ ও ব্যাপক জাতপ্রথার সম্বলিত কৃষি ব্যবস্থায় সামান্যই সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাব ফেলেছিল। এমতাবস্থায় স্থানীয় জনগণ মোগল কর্তৃত্ব প্রতিরোধ কিংবা নতুন শাসক শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ধর্মীয় আদর্শ ইসলাম গ্রহণ কোনটার দিকেই আগ্রহ প্রকাশ করেনি।

উত্তর সীমান্ত: রাজকীয় কর্তৃত্ব প্রতিরোধ

উত্তরদিকে, ব্রহ্মপুত্র নদীর উজানের পর, যেখানে তা আসামের সমভূমির দিকে বিশাল বাঁক নিয়েছে, সেখানে মোগল কর্মকর্তারা রাজকীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে

---

৭১. মুকুন্দরাম, কবিকঙ্কন চণ্ডি, ৩৪৮-৬১।

৭২. Smith, One-eyed Goddess, 56, 73, 133, 173.

৭৩. Bhattacharya, "La Deesse," 40, 41; Wise, "Hindus of Eastern Bengal," 8.

৭৪. Ray, "Medieval Bengali Culture," 90.

সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হয়। এই অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে মোগল কর্মকর্তারা ইতিপূর্বেকার মুসলমান সুবেদার ও সুলতানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেখানে বারবার অভিযান পরিচালনা করে এবং পরিণতিতে তারা কখনো সাময়িক সাফল্য ও কখনো চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল।[৭৫] মোগল বাংলার উত্তর সীমান্তে ছিল কুচবিহার, যা করতোয়া নদী থেকে ব্রহ্মপুত্র ও সংকোশ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কুচবিহারের পূর্বে ছিল কামরূপ, যা ব্রহ্মপুত্র নদীর তীর থেকে বরনদী নদী তথা আসাম রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল।[৭৬]

কুচবিহার একটা রাজনৈতিক সীমান্ত থেকেও বড় কিছু ছিল। 'পানি কুচ' মানুষেরা দীর্ঘদিন ধরে ইন্দো-আর্য সভ্যতার প্রান্তভাগে বসবাস করছিল: তারা বনে বসবাস করতো, নিড়ানি দিয়ে চাষাবাদ করতো, ধেনো মদ পান করতো, মাতৃপ্রধান ও বিয়ের পর স্ত্রীর গৃহে গমনের ঐতিহ্য অনুসরণ করতো এবং বাংলা থেকে ভিন্ন ভাষায় কথা বলতো। তবে অন্তত ষোড়শ শতাব্দী থেকে তাদের সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতি জায়গা করে নিচ্ছিল।[৭৭] সেই শতকের প্রথম দশকগুলোতে হরিয়া মণ্ডলের বংশধর কুচ রাজাদের রাজবংশের আত্মপ্রকাশ করে, গ্রামের উক্ত সরদারের পুত্র বিষু কুচ গোত্রগুলোকে নিয়ে একটি শক্তিশালী কনফেডারেশন গঠন করেন। করতোয়া নদী থেকে বরনদী নদী পর্যন্ত এলাকায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার পর বিষু 'রাজা' পদবি গ্রহণ করেন এবং নিজেকে অঞ্চলটির শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। ১৫৫৫ সালের দিকে তাঁর মৃত্যুর পর বিষুর পুত্র নর নারায়ণ (মৃত্যু ১৫৮৬) সিংহাসনের উত্তরসুরি হন এবং তিনিও তাঁর পিতার মতো ঐকান্তিকতা সহকারে সংস্কৃত সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

---

৭৫. মুসলমান সেনাপতিরা কুচবিহার, কামরূপ বা আসাম আক্রমণ করেছিলেন আনুমানিক ১২০৬, আনুমানিক ১২৩৮, ১২৫৭, ১৩২১-২২, ১৩৩২-৩৩, ১৪৫৭, ১৪৯৩-৯৪ ও ১৫৬৭-৬৮ সালে। এই অঞ্চলে সালতানাতের প্রাধান্যের দীর্ঘতম মেয়াদ ছিল আলাউদ্দিন হোসেন শাহের ১৪৯৪ সালে অভিযানের ফলে কুচবিহার ও কামরূপ জয়ের পর। হোসেন শাহি সরকার কর্তৃক মুদ্রিত মুদ্রাগুলোতে ১৫১৮ সাল পর্যন্ত "কামরূ"র উল্লেখ করতে থাকে, এবং অহোম ঐতিহাসিকদের ভাষ্য অনুযায়ী মনে হয়, ১৫৩৩ সাল পর্যন্ত অঞ্চলটিতে সুলতানদের নিয়ন্ত্রণ বলবৎ ছিল, সেই বছরই অহোম রাজাদের হাতে তারা সিদ্ধান্তসূচকভাবে পরাজিত হয় এবং কুচবিহার ও কামরূপ থেকে প্রত্যাহারে বাধ্য হয়। Sudhindra Nath Bhattacharyya, *A History of Mughal North-east Frontier Policy* (Calcutta: Chuckervertty, Chatterjee & Col. 1929), 52-80; Momtazur Rahman Tarafdar, *Husain Shahi Bengal, 1494-1538 AD: A Social-Political Study* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1965), 40-80.

৭৬. Bhattacharyya, *Mughal North-east Frontier*, 6-9.

৭৭. Buchanan-Hamilton MSS, "List of Papers Rspecting the District of Ronggopur" (India Office Library, London, Eur. MSs. D 74, vol. 1) bk. 2, 127-31.

কুচ রাজবংশের আত্মপ্রকশের সাথে ঊর্ধ্বমুখী গতিশীল গোত্রীয় রাজবংশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাল্পনিক বংশও গৃহীত হয়। তাই সামান্য পল্লী সরদার হরিয়া মণ্ডল ও তাঁর ১২ কুচ পরিবার প্রধানদের কামরূপের পাহাড়ে বসতি স্থাপনকারী পলাতক এবং মেচ গোত্রের মহিলাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকারী ১২ জন ক্ষত্রিয় রাজপুত্রের সন্তান হিসেবে পরিচয় দেওয়া হতে থাকে। হিন্দু সামাজিক প্রাধান্যপরম্পরার সর্বোচ্চ স্তরের সাথে তারা সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইলে একটি কিংবদন্তী প্রচার করে যে, বিষুর মা অলৌকিকভাবে শিব কর্তৃক গর্ভবতী হয়। তাই এসব কিংবদন্তীতে বিষুকে একটি প্রধান হিন্দু দেবতার পুত্র ও এক ক্ষত্রিয় যোদ্ধার নাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। তাই বিষুর উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের উদারহস্তে পৃষ্ঠপোষকতা বিস্ময়কর কিছু নয়, কারণ তারা জাঁকজমক বংশলতিকার মাধ্যমে রাজাকে উচ্চমর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিল।[৭৮] তখন সেই সুপরিচিত প্রক্রিয়া গৃহীত হয়: অর্থনৈতিক শক্তি ও রাজনৈতিক প্রাধান্য আকাঙ্ক্ষী গোত্রগুলোর ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির ধর্মাচারগতভাবে বিশুদ্ধ দেবতা ও বর্ণের সাথে নিজেদের সংযোগ সাধনের জন্য পৌরাণিক কিংবদন্তীর আশ্রয় গ্রহণ। সহস্র বছর ধরে ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রান্তে বসবাসকারী ভারতের আদিবাসী গোত্রগুলোর ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা এবং বর্ণবাদী সমাজে তাদের আত্মীকরণের মাধ্যম হিসেবে এটাই ছিল পথ।

ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে কুচ ধর্মীয় ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ্যবাদী উপাদান বেশ ভালভাবেই অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছিল। পূর্বে 'কোলিতা' নামে পরিচিত স্থানীয় পুরোহিতরা সূর্য, চাঁদ, তারকারাজি এবং স্থানীয় বন-জঙ্গল, পাহাড় ও নদ-নদীর সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন দেবতাকে নিবেদন করে অর্ঘ্য নিবেদনের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতো। তাদের দেবমণ্ডলে পূজার জন্য কারো মূর্তি ছিল না, সর্বোচ্চ দেবতার নাম ছিল রিশি এবং সে বিয়ে করেছিল জগো নামের অপর এক দেবীকে। ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ প্রতিবেশী ব্রাহ্মণরা কুচদের বলতে থাকে, তারা রিশি ও জগো নামের যে দেব-দেবীকে জানে, আসলে তারা শিব ও তার স্ত্রী পার্বতী। স্থানীয় দেব-দেবীদের সংস্কৃত লোক-কাহিনীর মাধ্যমে বৈধতা প্রদান এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সমর্থনে হিন্দু দেবতা হিসেবে স্বীকৃতিতে ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈশ্বিক ভাবনা ও সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণে কুচদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছিল। একই সময়ে, প্রাথমিকভাবে বিষুর পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণরা কুচ পুরোহিতদের মর্যাদা হুমকিগ্রস্ত করলেও তারা ব্রাহ্মণিক ধর্মাচার অনুষ্ঠান গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। তাদের নির্দেশনায় পুরা সমাজে ধীরে ধীরে 'সংস্কৃতায়ন' ঘটে এবং ১৮১০ সাল নাগাদ কুচ কৃষকরা নিজেদের 'বিশুদ্ধ শুদ্র' হিসেবে অভিহিত করে।[৭৯]

৭৮. K.L. Barua, *Early History of Kamarupa from the Earliest Times of the End of the Sixteenth Century* (Shillong: n.p., 1933), 284-88.
৭৯. Buchanan-Hamilton MSS., "List of Papers," bk. 2, 133-38.

কুচ সমাজ ছিল কিছু সংখ্যক গোত্র-ভিত্তিক উপজাতীয়দের একজন রাজাকে কেন্দ্র করে গড়া শিথিল সংস্থা, যেখানে স্থানীয় ভূস্বামীরা তার আনুগত্য প্রকাশ করতো এবং তাদের কাছে অধীনস্থ গোষ্ঠীপতিরা কর প্রদান করতো। এই কর প্রদান করা হতো নগদ বা শস্যের মাধ্যমে নয়, বরং বেগার শ্রমদানের মাধ্যমে, এটি দৃশ্যত প্রতিবেশী আসামে অহোম-রাজের প্রবর্তিত ব্যবস্থার অনুকরণ। *পাইক* নামে পরিচিত কৃষকরা প্রতি চারজনে একটি করে ইউনিট গঠন করতো এবং এসব ইউনিটের মধ্যে তারা পর্যায়ক্রমে রাজার সেবা করতো। একজন কৃষক এক বছর যখন রাজার সেবা করতো, তখন তার ইউনিটের অপর তিন সদস্য জমি তদারক করতো। ফলে প্রতিটি কৃষক প্রতি চার বছরে এক বছর করে রাজার সেবা করতো।[৮০] বাংলায় চালু থাকলেও তখনো কুচ রাজনৈতিক অর্থনীতি মুদ্রাভিত্তিক হয়নি। বাংলা সালতানাতের সাথে কখনো স্থায়ীভাবে আত্মীকরণ না হওয়ায় এখানকার মানুষ কখনোই পশ্চিমাঞ্চলীয় বদ্বীপীয় বাংলায় দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান ভূমি-রাজস্ব আদায়ের মতো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয়নি। এটা এখানকার কৃষক সমাজ পশ্চিমবঙ্গের স্তরীভূত সামাজিক ব্যবস্থার মতো গোঁড়ামিপূর্ণ ও প্রাধান্যপরম্পরায় সন্নিবেশিত জাতপাতে সংগঠিতও ছিল না। বস্তুত, মাত্র ষোড়শ শতকে কুচ সমাজ নিড়ানির বদলে লাঙল গ্রহণ করে এবং ধান চাষের সাথে সম্পৃক্ত স্থায়ী জীবন বেছে নেয়।[৮১]

তাই কুচবিহার ও কামরূপ বিজয়ের জন্য প্রেরিত মোগল বাহিনী বাংলা বদ্বীপের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সমাজের মুখোমুখি হয়। বাংলার বার ভূঁইয়াদের বশ মানানোর বিশাল দায়িত্ব দারুণভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর ১৬১৩ সালে ইসলাম খানকে পাঁচ হাজার গাদা বন্দুকধারী, সহস্রাধিক অশ্বারোহী, বৃহৎ কামান সুসজ্জিত চারশত রণতরী এবং তিনশত রাজহাতি নিয়ে সাত লাখ রূপি ব্যয়ের অভিযানে কুচবিহার পাঠানো হয়। সম্প্রতি পরাজিত ভাটির গোষ্ঠীপতিরা এখানেই প্রথম বড় ধরনের কোন অভিযানে শরিক হয় এবং তাদের নতুন প্রভু ও পৃষ্ঠপোষকদের পাশাপাশি অবস্থান নিয়ে যুদ্ধ করে।[৮২] ব্রহ্মপুত্র নদীর পশ্চিম তীরে ধুবরিতে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ কুচ দুর্গে পৌঁছে শত্রুভাবাপন্ন লোকদের বিরুদ্ধে মোগল বাহিনী তিন মাস অবরোধে থাকে।[৮৩]

৮০. See Amalendu Guha, "The Medieval Economy of Assam" in *The Cambridge Economic History of India*, ed. Tapan Raychaudhuri and Ifran Habib (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), 1: 483-85.

৮১. Buchanan-Hamilton MSS., "List of Papers, bk.2, 128 137-38.

৮২. এঁদের মধ্যে রয়েছেন সিলেটের উসমান খানের সাবেক অনুগত আফগানরা, রাজা সত্যজিত, বাহাদুর গাজি, সোনা গাজি ও মুসা খানের বাহিনী। Nathan, *Baharistan*, text, fol. 105b; trans., 1: 222-23.

৮৩. এই অভিযানে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনকারী মির্জা নাথান অসহিষ্ণু হয়ে বলেন, "জলকাদায় মহিষ যেমন গড়াগড়ি খায়" এই অবরোধের সময়ে মোগল বাহিনীর অবস্থাও তেমন হয়েছিল। Ibid., text fol. 112b; Trans., 1: 236.

শেষ পর্যন্ত মোগল বাহিনীই জয়ী হয় এবং তারা কুচদের ধাওয়া করে রাজধানী গিলায় যায় এবং কুচ রাজা পরীক্ষিত নারায়ণকে দেশ থেকেই তাড়িয়ে দেয়। রাজধানী শহরে পৌছার পর তারা জাঁকজমকপূর্ণভাবে সেটির নাম রাখে 'জাহাঙ্গীরাবাদ,' সাম্রাজ্যবাদীরা কুচবিহারকে মোগল বাংলার সাথে জুড়ে দেয় এবং সাবেক রাজাকে সংকোশ ও মনা নদী দিয়ে কামরূপে ধাওয়া করে। সেখানে পলাতক সাবেক রাজা পরিশেষে মোগল কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং মির্জা নাথানের ভাষায় তাঁকে 'দরবারের আদব-কায়দা শেখানোর জন্য' ঢাকায় পাঠানো হয়।[৮৪]

১৬১৩ সালের জুলাই মাস নাগাদ কুচবিহার ও কামরূপ উভয়ই সংযুক্ত হয় এবং মোগল রাজস্ব প্রশাসনের আওতায় আসে। অঞ্চলটিকে ১২টি রাজস্ব এলাকায় ভাগ করা হয়, কৃষকদের উপর করারোপ করা হয় এবং নতুন আরোপিত ভূমিকর আদায়ের জন্য রাজকীয় এজেন্টদের *(কুরুরি)* পাঠানো হয়। কিছু রাজস্ব এলাকা রাজস্ব কৃষকদের *(মুসতাজির)* প্রদান করা হয় এই শর্তে যে, তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করে ঢাকায় পাঠাবে।[৮৫] শীঘ্রই মোগলরা জাহাঙ্গীরাবাদে মির সাফি নামক নতুন একজন রাজস্ব কর্মকর্তাকে পাঠালো এবং তিনি রাজস্ব মূল্যায়নে আরো পরিবর্তন এনে দাবি জানালেন, স্থানীয় রক্ষীবাহিনী বা *পাইকদের* তাদের কাজের জন্য সাধারণ ভূমিকর থেকে বেতন দিতে হবে। এভাবে বেগার কোন *পাইক* স্থানীয় রাজার সেবায় নিয়োজিত হলে সে দূরবর্তী সুবেদারের কর্তৃত্বের আওতাধীন একটি বেতনভূক সেনাবাহিনীর সদস্যে পরিণত হয়ে যেত। অধিকন্তু, সেনাবাহিনীর জন্য অতিরিক্ত রাজস্বের প্রয়োজন হওয়ায় মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির সাথে অপরিচিত কৃষক সম্প্রদায়ের উপর বাড়তি চাপ পড়ে। অবস্থার আরো অবনতি হয়, নির্দিষ্ট মাত্রার রাজস্ব প্রদানের জন্য সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ মোগল রাজস্ব চাষীরা যখন তাদের নিজস্ব লাভের জন্য তাদের রাজস্ব এলাকার বাড়তি কর আদায়ের জন্য কৃষকদের চাপ দিয়ে তাদের অবস্থা আরো খারাপ করতে থাকে।[৮৬]

পুরো কুচ রাজনৈতিক অর্থনীতি মৌলিকভাবে ঝাঁকুনি খায় এবং কোন রাজা এসব পরিবর্তনে তেমন অসন্তোষ প্রকাশ না করায় কুচবিহার ও কামরূপ জুড়ে বেশ কয়েকটি কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ১৬১৪ সালে কৃষক বিদ্রোহীরা রাঙামাটিতে মোগল সেনাছাউনি দখল করে এবং গিলাহের আঞ্চলিক সদর দফতর অবরোধ করে। মোগল বাহিনী পাল্টা আঘাত হেনে গিলাহের অবরোধ অবসান করে, রাঙামাটি পুনর্দখল করে এবং মনা ও বরনদীর মধ্যবর্তী পূর্ব কামরূপে সেনাছাউনি নির্মাণ করে। ১৬১৫ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের দিকে তারা আসামে পূর্ণাঙ্গ অভিযান পরিচালনা

৮৪. Ibid., text, fols. 116b-118b, 153a-b; Trans., 1: 248-53, 292.
৮৫. Ibid., text, fol. 147a; Trans., 1: 272-73.
৮৬. Ibid., text, fol. 152b; Trans., 1: 288-89.

করে, এখান থেকেই পূর্ব কামরূপের বিদ্রোহীরা দমদমের মোগল সেনাছাউনি দখল করেছিল। সেখানে সম্ভবত *পাইকদের* কোন বংশানুক্রমিক সরদার, সনাতন নামক এক কৃষকের নেতৃত্বে কুচ বিদ্রোহীরা স্বাধীনতার দাবিতে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।[৮৭] সনাতন অবরুদ্ধ মোগল বাহিনীর কাছে চারটি দাবি পেশ করে: কামরূপে প্রেরিত কর সংগ্রহকারীকে তার নির্যাতনের জন্য শাস্তি দিতে হবে, একটি পূর্ণ বছরের জন্য সকল মোগল কর মওকুফ করতে হবে, রাজকীয় বাহিনীকে কামরূপ থেকে প্রত্যাহার করতে হবে এবং '*পাইকদের* ভাতা সরাসরি তাদের দিতে হবে, সরকারকে এবাবৎ কিছু দেওয়া হবে না।' জবাবে মোগলরা নির্যাতনকারী কর সংগ্রহকারী মির সাফিকে বরখাস্তের মাধ্যমে বিদ্রোহীদের শান্ত করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। তবে তারা ইতোপূর্বে প্রবর্তিত নতুন কর ব্যবস্থা বাতিল করতে রাজি ছিল না, এমনকি তারা *পাইকদের* সাবেক মর্যাদা পুনর্বহালেও সম্মত হয়নি।[৮৮] এই অচলাবস্থায় হিন্দু রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতীক কব্জা করে সনাতন নিজেকে উক্ত এলাকার 'রাজা' ঘোষণা করে।[৮৯] মোগল সেনানায়করা জনশক্তি এবং অস্ত্রশক্তির সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রয়োগ করে এবার সনাতনের সুরক্ষিত প্রতিরক্ষা দুর্গ ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়, এক হাজার বিদ্রোহীকে হত্যা করে এবং শেষ পর্যন্ত সনাতনকে তারা জীবন নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে।[৯০]

এই প্রক্রিয়ায় বাংলার উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্ত অঞ্চল বলপূর্বক রাজকীয় কর্তৃত্বের অধীন হলো। পশ্চিমবঙ্গে মোগল শক্তির সুশৃঙ্খল হস্তান্তরের সুস্পষ্ট বিপরীতে এই বিজয়ের ফলে অঞ্চলটির সাবেক রাজনৈতিক অর্থনীতিতে আকস্মিক বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়। কুচবিহার ও কামরূপে একটি অ-মুদ্রানির্ভর অর্থনীতির স্থলাভিষিক্ত হয়। মুদ্রাব্যবস্থা, স্থানীয় রাজার স্থলাভিষিক্ত হন দূরবর্তী সুবেদার, রাজার প্রথাগত সেবাব্যবস্থা হিসেবে বেগার শ্রমদানকারী রক্ষীবাহিনী। এই ছন্দপতনের ফলে মোগল কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ব্যাপকভিত্তিক ও জনপ্রিয় প্রতিরোধ গড়ে ওঠে, যা হাজার হাজার গ্রামবাসী সনাতনের অবরুদ্ধ যোদ্ধাদের সমর্থন দিতে তাদের ছাউনিতে রসদ নিয়ে আসার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।[৯১] পরিশেষে মোগলদের আবির্ভাবের আগেই কুচ সমাজে সংগঠিত নিড়ানির পরিবর্তে লাঙলের অগ্রগতি, সমভূমি থেকে আসা হিন্দু সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষাকে গ্রহণের মাধ্যমে হয়েছিল এবং তা ইসলামী সংস্কৃতি বা

৮৭. Gautam Bhadra, "Two Frontier Uprisings in Mughal India," in *Subaltern Studies 11: Writings on South Asian History and Society*, ed. Ranajit Guha (Delhi: Oxford University Press, 1983), 55n.

৮৮. Nathan, *Baharistan*, text, fol. 181a; trans., 1: 370.

৮৯. 'oid., text, fol. 183b; Trans., 1: 378.

৯০. Ibdi., text, fol. 184b; Trans., 1: 381.

৯১. Ibid.

মোগল প্রশাসনের সাথে নয়। এই সময়কালের উল্লেখ করে বুকানন-হ্যামিলটন বলেন, 'এই সময়ে জাতিটি সাধারণভাবে লাঙল গ্রহণ করেছিল এবং কোলিতাগণ (সনাতনধর্মী পুরোহিত) বাংলা ভাষা পড়তে পারতো এবং তার মাধ্যমে এতটুকু অন্তত বোঝা যায়, তারা বারংবার তা ব্যবহার করতে পারতো।'[৯২] সংক্ষেপে, সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে, কুচ সমাজের সংস্কৃতায়ন এতো বেশি মাত্রায় সংঘটিত হয়েছিল যে, সমাজের জন্য ব্যাপকভিত্তিক হুমকি সৃষ্টিকারী মোগল বাংলার উত্তর সীমান্তে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতি শুধুমাত্র টিকে থাকাটাই নিশ্চিত করেনি বরং সেই সাথে তা স্পষ্টতই শক্তিশালীও করেছিল।

পূর্ববঙ্গ : বিজয় ও সংস্কৃতির পরিবর্তন

ভাটি বা বাংলার পূর্বাঞ্চল বিজয়ে মোগল পদ্ধতিসমূহ পাশবিক শক্তির হুমকি বা ব্যবহার এবং শত্রুকে পক্ষত্যাগে প্ররোচিত করে উল্লেখযোগ্য পুরস্কারের ব্যবস্থা— পশ্চিম বা উত্তরবঙ্গে ব্যবহৃত পদ্ধতি থেকে ভিন্ন ছিল না। এর আদর্শ উদাহরণ হলো, ইসলাম খানের বদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বর্তমান কুমিল্লা-নোয়াখালি অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ভুলুয়ার *জমিদারি* অন্তর্ভুক্তকরণ। ১৬১১ সালের দিকে চার হাজার অশ্বারোহী, তিন হাজার গাদাবন্দুকধারী এবং পঞ্চাশটি হাতির একটি বাহিনী রাজা অনন্ত মানিকের এলাকায় এই নির্দেশ নিয়ে প্রবেশ করে যে, তিনি যদি আত্মসমর্পণ করেন তবে রাজকীয় আনুকূল্যের আশা করতে পারেন; আর যদি প্রতিরোধ করেন, তবে তাঁকে বন্দী হিসেবে কিংবা তাঁর কর্তিত মাথা ঢাকায় পাঠানো হবে।[৯৩] কুমিল্লা অঞ্চলে অগ্রসর হয়ে সেনাবাহিনী সহজেই বর্তমান চাঁদপুরের নিকটস্থ রাজার অন্যতম একটি দুর্গ দখল করে এবং মোগল সৈন্যরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পল্লী এলাকায় লুঠপাট চালায় এবং বশ্যতা স্বীকারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের হত্যা বা বন্দী করে কৃষকদের আতংকিত করে তোলে।[৯৪] অন্যান্য স্থানের মতো এখানেও সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক মূলা ঝোলানোর নীতিতে অটল থাকে। মোগল কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার পর রাজার মুখ্যমন্ত্রীকে মধ্যমানের রাজকীয় পদবির প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং তা গৃহীত হয়।[৯৫] তবে তার সামরিক ও রাজনৈতিক অবস্থান অবমূল্যায়ন হয়ে যায়, কারণ অনন্ত মানিক নিজেই শেষ পর্যন্ত তার এলাকা ত্যাগ করলে তা মোগল বাংলায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

৯২. Buchanan-Hamilton MSS., "List of Papers," bk.2, 97.

৯৩. Nathan, *Baharistan*, text, fol. 40b; trans., 1:97.

৯৪. "বা তাখত-ই নাওয়াতি রাফতা, রায়া-রা বা খুদ ইল মিগারদানিদ ওয়া হার কি রাজু নামি-নুমাদ মিকুশতান্দ ওয়া আসির মিসাখতান্দ।" Ibid., text, fol. 40b; Trans., 1: 97.

৯৫. Nathan, *Baharistan*, text, fol. 41a; trans., 1: 98.

প্রায় একই সময়ে, পূর্ববঙ্গের 'বার ভুঁইয়ার' অন্যতম পূর্ব বাকেরগঞ্জের বাকলার রাজা রাম চন্দ্রও একইভাবে লীন হয়ে যান। তাঁকে ঢাকায় আটক রাখা হলেও একটি নৌবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সাবেক রাজাকে তাঁর সাবেক ভূখণ্ডের একটি বড় অংশ বহাল রাখতে দেওয়া হয় এবং তাঁর অবশিষ্ট ভূখণ্ড মোগল কালেকটর ও অন্যান্য *জায়গিরদারদের* কাছে হস্তান্তর করা হয়।[৯৬] আর আমরা দেখেছি, বদ্বীপের মধ্য ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে-বর্তমান ঢাকা, মোমেনশাহি ও সিলেট জেলাসমূহ ঈশা খানের পুত্র মূসা খান ইতিমধ্যেই পরাজিত হয়ে মোগল বাহিনীতে অঙ্গীভূত হয়ে গেছেন এবং ১৬১২ সালে প্রদেশটির মোগল কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে শেষ প্রধান প্রতিরোধকারী উসমান খান নিহত হন এবং তাঁর আফগান সৈন্যারা মোগল বাহিনীতে একীভূত হয়ে যায়।

অবশ্য, উত্তর সীমান্ত অঞ্চলের জনগণের বিপরীতে অনন্ত মানিকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সময়ে পল্লী সম্প্রদায়ের উপর লুণ্ঠন চালানো সত্ত্বেও পূর্ব বাংলার মানুষ মোগল কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ গড়েনি। বরং অঞ্চলটির জনগণের অধিকাংশই রাজনৈতিক বশ্যতা স্বীকারের পর ধীরে ধীরে নতুন ইসলামী পরিচিতি গ্রহণ করে। ঢাকা অঞ্চলে ১৫৯৯ সালের মতো আগাম সময়েও মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা জানা যায়, যখন অঞ্চলটির শক্তির ভারসাম্য ঈশা খানের থেকে রাজা মানসিংহের কাছে চলে যায়। এ ধরনের সম্প্রদায় ১৬৩০-এর দশকে নোয়াখালি অঞ্চলে এবং ১৬৬০-এর দশকে রংপুর অঞ্চলে (দেখুন পূববর্তী 'ইসলামে গণ-ধর্মান্তর' অধ্যায়ের শেষ পৃষ্ঠাগুলোতে) দেখা যায়। ৩ নম্বর মানচিত্রে দেখা যায়, ১৮৭২ সালের সর্বপ্রথম নির্ভরযোগ্য আদমশুমারি অনুযায়ী, বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে ৬০ থেকে ৯০ শতাংশ জনসংখ্যা নিয়ে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং বিপরীতক্রমে পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে সার্বিক বিবেচনায় ৪০ শতাংশে নেমে আসলেও বদ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে তা আসলে শূন্যে দাঁড়ায়।

স্পষ্টত, ইসলামীকরণের নজিরবিহীন ঘটনা পূর্ববঙ্গের সাংস্কৃতিক বিবর্তন বদ্বীপের অবশিষ্টাংশ কিংবা ভারতের অবশিষ্টাংশের চেয়ে মৌলিকভাবে ভিন্ন থাকার কথা বলে। যদিও 'স্থানীয়দের' ধর্মান্তরিত না করার ব্যাপারে মোগলরা পশ্চিম দিকের চেয়ে পূর্বদিকে ভিন্ন কোন নীতি অবলম্বন করেনি। এমন কিছুও দেখা যায় না, যাতে প্রমাণিত হয়, পশ্চিমের তুলনায় পূর্ববঙ্গে সূফী সাধকরা অধিক ধার্মিক ছিল, ধর্ম প্রচারকরা ছিল অনেক বেশি উদ্দীপ্ত, সৈনিকরা ছিল অনেক বেশি উৎসাহী। তাই এতো ভিন্ন একটি ঘটনা যখন ঘটলো, তখন পূর্ববঙ্গে এই অঞ্চলের মধ্যে সার্বিকভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন উপাদান বা শক্তি অবশ্যই কাজ করেছিল। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা এই প্রশ্নের জবাব বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান করবো।

৯৬. Nathan, *Baharistan*, text, fol. 53a; trans., 1: 131-32.

৮ ইসলাম এবং পূর্ববঙ্গের কৃষিব্যবস্থা

নিরঞ্জন (আল্লাহ) আজ্ঞা হৈছে কৃষি হৈব ভাল।
—আদমের প্রতি জিবরাইল
সৈয়দ সুলতানের 'নবী বংশ' (আনুমানিক ১৫৮৪)

নদীপথের পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

মোগল আমলে পূর্ববাংলা তথা 'ভাটির' একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল পশ্চিম বাংলার তুলনায় এখানকার অনেক বেশি হারে কৃষিজ উৎপাদনশীলতা এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধি। চূড়ান্তভাবে এটি আসে বাংলার নদীব্যবস্থার পূর্বগামিতার দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনের কারণে, যার মাধ্যমে উর্বর পলি সঞ্চিত হয়ে ধান চাষ সম্ভব করে তোলে। ভূগোলবিদগণ সাধারণত বাংলার নদীসমূহের গতিপথের ব্যাখ্যা হিসেবে নদীবাহিত পলির প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার কথা বলে থাকেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী প্রাগৈতিহাসিককালে পুরো বদ্বীপই ছিল সাগরের গর্ভে এবং গঙ্গা নদী বর্তমানের উত্তর-পশ্চিম কোণে (আধুনিক মুর্শিদাবাদ জেলা) সাগরের সাথে মিশেছিল এবং ব্রহ্মপুত্র নদী মিশেছিল সর্ব উত্তরে (আধুনিক রংপুর জেলায়)। বর্তমানকালে ভাগিরথি নদী গঙ্গার মূল প্রবাহ উপকূলে বহন করার প্রেক্ষাপটে সাগর সঙ্গমে পলিমাটি ও আবর্জনা জমে জমে একটি ছোট বদ্বীপ গড়ে উঠতে থাকে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র উভয় নদীই অব্যাহতভাবে পলি সঞ্চয় করে বদ্বীপকে ধীরে ধীরে উপকূলের দিকে আরো ঠেলে দিতে থাকে।

কিন্তু বৃহৎ নদীগুলো বন্যাপ্রবণ সমভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময়ে বহন করা সব পলি সাগরে ফেলে দেওয়ার মতো যথেষ্ট দ্রুত না হওয়ায় নিজের তলদেশেই প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করে। এসব পলিমাটি যখন নদীর তলদেশ পার্শ্ববর্তী এলাকার চেয়ে উঁচু হয়ে পড়ে, তখন পানিরাশি তাদের সাবেক স্থান ত্যাগ করে নতুন পথে প্রবাহিত হতে থাকে।[১] এ কারণেই গঙ্গার প্রধান প্রবাহ এক সময়ে

১. দেখুন R.K Mukherjee, *The Changing Face of Bengal: A Study of Riverine Economy* (Calcutta: Univeristy of Calcutta, 1938), 3-10; S.C. Majumdar, *Rivers of the Bengal Delta* (Calcutta: University of Calcutta, 1942), 65-72. W.H. Arden Wood, "Rivers and Man in the Indus-Ganges Alluvial Plain," *Scottish Geographical Magazine* 40, no. 1 (1924); 9-10; C. Strickland, *Deltaic Fromation, with Special Reference to the Hydrographic Processes of the Ganges and the Brahmaputra* (Calcutta: Longmans, Green, 1940),

বর্তমানের ভাগিরথি-হুগলি চ্যানেলে প্রবাহিত হলেও তা পরে পরিবর্তিত হয়ে ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, গড়াই-মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ এবং পরিশেষে বর্তমানের পদ্মা-মেঘনা পথে প্রবাহিত হতে থাকে। কাননগোপাল বাগচি লিখেন, 'পশ্চিমের শাখাগুলো যখন সক্রিয় ছিল, তখন সম্ভবত পূর্বেরগুলোর সবেমাত্র শুরু হয়েছে এবং পূর্বদিকের নদীগুলো যখন বেগবান হতে থাকলো, তখন পশ্চিমেরগুলো মরে যেতে শুরু করেছে। সময় ও অবস্থাভেদে বদ্বীপ গঠনের সক্রিয় ধাপটি তাই দক্ষিণ-পূর্বে সরে গেল তথা বর্তমানের মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও যশোরের নদীগুলো শুকিয়ে বা মরে গিয়ে ফরিদপুরের গোয়ালন্দ হলো।[২] বদ্বীপটির সক্রিয় অংশটি পূর্বদিকে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় বদ্বীপের পশ্চিমের অঞ্চলগুলো নতুন পানি ও পলির প্রবাহ বঞ্চিত হয়ে ধীরে ধীরে মৃতের দিকে যেতে লাগলো। বদ্ধ পানিতে সৃষ্ট রোগবালাই স্থানীয় বসতিগুলোতে ছড়িয়ে পড়ায় পরিত্যক্ত প্রবাহগুলোর তীরবর্তী নগর ও জনপদগুলো বিরান হয়ে পড়লো। ফলে বদ্বীপটি সার্বিকভাবে আস্তে আস্তে সভ্যতার পূর্বগামিতার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকলো, কারণ অভিযাত্রীরা প্রতিবেশগতভাবে অধিকতর সক্রিয় অঞ্চলের আদিম জঙ্গল কেটে কৃষিকাজের জন্য একটি বিস্তৃত অঞ্চলের সৃষ্টি করতে থাকে। ভূগোলবিদ আর. কে. মুখার্জি বলেন, পঞ্চদশ শতাব্দীর পর থেকে এক সময়ের অপ্রবেশযোগ্য জঙ্গলের অর্ধেকে তাল গাছের চমৎকার বাগান আর আন্দোলিত ধানক্ষেতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত এখানকার মানুষ পুনরুদ্ধারের কাজ, জঙ্গলে, বাঘ, বন্য মহিষ, শূকর ও কুমিরের সাথে যুদ্ধ করেছে।[৩] যদিও মুখার্জি বর্ণিত প্রক্রিয়াটি প্রকৃতপক্ষে পঞ্চদশ শতাব্দীর অনেক আগেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু ষোড়শ শতকের শেষদিকের পর তা

104; Kanangopal Bagchi, *The Ganges Delta* (Calcutta: University of Calcutta, 1944), 33. ভৌগোলিক এবং ভূতত্ত্ববিদগণ বাংলার নদীব্যবস্থার গতিশীলতার মৌলিক কারণ সম্পর্কে একমত নন। ভৌগোলিকগণ যখন নদীর গতিপথের পরিবর্তনের পেছনে চালিকাশক্তি হিসেবে পলিসঞ্চয়কে দায়ী করেছেন, তখন ভূতত্ত্ববিদগণ সাধারণভাবে পূর্ববঙ্গের ভূভাগে আবরণ সৃষ্টিকারী বিশেষ তৎপরতাকে চিহ্নিত করেছেন। এই মত অনুযায়ী, উক্ত আবরণের কারণেই উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র এলাকা উঁচু হয়েছে এবং সিলেট অববাহিকায় নিম্নাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে, যার পরিণতিতে, পূর্ব রংপুর হতে পূর্ব বরিশাল পর্যন্ত দক্ষিণ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে 'ফল্ট লাইনের' সৃষ্টি হয়েছে, আর এজন্য বাংলার প্রধান প্রধান নদীগুলো বিশেষভাবে আকর্ষিত হয়েছে। দেখুন J. Fergusson, "Delta of the Ganges," *Journal of the Geological Society of London* 19 (1863): 321-54; F.C. Hirst, *Report on the Nadia Rivers, 1915* (Calcutta, 1916); and James P. Morgan and William G. McIntire, "Quanternary Geology of the Bengal Basin, East Pakistan and India," *Bulletin of the Geological Society of America* 70 (March 1959): 319-42.

২. Bagchi, *The Ganges Delta*, 58, See also N.D. Bhattacharya, "Changing Course of the Padma and Human Settlement," *National Geographic Journal of India* 24, nos. 1 and 2 (March-June 1978): 63-65.

৩. Mukherjee, *The Changing Face*, 137.

মানচিত্র ৫। বাংলার নদীসমূহের গতির পরিবর্তন, ১৫৪৮-১৭৭৯

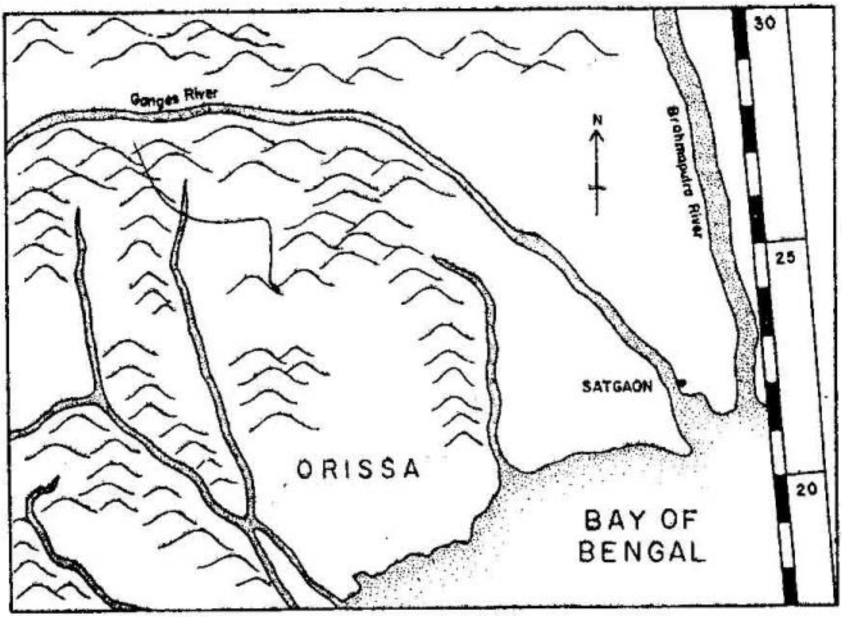

ক) ১৫৪৮ (গ্যাসটালডি)

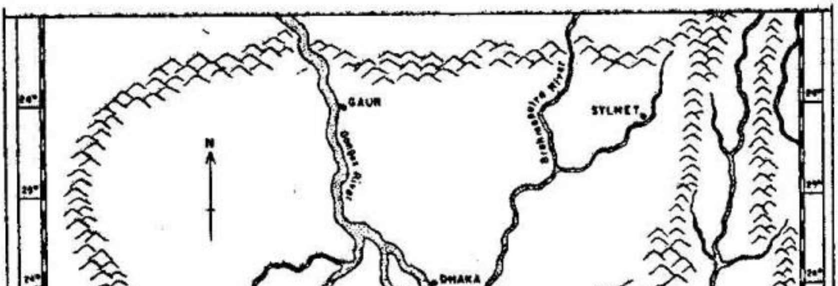

খ) ১৬১৫ (ডি বারোস)

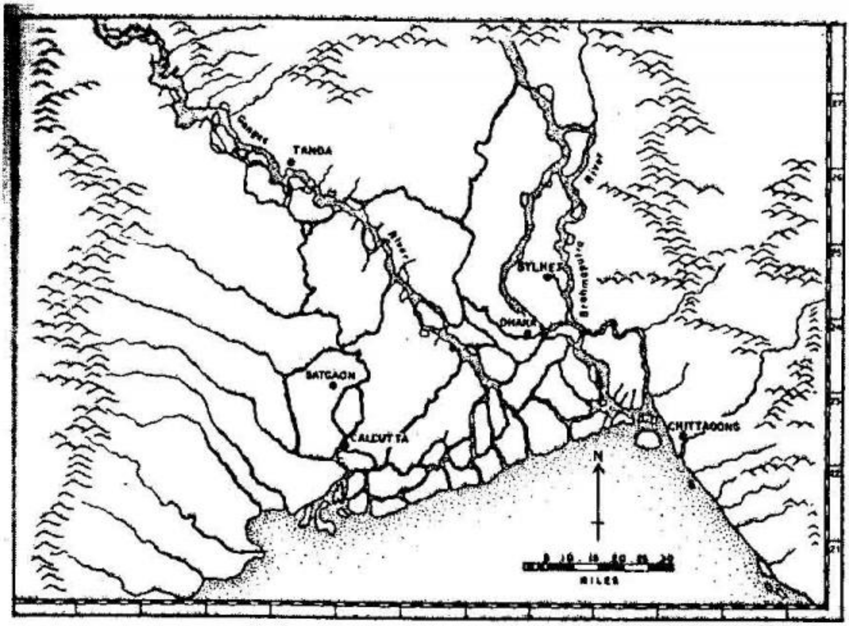

গ) ১৬৬০ (ভ্যান ডেন ব্রুক)

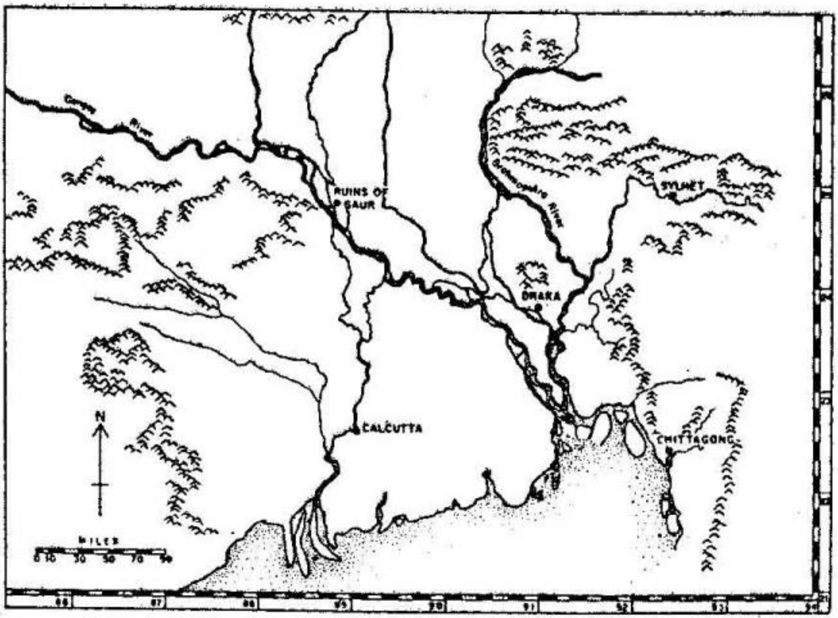

ঘ) ১৭৭৯ (রেনেল)

নাটকীয়ভাবে ব্যাপকতর হয়। সমসাময়িক ইউরোপীয়ান মানচিত্রগুলোতে দেখা যায়, এই সময়ে গঙ্গার ব্যাপক নদীব্যবস্থা পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলে তার সাবেক পথগুলো পরিত্যাগ করেছে এবং পদ্মার সাথে যুক্ত হয়ে প্রধান প্রবাহ পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্রে সরাসরি প্রবাহিত হয়েছে (দেখুন মানচিত্র ৫খ ও ৫গ)। ১৫৬৭ সালেই ভেনেশীয় পর্যটক সিজার ফেডেরিসি লক্ষ্য করেছেন, জাহাজগুলো পুরাতন গঙ্গার সাতগাঁও-এর উত্তরে তথা বর্তমানকালের পশ্চিমবঙ্গের ভাগিরথি-হুগলিতে চলাচল করতে পারে না।[৪] প্রায় একই সময়ে পলি জমে গঙ্গা ভরাট হয়ে যায় এবং গৌড়ের উজানের গতিপথগুলো পরিত্যক্ত হয়, পরিণতিতে সালতানাত আমলে গুরুত্বপূর্ণ রাজধানী, যা সম্প্রতি আকবরের বাহিনী জয় করেছে, এক মারাত্মক মহামারির কবলে পড়ে এবং বিরান হয়ে যায়। ১৫৭৪ সালে আবুল ফজল উল্লেখ করেন, আফগান রাজধানী টান্ডায় গঙ্গা নদী দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে: একটি শাখা সাতগাঁও-এর দিকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে এবং অপরটি পূর্বদিকে সোনারগাঁও ও চট্টগ্রামের দিকে।[৫] সপ্তদশ শতকে পূর্বদিকের শাখাটি দিয়ে ক্রমাগতভাবে বেশি পানি প্রবাহিত হতে থাকায় প্রথম শাখাটি অব্যাহতভাবে শুকিয়ে যেতে থাকলো এবং ১৬৬৬ সালে এই শাখাটি মোটের উপর জাহাজ চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়লো।[৬]

অবশ্য, পূর্বদিকে এই পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া হলো বিপরীত। গঙ্গার প্রধান প্রবাহ পদ্মানদী পথে এখন প্রবাহিত হতে থাকায় গঙ্গা-পদ্মা সম্মিলিত ব্যবস্থা মোগল সাম্রাজ্যের সাথে বাংলার রাজনৈতিক একীভূত হওয়ার একেবারে শুরুর সময়ে উত্তর ভারতের সাথে পূর্ববাংলার সংযোগ সাধন করে দেয়। ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক একীভূতের অব্যাহতি পরপরই ঘটে অর্থনৈতিক একীভূত; পূর্ববঙ্গ ও উত্তর ভারতের মধ্যে সরাসরি নদী সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পূর্ববঙ্গের সামগ্রীর, বিশেষ করে বস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য, সীমান্ত থেকে রাজকীয় মহানগরীগুলোতে পরিবহন ব্যয় নাটকীয়ভাবে কমে যায়। একই সময়ে গঙ্গার প্রধান পলিরাশি এখন সরাসরি পূর্বদিকে গিয়ে বার্ষিক বন্যার সময়ে পূর্বাঞ্চলে বদ্বীপের আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে সঞ্চয় করতে লাগলো। এর ফলে বৃহত্তর নদীর তীর জুড়ে ইতিমধ্যেই সূচিত ধান চাষ আরো ব্যাপকতর হলো এবং সেই সাথে তখনো লাঙলের আওতায় আসেনি এমন সব অভ্যন্তরভাগও ব্যাপক চাষাবাদের অধীনে এসে গেল। ফলে পূর্ববঙ্গ কৃষি ও জনসংখ্যার এমন এক প্রবৃদ্ধিতে পৌঁছে গেল, যা পশ্চিমবঙ্গে কখনো সম্ভব হয়নি। এসব পরিবর্তন সর্বোপরি ভূমি রাজস্ব দাবির *(জমা)* মোগল সরকারি অংশের *(খালিসা)* পরিসংখ্যানে প্রতিফলিত হয়। যেহেতু রাজস্ব দাবি ভূমির আয়-সৃষ্টিকারী সামর্থ্যের সরকারি হিসাবের প্রতিনিধিত্ব করে

৪. Federici, "Extracts," 113,তিনি লেখেন, "নদীটি খুবই সরু এবং পানি সামান্য।"

৫. Ibid., Abul Fazl Allami, *Akbar-nama*, Trans. 3: 153; text, 3: 109.

৬. Jean Baptice Tavernier, *Travels in India*, ed. V. Ball (London: Macmillan, 1889; reprint, Lahore: Al-Biruni, 1976), 1: 125.

টেবিল ৪ : বাংলার রাজস্ব দাবির পরিবর্তন, ১৫৯৫-১৬৫৯

রাজস্ব দাবি (রুপিতে)

চতুর্থাংশ	১৫৯৫	১৬৫৯	পরিবর্তনের হার
উত্তর-পশ্চিম	১,৩৭৪,৮৫৯	১,১৯০,০৬৪	-১৩%
দক্ষিণ-পশ্চিম	২,২৫৮,১৩৮	৩,৪৮২,১২৭	+৫৪%
উত্তর-পূর্ব	১,৩৭৯,৫২৯	২,৭২০,১১৫	+৯৭%
দক্ষিণ-পূর্ব	১,৩৪৬,৭৩০	২,৯২১,৩১৪	+১১৭%
মোট	৬,৩৫৯,২৫৬	১০,৩১৩,৬২০	+৬২%

উৎস: ১৫৯৫ সালের জন্য আবুল ফজল আল্লামির আইন-ই-আকবরি, যা দেওয়া হয়েছে Shireen Moosvi, The Economy of the Mughal Empire, c. 1595: A Statistical Study, (Delhi: Oxford University Press, 1987), এ, ২৬-২৭। ১৬৫৯ সালের জন্য দাসতুর আল-আমল-ই আলমগিরি (British Library MS, Add. 6599), fols. 120a-121a.

মন্তব্য: দামের হিসাবে পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেওয়া হয়েছিল, রুপির মূল্যমানে তা রূপান্তরিত করতে হলে অবশ্যই ৪০ দিয়ে ভাগ করতে হবে। উত্তর-পশ্চিম চতুর্থাংশের এলাকাগুলোর মধ্যে ছিল পুর্ণিয়া, তাজপুর, গৌড় (লক্ষ্ণৌতি), পাঁজরা ও বারবাকাবাদের সরকারসমূহ; দক্ষিণ-পশ্চিম চতুর্থাংশের এলাকাগুলোর মধ্যে ছিল টাণ্ডা (উদামপুর), শরিফাবাদ, সাতগাঁও, সুলায়মানাবাদ ও মান্দারান সরকারসমূহ; উত্তর-পূর্ব চতুর্থাংশের এলাকাগুলোর মধ্যে ছিল ঘোড়াঘাট, বাজুহা ও সিলেট সরকারসমূহ; দক্ষিণ-পূর্ব চতুর্থাংশের এলাকাগুলোর মধ্যে ছিল মাহমুদাবাদ, খলিফাতাবাদ, ফতেহবাদ, বাকলা, সোনারগাঁও ও চাটগাঁও সরকারসমূহ। পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ সরকারই ১৫৯৫ সালে মোগল প্রশাসনের বাইরে ছিল, তবে রাজকীয় রাজস্ব কর্মকর্তারা স্পষ্টত বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলের সেসব জেলার চিত্র থেকে, যা বর্তমানে হারিয়ে গেলেও তখন তাদের কাছে তা জানা ছিল, হিসাব বের করেছিলেন। ১৬৫৯ সাল নাগাদ চট্টগ্রাম (চাটগাঁ) ছাড়া বাংলার পুরোটাই মোগল প্রশাসনের আওতায় আসে এবং উক্ত স্থানটি ছিল আরাকানি অধিকারে, যা ১৬৬৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত মোগল নিয়ন্ত্রণে আসেনি। প্রাদেশিক রাজস্ব কর্মকর্তারা তবুও চট্টগ্রামের জন্য চলতি রাজস্ব লাভ করতেন এবং তা পুরো প্রদেশের রাজস্ব দাবিতে অন্তর্ভুক্ত করতেন।

এবং যেহেতু বাংলার প্রধান আয়-সৃষ্টিকারী তৎপরতা ছিল শ্রমঘন শস্য ধান চাষ, তাই এসব পরিসংখ্যান বদ্বীপের অভ্যন্তরে বিভিন্ন খাতে জনসংখ্যার তুলনামূলক ঘনত্বের পরিবর্তনের প্রমাণও দিচ্ছে।

৪ নম্বর টেবিলটি বদ্বীপটিকে চারটি ভাগে ভাগ করছে এবং মোগল শাসনের প্রথম শতাব্দীতে প্রতিটি অংশে রাজস্ব দাবির পরিবর্তন প্রদর্শন করছে। এতে দেখা যায়, ১৫৯৫ ও ১৬৫৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বদ্বীপটির উত্তর-পূর্বাংশে রাজস্ব দাবি ৯৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে বাংলার প্রতিবেশগত দিক থেকে সবচেয়ে সক্রিয় অংশ দক্ষিণ-পূর্ব চতুর্থাংশের রাজস্ব বৃদ্ধি পায় ১১৭ শতাংশ, অপরদিকে এ সময়ে প্রতিবেশগতভাবে অপেক্ষাকৃত, পুরাতন এলাকা দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার রাজস্ব দাবি মাত্র ৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। আর বদ্বীপটির সবচেয়ে মৃতপ্রায় এলাকা উত্তর-পশ্চিম

টেবিল ৫: বাংলায় জনসংখ্যার ঘনত্বের বৃদ্ধি, ১৮৭২-১৯৮১
জনসংখ্যা প্রতি মাইলে

চতুর্থাংশ	১৮৭২	১৯৮১	পরিবর্তনের হার
উত্তর-পশ্চিম	৫০৩	১৫৪৪	২০৭%
দক্ষিণ-পশ্চিম	৫৯৮	১৭০১	১৮৪%
উত্তর-পূর্ব	৪০৬	১৯৩৩	৩৭৬%
দক্ষিণ-পূর্ব	৫২৬	১৯৪১	২৬৯%

উৎস: H. Beverly, *Report on the Census of Bengal, 1872* (Calcutta: Secretariat Press, 1872), 6-9; Census of India, 1981 (New Delhi, 1985), Pt.II-A[I], "General Population Tables," section 2, 182-85; The Preliminary Report on Bangladesh Population Census, 1981, (Dacca: Bangladesh Secretariat, 1981), 2-3. উত্তর-পশ্চিম চতুর্থাংশের জেলাগুলোর মধ্যে ছিল ১৮৭২ সালে রংপুর, বগুড়া, পাবনা, দিনাজপুর, মালদহ, রাজশাহী ও মুর্শিদাবাদ। দক্ষিণ-পশ্চিম চতুর্থাংশের জেলাগুলোর মধ্যে ছিল বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনিপুর, হুগলি ও হাওড়া, চব্বিশ পরগনা ও নদীয়া। উত্তর-পূর্ব চতুর্থাংশের জেলাগুলোর মধ্যে ছিল মোমেনশাহি, সিলেট ও ঢাকা। দক্ষিণ-পূর্ব চতুর্থাংশের জেলাগুলোর মধ্যে ছিল যশোর (খুলনাসহ), ত্রিপুরা (কুমিল্লা), ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম।

বাঙলার রাজস্ব প্রকৃতপক্ষে ১৩ শতাংশ কমে যায়। বাংলার প্রজনন হারের আঞ্চলিক পরিবর্তনশীলতার এই প্রাথমিক প্রবণতার সঙ্গে আধুনিক সময়ে জনসংখ্যার উপাত্তের সাথে তুলনীয়।

৫ নম্বর টেবিলে প্রদর্শিত ১৮৭২ সাল থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যবর্তী শতাব্দীতে পূর্বার্ধে জনসংখ্যার ঘনত্ব গড়ে ৩২৩ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, অথচ পশ্চিমার্ধে এই গড় ছিল ১৯৬ শতাংশ।[৭] তাই সপ্তদশ শতকের রাজস্ব তথ্য এবং উনবিংশ ও বিংশ শতকের জনসংখ্যা তথ্য একটি গতিশীল জনসংখ্যাতাত্ত্বিক এমন সব সীমান্তের চিত্র তুলে ধরে, যেখানে দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ায় ভূমি উর্বরতা, ধান চাষ ও জনসংখ্যার ঘনত্ব সবই পশ্চিমের তুলনায় পূর্বে অনেক বেশি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭. বৃটিশ আমলে সমৃদ্ধি ও জনসংখ্যার গতিশীলতা উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকের জেলাগুলোর ভেতরেই লক্ষ্য করা যায়। তাই ১৮৮১ ও ১৯১১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ফরিদপুরের উত্তরাঞ্চলে যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৭ শতাংশ, সেখানে ফরিদপুরের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে তা ৫০ শতাংশ। ফরিদপুরের সেটেলমেন্ট রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, উত্তরের স্থবিরতা স্পষ্টতই নদী ও পানিপ্রবাহগুলোর মরে যাওয়া, যার পরিণতিতে মাটি হয় কম উর্বরা, উৎপাদিত সামগ্রীর পরিবহন হয়ে পড়ে অধিকতর কঠিন এবং আবহাওয়া হয়ে পড়ে অনেক বেশি অস্বাস্থ্যকর।--- শীত মওসুমে নদীগুলো হয়ে পড়ে নোংরা জলাশয়ের ফিতা; পুকুরের সংখ্যা গুটিকতেক এবং ভাল খাবার পানি থাকে না। কলেরার প্রাদুর্ভাব প্রায়ই দেখা যায় এবং অন্যান্য রোগবালাই মানুষের জীবন কেড়ে নেয়; ম্যালেরিয়া সর্বত্রই সবসময়ে দেখা যায় এবং মানুষের জীবনীশক্তি খুবই নিম্নমানের।" J.C. Jack, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the Faridpur District, 1904 to 1914* (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1916), 7.

ফলে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ নাগাদ দক্ষিণ ও পূর্ববাংলা এতো বেশি খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে লাগলো যে, প্রথমবারের মতো ধান একটি গুরুত্বপূর্ণ রফতানিকারক শস্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো। দুটি প্রধান সমুদ্রবন্দর পূর্বে চট্টগ্রাম এবং পশ্চিমে সাতগাঁও থেকে ভারত মহাসাগর দিয়ে পশ্চিমে গোয়া পর্যন্ত এবং পূর্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালাকা পর্যন্ত চাল রফতানি হতে লাগলো।[৮] এ ব্যাপারে চাল এখন সুতিবস্ত্রের সাথে যুক্ত হলো, অন্তত পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে যা ছিল বাংলার প্রধান রফতানি পণ্য এবং অন্তত দশম শতাব্দী থেকে অন্যতম পণ্য। ১৫৬৭ সালে সিজার ফেডেরিসি অভিমত প্রকাশ করেন, সন্দ্বীপ 'পৃথিবীর মধ্যে উর্বরতম দ্বীপ' হিসেবে গণ্য হতে পারে এবং কেউ সেখান থেকে 'এক বস্তা সরু চাল প্রায় বিনামূল্যেই' পেতে পারে।[৯] ২০ বছর পর ঈশা খান তখনো সোনারগাঁও-এ ক্ষমতাসীন, তখন রালফ ফিচ লিখেন, 'এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে তুলা ও চাল জমা হয় এবং তা ভারত, শ্রীলঙ্কা, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা ও অন্য আরো অনেক স্থানে পাঠানো হয়।'[১০] এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে মুগ্ধকর বর্ণনাটি এসেছে ফ্রানকোইস পাইরার্ডের নিকট থেকে। ১৬০৭ সালটি চট্টগ্রামে অবস্থান করে, যা তখনো মোগল নিয়ন্ত্রণের বাইরে স্বাধীন শাসকদের অধীনে ছিল, এই ফরাসি নাগরিক লিখেন,

এখানে প্রচুর পরিমাণে চাল আছে, যা সারা দেশে সরবরাহের পরও গোয়া ও মালাবারসহ ভারতের সর্বত্র এবং সেই সাথে সুমাত্রা, মালাক্কা এবং সান্দা দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র রফতানি করা হয়, এদের সবার জন্য বাংলা হলো লালনকারী মা, যে তাদের প্রাণরক্ষাকারী পুরো খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করে। তাই কেউ যদি সেখানে (অর্থাৎ চট্টগ্রামে) যায়, তবে প্রতিদিনই দেখবে ভারতের সকল স্থান থেকে অগণিত জাহাজ এই উদ্দেশ্যে আসছে।[১১]

মোগলদের অধীনে উদ্বৃত্ত চালের ব্যাপক রফতানি শুধু অব্যাহতই থাকেনি, বরং বেড়েছিল।[১২] সন্ন্যাসী মানরিক উল্লেখ করেছেন, প্রতিবছর শতাধিক জাহাজ চাল ও অন্যান্য খাদদ্রব্য বোঝাই হয়ে বাংলার বন্দর ত্যাগ করে সমুদ্রপথে বিদেশে রফতানির জন্য।[১৩] এবং পূর্বেকার পর্যবেক্ষকদের মতো মানরিকও স্থানীয় খাদ্যদ্রব্যের

---

৮. Subrahmanyam, "Notes," 268.

৯. Federici, "Extracts," 137.

১০. Ibid., 185.

১১. Francois Pyrard, *The Voyage of Francois Pyrard of Laval to the East Indies, the Maldives, the Moluccas and Brazil*, ed. and trans. Albert Gray (Hakluyt Society. 1st ser., nos. 76, 77, 80, 1887-90; reprint, New York: Burt Franklin., n.d.), 2: 327.

১২. S. Arasaratnam, "the Rice Trade in Eastern India, 1650-1740," *Modern Asian Studies* 22, no. 3 (1988): 531-49.

১৩. Manrique, *Travels* 1: 56. ১৬৬৫ সালে বারনিয়ার উল্লেখ করেন যে বাংলা "এতো বেশি ধান উৎপাদন করে যে তা শুধু আশেপাশে নয়, দূরবর্তী রাজ্যগুলোতেও সরবরাহ করা হয়। গঙ্গা দিয়ে

স্বল্প মূল্যে আবির্ভূত হয়েছেন।[১৪] যদিও ১৬৭০ সালের[১৫] দিকে পূর্বদিকে চাল রফতানি হ্রাস পেয়েছে তবুও নিম্নবঙ্গে পুরো সপ্তদশ শতক এবং অষ্টাদশ শতকেও তা সস্তা ও প্রচুর উৎপাদিত হতে থাকে, যা ১৭৬৩ সালে একজন ইংরেজ পর্যবেক্ষক লিখেন, 'তাদের খাবারের বৃহত্তর অংশ পূরণকারী এই শস্যটি প্রদেশটির নিম্নাংশে এতো বেশি উৎপাদিত হয় যে, তা প্রায়ই ঘটনাস্থলে এক ফারদিং-এ দুই পাউন্ড করে বিক্রি হয়।'[১৬]

সক্রিয় বদ্বীপের সম্প্রসারণের সাথে ধান উৎপাদনের সবচেয়ে উর্বরাক্ষেত্র ধীরে ধীরে পূর্বদিকে সরে যেতে থাকলেও অর্থকরী শস্যের উৎপাদন বিশেষ করে তুলা ও রেশম পুরো বদ্বীপ জুড়ে বিকশিত হতে থাকে। তুলা উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোর অবস্থান কেন্দ্রীভূত ছিল ঢাকার আশেপাশের এলাকা এবং উত্তরে কাশিমবাজার থেকে হুগলি হয়ে মালদহ ও দক্ষিণে মেদিনিপুরসহ একটি করিডোর পথে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত।[১৭] ১৫৮৬ সালে রালফ ফিচ উল্লেখ করেন, ঢাকার মাত্র ১৫ মাইল পূর্বে অবস্থিত সোনারগাঁও-এ 'সমগ্র ভারতের মধ্যে সুতার সেরা ও সূক্ষ্মতম বস্ত্র তৈরি হয়।'[১৮] এমনকি দূরবর্তী মধ্যএশিয়ায় সূক্ষ্ম মসলিন কাপড়কে বলা হতো *'ডাকা'*,[১৯] যা ছিল উত্তর ভারতের সাথে বাংলার রাজনৈতিক আত্মীকরণ এবং সেখানে ও তার বাইরেও তার বাজার সৃষ্টির পরিণাম।[২০] মোগল সংযোগের কারণে

তা পাটনা পর্যন্ত নেওয়া হয় এবং সমুদ্রপথে মেসোপটেমিয়া এবং *করমণ্ডলের* উপকূলের অন্যান্য বন্দরেও রফতানি করা হয়। এ ছাড়াও প্রধানত শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের মতো অন্যান্য দেশেও তা পাঠানো হয়। Bernier, *Travels in the Mogul Empire, AD 1656-68,* trans. Archibald Constable, 2d ed. (New Delhi: S. Chand & Co., 1968), 437.

১৪. Manrique, *Travels* 1: 54.

১৫. Om Prakash, *The Dutch East India Company and the Economy of Bengal, 1630-1720* (Princeton: Princeton University Press, 1985), 224-29.

১৬. Orme, *Military Transactions*, 2: 4.

১৭. বাংলার বস্ত্রশিল্পের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য দেখুন K.N. Chaudhuri, *The Trading World of Asia and the English East India Company, 1660-1760.* (Cambridge: Cambridge University Press, 1978) 248; and Irfan Habib, *An Atlas of the Mughal Empire* (Delhi: Oxford University Press, 1982), map 11B.

১৮. Ralph Fitch, "The Voyage of Master Ralph Fitch Merchant of London to Ormus, and so to Goa in the East India, to Cambaia, Ganges, Bengala ----," in Samuel Purchas, *Hakluytus Posthumus, or Purchas his Pilgrimes* (1625; Glasgow: James Mac Lehose and Sons, 1905), 10: 184.

১৯. Henry Yule and A. C. Burnell, *Hobson-Jobson: A Glossary of Colloquial Anglo-Indian Words and Phrases*, 2d ed., Eilliam Crooke (Delhi: Munshiram Manoharlal, 1968), 290.

২০. ১৬৪০ সালে মানরিক উল্লেখ করেন, "অধিকাংশ বস্ত্রই সুতায় তৈরি এবং তা এতো সূক্ষ্ম ও যত্ন সহকারে প্রস্তুত করা হয়, যা অন্যত্র দেখা যায় না। এই দেশে ৫০ থেকে ৬০ গজ লম্বা ও ৭ থেকে ৮ হাত প্রশস্ত, প্রান্তগুলোতে স্বর্ণ ও রূপা বা রঙিন রেশম দেওয়া সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও সবচেয়ে উন্নতমানের

রাজদরবারের বিলাস দ্রব্যসামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা পূরণে বাংলা একটি প্রধান উৎপাদকে পরিণত হয়। অপরিশোধিত রেশমের ক্ষেত্রে বিষয়টি বিশেষভাবে প্রযোজ্য, বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিমবাজারের আশেপাশের এলাকা ছিল পণ্যটি উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র।[২১]

বাংলার কৃষিজ ও শিল্পজ বিকাশ শুধুমাত্র প্রদেশটিতে মোগল শক্তির সুসংহত হওয়ার সাথে সাথে সূচিত হয়নি, সেই সাথে স্থল সামুদ্রিক বাণিজ্যে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে আরো ঘনিষ্ঠভাবে বাংলাকে আবদ্ধ করে। আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি, ত্রয়োদশ শতকে বদ্বীপে মুসলিম বিজয়ের ফলে ভারত মহাসাগরীয় বাজারে বাংলার বস্ত্রসম্ভারের রফতানি বৃদ্ধি পেয়েছে।[২২] পরে, সালতানাতের আমলের শেষদিকে পর্তুগীজ বণিকরা বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে এবং ১৫৩০-এর দশকে চট্টগ্রাম ও সাতগাঁও উভয় স্থানেই বাণিজ্যিক কেন্দ্র স্থাপন করে। ষোড়শ শতকের শেষ দুই দশকে মোগলরা যখন বদ্বীপের কেন্দ্রে প্রবেশ করছিল, তখন পর্তুগীজরা হুগলিতে (সাতগাঁও-এর ভাটিতে) প্রধান বন্দর প্রতিষ্ঠা করেছে, চট্টগ্রামে তাদের সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে, ঢাকায় ও এর আশেপাশে বাণিজ্যিক উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। পর্তুগীজরা বাণিজ্য থেকে এশিয়ান বণিকদের উচ্ছেদ করেনি, প্রায়ই হয়েছিল বলে যা অনুমান করা হয়,[২৩] ষোড়শ শতকে ইউরোপীয়ান বণিকদের আবির্ভাবে অবশ্যই বাঙলার শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করেছিল এবং পরিণতিতে সেসব পণ্যের স্থানীয় উৎপাদন বেড়ে গিয়েছিল।

সপ্তদশ শতকের শুরুতে, বাংলার সমুদ্র নগরীগুলোতে ইউরোপীয়ান বণিকদের প্রাধান্যের প্রেক্ষাপটে ওলন্দাজ ও ইংরেজ বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলো ধীরে ধীরে অতিবিস্তৃত পর্তুগীজদের স্থানচ্যুত করতে থাকে। ১৬৩৫ সালে শাহজাহান কর্তৃক বাংলায় বাণিজ্য করার সনদ পেয়ে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পরের বছরই হুগলিতে একটি বাণিজ্যকেন্দ্র চালু করে। কোম্পানিটি ১৬৫০ সালে বাঙালি সরবরাহকারীদের নিকট থেকে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড কাঁচা রেশমের অর্ডার দেয় এবং চার বছর পর এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় দু লাখ পাউন্ড।[২৪] সপ্তদশ শতকের শেষ নাগাদ কাঁচা সিল্ক ও

মসলিন তৈরি হয়। এসব মসলিন আসলেই এতো সূক্ষ্ম যে, ব্যবসায়ীরা দুই বিঘত লম্বা বাঁশের ফাঁকা জায়গায় তা পুরে নিরাপদে পুরো কারাজানে (খুরাশান), পারস্য, তুরস্ক ও অন্য অনেক দেশে নিয়ে যায়।" Manrique, *Travels* 1: 56-57.

২১. উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৬৫৫ সালে আগ্রার ব্যবসায়ীগণ কাসিমবাজার থেকে ছয় হাজার বেল ক্রয় করে এবং তা রাজদরবারে রফতানি করে, দুই বছর পর ওলন্দাজরা এর অর্ধেক ক্রয় করেছিল। *Generalen missiven*, 2: 795; 3: 101.

২২. See pp. 96-97.

২৩. Subrahmanyam, "Notes," 265-89.

২৪. Sushil Chaudhury, *Trade and Commercial Organization in Bengal, 1650-1720* (Calcutta: Firma K.L.M., 1975), 178-79. ১৬৫২ সালে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া

সুতিবস্ত্রের রফতানি এতো দ্রুত বৃদ্ধি পায় যে, বাংলা সমগ্র এশিয়ার মধ্যে ইউরোপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক সরবরাহকারীতে পরিণত হয়।[২৫] তবে এই শিল্প-উৎপাদনের ব্যাপক বৃদ্ধি শুধুমাত্র ইউরোপের একার সম্প্রসারণের কারণে হয়নি। ১৭৬০-এর দশক পর্যন্ত সুস্পষ্ট প্রমাণে দেখা যায়, এশিয়ান বণিকরা-বিশেষ করে গুজরাটি, আরমেনিয়ান ও পাঞ্জাবি-ইউরোপিয়ানদের চেয়ে বেশি পরিমাণে বাংলার বস্ত্র সংগ্রহ করেছে এবং তা পুরো দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে রফতানি করেছে।[২৬]

শিল্প-উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির একটি পরিমাণ ছিল প্রদেশের বাইরে থেকে, ইউরোপীয়ান বা এশিয়ান উভয় বণিকদের আনা, প্রচুর পরিমাণে রৌপ্যের আগমন। ১৫১৬ সালে বাংলার জাহাজগুলো বার্মায় বস্ত্র সামগ্রী রফতানি করে বদ্বীপে প্রধানত রূপা নিয়ে ফিরে আসে।[২৭] এবং ১৫৫০-এর দশকে পর্তুগীজরা দেখতে পায়, বাংলায় তারা এতো সম্পদ পারাপার করছে যে, বাংলা ও মালাক্কার মধ্যে জাহাজ চলাচল মওসুমে গোয়ায় রৌপ্য মুদ্রার মূল্যমানে প্রকৃতপক্ষে উঠানামা করছে।[২৮] সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আমরা এবিষয়ে নিখুঁত চিত্র পাই। ডাচরা একই বার্ষিক গড়ে ১৬৬০ এর দশকে ১.২৮ মিলিয়ন ফ্লোরিন এবং ১৭১০-এর দশকে ২.৮৭ মিলিয়ন

কোম্পানির কর্মকর্তাদের লিখিত ভাষ্যে দেখা যায় যে, বাংলায় কাঁচা রেশম এতো বেশি পাওয়া যায় যে, শুধুমাত্র কাসিমবাজারেই এই পণ্যটিতে তাদের দশ টন স্বর্ণ বিনিয়োগ করা সম্ভব বলে উল্লেখ করে বলেছেন, স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এ ধরনের ক্রয়ে শুধুমাত্র রৌপ্য বা স্বর্ণই গ্রহণ করে। *Generalen missiven*, 2: 622.

২৫. Prakash, *The Dutch East India Company 75*. ওলন্দাজরা বাংলা থেকে যেসব পণ্য রফতানি করতো তার মধ্যে প্রধানত ছিল কাঁচা রেশম ও সুতি বস্ত্র, এরপর ছিল সোরা ও আফিম। ১৬৭৫-৭৬ সালে ডাচ রফতানির প্রায় ৪০ শতাংশ ছিল রেশম, ১৭০১ ও ১৭০৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে তা হয় ২৯ শতাংশ। একই সময়ে বাংলার বস্ত্র রফতানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২২ ও ৫৪ শতাংশ। Ibid., 72.

২৬. Sushil Chaudhury, "The Asian Merchants and Companies in Bengal's Export Trade, Circa mid-Eighteenth Century" (Paper Presented at the International Conference on "Merchants, Companies, and Trade" held at the Maison des Sciences de l'homme, Paris, May 30-June 2, 1990). See also Sushil Chaudhury, *Pre-Modern Industries and Maritime Trade in South Asia: Bengal in the Dirst Half of the Eighteenth Century*, chs. 7 and 8 (forthcoming).

২৭. Subrahmanyam, "Notes," 269.

২৮. Ibid., 279. ১৬২৬ থেকে ১৬৩৫ সালের সময়কালে বাংলার (পাটনাসহ) রাজকীয় টাকশালগুলোতে বছরে আনুমানিক ৮৫.৭৬ মেট্রিক টন রৌপ্যমুদ্রা মুদ্রণ করা হয়, যা গুজরাট, উত্তর-পশ্চিমের (লাহোর, মুলতান, থাট্টা, কাবুল, কান্দাহার) এবং মধ্য প্রদেশগুলোর টাকশালের উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যায়। Shireen Moosvi, *The Economy of the Mughal Empire, c. 1595: A Statistical Study* (Delhi: Oxford University Press, 1987), 357-61. এই সময়টা ছিল বাংলায় পর্তুগীজ বাণিজ্যের পতনের পর এবং ডাচ ও ইংলিশদের সেখানে আগমনের পূর্বে, তাই রূপার একটি বড় অংশ সম্ভবত নতুন সীমান্ত প্রদেশটিতে মোগল জনশক্তি ও অস্ত্রের সাথে এসেছিল।

ফ্লোরিন মূল্যমানের সম্পদ আমদানি করে।[২৯] এই হিসাবের সাথে অবশ্যই ১৬৫১ সালে হুগলিতে একটি বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনকারী ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমদানি যোগ করতে হবে। এই দুই কোম্পানি ১৭০৯ ও ১৭১৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে একত্রে বাংলায় বছরে গড়ে ৪.১৫ মিলিয়ন রুপির মূল্যমানের, যার মধ্যে ৮৫ শতাংশই ছিল রৌপ্য, জাহাজে করে বাংলায় আনে।[৩০] বাঙালি এজেন্ট, বণিক বা তাঁতিদের অগ্রিম হিসাবে প্রদত্ত এসব সম্পদ আঞ্চলিক অর্থনীতিতে আত্মস্থ হয়ে ইতিমধ্যেই প্রচলিত রৌপ্য মুদ্রার বিদ্যমান মজুতের সাথে যুক্ত হতো।[৩১] অধিকন্তু এশিয়ান বণিকদের স্থলপথে রৌপ্য আমদানি বদ্বীপে মোগল যুগের একেবারে শেষ সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।[৩২] অর্থনীতিবিদগণ অনেক আগে থেকেই আঞ্চলিক অর্থনীতিতে অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধিতে মুদ্রাস্ফীতির বিষয়টি অনুধাবন করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ষোড়শ শতকে মেক্সিকো থেকে স্পেনে ব্যাপক সম্পদের আমদানি উক্ত দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতিতে অবদান রেখেছিল বলে ধারণা করা হয়।[৩৩] ষোড়শ শতকের শেষদিকে এবং সপ্তদশ শতকে মোগল ভারতও অর্থ সরবরাহে একই ধরনের বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তবে স্পেনের দশ বা বিশ বছর পর দেখা যায়, আমেরিকার রৌপ্য খনি থেকে আহরিত সম্পদ ইউরোপে যাওয়ার পর তা ভারতে পুনঃ রফতানি হয়েছে।[৩৪] অধিকন্তু এমন প্রমাণও রয়েছে, স্পেনের মতো মোগল ভারতেও রূপার বৃদ্ধিতে সাম্রাজ্যে অন্তত পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে ভোক্তা মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে।[৩৫]

---

২৯. Prakash, *The Dutch East India Company* 249.

৩০. Om Prakash, "Bullion for Goods: International Trade and the Economy of Early Eighteenth Century Bengal," *Indian Economic and Social History Review* 13, no. 2 (April-June 1976): 162-63.

৩১. Chaudhury, *Trade and Commercial Organization, 100-125.*

৩২. ইংরেজ ব্যক্তিত্ব লুক স্ক্রাফটন (Luke Scrafton) ১৭৬০ সালে লিখেন, "শেষদিকের বছরগুলোর পূর্ব পর্যন্ত সাধারণভাবে এশিয়ার সমস্ত এলাকা থেকে এবং একইসাথে বিশেষভাবে হিন্দুস্তানের বাকি অংশ থেকে অবিশ্বাস্য সংখ্যক বণিক, অনেক সময়ে হাজার হাজারে দল বেঁধে প্রতিবছর বাংলায় আসতো এবং এসব প্রদেশের সামগ্রী ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ বা হুন্ডি ছাড়া বলতে গেলে অন্য কিছুই আনতো না।" Scrafton, *Reflections on the Government of Indostan* (London, 1760), 20. Cited in Sushil Chaudhury, "The Asian Merchants and Companies in Bengal's Export Trade," 18.

৩৩. See Earl J. Hamilton, *American Treasure and Price Revolution in Spain, 1501-1652* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1934; reprint, New York: Octagon Books, 1965), 283-306.

৩৪. Aziza Hasan, "The Silver Currency Output of the Mughal Empire and Prices in India during the 16th and 17th Centuries," *Indian Economic and Social History Review* 6, no. 1 (March 1969): 85-116.

৩৫. গুজরাটে সপ্তদশ শতকের প্রথম তৃতীয়াংশে অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধির সাথে সাথে নীল ও চিনির মূল্য বাড়ে, যেমনটি উত্তর ভারতে ১৫৯৫ থেকে ১৬৬৯ সালে শস্যের ক্ষেত্রে হয়েছিল। Ibid., 104-10.

কিন্তু সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে রূপার আমদানি বৃদ্ধির সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তা ভোক্তা মূল্যে সে ধরনের মুদ্রাস্ফীতির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি, এ সময় জুড়ে তা স্থিতিশীলই থাকে।[৩৬] এর কারণ ব্যাখ্যা করা যায় এইভাবে যে, সমতার সৃষ্টি হতে পারে যদি মুদ্রা বা পিণ্ডাকারে বাইরে থেকে আসা প্রবাহ বর্ধিত রাজস্ব আকারে ঠিক একই পরিমাণে বাঙলা থেকে উত্তর ভারতে চলে গিয়ে থাকে। এটাও সত্যি যে, প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ ১৬৫৯ থেকে ১৭২২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে ভূমি রাজস্ব দাবি বৃদ্ধি করেছে।[৩৭] কিন্তু এই সময় জুড়ে দিল্লীতে পাঠানো প্রকৃত রাজস্ব প্রায় একই ছিল, অন্যদিকে কৃষকদের উপর আরোপিত ও তাদের থেকে সংগৃহীত অতিরিক্ত কর সম্ভবত বাংলাতেই থেকে যেত।[৩৮] শায়েস্তা খান (১৬৬৪-৭৮), খান জাহান বাহাদুর খান (১৬৮৮-৮৯), আজিমউদ্দিন (১৬৯৭-১৭১২) প্রমুখ সুবেদার প্রাদেশিক রাজস্বের

---

৩৬. ডাচ দলিলপত্র অনুযায়ী ১৬৫৭ ও ১৭১৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলায় রূপার নাটকীয় বৃদ্ধি দেখা যায়, চাল, গম, ঘি ও চিনির মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যে উঠানামা ঘটলেও মুদ্রাস্ফীতির কোন স্থির চিত্র দেখা যায় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৬৫৮ সালে, তথ্যসমূহ প্রাপ্তির আদিমতম সময়, একশত মণ চালের দাম ছিল ৪৯ রুপি, আর ১৭১৭ সালে তা দাঁড়ায় ৪৮ রুপি। Prakash, *The Dutch East India Company* 251-53.

৩৭. ১৬৫৯ সালে প্রাদেশিক রাজস্ব দাবি *(জমা)* দাঁড়ায় পুরোপুরি ১ কোটি ৩ লাখ রুপি, কিন্তু ১৭০০ সাল থেকে এই পরিমাণ প্রতি বছর ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে ১৭২২ সালে দাঁড়ায় ১ কোটি ২৪ লাখ রুপিতে। এর মধ্যে ১ কোটি ৯ লাখ দিল্লীতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় কোষাগারে *(খালিসা)* প্রেরণ করা হতো এবং ৩৩ লাখ রুপি প্রদেশের *(জাগির)* স্থানীয় কর্মকর্তাদের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য বরাদ্দ রাখা হতো। দেখুন *Dastur-i amal-i Alamgiri* (British Library MS., Add. 6599), fols. 120a-121a; *Fifth Report from the Select Committee of the House of Commons on the Affairs of the East India Company, dated 8th July, 1812, ed.* Walter K. Firminger (Calcutta: R. Cambray & Co., 1917), 2: 189-91. ১৭০০ ও ১৭২১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বার্ষিক বৃদ্ধির নেপথ্যে ছিল প্রাদেশিক সুবেদার মুর্শিদ কুলি খানের তৎপরতা এবং তা দেখা যায় John Shore-এর "Minute on the Rights and Privileges of Zamindars" (West Bengal Government Archives, Calcutta, Board of Revenue Proceedings for April 2, 1788, vol. 127), 539-40, appendix No. 6-এ। Cited in Philip B. Calkins, "Revenue Administration and the Formation of a Regionally Oriented Ruling Group in Bengal, 1700-1740" (Ph.D diss., University of Chicago, 1972), 146

৩৮. কেন্দ্রীয় সরকার ১৬৫৯ সালে এমনকি ১ কোটি ৩ লাখ রুপির পুনর্নির্ধারিত ভূমি রাজস্ব দাবি ও আদায়ে স্পষ্টত ব্যর্থ হয়। ১৬৮৭ সালের দিকে দিল্লীতে প্রেরণের জন্য সংগৃহীত ভূমি রাজস্ব *(হাসিল)* ছিল ৮৬ লাখ রুপি। ১৭১২ থেকে ১৭২৭ সালের সময়কালে বাংলা থেকে দিল্লী বার্ষিক গড়ে ৮৯ লাখ রুপি ভূমি রাজস্ব পেত, অন্যদিকে ১৭২৮ থেকে ১৭৩৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯৪ লাখ রুপিতে। এসব হিসাব কষেছেন ফিলিপ ক্যালকিন্স। তিনি "Comparative Tables of the Revenue of Bengal," British Library, London, Add, MS. 6586, ff. 46b-48a এর খসড়া উপাত্ত থেকে সংগ্রহ করেছেন। দেখুন Calkins, "Revenue Administration," 162. 'খালিসা' দাবি

বিপুল অংশ আত্মসাৎকরণ বা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অন্য প্রদেশে বদলি হওয়ার সময় সাথে করে নিয়ে যাওয়ায় নিঃসন্দেহে অনেক রূপা বদ্বীপ থেকে চলে গেছে।[৩৯] কর্মকর্তাদের অর্থ উপার্জনের এ ধরনের পন্থা সম্ভবত পুরো মোগল আমল জুড়েই ছিল এবং শুধুমাত্র তা দিয়েই সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে মুদ্রাস্ফীতির অনুপস্থিতির ব্যাখ্যা করা যায় না।

অন্যদিকে, আনুমানিক ১৬৫০ থেকে ১৭২৫ সাল পর্যন্ত বাংলার সুবিদিত মূল্য স্থিতিশীলতাকে প্রদেশটিতে সে সময়ে সংঘটিত অর্থনৈতিক দ্রুত বিকাশের সাথে সম্পর্কিত করা যায়। সাদামাটাভাবে বলা যায়, ভোক্তা-মূল্য স্থিতিশীল থাকার কারণ ছিল, কৃষিজ ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে জনসংখ্যার ভিত্তিও এমন মাত্রায় বেড়ে যায় যে, তা বাইরে থেকে আসা রূপার ফলে সৃষ্ট অতিরিক্ত অর্থ আত্মীকরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। অধিকন্তু, অতিরিক্ত বর্ধিত অর্থ সরবরাহ যেহেতু প্রদেশটির বাইরে যেতে পারতো না, তাই নতুনভাবে মুদ্রিত রূপার মুদ্রা অবাধে বাংলার সমাজের সব জায়গায় প্রবেশাধিকার পাওয়ায় নিম্নতর পর্যায়ে অনুপ্রবেশ করে কৃষিজ সীমান্ত সম্প্রসারণের সাথে প্রয়োজনীয় বিষয়টি দেখা যায় ১৬৯০ সালের দিকে মুকুন্দরামের রচিত *'চণ্ডি-মঙ্গল'* কাব্যে। এতে চণ্ডিদেবীকে কাব্যের কালকেতুকে একটি *অঙ্গুরী দিয়ে* সেটি নগদে বিক্রি করতে বলতে দেখা যায়। তা থেকে প্রাপ্ত অর্থে– সাত কোটি *তঙ্কা*– কালকেতুকে বন পরিষ্কার এবং একটি নগর ও দেবীর সম্মানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয়। ভূমি কৃষিকাজের উপযোগী হওয়ামাত্র কালকেতু নতুন প্রাপ্ত ভূমিতে কায়স্থ ভূস্বামীদের হাজার হাজার শ্রমিকের *(প্রজা)* আগমন ও বসতি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় নগদ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়।[৪০] এ ধরনের সমসাময়িক সাহিত্যিক প্রমাণ শুধুমাত্র ষোড়শ শতকের শেষদিকে মুদ্রায়নে উচ্চমাত্রার কথাই বলে না, সেইসাথে আদিম বনভূমির কৃষিজ সম্প্রদায়ের বসতিতে রূপান্তরে নগদ অর্থের ভূমিকাও প্রকাশ করে।

এবং দিল্লীতে প্রেরিত প্রকৃত পরিমাণের মধ্যকার পার্থক্য থাকার কারণ সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন এম. ডি থেভেনট। এই ফরাসি ব্যক্তিটি ১৬৬৬ সালে ভারত সফর করেন এবং তিনি যা শুনেছেন, তা অতি যত্ন সহকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি সেই বছর লিখেন, 'আমার ভারতীয় হিসাব করে বাৎসরিক মোগল (বাংলায়) রাজস্ব ১০ মিলিয়ন; তবে আমি অন্য সূত্র থেকে শুনেছি, তা বড়জোর নয়, যদিও অন্য যেকোন প্রদেশ থেকে এটা অনেক বেশি: এর কারণ হিসেবে দেখানো হয়, এটা সাম্রাজ্যের দূরতম স্থানে অবস্থিত হওয়ার জন্য, এবং সেখানকার লোকজন অসিস্থরমতি হওয়ার জন্য, তাদের সাথে ভদ্র আচরণ করতে হয়, কারণ প্রতিবেশী রাজারা শত্রুভাবাপন্ন।" Surendranath Sen, ed., *Indian Travels of Thevenot and Careri* (New Delhi: National Archives of India, 1949), 97.

৩৯. Jadunath Sarkar, ed., *History of Bengal*, 413.

৪০. মুকুন্দরাম, *কবিকঙ্কন চণ্ডি*, ২৯০, ২৯৫-৯৬, ৩৫৪-৫৫। See also, Bhattacharya, "La Deesse," 33.

সংক্ষেপে, বেশ কয়েকটি বিষয় – প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্মিলিতভাবে পূর্ববঙ্গে সপ্তদশ শতকের ধান সীমান্ত দ্রুত সম্প্রসারিত করেছিল: বাংলার নদীগুলোর পূর্বগামী গতিশীলতা ও তার ফলে সক্রিয় বদ্বীপের গঠন, মোগল ভারতের সাথে অঞ্চলটির রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক একাত্মতা এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বস্ত্রের বিনিময়ে বহিরাগত রৌপ্যের প্রবাহ বাড়ার ফলে অর্থ সরবরাহে বৃদ্ধি। আমরা দেখবো, মোগল যুগে বাংলা নগদ অর্থের উচ্চ মাত্রায় প্রবাহে সীমান্তে ও সীমান্তের মধ্যে শুধুমাত্র মানুষ ও সম্পদের গতিশীলতায় অবদান রাখেনি। এর ফলে সাম্প্রদায়িক বা সাংস্কৃতিক মতানুযায়ী ভূমির হাত বদলের সুবিধা সম্বলিত অব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক লেনদেনের সুযোগও করে দেয়। পরিশেষে, বাংলার ধান উৎপাদন বৃদ্ধি সময় ও স্থানগতভাবে– ষোড়শ শতকের শেষ থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথম পর্যন্ত সময়কালে বদ্বীপের পূর্বাঞ্চলে– মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও ধর্মীয় পরিবর্তনের মধ্যে এ ধরনের সংশ্লেষ তাদের মধ্যকার সম্ভাব্য সংযোগের অনুসন্ধানের আগ্রহ সৃষ্টি করে।

কৃষিজ সীমান্তে আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক

এক সময়ের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলগুলোতে ধানের আবাদের অগ্রগতি বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে পুরাতন বিষয়বস্তুগুলোর অন্যতম। ১৩৪৯-৫০ সালে বদ্বীপে সফরকারী চিনা বণিক ওয়াং তা-ইয়ুন লক্ষ্য করেন, বাঙালিরা 'তাদের সব প্রশান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য নিজেদের কাছেই ঋণী, কৃষির প্রতি আত্মনিবেদনেই তাদের সকল উৎস নিহিত, যেখানে আগে জঙ্গলে ঢাকা জমি ছিল, তাদের চাষাবাদ ও রোপনের বিরামহীন পরিশ্রমে তা উদ্ধার করা হয়েছে----। এখানকার মানুষের সম্পদ ও একাগ্রতা সম্ভবত চিউ চিয়াং (পালেমবাং)-এর লোকদের ছাড়িয়ে গেছে এবং তারা চাও-ওয়ার (জাভা) সমকক্ষ।'[৪১]

যদিও বদ্বীপটির মানুষ মুসলমানদের আগমনের অনেক আগে থেকেই বনাঞ্চলকে ধানক্ষেতে রূপান্তরের কাজ করছিল, কিন্তু অন্তত ষোড়শ শতক থেকে যা নতুন আকারে দেখা গেছে, তা হলো বন পরিষ্কারকরণ এবং ভূমি পুনরুদ্ধারের সাথে মুসলমান *পীর* বা এই পরিচিতিতে জনপ্রিয় ব্যক্তিবর্গের সম্পৃক্ততা। জনপ্রিয় জনস্মৃতি অনুযায়ী, এ ধরনের অনেক লোক প্রাণবন্ত লৌকিক-ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, সাধু পুরুষে পরিণত হয়, যাদের জীবন ধর্ম ও কৃষি উভয়ের সম্প্রসারণের রূপক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তারা স্থায়ীভাবে পরিস্ফুটিত হয়, কারণ সম্মিলিত লোকস্মৃতিতে, তাদের জীবন

৪১. Wang Ta-yuan, *Tao i chih lio* ("Description of the Barbarians of the Isles") in W.W. Rockhill, "notes on the Relations," *T'oung pao 16, pt. 2, section 4 (1915): 436.*

ও কর্ম একটি জটিল সামাজিক ধর্মীয় প্রক্রিয়ায় প্রকাশিত হয়, যেখানে তাদের ছোঁয়ায় আদিতে জঙ্গলাকীর্ণ ও অমুসলমান অধ্যুষিত একটি ভূমি চাষযোগ্য ও মুসলমান প্রাধান্যপূর্ণতে রূপান্তরিত হয়। আমরা বিংশ শতকের বর্ণনা ও সাহিত্যকে পরীক্ষা করতে পেছনে ফিরিয়ে উনবিংশ, অষ্টাদশ ও ষোড়শ শতকে নিয়ে যাই, যে প্রাচীনতম সময়ে বাংলার পথপ্রদর্শক সাধু পুরুষদের নিশ্চিত যাত্রা শুরু হয়েছিল।

১৯৮০ -এর দশকে সংগৃহীত মৌখিক বর্ণনায় বলা হয়, জনৈক মেহের আলী তাঁর বোন ও অপর সঙ্গী নিয়ে মোগল যুগের প্রথমদিকে দাক্ষিণাত্য থেকে যশোরের বনাঞ্চলে আসেন। বর্তমানে তার নামে নামকরণকৃত মেহেরপুরের বসতিতে পৌঁছে এই সাধুপুরুষ স্থানীয় জনগণকে জঙ্গল পরিষ্কার করে তা ধানচাষের উপযোগী করতে সাহায্য করছেন।[৪২] বলা হয়, সিলেটের হবিগঞ্জের মুরারবন্দে মোগল আমলে মধ্যপ্রাচ্য থেকে শাহ সৈয়দ নাসিরউদ্দিন নামক এক ব্যক্তি আসেন এবং স্থানীয় জনগণকে জঙ্গল পরিষ্কারকরণ ও ধান চাষের নির্দেশনা দেন; তাঁর আগমনের আগে জায়গাটি ছিল জঙ্গল। তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষাও দান করেন। হবিগঞ্জ থেকে কয়েক মাইল দূরের পাইলে আরেক পথপ্রদর্শক সাধু পুরুষের মাজার আছে। বলা হয়ে থাকে, তিনি মধ্যপ্রাচ্য থেকে এসে স্থানীয় জনগণকে ধান চাষাবাদের পদ্ধতি এবং ইসলামের মৌলিক ধারণা সম্পর্কে শিখিয়েছিলেন। পরে তাঁর ছেলেরা বর্তমানের কুমিল্লা ও সিলেটে বসতি স্থাপন করে এবং সেখানে তারা একই কাজ করে।[৪৩] বলা হয়ে থাকে মেদিনিপুরের পিঙ্গলায়, সুলতান তাজ খান কররানির দানকৃত ভূমিতে খন্দকার শাহ আলী নামের জনৈক মুসলমান সাধু পুরুষ একটি বসতি স্থাপন করেন এবং সুলতান উক্ত *পীরকে* নির্দেশনা দেন, একটি ঘোড়াকে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বিচরণ করতে দিতে যার মাধ্যমে ঘেরাওকৃত এলাকা যে সারা জীবনের জন্য তার আধ্যাত্মিক ও বাস্তব নিয়ন্ত্রণে তা বোঝা যায়। সপরিবারে উক্ত এলাকায় পৌঁছে ও বসতি স্থাপনের পর খন্দকার শাহ স্থানীয় মানুষের সহায়তায় এলাকার জঙ্গল পরিষ্কার করেন এবং তাদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেন। তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পর উভয় সময়েই উক্ত এলাকার অধিবাসীরা তাঁকে পীর হিসেবে সম্মান করতো।[৪৪]

---

৪২. মুহাম্মদ শরীফ হোসেন, সচিব, যশোর পাবলিক লাইব্রেরি, ডাক খরকি, জেলা যশোর, এর সাথে সাক্ষাৎকার, ১৯ মে, ১৯৮২।

৪৩. মুহাম্মদ বদরুর হুদা, অতিরিক্ত মহকুমা কর্মকর্তা, রাজস্ব, নোয়াখালি জেলা কালেকটরেট, এর সাক্ষাৎকার। ১৭ জুন, ১৯৮২।

৪৪. Mohendra Nath Karan, *Hijili Masnad-i Ala*, *621*, cited in Sultan Jahan Ahmad, "Muslim Society in Midnapur—a Social Study of a Bengal District (1800 AD-1919 AD)" (Ph. D. Diss., Jadavpur University, Calcutta, 1982), 58. গল্পটিতে অশ্বমেধের (ঘোড়া বলিদান) ভারতীয় রাজত্বের চিরায়ত প্রথার উল্লেখ আছে, এতে ঘোড়াটি যেসব স্থানে অবাধে ঘুরতে পারবে, সেসব স্থানে রাজার সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত থাকবে।

১৯০৮ সালে সংকলিত খুলনা জেলার গেজেটিয়ারে প্রকাশ করা হয়, বিংশ শতকের গোড়ার দিকে সুন্দরবনের অংশবিশেষ তখনো মুসলমান সাধু পুরুষদের আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বে ছিল বলে বলা হতো।[৪৫] ১৮৯৮ সালে জেমস ওয়াইজ জিন্দা গাজি সম্পর্কে লিখেন, পূর্ববঙ্গের সকল কাঠুরে ও মাঝির রক্ষাকর্তা হিসেবে বিবেচিত এই কিংবদন্তির ব্যক্তি সম্পর্কে 'বলা হয় গভীর জঙ্গলে বাস করেন, বাঘের পিঠে চড়েন এবং তাদেরকে এতো সতর্ক পর্যবেক্ষণে রাখেন যে, তার সুস্পষ্ট নির্দেশ ছাড়া তারা কোন মানুষকে স্পর্শ করতে সাহসী হয় না।[৪৬] ১৮৩৩ সালে অপর বৃটিশ কর্মকর্তা ফ্রানসিস বুকানন উল্লেখ করেন, দিনাজপুর জেলায় পীরগণ ও বাঘেরা সাধারণত বনের একই অংশে বসবাস করে:

> এই জেলায় এসব জানোয়ার কদাচিৎ মানুষকে আক্রমণ করে। উভয় ধর্মের মানুষই সাধারণভাবে মনে করে পীরই জানোয়ারটিকে তার সহজাত হিংস্রতা থেকে সংযত রাখেন কিংবা আরো পরিষ্কার করে বললে বলা যায়, তিনি নরহত্যা করতে বাঘকে নিষেধ করেছেন। বাঘ এবং ফকিরগণ তাই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করেন এবং ফকিরগণ মানুষকে এই বলে আশ্বস্ত করেন, যারা দরবেশকে শ্রদ্ধা করবে এবং শিরনি দেবে, তার (বাঘের) কাছ থেকে তারা পুরোপুরি বিপদমুক্ত থাকবে।[৪৭]

বদ্বীপের বাঘ এবং মুসলমান সাধুপুরুষ বা তাদের মাযারের মধ্যকার প্রতীকী সম্পর্কের একেবারে প্রথম ইউরোপীয়ান বর্ণনাটি করা হয়েছে ১৬৭০ সালে।[৪৮]

---

৪৫. L.S.S. O'Malley, *Eastern Bengal District Gazetteers, Khulna* (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1980), 193-94. পেশাদার কাঠুরেদের একটি শ্রেণী "*গাইস* নামে অভিহিত বনের নির্দিষ্ট এলাকায় নৌকায় করে গমন করতো, প্রতিটিতে নেতৃত্বে থাকতেন একজন করে *ফকির*, তাঁর বাঘ বিতাড়নের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা আছে বলে মনে করা হতো এবং নিঃসন্দেহে তাঁর বন সম্পর্কিত জ্ঞান অবশ্যই থাকতো। এখানে কাঠুরেরা সপ্তাহে ছয়দিন কাজ করতো এবং সপ্তাহের একদিন (কোন নির্দিষ্ট দিন নয়) উক্ত বনের আরণ্যক দেবতার উপাসনার জন্য পৃথক করে রাখতো।

৪৬. Wise, "Muhammadans of Eastern Bengal," 40.

৪৭. Francis Buchanan, *A Geographical Statistical, and Historical Description of the Districts, or Zila, of Dinajpur* (Calcutta: Baptist Mission Press, 1833), 93.

৪৮. ইংরেজ নাগরিক জন মারশাল উড়িষ্যা থেকে হুগলি ভ্রমণ করার পথে ১৬৭০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি নিম্নোক্ত কাহিনীটি বর্ণনা করেন, "বলা হয়ে থাকে, প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে সেখানকার (রামচাঁদপুর, বালাসরের কাছে) *ফকিরের* দরগায় একটি বাঘ আসে এবং তাঁকে সালাম করে, এবং আমি যখন বৃহস্পতিবার রাতে সেখানে ছিলাম, তখন আমি সেই দৃশ্য দেখেছি এবং সেইসাথে শুনেছিও। Shafaat Ahmad Khan, ed., *John Marshall in India: Notes and Observations in Bengal, 1668-1672* (London: Oxford University Press, 1927), 62.

১৮৫৭ সালে সংগৃহীত লোককাহিনীর উপর ভিত্তি করে ওয়াইজ আরো লিখেন, কিংবদন্তির *পীর* মুবারা গাজি সুন্দরবনের চব্বিশ পরগনার জঙ্গল পরিষ্কার করেছেন। তিনি লিখেন, এই দরবেশ 'ছিলেন একজন ফকির, যিনি হুগলি নদীর বাম তীর জুড়ে জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি পুনরুদ্ধার করেছেন এবং প্রতিটি গ্রামে তাঁর প্রতি উৎসর্গ করা একটি বেদি আছে। তাঁর কোন মাযারে প্রথমে শিরনি না দিয়ে কেউ বনে প্রবেশ করে না বা কেউ জেলায় কোথায় নৌকা ভাসায় না। এসব বিপদসংকুল বনে বসবাসকারী ফকিররা নিজেদের গাজির বংশধর হিসেবে দাবি করে এবং *সাঁগু* নামে পরিচিত একটি লাঠি দিয়ে বনের ঠিক কতটুকু কাটা হবে তা নির্ধারণ করে দেন।[৪৯] বনের কতটুকু কাটা যাবে, তা চিহ্নিতকরণের জন্য *পীরের* প্রতিনিধির কাছে আবেদন জানানোর ঘটনায় মুবারা গাজির বংশধর হিসেবে পরিচয়দানকারী মানুষরা বদ্বীপের এই অংশে *পীরের* ধর্মীয় সার্বভৌমত্ব দাবি অব্যাহত রেখেছিল।

ঊনবিংশ শতকের আরেকটি বর্ণনা সুন্দরবনের জঙ্গলের নিকটবর্তী বাগেরহাটের পৃষ্ঠপোষক দরবেশ খান জাহানের (মৃত্যু ১৪৫৯) জীবন সম্পর্কিত। তাঁর কবরের খোদাইলিপিতে বর্ণিত ব্যক্তির পরিচিতি 'উলুখ খান-ই আযম খান জাহান' ধারণা দেয়, তিনি ছিলেন গোষ্ঠীগত তুর্কি *('উলুখ')* এবং বাংলা সালতানাতের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা *('খান-ই-আযম')*।[৫০] তাঁর স্মরণীয় কীর্তিসমূহের মধ্যে রয়েছে, স্থানীয় জঙ্গল পরিষ্কারকগণ, তা চাষের জন্য প্রস্তুত করা, স্থানীয় জনগণকে ইসলামে ধর্মান্তরকরণ, এবং এলাকাটিতে অনেক রাস্তাঘাট ও মসজিদ নির্মাণ।[৫১] ১৮৭০ সালে সংগৃহীত স্থানীয় কাহিনীতে বলা হয়, তিনি অঞ্চলটিতে এসেছিলেন,

> সুন্দরবনের ভূমি পুনরুদ্ধার ও তাতে চাষাবাদের জন্য, যা সে সময় ছিল জলাভূমি ও জঙ্গলাকীর্ণ, তিনি সম্রাট বা গৌড়ের রাজার নিকট থেকে এসব ভূমির জায়গির লাভ করেন এবং সে অনুযায়ী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর কাচারির ঐতিহ্যে দুটি বিষয়ই ফুটে উঠতো: তাঁর মর্যাদা এবং তিনি যে বিশাল কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন-এমন সব কাজ যাতে বিশাল কর্মী বাহিনীর প্রয়োজন-তাছাড়া খাজনা গ্রহণকারী বা ভূমিচাষের প্রধান হিসেবে তাঁর অবস্থানও প্রকাশিত হতো। ---- একজন বিরাট জমিদার হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করার পর তিনি জাগতিক তৎপরতা পরিত্যাগ করেন এবং একজন ফকিরের মতো বসবাস করতে থাকেন।[৫২]

খান জাহান অবশ্যই ছিলেন একজন কার্যকর নেতা, কারণ অঞ্চলটির পূর্বেকার ঘনবনকে ধানক্ষেতে রূপান্তরিত করতে শ্রেয়তর সাংগঠনিক দক্ষতা ও প্রচুর জনশক্তির

৪৯. Wise, "Muhammadans of Eastern Bengal," 40.

৫০. Shamsud-Din Ahmed, ed. and trans., *Inscriptions, 4: 66.*

৫১. Syed Murtaza Ali, *Saints of East Pakistan* (Dacca: Oxford University Press, 1971), 41.

৫২. Westland, *Report*, 20-21.

প্রয়োজন ছিল: একদিকে লোনা পানি সরিয়ে রাখার জন্য পানিপ্রবাহ বরাবর জমিতে বাঁধ দেওয়া, পানি সরবরাহ ও মজুতের জন্য পুকুর খনন, শ্রমিকদের জন্য কুঠির নির্মাণ। এসব কাজ সম্পন্ন করার পরপরই ধানের চাষাবাদ শুরু করতে হতো, অন্যথায় নল-খাগড়ার বন শীঘ্রই ফিরে আসতো। এসবই ছিল অত্যন্ত কষ্টকর তৎপরতা এবং এসব কাজ আরো বেশি কঠিন করে তুলতো সদা-বিদ্যমান বাঘ ও জ্বরের উপস্থিতি।[৫৩] খান জাহান তাঁর লোকদের স্থাপত্যের বিশাল কর্মকাণ্ডের দিকেও ধাবিত করেন। বিভিন্ন জরিপে তাঁকে বাগেরহাট এলাকায় অর্ধশতাধিক স্থাপনা নির্মাণের কৃতিত্ব দিয়েছে, আর লোক ঐতিহ্যে দাবি করা হয় তিনি ৩৬০টি মসজিদ এবং সমসংখ্যক দীঘি বানিয়েছেন।[৫৪] যশোর শহরের দশ মাইল উত্তরে অবস্থিত বরোবাজারের ১২৬টি মসজিদও তাঁর প্রতি আরোপ করা হয় এবং বাগেরহাট অঞ্চলে অসংখ্য সড়ক নির্মাণের কৃতিত্বও দেওয়া হয়।[৫৫] বাগেরহাট কমপ্লেক্সের অদ্বিতীয় অবিস্মরণীয় সৃষ্টি হলো ষাটগম্বুজ মসজিদ, যার ৬৭টি গম্বুজ ও ১৫৭ × ১৬ ফুট আয়তন বিশিষ্টতার কারণে এমনকি বর্তমানকালেও বাংলাদেশের বৃহত্তম মসজিদের মর্যাদা পেয়েছে।[৫৬] সংক্ষেপে, খান জাহানকে স্মরণ করা হয় শুধুমাত্র বনের একজন অগ্রপথিক হিসেবেই নয়, সেই সাথে বৃহত্তর ধারণায় একজন সভ্যতা বিনির্মাণকারী হিসেবে।

অষ্টাদশ শতকের বৃটিশ রাজত্ব বিবরণীতে আমরা পীর উমর শাহের কথা জানতে পারি, যিনি ছিলেন নোয়াখালির অম্বরাবাদের পৃষ্ঠপোষক দরবেশ। বলা হয়ে থাকে, এই ব্যক্তি, যার নামে অঞ্চলটির নামকরণ হয়েছে, ১৭০০ সালের প্রথমদিকে ইরান থেকে নোয়াখালীর জঙ্গলে এসেছিলেন এবং 'সেখানে তাঁর নৌকায় বসবাস করে কেরামতি প্রদর্শন করতেন এবং যাদের দিয়ে ধীরে ধীরে বন পরিষ্কার করাতেন, তাদেরকে ধর্মান্তরিত করেন।'[৫৭] পীর উমর আলী শাহ ও তাঁর স্থানীয় অনুসারীরা যে এলাকা

৫৩. O'Malley, *Khulna District Gazetteer*, 194.

৫৪. Westland, *Report*, 15; Johana E. van Lohuizen de Leeuw, "The Early Muslim Monuments al Bagerhat," in *The Islamic Heritage of Bengal*, ed. George Michell (Paris: UNESCO, 1984), 169.

৫৫. এসব রাস্তার কোন কোনটি প্রকৌশলগতভাবে এতো উন্নতমানের করে বানানো হয়েছিল যে, সেগুলোর কখনো মেরামতের প্রয়োজন হয়নি। এগুলোর মধ্যে সেরাটি বাগেরহাটে ভৈরব নদীর তীর ঘেঁষে বানানো হয়েছে, পাঁচ বা ছয় ইঞ্চি বর্গাকার এবং দুই ইঞ্চি মোটা ইট দিয়ে দশ ফুট চওড়া রাস্তাটি বাঁধের একটু উপর দিয়ে চলে গিয়েছে। Westland, *Report*, 11-12, 19.

৫৬. মসজিদটির ক্রমাগত সরু হয়ে যাওয়া দেয়ালগুলো, যা বাংলার আর কোন মনুমেন্টে দেখা যায় না, উত্তর ভারতের এবং তোগলকের স্থাপত্য রীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সেই সাথে খানজাহান আলীর উৎসও সেখানে বলে ইঙ্গিত দেয়। Van Lohuizen de Leeuw, "Early Muslim Monuments," 177.

৫৭. Webster, *Eastern Bengal and Assam District Gazetteers: Noakhali*, 100-101.

পরিষ্কার করেছিলেন, তা ছিল প্রায় ১৭৫ বর্গমাইল জমি, যা মোগলরা ১৭৩৪ সালে তাদের প্রশাসনের মৌলিক, আঞ্চলিক ইউনিট হিসেবে একটি পৃথক *পরগনা* হিসেবে ঘোষণা করে। প্রায় ত্রিশ বছর পর, বাংলার রাজস্ব সংগ্রহের নিয়ন্ত্রণ বৃটিশদের হাতে চলে যায় এবং তারা জানায়, আদিম বনভূমিকে সম্প্রতি পরিষ্কার করা হয়েছে এবং *'জঙ্গল-বাড়ি তালুকদার* বা 'জঙ্গল-কর্তনকারী ভূস্বামীরা' প্রথমবারের মতো তা চাষাবাদের আওতায় এনেছে। ভূস্বামীরা দাবি করে, তাঁরা সকল ধরনের সরকারি অধীনতা থেকে মুক্ত ছিলেন এবং শুধুমাত্র পরে তাঁরা মোগল কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের নিকট রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাজস্ব সংগ্রহ তদারকির জন্য কালেকটর বা *জমিদার* নিয়োগের *'অনুরোধ'* করেছিলেন। স্থানীয় জনগণকে ইসলামে ধর্মান্তরকরণকারী এবং জঙ্গল পরিষ্কারের জন্য তাদেরকে সংগঠিতকারী পীর উমর আলীর পুত্ররা ছিলেন প্রথম দুই কালেকটর। *তালুকদারগণ* উভয় পুত্রকেই অনেকগুলো গ্রামের তাদের রাজস্বের অংশ প্রদান করে এবং তাদের একজন আমানউল্লাহ ১৭৩৪ সালে বেগমগঞ্জের পাঁচ মাইল উত্তরে বজরা শহরে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।[৫৮] তাই বলা যায়, মোগল কর্তৃত্ব ও ইসলামী প্রতিষ্ঠান উভয়ই প্রায় একই সময়ে নোয়াখালির অভ্যন্তরে পৌঁছে।

পীর উমর আলী শাহ অবশ্যই ১৭৩৪ সালের আগে নোয়াখালির জনগণের সাথে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কারণ সে সময়েই তাঁর বসতি স্থাপনের অঞ্চল একটি *পরগনা* হিসেবে সংগঠিত হয়, যা ছিল রাজস্ব সৃষ্টির সামর্থ্য সম্পন্ন একটি জেলার মতো। যদিও বন পরিষ্কারকারী ব্যক্তিদের দাবি ছিল, তারাই সরকার-নিযুক্ত সংগ্রাহকের *'অনুরোধ'* করেছিল, তবে সম্ভবত ঘটনাটি ছিল ১৭৩৪ সাল নাগাদ তারা নোয়াখালির সেই অঞ্চলের মোগল শক্তির সাথে আপোস করতে বাধ্য হয়েছিল এবং প্রাদেশিক সরকার তাদের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে পীর উমর শাহের পুত্রদের মেনে নিয়েছিল এবং রাজস্ব সংগ্রহে তাদের উপর নির্ভরশীল হওয়াটা সুবিধাজনক মনে করেছিল। তাই রাষ্ট্র এসব বনে বসবাসকারী মানুষকে তার রাজনৈতিক কক্ষপথে আত্মীকরণ করে নেওয়ার সময় *পীরের* আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বে পর্যবসিত হয় এবং *পীরের* দুই পুত্র এখন সরকারি কালেকটরে পরিণত হলো।

সপ্তদশ শতকের বাংলা সাহিত্যেও পথপ্রদর্শনের কিংবদন্তির *পীরদের* দেখা যায়। ১৬৮৬ সালে কৃষ্ণরাম দাস রচিত মহাকাব্য রায়-মঙ্গল এ দক্ষিণ রায় নামক ব্যাঘ্রদেবতা ও বদি গাজি খান নামক এক মুসলমানের সংঘাতের কথা বলা হয়েছে।

---

৫৮. পীর উমর এবং তাঁর পুত্রদের সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায় অষ্টম শতকের শেষদিকের বৃটিশ রাজস্ব দলিলপত্রে। উদ্ধৃতি W.H. Thompson, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Noakhali, 1914-1919 (Calcutta: Bengal. Secretariat Book Depot, 1919), 24, 60-61.*

যেহেতু প্রথমজনের নামের অর্থ দাঁড়ায় নিম্নবঙ্গ বা 'দক্ষিণের রাজা' তাই ব্যাঘ্রদেবতা স্পষ্টতই ছিলেন সাধারণভাবে সুন্দরবনের জঙ্গলের সার্বভৌম দেবতা এবং বদি গাজি খান ছিলেন সম্ভবত মুসলমান পথপ্রদর্শকদের একই বনে অনুপ্রবেশের ব্যক্তিতে পরিণত লোকস্মৃতির প্রতিনিধি। এই দুজনের মধ্যকার প্রাথমিক মোকাবেলা শত্রুতাপূর্ণ থাকলেও তা শেষ পর্যন্ত আপোসরফায় নিষ্পত্তি হয়েছিল: পুরো নিম্নবঙ্গে ব্যাঘ্রদেবতার কর্তৃত্ব প্রদর্শন অব্যাহত থাকবে, তবে মানুষ ব্যাঘ্রদেবতার মাথার প্রতীক চিহ্ন সম্বলিত বদি গাজি খানের কবরস্থানে অর্ঘ্য নিবেদন করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবে।[৫৯] এই পন্থায় বদি গাজি খানকে সম্ভবত খান জাহান বা পীর উমর শাহের মতো কিংবদন্তিসম কিছু শ্রদ্ধা সহযোগে বসবাসকারী এবং সুন্দরবনের জঙ্গলে ইসলাম ধর্মমত প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে স্মরণ করা হয়। বাংলার সবচেয়ে বিখ্যাত মুসলমান দরবেশ সিলেটের শাহজালাল মুজাররদের (মৃত্যু ১৩৪৬) সংশ্লিষ্ট কাহিনী সপ্তদশ শতকে রূপান্তরিত হয়ে প্রায় বর্তমানকালের মৌখিক বিবরণগুলোর অবস্থায় দেখা যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখি ১৫০০ শতকের মধ্যভাগে রচিত শাহজালালের প্রাচীনতম লিখিত জীবনীতে দরবেশকে এক তুর্কী হিসেবে, যাঁকে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে মধ্য এশিয়ার জনৈক পীর ভারতে পাঠিয়েছিলেন। পরবর্তীকালের জীবনী-ইতিহাস কাহিনীতে অবশ্য তাঁর কর্মজীবন ব্যাপকভাবে পুনঃ ব্যাখ্যা সংযোজিত হয়েছে। সপ্তদশ শতকে লিখিত বিবরণের[৬০] উপর ভিত্তি করে রচিত ঊনবিংশ শতকে জীবনী সংকলন 'সুহাইল-ই-ইয়ামেন' এ উক্ত দরবেশকে মধ্য এশিয়ার জনৈক সূফী কর্তৃক ভারতে প্রেরিত তুর্কিস্তানের কোন তুর্কী হিসেবে নয়, বরং মক্কার এক সূফী শিক্ষক কর্তৃক ভারতে প্রেরিত ইমেনের একজন আরব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৬১] শাহজালালকে এক মুঠো মাটি দিয়ে উক্ত শিক্ষক পুরোপুরি তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন স্থান না পাওয়া পর্যন্ত তাঁকে সারাবিশ্ব সফরের নির্দেশ দেন। শুধুমাত্র বাংলায় পৌছে এবং সিলেটের রাজাকে পরাজিত করতে সাহায্য করার পর তিনি তাঁর মুঠোর মাটির সাথে সেখানকার মাটির পুরোপুরি সামঞ্জস্য আবিষ্কার করেন। তিনি তাই তাঁর পরীক্ষাস্থলের

৫৯. Asutosh Bhattacharyya, "The Tiger-Cult and Its Literature in Lower Bengal," *Man in India*, 27, no. 1 (March 1947): 49-50.

৬০. এই বিষয়টি এখন হারিয়ে গেছে এমন দুটি পাণ্ডুলিপি থেকে তৈরি করা হয়েছে: *রাউজাত আস-সালিহিন* নামক গ্রন্থটি, যা আওরঙ্গজেবের আমলে (১৬৫৮-১৭০৭) রচিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয় এবং মুর্শিদ কুলি খানের সুবেদারির আমলে (১৭১৩-২৭) শাহ জালালের দরগার খাদেম মুইনউদ্দিনের লিখিত একটি বিবরণ।

৬১. শাহ জালালের মূল আবাসভূমি মধ্য এশিয়া থেকে আরবে পুনঃ নির্ধারণের বিষয়টি সম্ভবত পরবর্তীকালের মুসলমান সংস্কারকদের বাঙালি মুসলমানদের সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে মুসলমান দরবেশ ও বীরদের আরবিকরণের প্রয়াসের প্রতিফলন। দেখুন Rafiuddin Ahmed, *Bengal Muslims*, 106-13.

মাটি টিলাকে তাঁর খাঁনকাহ'র স্থান বা সূফী আবাসস্থল হিসেবে নির্বাচন করেন।[৬২] এই গল্পের প্রায় হুবহু সংস্করণ ১৯৭০-এর দশকে সিলেট থেকে প্রায় দুশ মাইল পশ্চিমে মধ্য বদ্বীপের পাবনা জেলার গ্রামবাসীরা তাঁদের মৌখিক বর্ণনায় বলে গেছেন। বাংলায় ইসলামীকরণের ব্যাপারে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা শাহজালাল ও তাঁর এক মুঠো মাটির গল্পটি ব্যক্ত করে জানায়, বদ্বীপটিতে ইসলামের বিকাশের অন্যতম কারণ হলো মাটি ছিল শাহজালালের বাণীর জন্য যথাযথ।[৬৩] তাই ষোড়শ শতকের জীবনীকারকরা যদি শাহজালালকে একজন মুজাহিদ হিসেবে চিত্রিত করে থাকে এবং হিন্দু বাংলাকে মুসলমান বাংলায় রাজনৈতিক রূপান্তরের ব্যাখ্যার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে চায়, তবে তাঁর আলোকে সপ্তদশ শতক থেকে শাহজালালকে কৃষিজ ধার্মিকতার প্রিজমের মাধ্যমে দেখা হতে লাগলো এবং দরবেশকে শুধুমাত্র প্রায়-ইসলাম থেকে ইসলামে রূপান্তরেই নয়, বরং সেই সাথে প্রাক-কৃষিজ থেকে একটি কৃষিজ অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্তির বাংলার ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত করা হতে লাগলো।

সর্বপ্রথম ষোড়শ শতক থেকেই সুনির্দিষ্টভাবে পারসি ও বাঙালি সূত্রগুলো পথপ্রদর্শক শেখদের আবির্ভাবের কথা ব্যক্ত হতে থাকে। বাংলায় মোগল শাসনের সূচনালগ্নে ১৫৯০ সালের দিকে বর্ধমান অঞ্চলে রচিত মুকুন্দরামের 'চণ্ডি-মঙ্গল' এ দেবী চণ্ডি ও তার মনুষ্য প্রতিনিধি শিকারি কালকেতুর কথা বলা হয়েছে।[৬৪] আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কালকেতুকে এই শর্তে তাঁর বনের রাজত্বের সাময়িক সার্বভৌমত্ব প্রদান করা হয়েছে যে, সে রাজা হিসেবে শিকারের সহিংসতাপূর্ণ জীবন পরিত্যাগ করবে এবং তাঁর ধর্মমত বিস্তারের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি বয়ে আনবে। এই পর্যায়ে কালকেতুকে জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ তত্ত্বাবধান এবং সেখানে মানুষ বসতি স্থাপন করে

৬২. Maulvi Muhammad Nasir al-Din Haidar, *Suhail-i Yaman, or Tarikh-i Jalali* (Persian MS., comp. 1277 A.H. [1860-61], Muslim Sahitya Samsad Sylhet), 4-27. An English Summary of this found in J. Wise, "Notes on Shah Jalal, the Patron Saint of Silhat," *Journal of the Asiatic Society of Bengal* 42, no. 3 (1873), 278-80.

৬৩. John P. Thorp, "Masters of Earth: Conceptions of 'Power' among Muslims of Rural Bangladesh" (Ph.D.diss., University of Chicago, 1978), 63-64. মৌখিকভাবে প্রচলিত কাহিনী এবং *সুহাইল-ই ইয়ামন* এর মধ্যে পার্থক্য হলো, পাবনার গ্রামবাসীরা শাহজালালের শিক্ষক হিসেবে মনে করে নবী মুহাম্মদকে, কোন সূফী গুরুকে নয়। গ্রামবাসীরা শাহজালালের কোন যুদ্ধে কোন হিন্দু রাজাকে পরাজিত করার কাহিনীও বাদ দিয়েছে।

৬৪. কবিতাটি ও চণ্ডির ধর্মাদর্শ বিশ্লেষণ করেছেন Bhattacharya, "La Seesse," 17-53. গ্রন্থটির জন্য দেখুন মুকুন্দরাম, *কবিকঙ্কন চণ্ডি*, ২৭১-৩৬১। See also Somnath Mukhopadhyay, *Candi in Art and Iconography* (Delhi: Agam Kala Prakashan, 1984).

ভূমি চাষাবাদ করবে এবং রাজার অতিলৌকিক পৃষ্ঠপোষক চণ্ডির উপাসনা করবে, এমন একটি আদর্শ নগরী প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়। দেবী যেমনভাবে রাজাকে নিরাপত্তা দিয়েছে, তেমনি কালকেতুও কৃষকদের প্রতি তাঁর নিরাপত্তা ব্যাপ্ত করেছেন আর তাদের প্রধানদের তিনি সোনার দুল দিয়েছেন, যার মাধ্যমে তিনি নিজেকে তাদের ও দেবীর মধ্যকার মধ্যস্থতাকারীর বিষয়টি প্রতীকীকরণ করেছেন। চাষাবাদ শুরু করতে সহায়তার জন্য কালকেতু ছয় বছর পর্যন্ত কোন রাজস্ব সংগ্রহ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অধিকন্তু, তিনি প্রতিটি চাষীকে একটি দলিল (পাট্টা) দিয়ে তার ভোগদখলের মেয়াদের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং সুনির্দিষ্ট করে বলেছেন, রাজস্ব যখন থেকে সংগ্রহ করা হবে, তখন তা হবে লাঙলের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে। এ ধরনের অনুকূল শর্ত ও প্রতিশ্রুতিতে আকৃষ্ট হয়ে কৃষক এবং বাঙালি সমাজের অন্যান্য পল্লী বর্ণনাগুলো, মুকুন্দরাম যেভাবে দেখেছেন, নতুন বন রাজ্যে অধিভুক্ত হয় এবং রাজার মুখ থেকে এক টুকরা পান গ্রহণ করে তার প্রতি আনুগত্যের শপথ করে।

মুকুন্দরামের কাব্য তাই বাংলা বদ্বীপে সভ্যতা-বিনির্মাণকারী প্রক্রিয়া ও বিশেষভাবে কৃষিজ সভ্যতাকে সাবেক জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিতে ঠেলে দেওয়ার নাটকীয়তা দানকারী বিশাল মহাকাব্য হিসেবে পড়া উচিত। এটা সত্যি যে, মুকুন্দরামের সৃষ্টিতে যে রাজকীয় কর্তৃত্বের মডেল চিত্রিত করা হয়েছে, তা দ্ব্যর্থহীনভাবে হিন্দু। রাজা, কালকেতু ছিলেন একাধারে বনদেবী চণ্ডির একজন পূজারী এবং মধ্যযুগীয় দৃষ্টিকোণ থেকে একজন হিন্দু রাজা, অন্যদিকে কাব্যে প্রদর্শিত কৃষক চাষীদের রাজার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে দেখা যায় তার মুখ থেকে পান-সুপারি গ্রহণ করে, যা পূজা অনুষ্ঠানে অর্ঘ নিবেদনের সনাতন হিন্দু ধর্মাচারের থেকে সরাসরি গ্রহণ করা। অবশ্য, বন পরিষ্কারের মাধ্যমে স্থানটিকে শহর এবং ধানক্ষেত হিসেবে বিকশিত করার কাজে মুসলমানরাই ছিল প্রধান পথপ্রদর্শক। কবি লিখেন,

'মহাবীর কাটে বন শুনি বেরুণিয়াগণ
আইসে তারা নানা দেশ হৈতে
কাঠদা কুঠার বাসি টাঙ্গী বাণ রাশি রাশি
কিনে বীর সবাকারে দিতে।।
উত্তর দিকের জন যেন আইসে দাস গণ
শতেক জনের জনের আগুয়ান
তাহারে দেখিয়া বীর মনে বড় সুস্থির ।
জনে জনে দিলা গুয়া পান।।
দক্ষিণ দেশের জন আইল নাম বিকর্ত্তন।
পঞ্চশত জনের অধিকারী।

আশ্বাসিয়া মহাবীর বেরুণিয়া কৈল স্থির
দেখি বীর জন সারি সারি।।
পশ্চিমের বেরুণিয়া আইল দফর মিয়া
সঙ্গে জন বাইশ হাজার।
ছোলেমানী মালা করে জপে পীর পেগম্বরে
বন কাট্যা পাতায়ে বাজার।।'[৬৫]

কবির সময়কালে সংগঠিত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ায়-জঙ্গল পরিষ্কার এবং স্থানীয় বাজার প্রতিষ্ঠা-মুসলমান পথপ্রদর্শকরা দ্ব্যর্থহীনভাবে সম্পৃক্ত ছিল। অধিকন্তু বলা হয়েছে, জঙ্গল-পরিষ্কারকরণ অভিযানে সম্পৃক্ত মুসলমানরা এসেছে পশ্চিম দিক থেকে, এতে তাদের উৎস উত্তর ভারত কিংবা তার থেকেও দূরবর্তী কোন স্থানের কথা বোঝা যায়, বিপরীতক্রমে আদিবাসীরা (*'জন যেন আইসে দাসগণ'*) এসেছে উত্তর এবং ফসল কর্তনকারীরা এসেছে দক্ষিণ থেকে অর্থাৎ বদ্বীপের ভেতর থেকে। সংখ্যার দিক থেকে অন্য পথপ্রদর্শকদের অনেক বেশি ছাড়িয়ে যাওয়া বাইশ হাজার মুসলমানের নেতৃত্বে ছিলেন জনৈক 'দফর মিয়া', স্পষ্টত তিনিই মুসলমান কর্মশক্তির সংগঠক বা গোষ্ঠীপ্রধান। এটাও তাৎপর্যপূর্ণ যে, শ্রমিক বাহিনীর সদস্যরা একজন *পীরের* নামে ধ্বনি দিয়েছে, খুবই সম্ভব যে তিনি দফর মিয়া নিজেই।[৬৬] সংক্ষেপে, এই কাব্য ঐতিহাসিক বর্ণনার সাক্ষী হিসেবে পঠিত না হলেও, আমরা জানি যে, এটির লেখক তার নিজের সময়ের সংস্কৃতি থেকে তার পদ্যের উপজীব্য সংগ্রহ করেছিলেন। এমনকি কোন ঐতিহাসিক 'দফর মিয়া' না থাকলেও কবি আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন *পীরদের* নেতৃত্বে হাজার হাজার মুসলমানের বন অক্রমণের ধারণার সাথে স্পষ্টতই পরিচিত ছিলেন।

ইসলামীকরণ ও কৃষিজ সম্প্রসারণের চূড়ান্ত সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে আমরা উত্তর-পশ্চিম বদ্বীপের পাণ্ডুয়ার পৃষ্ঠপোষক দরবেশ শেখ জালালউদ্দিন তাবরিজির কিংবদন্তিসম জীবনী পরীক্ষা করতে পারি। তৃতীয় অধ্যায়ে, প্রাথমিক পারসি জীবনীকারগণ এই দরবেশকে মুজাহিদ এবং মন্দির ধ্বংসকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু ব্যতিক্রমধর্মী সাংস্কৃতিক গ্রন্থ 'শেক শুভদয়া'য় আমরা শেখ তাবরিজির ভিন্ন চিত্র দেখি। যদিও এই সাহিত্যে বর্ণিত ঘটনাবলী তুর্কী বিজয়ের সামান্য পূর্বের

৬৫. মুকুন্দরাম, *কবিকঙ্কন চণ্ডি*, ২৯৯-৩০০। (অনুবাদটি স্টুডেন্ট ওয়েজ প্রকাশিত মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত *কালকেতু উপাখ্যান* থেকে নেওয়া হয়েছে– অনুবাদক)।

৬৬. এটা খুবই সম্ভব যে, এই জাফর মিয়া ত্রিবেনিতে ১২৯৮ সালে একটি মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণকারী ঐতিহাসিক অগ্রপথিক জাফর খানের অস্পষ্ট স্মৃতির প্রতিনিধিত্ব করছে, কারণ মুকুন্দরামের বাড়ি বর্ধমান থেকে তা তেমন দূরে নয়। দেখুন Shamsud-Din Ahmed, ed. and trans., *Inscriptions*, 18-21.

আমলের এবং গ্রন্থকার যদিও দাবি করেন, তিনি ছিলেন ১২০৪ সালে তুর্কীদের কাছে পরাজিত হিন্দু রাজা লক্ষণ সেনের মন্ত্রী, তবুও আমাদের নিকট বিদ্যমান গ্রন্থটির রচনাকাল সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর।[৬৭] অর্থাৎ মুকুন্দরামের চণ্ডি-মঙ্গলের মতো *শেক শুভদয়া* রচনাও বদ্বীপটিতে মোগল শক্তির প্রাথমিক সংহত করার সমসাময়িক। মুকুন্দরাম ও কৃষ্ণরাম দাসের কবিতার মতো এটাও প্রাক-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মঙ্গল-কাব্য শ্রেণীভুক্ত, যেখানে কোন নির্দিষ্ট দেবতাকে বিশেষভাবে মহিমান্বিত করা হয়েছে এবং দেবতার অনুসারীদের তাদের পূজার প্রতিদানে অকৃপণ আনুকূল্য প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অবশ্য, শেক শুভদয়ার নায়ক কোন ঐতিহ্যবাহী বাঙালি-দেবতা নন, বরং তিনি শেখ জালালউদ্দিন তাবরিজি নিজেই।[৬৮]

এই বিবরণীতে তাবরিজিকে ইরানের তাবরিজের নয়, বরং 'আত্তাভা'[৬৯] রাজ্যের—সম্ভবত বর্তমান মধ্যপ্রদেশের মানদিয়া জেলার প্রাচীন আতভিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ—অধিবাসী হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে, 'প্রধানপুরুষ (খোদা) বুজুর্গ ব্যক্তিটিকে 'পূর্বের দেশে' যাওয়ার নির্দেশ দেন, সেখানে তিনি মুসলমানদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন রাজা লক্ষণ সেনের সাথে সাক্ষাৎ করবেন।[৭০] এই বিবরণ অনুযায়ী বাংলায় শেখ তাবরিজির জীবনী তুর্কী বিজয়ের পূর্বের সময়ে নির্ধারিত।[৭১] প্রধানপুরুষ শেখ তাবরিজিকে একটি মন্ত্রপূত কবচ, একটি বদনা, একটি আশা (লাঠি), আগুন বা পানির উপর দিয়ে হাঁটা যায় এমন একজোড়া জুতা ও দুই দিব্যসুন্দর নারীর হার দিয়ে তাঁকে লক্ষণ সেনের রাজ্যে একটি দেবসদন বা মসজিদ নির্মাণের দায়িত্ব দেন।[৭২] 'পূর্বের দেশ' সফরের পর শেখ জাদুর জুতা পরে সেন রাজার রাজধানী নগরীতে গঙ্গার তীরে পৌঁছালেন।

'গঙ্গা গঙ্গা' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করার পর (নদী) দেবীর প্রতি মাথা নত করার পর রাজা তাঁকে পশ্চিমদিকে পানির উপর (হাঁটতে) দেখলেন। কালো পোশাকে পাগড়ি পরে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের মতো তিনি রাজার দিকে দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে

৬৭. Sukumar Sen, ed. and trans., *Sekasubhodaya of Halayudha Misra* (Calcutta: Asiatic Society, 1963), ix-ix. এই গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপি ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে পাণ্ডুয়ার বাইশ হাজারি মসজিদে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে এটি তাবিজ-কবজ হিসেবে ব্যবহৃত হতো, ভয়াবহ কোন দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে এটি বের করে পাঠ করা হতো।

৬৮. Ibid., iii. গ্রন্থটিতে ঘোষণা করা হয়েছে, "যেই শেখের কথা শুনবে বা তার শুভাগমনের কথা অন্যদের শুনাবে, তার কোন ক্ষতি হবে না এবং তার সমৃদ্ধি বাড়তেই থাকবে। Ibid., 255.

৬৯. Ibid., 160

৭০. Ibid., 179

৭১. গ্রন্থটিতে তাঁর আগমনের তারিখ দেওয়া হয়েছে ৬০৪ হিজরী তথা ১২০৭-৮ খ্রিস্টাব্দ, সেই অনুযায়ী তিনি তর্কী বিজয়ের চার বছর পর এসেছেন বলে ধরতে হবে। Ibid., 255.

৭২. Ibid., 179

আসতে লাগলেন।--- রাজা বললেন, 'আমি যেন বিস্ময়কর কিছু দেখলাম: (একটি লোক) নদী থেকে উদিত হয়ে পানির উপর হাঁটতে লাগলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রায়শ্চিত্তের উজ্জ্বলতায় ফুটে উঠতে লাগলো।[৭৩]

দুজনে মিলিত হলেন, রাজার 'পৃথিবীর শাসক' পদবির বৈধতা নিয়ে শেখ প্রশ্ন করলেন এবং নিকটস্থ একটি বকের ঠোঁটে থাকা মাছকে মুক্ত করার চ্যালেঞ্জ জানালেন হিন্দু রাজাকে। রাজা যখন তা পারলেন না, তখন শেখ স্রেফ পাখিটির দিকে তাকানো মাত্র সেটি সাথে সাথে মাছটিকে ফেলে দিল। এটা দেখে বিস্মিত লক্ষণ সেন শেখের নিকট প্রাসাদ চাইলেন,[৭৪] এবং তখন থেকে তিনি শেখ তাবরিজির একনিষ্ঠ পূজারী হয়ে গেলেন এবং শেখ তাঁকে আশ্বস্ত করলেন, তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত (এখানে) থাকবেন, তার কোন ভয় নেই।[৭৫] এদিকে শেখ বেশ কিছু কেরামত প্রদর্শন করেন, যেমন জনৈক ধোপার পুত্রের জন্য হুমকি সৃষ্টিকারী তিনটি বাঘকে বশ মানানো, এক মৃত লোককে বাঁচিয়ে তোলা এবং ঝড়ে বিধ্বস্ত একটি জাহাজকে উদ্ধার করে, নগরবাসীর মন জয় করলেন।[৭৬]

তবে যখন শেখ তাবরিজি প্রাচীন হিন্দু রাজনৈতিক কেন্দ্র পাণ্ডুয়ায় একটি মসজিদ নির্মাণ করতে চাইলেন, তখন গল্পটি নিয়ে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হয়। মসজিদের জন্য নির্ধারিত স্থান থেকে প্রথমে ভূত-প্রেতদের তাড়িয়ে শেখ পবিত্র পানি ছিটিয়ে স্থানটিকে পবিত্র করলেন প্রধানপুরুষের দিকে ফিরে, পূর্বে সূর্যোদয়ের পর্বতের প্রতি, উত্তরে হিমালয়ের প্রতি, বিশ্বমানুষের প্রতি, তাঁকে সম্মান করে এমন সকল রাজার প্রতি, গ্রামের যে তাঁর প্রতি সম্মান দেখাবে তাঁকে, যারা অর্থ ও সন্তান মানত করবে তাদের জন্য।[৭৭] লক্ষণ সেন তাঁর পক্ষ থেকে মসজিদের জায়গার জন্য বনের ভূমি দান করলেন এবং তা নির্মাণের জন্য শ্রমিকদের শ্রমদানের নির্দেশ দিলেন। এরপর শেখ 'দেশ থেকে মানুষদের ডাকলেন এবং সেই ভূমিতে তাদের বসতি স্থাপন করতে দিলেন।'[৭৮] এখানে আমরা মুসলমান সাধুপুরুষ ও হিন্দু রাজার মধ্যকার শ্রম বিভাজন দেখতে পাই: প্রথমজন মসজিদ নির্মাণের জন্য জাদুক্ষমতা ও ধর্মাচার পালনকে যথাযথ কাজ মনে করেছেন এবং দ্বিতীয়জন বনজ ভূমি দান এবং শ্রমশক্তির যোগান দিয়ে রাজকোচিত কাজ করেছেন। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, ভূমিটির বন থেকে ধানক্ষেতে পরিবর্তনে শেখ কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছেন; আর রাজা নন, তিনিই সাবেক বনজ ভূমিতে বসতি স্থাপনের জন্য মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

---

৭৩. Ibid., 135
৭৪. Ibid., 136-37
৭৫. Ibid., 194
৭৬. Ibid., 142-43, 151
৭৭. Ibid., 217.
৭৮. Ibid., 218, 220

গ্রন্থটিতে এটাও বলা হয়েছে, নির্মাণের পর মসজিদটি কিভাবে পরিচালিত হয়েছে। শেখ লক্ষণ সেনকে অবগত করেন যে, প্রতিষ্ঠানটির এমন সম্পদ থাকতে হবে যাতে রাজা বা ভিখারি সবাইকেই প্রতিদিন পঞ্চাশ মুদ্রা করে দান করা যায়। এজন্য অর্থ চাওয়া হলে রাজা জবাব দেন, তিনি নগদ দিতে পারবেন না, তবে তার বদলে তিনি গ্রাম ও ভূমিদান করবেন। এরপর শেখ তাবরিজি বসতি স্থাপনকারী গ্রামবাসীদের তালিকা তৈরি করলেন, তাদেরকে জরিপ করার নির্দেশ দিলেন এবং হিসাব করে দেখলেন তাদের সম্মিলিত রাজস্ব হয় ২২০০০ (মুদ্রা)।[৭৯] গ্রন্থটিতে বলা হয়, 'তারপর শেখ (সকলকে) একত্রিত করলেন এবং বসতি স্থাপনের দলিলপত্র প্রদান করলেন।' এটা করার পর তিনি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, মুসাফির, নিচু জন্মের লোক ও দরিদ্রদের জন্য দাতব্য রাজস্ব থেকে প্রতিদিন দানের ব্যবস্থা করলেন।[৮০]

এখানে আমরা 'ঐতিহাসিক' শেখ জালালউদ্দিন তাবরিজিকে পুনরাবিষ্কারের চেষ্টা করছি না। আমরা বরং শেক শুভদয়ায় লোকজ প্রক্রিয়ার উন্মোচন দেখতে পারছি: শেখের কর্মজীবনকে সমগ্র বদ্বীপের মানুষের ঐতিহাসিক পরিবর্তনের অভিজ্ঞতার রূপক হিসেবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সর্বোপরি, গ্রন্থটিতে বাঙালি হিন্দু জগৎ থেকে বাঙালি মুসলমান জগতে ক্রমাগত সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে, ষোড়শ শতকে যা ব্যাপকতর হয়েছে, তখনই গ্রন্থটি বর্তমান অবয়ব পেয়েছে। এটা অংশত করা হয়েছে পরিচিতির ছদ্মাবরণে নতুনকে উপস্থাপন করার মাধ্যমে। এমনকি শেখ তাবরিজি যা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, প্রাথমিকভাবে তা ছিল ভিনদেশি ধর্মমত, তিনি তা করেছিলেন একটি হিন্দু কল্পনাপ্রসূত কাঠামোর মধ্যে: তাঁর ব্যক্তিত্ব *তপোপ্রভাবে* আলোকিত, যা নির্জন তপস্যা সাধনার মাধ্যমে প্রাপ্ত শক্তির ভারতীয় চিরায়ত চিন্তাধারা; তিনি রাজাকে যে 'অনুগ্রহ' দিলেন তা ছিল কেবল হিন্দু দেবতার তার পূজারীকে খাদ্য হিসেবে প্রদান করা প্রসাদ; শেখ যে ধর্মাচারের মাধ্যমে মসজিদকে পবিত্র করলেন, তা কোন হিন্দু মন্দিরের পবিত্রকরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; শেখের পৃষ্ঠপোষক ঈশ্বর 'আল্লাহ' যদিও কোন হিন্দু দেবতার মতো নয়, কিন্তু তবুও তাঁকে সেই শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে এবং তাই তাঁর চলমান নাম দেওয়া হয়েছে প্রধানপুরুষ।

মঙ্গল-কাব্য সাহিত্যের সকল কিংবদন্তিতুল্য গুণগত বৈশিষ্ট্য ছেঁটে ফেলে, শেক শুভদয়ায় প্রাক-আধুনিক সময়কালে ইসলামী সীমান্ত ও কৃষিজ সীমান্ত কিভাবে একই বিন্দুতে মিলিত হয়েছিল, তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শেখকে একজন মুজাহিদ হিসেবে

৭৯. Ibid., 220, 222-24. জালালউদ্দিন তাবরিজির এস্টেট এখনো "বাইশ হাজারি" হিসেবে পরিচিত এবং ফকির ও দরিদ্রদের দেখাশোনার জন্য সেখানে এখনো একজন *মোতাওয়াল্লি* আছেন। 'Abid Ali Khan, *Memoirs of Gaur and Pandua*, ed. H.E Stapleton (Calcutta: Bengal Secretariat, 1931), 99.

৮০. Sen, *Sekasubhodaya*.

উপস্থাপনের বদলে-বর্ণনায় কোথাও তাঁকে পাণ্ডুয়ায় হিন্দুদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ করার কথা বলা হয়নি– গ্রন্থটিতে ইসলামের সম্প্রসারণের সাথে কৃষিজ সমাজের বিকাশকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে গল্পটির কয়েকটি উপাদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ: (১) শেখের আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব ও সাংগঠনিক সামর্থ্য, (২) মসজিদ নির্মাণ, (৩) প্রতিষ্ঠানের প্রতি রাষ্ট্রীয় সমর্থন, (৪) বনজ ভূমির বসতিগুলোকে প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তরে শেখের উদ্যোগ এবং (৫) সাবেক বনজ ভূমিকে সম্পদ সৃষ্টিকারী কৃষিজ সম্প্রদায়ের কাছে হস্তান্তরকরণের ফলে মসজিদের প্রতি সমর্থন অব্যাহত থাকা। এভাবে, পৃষ্ঠপোষকতার একটি মডেল—অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদভূমির সাথে এবং রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্রের সাথে-আঁকেন যা ছিল বদ্বীপ জুড়ে মুসলমান কৃষিজ সভ্যতার সম্প্রসারণের মৌলিক চিত্র।

সংক্ষেপে, ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে বাঙালিরা তিনটি অতিক্রমশীল ভিত্তির উপর স্থাপিত আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন পীরদের কর্তৃত্বের স্মৃতি জাগরূক রেখেছিল: বনের সাথে তাদের সম্পর্ক, বন্য ও বিপদজ্জনক এই এলাকা যা তারা বশ মানিয়েছে বলে বিশ্বাস করা; একটি অতিলৌকিক বিশ্ব, বিস্ময়কর ও শক্তিশালী ক্ষেত্রের সাথে তাদের সম্পর্ক থাকা, যার মাধ্যমে তারা অব্যাহত প্রভাব সৃষ্টির অধিকারী হতো; এবং মসজিদের সাথে তাদের সম্পর্ক, যা তারাই নির্মাণ করেছে বলে বিশ্বাস করা হতো এবং তার মাধ্যমে ইসলামী ধর্মবিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণ। প্রথম দুটি ভিত্তিতে কোন পীর থাকতে পারেন, আবার নাও পারেন, কিন্তু তৃতীয়টির বেলায় প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাঁদের কেউ না কেউ উপস্থিত ছিলেন, যাতে শেখ তাবরিজির পাণ্ডুয়ার মসজিদের দৃষ্টান্তমূলক মডেলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

অধিকন্তু, নোয়াখালির পীর উমর শাহের পুত্রদের ঘটনায় দেখা যায়, তাঁদের কিছু লোক বা তাঁদের বংশধর ক্ষুদে ভূস্বামীতে পরিণত হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা ভূস্বামীর মর্যাদা বা এ ধরনের কোন কিছুর অধিকারী হয়েছে, সেখানে একটি নতুন শ্রেণীর—বাংলার 'ধর্মীয় সম্প্রদায়ের'—উদ্ভব হয়েছে। ভূমির অধিকারের সাথে ধর্মানুরাগের মিলনে এই সম্প্রদায়টি মোগল আমলে বাংলার পল্লী এলাকায় ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণে সিদ্ধান্তসূচক ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের কাছে থাকা দুই শ্রেণীর তথ্য এই সম্প্রদায়ের বিবর্তন ফুটিয়ে তুলছে: ভূমি হস্তান্তর সংক্রান্ত সমসাময়িক পারসি ভাষার রেকর্ডসমূহ এবং বিংশ শতকের প্রথম দিককার পল্লী জরিপসমূহ। এই অধ্যায়ের বাদবাকি অংশে বাংলার সক্রিয় বদ্বীপের দুটি জেলা: বাকেরগঞ্জ ও ঢাকার সাথে সম্পর্কিত দ্বিতীয় ধরনের তথ্য পরীক্ষায় ব্যয়িত হবে।

বাকেগঞ্জ ও ঢাকার ধর্মীয় সম্প্রদায়: ১৬৫০-১৭৬০

বর্তমানকালের বৃহত্তর বরিশাল ও পটুয়াখালী নিয়ে গঠিত বাংলার নিম্নতর উপকূলীয় অঞ্চলটিকে মোগল আমলে সরকার বাকলা ও বৃটিশ আমলে বাকেরগঞ্জ

জেলা বলা হতো, যা দীর্ঘদিন ধরে ছিল একটি অর্থনৈতিক সীমান্ত এলাকা। বদ্বীপের সক্রিয় অংশের কেন্দ্রে অবস্থিত বাকেরগঞ্জ বাংলার ভৌগোলিকভাবে নবীনতম জেলাগুলোর অন্যতম। পুরো এলাকাটি গঠিত হয়েছে ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা সম্মিলিত নদীব্যবস্থার বিশাল প্রবাহগুলোর বয়ে আনা পাললিক মাটিতে ও রূপান্তরিত দ্বীপগুলোর মাধ্যমে সৃষ্ট জলাভূমির মিলনের ফলে। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমদিকে এই বনজ অঞ্চলটি উত্তর-পশ্চিম বাংলার ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদকৃত হিন্দু গোষ্ঠিপতিদের আশ্রয়ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

এখানে তারা তুর্কী অশ্বারোহী বাহিনীর নাগালের বাইরে অবস্থান করে বড় বড় নদীগুলোর তীরে ও বনজ দ্বীপগুলোতে নিজেদের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে। জে. সি. জ্যাক জেলাটির সেটেলমেন্ট রিপোর্টে যেমনটি লিখেছেন, 'বিশাল নদীব্যবস্থা তাদের যন্ত্রণাদানকারী পশ্চাদ্ধাবনকারীদের রশি টেনে ধরলেও একইভাবে তাদের রাজ্যের আকারও সীমিত করে দেয়, যা ছিল মিঠা পানির নদীগুলোর তীরে গুচ্ছকার এবং যা ছিল অপ্রবেশযোগ্য বনে ঘেরা।'[৮১]

মোগল বিজয়ের সময়ে হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ উত্তর ও পশ্চিম বাকেরগঞ্জে সীমাবদ্ধ ছিল এবং অন্যদিকে জেলাটির দক্ষিণাঞ্চলীয় অংশগুলো ছিল জঙ্গলে ঢাকা ও খাড়ি দিয়ে বিভক্ত, যা সময়ের পরিক্রমায় জলাভূমিতে পরিণত হয়। বাকেরগঞ্জের উত্তর-পশ্চিম অংশেই কেবল বৃটিশ আমলের প্রথম দিককার আদমশুমারি রেকর্ডসমূহে মুসলমানের চেয়ে হিন্দুর সংখ্যা বেশি দেখা যায়, কারণ হিন্দু অভিবাসীরা এই এলাকায় ঢুকে পড়ায়, প্রধানত চণ্ডাল মৎস্যজীবী জাতিগুলো নিয়ে গঠিত সেখানে আগে থেকে বসবাসকারী স্থানীয় গ্রুপগুলো কৃষিজীবী হিসেবে হিন্দু সমাজে মিশে যায়।[৮২] বর্তমানে তারা পূর্ববাংলায় বৃহত্তম হিন্দু কৃষক সম্প্রদায় নমশুদ্র নামে পরিচিত।

বাকেরগঞ্জের বনজ ও জলাভূমিতে দ্বিতীয় দফায় ব্যাপক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্প্রসারণ সংঘটিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে। এবারে মুসলমান পথপ্রদর্শকরা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে বলে ধারণা করা হয়।

৮১. J.C. Jack, Final Report on the Survey and Settlement Operations in the Bakarganj district, 1900-1908 (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1915), 45.

৮২. Ibid., 17; H. Beveridge, *The District of Bakarganj: Its History and Statistics* (London: Trubner, 1876), 229-30, 142. হিন্দু ঔপনিবেশিকরা মোগল আমলে বাকেরগঞ্জের উত্তরাঞ্চলে বসতিস্থাপন অব্যাহত রাখে। ১৯০৬ সালের স্বরূপকাঠি থানার একটি জরিপে বলা হয়, "পাল, দাস ও চন্দ্ররা মালিক, তারা প্রায় ২২০ বছর আগে (অর্থাৎ ১৬৮৬ সালে) নায়েরকালেরির তদানিন্তন জমিদারদের নিকট থেকে কৃষি জমি ইজারা নেওয়ার জন্য এখানে এসেছিল। "Mauza Notes," Barisal District Collectorate Record Room, Swarupkati Thana, vol. 2 R.S. 2984.

সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে প্রাদেশিক মোগল রাজধানী হিসেবে ঢাকার আত্মপ্রকাশের ফলে আগের যে কোন সময়ের চেয়ে বাকেরগঞ্জ অঞ্চল উদ্যোক্তা ও ভূমি-উন্নয়নকারীদের জন্য অনেক বেশি সহজে প্রবেশযোগ্য হয়। কিন্তু দক্ষিণপূর্ব বাংলার নদীসমূহ ও উপকূল জুড়ে আরাকানি ও দলত্যাগী পর্তুগীজ জলদস্যুদের অব্যাহত উৎপাতে মোগল সুবেদাররা বাকেরগঞ্জের জঙ্গলসমূহে স্থায়ী অভিযান চালাতে উদ্যোগী হয়।[৮৩] ১৬৬৬ সালের পর মোগল নৌবাহিনী মেঘনা মোহনাকে এ ধরনের বাইরের হুমকি থেকে মুক্ত করার ফলে বাকেরগঞ্জের অভ্যন্তরভাগ উপনিবেশকারীদের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠে। ভূমি উন্নয়নকারীরা ঢাকা বা ১৭০৪ সালের পর থেকে মুর্শিদাবাদের প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ থেকে তালুক সংগ্রহ করে।[৮৪] সপ্তদশ শতকের শেষভাগ থেকে প্রাচুর্যপূর্ণ ও সহজলভ্য এসব ভূখণ্ডের মালিকরা স্থায়ী ভিত্তিতে মালিকানা লাভ করায় তাদেরকে তালুকদার হিসেবে অভিহিত করা হতো।[৮৫] নিজেদের *তালুকগুলোকে* কৃষিজ উৎপাদনের আওতায় আনা এসব ব্যক্তি অকৃষক মধ্যস্থতাকারী বা *জমিদার* নামে পরিচিত এক শ্রেণীর লোকের মাধ্যমে ভূমি রাজস্ব প্রদান করতো। পরে এসব লোক বা তাদের এজেন্টরা বৈশিষ্ট্যসূচকভাবে প্রাদেশিক রাজধানীতে বসবাস করতে থাকায় তারা সহজেই প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা *(দেওয়ান)* বা তার কর্মচারিদের কাছে সহজেই প্রবেশাধিকার পেত। বাকেরগঞ্জে বন পরিষ্কার এবং ভূমি পুনরুদ্ধারের জটিল প্রক্রিয়ায় শৃঙ্খলের উচ্চতর স্তরের জমিদার থেকে নিম্নতর স্তরে প্রকৃত চাষীদের মাঝামাঝিতে অবস্থান করছিল তালুকদার ও উপ-তালুকদাররা। জ্যাক

---

৮৩. ১৬৬৫ সালে বাংলায় অবস্থানকারী ফ্রঁসোয়া বারনিয়ার লিখেন যে, দলত্যাগী পর্তুগীজরা আরাকানি রাজার নিরাপত্তার আওতায় থেকে "লুটপাট আর দস্যুতা ছাড়া আর কোন কাজই করতো না। *গ্যালেসেজ* নামে অভিহিত পালতোলা হালকা জাহাজে করে তারা সমুদ্রের আশেপাশের এলাকা চষে ফেলতো এবং গঙ্গার নিম্নভাগের নানা শাখা ওপ্রশাখা নদী বেয়ে নিম্নবঙ্গের দ্বীপগুলোতে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতো, প্রায়ই এই দেশটির চল্লিশ বা পঞ্চাশ লিগ ভিতরে অনুপ্রবেশ করতো এবং হাটের দিনে হঠাৎ করে তারা গ্রামগুলোর সবাইকে ধরে নিয়ে যেত। ---লুণ্ঠনকারীরা তাদের অসহায় বন্দীদের ক্রীতদাস বানাতো এবং যা কিছু নিতে পারতো না, তাতে আগুন লাগিয়ে দিত। বারংবারের এইসব লুটপাটের কারণেই গঙ্গার মুখে এতো সুন্দর অনেক দ্বীপ, যা এক সময়ে ঘন জনবসতি ছিল, তা এখন পুরোপুরি জনশূন্য এবং বাঘ এবং অন্যান্য বন্য প্রাণীর নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হয়েছে।" Bernier, *Travels in the Mogul Empire*, 175.

৮৪. পরবর্তীতে মুর্শিদ কুলি খান হিসেবে পরিচিত *দেওয়ান* (প্রধান প্রাদেশিক রাজস্ব কর্মকর্তা) যখন ১৭০৪ সালে তাঁর বাসভবন মাখসুসাবাদে (পরবর্তী নাম মুর্শিদাবাদ) নিয়ে গেলেন তখন ঢাকা থেকে সেখানেই বাংলার রাজস্ব প্রশাসন স্থানান্তরিত হয়। সেই বছর রাজকীয় টাকশাল সেখানেই স্থাপিত হয়। মুর্শিদ কুলি খানকে যখন ১৭১৫-১৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সুবেদার (১৭১৩ সাল থেকেই তিনি ছিলেন কার্যকর সুবেদার) করা হয়, প্রাদেশিক সদর দফতর আনুষ্ঠানিকভাবে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। দেখুন Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Times* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1963), 21-24, 63.

লিখেন, 'এসব তালুকদারের সাধারণত তাদের তালুকের পুনরুদ্ধারে ব্যক্তিগত অংশগ্রহণের কোন ইচ্ছা ছিল না এবং তারা একই ব্যবস্থায় সেগুলো অন্যদের ইজারা প্রদানের উদ্যোগ নিত, তবে সাধারণত জমিতে কৃষকদের বসতি গড়ার মতো সামর্থ্যবান লোকদের তারা বাছাই করতো।' অন্য কথায়, বাকেরগঞ্জে কৃষি উন্নয়নের ব্যাপক বিকাশ কার্যত পুঁজিবাদি ফটকাবাজ বা চিরায়ত রাজস্ব কৃষকদের অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগীদের সুযোগ করে দেয়। সবকিছু মিলিয়ে তারা এমন একটি জটিল আধা-সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর সৃষ্টি করে, যা জ্যাকের ভাষায় 'বিশ্বের ভূমি ভোগদখলের নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যঙ্গচিত্র।'[৮৬] বস্তুত, সম্প্রসারণযোগ্য কোন অর্থনৈতিক সীমান্তের জন্য যথাযথ ভূমি ভোগদখল ব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণিত হয়। জ্যাক নিজেই লক্ষ্য করেছেন,

বনের ভূমি পুনরুদ্ধার সহজ কোন কাজ নয়। নিয়মিত কৃষিকাজের উপযোগী করার মতো কোন ভূমি পরিষ্কার করতে তিন বা চার বছর সময়ের প্রয়োজন, আর এ সময়ে কৃষক ও শ্রমিকদের এমন এক এলাকায় অবস্থান করতে হয়, যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা কঠিন, নদীসমূহ বিপজ্জনক এবং হাটবাজার স্বল্প। দায়দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেওয়া হলে এ ধরনের কাজ সহজ হয়ে যায় এবং পেশা বহির্ভূতরা প্রচুর সংখ্যায় ঢাকায় থাকার সময়ে পুনরুদ্ধারের কাজটি সংঘটিত হয়েছিল। এ ধরনের লোকজন ধনী হতে ব্যগ্র ছিল এবং চাষবাসের কাজে জাতপাত মেনে চলার ধার ধারতো না বরং বসতি গড়ার দিকে তাদের আকর্ষণ ছিল ও তারা তাদের আশেপাশে বসবাসকারী রাজা রাজবল্লভ ও আরো কম গুরুত্বপূর্ণ লোকদের অনুসরণ করতো। ভূমির মালিকদের তাদের বনভূমি পুনরুদ্ধারের শক্তি বা সম্পদ কোনটাই না থাকায় তারা স্বাভাবিকভাবে প্রায়ই সহায়তার জন্য তাদের বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের দিকে তাকাতো।[৮৭]

আলোচ্য অংশটিতে মোগল আমলের পূর্ব-বাংলায় সৃষ্ট ব্যতিক্রমধর্মী ভূমি ভোগদখল ব্যবস্থার উৎপত্তির ইঙ্গিত দিচ্ছে। আবাসিক ব্রাহ্মণদের তীব্র সংকটপূর্ণ একটি অঞ্চলে সামাজিক আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে দক্ষিণ বদ্বীপে আগে থেকেই নিজেদের

---

৮৫. বি. আর. গ্রোভার লিখেন, "১৭তম ও ১৮তম শতকে ব্যাপক বিক্রিজনিত লেনদেনের ফলে বিপুল সংখ্যায় ক্ষুদে *তালুকদার* শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ঘটে। যে ব্যক্তি রাষ্ট্র থেকে *জমিদারি* সংগ্রহ করতে পারতেন না, তিনি আসল *জমিদারের* নিকট থেকে কয়েকটি গ্রামের *জমিদারি* স্বত্ব ক্রয় করতে পারতেন এবং *তালুকদার* নামে পরিচিত হতেন। সাধারণভাবে ছোট আকারের *জমিদারির* বিক্রি বা বন্ধকির জন্য সরকারের আগাম কোন অনুমতির প্রয়োজন হতো না [,] তবে বিশাল আকারের *জমিদারির* অংশ লেনদেনের জন্য সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হতো এবং সাধারণভাবে সবস ময়েই রাষ্ট্র তা অনুমোদন করতো। "Evolution of the Zamindari and Taluqdari System in Bengal (1576-1765 AD)."in *Bangladesh Itihas Parishad: Third History Congress, Proceedings* (Dacca; Bangladesh Itihas Parishad, 1973), 110.

৮৬. J.C. Jack, *Final Report— Bakarganj District*, 58.

৮৭. Ibid., 59.

প্রতিষ্ঠাকারী উচ্চবর্ণের হিন্দুরা উচ্চবর্ণের জমিদারদের সেই অঞ্চলে বসতি স্থাপনে উৎসাহিত ও সম্ভবত অর্থায়ন করতে থাকে।[৮৮] কিন্তু জ্যাক লক্ষ্য করেছেন, সামাজিক বিধিনিষেধের প্রতিবন্ধকতার কারণে তারা কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করতে না পারায় এসব হিন্দুরা ভোগদখলের শৃঙ্খলের উচ্চতর স্তরেই আধিপত্য করতে থাকে। অন্যদিকে সেই একই শ্রেণী–বিশেষ করে ব্রাহ্মণ বা বৈদ্য ব্যবসায়ী বা মহাজনরা নিম্নতর ইজারাদারদের আগাম ঋণ দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহ করে; এবং এগুলো আবার তাদের নিচে থাকা ইজারাদারদের দেওয়া হয়, এভাবে ভোগদখলে একেবারে সর্বনিম্ন স্তরে থাকা সাধারণ চাষীদের কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত নামতে থাকতো। আদিবাসী লোকদের মধ্য থেকে কিংবা বাইরে থেকে যেভাবেই সংগৃহীত হোক না কেন, এই শেষোক্তরাই জঙ্গল থেকে নব-উদ্ধারকৃত জমিতে সাধারণ চাষী হিসেবে কাজ করতো।

এই ভোগদখলের শৃঙ্খলের অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ছিল মুসলমান ধর্মীয় সম্প্রদায়, যারা *তালুকদার* হিসেবে মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করে *জমিদার* ও চাষীদের মাঝখানে অবস্থান করতো। জ্যাকের মতে, প্রাথমিক বৃটিশ সূত্রগুলোর বর্ণনা অনুযায়ী, *কাজি, পীর বা* স্রেফ *শেখ* হিসেবে এসব মানুষ 'মুসলমান অভিযাত্রীদের' একটি বড় অংশ গঠন করেছিল, যারা উচ্চবর্ণের হিন্দু 'পুঁজিপতিদের' অতিরিক্ত হিসেবে বসতি স্থাপন আন্দোলনের পুরাভাগে থাকতো।[৮৯] এই সম্প্রদায়ের মানুষদেরই মোগল যুগে প্রায়ই কৃষিজ বসতি স্থাপনে মূল স্থপতি হিসেবে কৃতিত্ব দেওয়া হয়। উদাহরণ হিসেবে, ১৯০২ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত বাকেরগঞ্জের বুরহানুদ্দিন থানার প্রস্তুত পল্লী জরিপের রেকর্ডে বলা হয়, 'এই মৌজার (বসতি) উক্ত নাম (কাজি আবাদ) হয়েছে জনৈক *কাজির* ('বিচারক') থেকে, যিনি এখানে প্রথমে বসতি স্থাপন করেছিলেন।----এখানকার মানুষ প্রধানত মুসলমান।'[৯০] গৌড়নদী থানায়, 'মুসলমানরা তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উৎসের জন্য জনৈক কাজির কাছে ঋণী, যিনি এই গ্রামের অন্যতম আদি বসতি স্থাপনকারী।'[৯১] কিংবা আরেকভাবে বলা যায়, 'এই গ্রামে প্রথম বসতি স্থাপনকারীদের কয়েকটি পরিবার ছিল মুসলমান কাজি। তারা এক

৮৮. ১৯০৪ সালে পরিচালিত এক জরিপে বলা হয় যে, বরিশাল থানায়, " রহমতপুরের চক্রবর্তীরা আগে উত্তর রহমতপুরে বসবাস করতো, পরে এই মৌজায় (গ্রামে) বসতি স্থাপন করে। রহমতপুরের চক্রবর্তীরা ছিল গোঁড়া ব্রাহ্মণ এবং তারা দাদের সামাজিক অবস্থান উঁচুতে রাখার জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে বিপুল সংখ্যক কুলিন ব্রাহ্মণ নিয়ে আসে এবং এখানে তাদেরকে বসতি স্থাপন করে দেওয়া হয়। " Mauza Notes," Barisal District Collectorate Record Room, Barisal Thana, vol. 2, R.S. 2120.

৮৯. J.C. Jack, *Final Report— Bakarganj District*, 46.

৯০. "Mauza Notes," Barisal District Collectorate Record Room, Barahanuddin Thana, R.S. 1846.

৯১. Ibid., Barisal Thana, vol. 1, R.S. 696.

সময়ে ছিল সমৃদ্ধ। জনসংখ্যা ৭১৫, যার অধিকাংশ মুসলমান।'[৯২] একইভাবে ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জে পুরোপুরি মুসলমান জনঅধ্যুষিত গ্রাম কুতুবপুরের নাম হয়েছে পীর কুতুব নামক জনৈক দরবেশের থেকে, যিনি, আমাদের বলা হয়েছে, 'যখন এখানে কোন বসতি ছিল না' বা এলাকাটিতে বিক্ষিপ্ত গুটিকতেক ঘর ছিল, তখন এখানে বসতি স্থাপন করেন।[৯৩]

পল্লীর পটভূমিতে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে এসব লোক দুটি পন্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, উচ্চতর কোন কর্তৃপক্ষ থেকে, হয় স্থানীয় কোন গোষ্ঠীপতি বা প্রাদেশিক রাজধানীর কোন রাজস্ব ঠিকাদারের নিকট থেকে, তারা *তালুক* সংগ্রহ করে জঙ্গল বা জলাভূমি পরিষ্কারের কাজে চলে যেত এবং সেই ভূমিতে বসতি স্থাপন করতো। নিম্নতর ইজারাদারদের পুনরুদ্ধারের কাজ অধীনচুক্তির মাধ্যমে লাভের আশায় ফটকাবাজরা মোগল রাজস্ব দাবি প্রদান করতে সম্মত হতো। এভাবে শেষোক্তরা তাদের পুরো অঞ্চলের কার্যকর ভূস্বামী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতো, যা শেষ পর্যন্ত বসতি স্থাপনকারী সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হতো। সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে, পটুয়াখালির মিঠাপুর নামক একটি মুসলমান বসতি প্রতিষ্ঠার সাথে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডটিতে এটাই ঘটতে দেখি। (জনৈক শেখ গাজি অষ্টাদশ শতকে)?

> জানকি বল্লভ রায় নবাবের (তথা সুবেদার) নিকট থেকে আওরঙ্গপুরের জমিদারি পাওয়ার পরপরই তিনি তার (রায়) সাথে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলেন। জানকি বল্লভ সুন্দরবনের (অর্থাৎ জঙ্গল) থেকে ভূমি পুনরুদ্ধার কাজে এই লোকটির নিকট থেকে বস্তুগত সহায়তা পেয়েছিলেন। শেখ গাজি এর পরপরই মিঠাপুরে বসতি স্থাপন করেন।[৯৪]

এখানে অষ্টাদশ শতকের বাকেরগঞ্জের বনজঙ্গলে উপ-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি চিরায়ত নক্সা দেখা যায়: একজন অনুপস্থিত হিন্দু মোগল সুবেদারের নিকট থেকে *জমিদারি* স্বত্ব লাভ করলেন এই শর্তে যে, ভূমি রাজস্ব হিসেবে তাঁর স্বীকৃত সরকারের নির্ধারিত পরিমাণে অর্থ প্রদানের জন্য তিনি কোন প্রদত্ত তালুক থেকে যত সম্ভব সম্পদ আহরণ করতে পারবেন। *জমিদার* তখন জঙ্গল পরিষ্কার ও ধান চাষের জন্য জমি প্রস্তুতের কষ্টকর কাজ সংঘটনের জন্য কয়েকজন উদ্যোক্তা মধ্যবর্তী লোক, বিশেষভাবে মুসলমান ক্ষুদে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের একজন সদস্যকে নিয়োগ করেন। অনেক ক্ষেত্রে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াটি সাম্প্রদায়িক সীমারেখার মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতো। উপরে উল্লিখিত উদাহরণে দেখা যায়, হিন্দু জানকি রায় সুবেদারের সাথে

৯২. Ibid., vol. 2, R.S. 717.

৯৩. "Mauza Notes," Dhaka District Collectorate Record Room, Narayanganj Thana, vol. 3, No 4534.

৯৪. " Mauza Notes," Barisal District Collectorate Record Room, Patuakhali Thana, vol. 2 R.S.2855.

চুক্তি করেছেন এবং তিনি প্রাদেশিক রাজস্ব কর্মকর্তাদের সাথে কর প্রদানের বিষয়টি নিষ্পত্তি করেছেন। সেই সময়ে রায় পুনরুদ্ধার কাজ থেকে সরে গেছেন, শেখ গাজি নামের একজন মুসলমানের নিকট থেকে 'বস্তুগত সহায়তা' পাওয়ায় তার ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের বিষয়টি বোঝা যায় এবং তিনিই প্রকৃতপক্ষে বন পরিষ্কারের কার্যক্রম সংঘটিত করে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

তাই, হিন্দু 'পুঁজিপতি' ও মুসলমান 'অভিযাত্রী'—এই দুই ভিন্ন শ্রেণীর উন্নয়নকারী পৃথক পৃথকভাবে বাকেরগঞ্জে গমন করেছেন বলে জে. সি. জ্যাক যে চিত্র এঁকেছেন, তার বিপরীতে, দৃশ্যত ভূমি ভোগ-দখলের শৃঙ্খলের ভিন্ন প্রান্তে থেকেও দুটি শ্রেণীই একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে অগ্রসর হয়েছে। প্রভাবশালী শহুরে হিন্দুরা নগদ অর্থ সরবরাহ করেছে বা অন্তত সরকারের রাজস্ব পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে; এবং উদ্যোগী মুসলমানরা নির্দিষ্ট স্থানে শ্রমিক শক্তির চলাচলে পারদর্শিতা প্রদর্শন করে সাংগঠনিক সামর্থ্য এবং আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় দিয়েছে। এই সহযোগিতা প্রাক-১৯৪৭ পূর্ববাংলায় ভূমি ভোগ-দখলের বাহ্যিক অবস্থা নির্ধারণে ব্যাপক অবদান রেখেছে, যেখানে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা, বিশেষত অনুপস্থিত *জমিদাররা* ভোগ-দখলের উচ্চপ্রান্তে এবং মুসলমান চাষীরা নিম্নতর প্রান্তে আবির্ভূত হয়েছিল।

ভূমি উন্নয়নের দ্বিতীয় ছকে মুসলমান *পীর* বা *কাজিরা* সরাসরি অকৃষিজ এলাকায় গিয়ে স্থানীয় লোকদের জঙ্গল পরিষ্কারে সংগঠিত করেছে এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে প্রথমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার পরই কেবল মোগল কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে। এসব ক্ষেত্রে সরকার স্থানীয় প্রভাবসম্পন্ন যথাযথ লোককে ক্ষুদে কর সংগ্রহকারীর মর্যাদায় সমাসীন করার কৌশল অবলম্বন করে। ঢাকা জেলার দক্ষিণাঞ্চলে পানাম দুলালপুরে অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে হজরত দানের মাউ নামক জনৈক *পীরকে* ঘিরে বসতি গড়ে ওঠে। এই বসতি স্থাপনের ইতিহাসের প্রথমদিকে অধিবাসীরা শ্রদ্ধাভাজন ও জনপ্রিয় এই পীরকে নিয়মিত *নজর* দান করতো। পরে এই নজর গ্রামের প্রতিটি প্রজার নিকট থেকে নির্ধারিত হারে আদায় করা হতো। অনেক অধিবাসী—আমরা জানি না কারা—এই অর্থ দিতে অস্বীকার করে এবং বিষয়টি মুর্শিদাবাদের কর্তৃপক্ষের কাছে উত্থাপন করে, কিন্তু সেখানে তা বিবেচনা করতে অস্বীকার করা হয়। তাই পানামের মানুষ পুরো মৌজার অধিবাসীদের নিকট থেকে বার্ষিক নির্ধারিত হারে অর্থ প্রদানের শর্তে এই পীরের সাথে একটি সমঝোতায় আসতে বাধ্য হয়। এই পরিমাণ ছিল ১১৮ সিক্কা (রুপি)... এটা পুরো পানাম দুলালপুর মৌজার নির্ধারিত খাজনায় গণ্য হয় এবং হযরত দানের মাউ নামক উক্ত পীর মৌজার ভূস্বামীতে পরিণত হন এবং মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট থেকে এ ধরনের বরাদ্দ লাভ করেন।[৯৫]

৯৫. "Mauza Notes," Dhaka District Collectorate Record Room, Narayanganj Thana, vol. 9 No 4269.

হযরত দানের মাউয়ের সাধু পুরুষ থেকে ভূস্বামীতে রূপান্তরের পেছনে তাই রাষ্ট্রশক্তির হস্তক্ষেপ ছিল। ভূমি রাজস্ব পেতে অত্যন্ত আগ্রহী থাকায় সরকার দৃশ্যপটে প্রাপ্ত যেকোন স্থানীয় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিকেই দলভুক্ত করে রাজস্ব প্রদানকারী কর্মকর্তায় রূপান্তরিত করতে চেয়েছে। উপরোল্লিখিত ঘটনায় কিছু গ্রামবাসীর নজর প্রদানের অস্বীকৃতিকে ব্যবহার করে সরকার *পীরকে* প্রদানের জন্য গ্রামভিত্তিক একটি নির্ধারিত অংক নির্ধারণ করেছে; তারপর তা ভূমিকর হিসেবে পুনঃ সংজ্ঞায়িত করেছে এবং *পীরকে* রাজস্ব প্রদানকারী ভূস্বামী বানানো হয়েছে।

পীরগণ নিজেদের *জমিদার* হিসেবে সংজ্ঞায়িত না করলেও তাদের পুত্ররা ও বংশধররা প্রায়ই তা করতো, যা দেখা গেছে পূর্বে উল্লিখিত নোয়াখালির পীর উমর শাহের পুত্রদের ঘটনায়।[৯৬] তবে ধর্মীয় সম্প্রদায় ও মোগল কর্তৃপক্ষের মধ্যকার সম্পর্ক সব সময় ভাল ছিল না, কারণ পীরের কর্তৃত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতার স্বাভাবিক বন্ধন ছিল সাধারণত তাঁর নীচের কৃষকজনতার সাথে, দূরবর্তী ঢাকা বা ১৭০৪ সালের পর থেকে মুর্শিদাবাদের সুবেদার বা আমলাদের সাথে নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাকেরগঞ্জ সুন্দরবনের প্রত্যন্ত ঝালকাঠিতে অষ্টম শতাব্দীতে সৈয়দ ফকির নামক এক পীর তাঁর নামে নামকরণকৃত পুরোপুরি মুসলমান অধ্যুষিত গ্রাম সৈয়দপুরের কৃষকদের উপর প্রভূত প্রভাবের অধিকারী ছিলেন। ১৯০৬ সালের পল্লী জরিপে উল্লেখ করা হয়, 'এই অংশের মানুষ তাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে ফকিরের দিকেই তাকিয়ে থেকে নবাবের প্রাপ্য পরিশোধ না করায়' জটিলতার সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায়, সুবেদার সেনাবাহিনীর জনৈক কর্মকর্তা লালা শেঠ সিং 'ফকিরকে দেশ ত্যাগ করাতে সফল হন।' যদিও আমরা জানি না, কর্মকর্তাটি কিভাবে পীরকে গ্রামছাড়া করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তবে তিনি সফল হয়েছিলেন তা বোঝা যায়, কারণ মুর্শিদাবাদের কর্তৃপক্ষ তাঁকে *পরগনাটির* রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার দিয়ে তার কাজের জন্য তাঁকে পুরস্কৃত করে।[৯৭] এতে বোঝা যায়, রাজনৈতিকভাবে চলমান বাংলা সীমান্তে কৃষকদের আনুগত্য তাদের স্থানীয় সাধু পুরুষদের উর্ধ্বে সম্প্রসারিত হওয়াটা প্রয়োজনীয় ছিল না। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, প্রভাবশালী সাধু পুরুষদের সম্ভাব্য অন্তর্ভুক্ত করে

---

৯৬. ১৯১২ সালের পল্লী জরিপে বলা হয় যে, শাহ ফাতেহ উল্লাহ নামক একজন "প্রখ্যাত মুসলমান সাধুপুরুষ," বলা হয়ে থাকে তিনি জাহাঙ্গীরের শাসনকালে "বারজন দরবেশের একজন হিসেবে চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারের জন্য পশ্চিম থেকে এসে সেখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন।" তিনি সেখান থেকে ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশে সফর করেন, সেখানে তিনি ও তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ, তিনিও ছিলেন একজন পীর, নিজেদের প্রখ্যাত সাধক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে– কখন এবং কিভাবে তা আমাদের বলা হয়নি– তাঁদের বংশধরগণ এর প্রতিষ্ঠাতার নামে নামকৃত "ফতুল্লা" নামক একটি গ্রামের ভূস্বামী *(চৌধুরী)* হন এবং তাঁদের বংশধরগণ বিংশ শতকেও ভূস্বামী হিসেবে সেখানে বসবাস করতে থাকে Ibid., vol. 4, No.1286.

৯৭. " Mauza Notes," Barisal District Collectorate Record Room, Jhalakathi Thana, vol. 3 R.S. 2517.

নিতে সব সময়েই অগ্রাধিকার দেওয়া হলেও প্রয়োজনবোধে মোগলরা পল্লী বসতিগুলোতে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা আরোপ করতে দ্বিধা করতো না।

বিংশ শতকের প্রথমদিকে পূর্ববাংলার মুসলমান চাষীদের পরিশ্রমী, দুরন্ত এবং সামাজিকভাবে অবিন্যস্ত জনসাধারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের আনুগত্য তাদের *পীরদের* উর্ধ্বে খুব কমই উঠতে পেরেছিল। বাকেরগঞ্জের পুরোপুরি মুসলমান অধ্যুষিত একটি বসতি স্বরূপকাঠির জনসাধারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'বেশ রাগী। পরগনার ইতিহাসে তারা অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে।........ তারাই প্রথম লোক যারা... (অস্পষ্ট) কে ঘিরে সমবেত হয়েছিল... যখন তিনি তাঁর জমিদারকে তালুকে পরিণত করেছিলেন।'[৯৮] বাকেরগঞ্জের ঝালকাঠির একটি বসতি সম্পর্কে আমরা নিম্নোক্ত বিবরণ পাই, যা ১৯০৬ সালে বলা হয়েছিল:

> গ্রামটি এখন মুসলমানদের অধ্যুষিত। আগে এখানে কয়েকটি নমশুদ্র পরিবার ছিল, তবে মুসলমানদের নির্যাতনে তারা গ্রাম ছেড়ে যায়। তাদের জমিজমা ও ঘরবাড়ি এখন মুসলমানদের অধিকারে। গ্রামটির মানুষজনের সবাই খুবই একগুঁয়ে ও দাঙ্গাপ্রবণ। সামান্য ক্রোধেই তারা সহজেই জীবন কেড়ে নিতে পারে। এখানে শান্তিভঙ্গকারী অপরাধ প্রতিদিন ঘটে। মানুষ এতো অধার্মিক যে, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা কখনো মিথ্যা মামলা দায়ের থেকে পিছপা হয় না।...বিষখালি নদীর ডাকাতরা (দুর্বৃত্ত) এই গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গ্রামের অধিবাসী ভিন্ন কেউ নয়।[৯৯]

আইন-কানুন মেনে চলার মন-মানসিকতাসম্পন্ন বৃটিশ কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে তারা হয়তো একগুঁয়ে ও দুরন্ত হতে পারে, তবে এসব মানুষ– বা আরো নির্ভুলভাবে, তাদের পূর্বপুরুষরা বাস্তবে–পূর্ব বাংলার অধিকাংশ এলাকায় কৃষি সম্প্রসারণের প্রাথমিক প্রতিনিধি ছিল। বাকেরগঞ্জের অপর একটি গ্রাম সম্পর্কে ১৯০২ সালের জনৈক বৃটিশ কর্মকর্তা বলেন, 'জনসাধারণের প্রায় সবাই মুসলমান, তারা নিষ্ফলা জমিকে চাষাবাদের আওতায় আনতে সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। বাস্তবে জঙ্গল এখন প্রায় পুরোটাই পরিষ্কার হয়ে গেছে।'[১০০] কিংবা আরো বলা হয়, 'এই মৌজায় (বসতিতে) অনেক সংখ্যক ক্ষুদে মালিক আছে, যাদের সবাই জমিজমাগুলোকে চাষাবাসের আওতায় এনেছেন। লোকজন মুসলমান।'[১০১]

---

৯৮. Ibid., Swarupkathi Thana, vol. 1, R.S. 177.
৯৯. Ibid., Jhalakathi Thana, vol. 3, R.S. 2471.
১০০. Ibid., Barisal Thana, vol. 1, R.S. 972.
১০১. Ibid., Jhalakathi Thana, vol. 3, R.S. 2489.

সারাংশ

ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাঙালি সাহিত্য ও লোকঐতিহ্য বনকে বশ মানানো, কৃষিজ এলাকা সম্প্রসারণ ও নতুন নতুন ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠানিকরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত নায়কদের ব্যাপক উপস্থিতি দেখা যায়। বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে, এসব নায়করা সাধু পুরুষের ভাবমূর্তির সাথে বন পরিষ্কার এবং ভূমি পুনরুদ্ধারের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক দক্ষতার অধিকারী ছিলেন; তাই তাঁদেরকে শুধুমাত্র মসজিদ ও দরগাহ প্রতিষ্ঠার জন্যই নয়, সেই সাথে জঙ্গল কাটা ও ভূমিতে বসতি স্থাপনে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করার জন্যও স্মরণ করা হয়। এটা ঘটার সময়ে, মানুষ ধীরে ধীরে সাধারণভাবে মুসলমান ব্যক্তিদের ভক্তি করতে লাগলো। সক্রিয় বদ্বীপে, তখন, ভূমি বিন্যাস ও জনবসতি উভয়ের সাথে সম্পর্কিত সভ্যতা-বিনির্মাণকারী আদর্শ এবং সেই প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি অলৌকিক বাস্তবতা সৃষ্টির ধর্ম হিসেবে ইসলাম আত্মপ্রকাশ করে।

এসব ঘটনার পেছনে পরিবেশগত অসংখ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। পূর্ববাংলায় নতুন কৃষি সম্প্রদায়ের বসতি স্থাপন, আত্মীকরণ ও প্রাকৃতিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি-আত্মপ্রকাশের প্রধান প্রধান উপাদানগুলোর সবই বদ্বীপটির সক্রিয় অংশ পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রথমত এই পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত কম উর্বরা অংশ তথা পশ্চিমবঙ্গ কিংবা উত্তর ভারত বা তার বাইরে থেকেও অভিবাসীদের সক্রিয় বদ্বীপে বসতি স্থাপন বেগবান করেছিল। দ্বিতীয়ত এসব কিছু হওয়ার সময়ে আদিবাসী জেলে সম্প্রদায়গুলো ও পালাক্রমিক চাষীরা মুসলমান পথপ্রদর্শকদের আধ্যাত্মিক ও সাংগঠনিক সামর্থ্যের উপর জোর দেওয়া সংগঠিত সম্প্রদায়ের সাথে একীভূত হয়ে যায়। এবং তৃতীয়ত বদ্বীপটির সক্রিয় অংশ দক্ষিণ ও পূর্বদিকে স্থানান্তরণের প্রেক্ষাপটে এই অঞ্চলে ধান চাষের সূচনা বা ব্যাপকতর হওয়ায় স্থানীয় খাদ্য সরবরাহ নাটকীয়ভাবে বেড়ে যাওয়ায় তা স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। যদিও পূর্ব বাংলার বর্ধিষ্ণু উর্বরতা সমসাময়িক পর্যবক্ষেকদের নজরে আসার মতো ব্যাপকতর ছিল না, তবে ষোড়শ শতকের শেষদিকে এবং সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের রাজস্ব দাবির পরিসংখ্যানসমূহ এবং একইসাথে বনের পথিকৃৎদের নেতৃত্ব ও শ্রমের গুণগানে প্রতিফলিত হয়। ষোড়শ শতাব্দী পরবর্তী পূর্ব বদ্বীপে বিস্ময়কর ঘটনা হিসেবে মুসলমান কৃষক সমাজের অগ্রগতি তাই বৃহত্তর প্রতিবেশগত ও জনসংখ্যাতাত্ত্বিক শক্তির সাথে সম্পর্কিত হিসেবে আবির্ভূত হয়।

পরিশেষে, ষোড়শ শতাব্দী- পরবর্তী সাংস্কৃতিক ও প্রতিবেশগত-জনসংখ্যাতাত্ত্বিক পরিবর্তন অবশ্যই এসব পরিবর্তনের সাথে সংযুক্ত নতুন রাজনৈতিক পরিবেশের– তথা বদ্বীপে মোগল কর্তৃত্বের সূচনা– প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে একই সাথে

মোগল শাসন অঞ্চলটিতে সুসংহত হওয়ার সময়টিতেই-ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে-পদ্মায় রূপান্তরের গঙ্গানদীর পূর্বগামিতা সম্পন্ন হয়। এমতাবস্থায় সক্রিয় বদ্বীপটির কেন্দ্রস্থলে মোগলদের প্রাদেশিক রাজধানী প্রতিষ্ঠার প্রতিকীকরণের মধ্য দিয়ে মোগল কর্তৃপক্ষ পূর্বগামী প্রতিবেশগত গতিশীলতাকে সমর্থন করে। এই অঞ্চলে সংগঠিত নতুন রাজনৈতিক পরিবেশ সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের উপর কেমন প্রভাব সৃষ্টি করেছিল, তা নির্ণয়ের জন্য আমরা কৃষিজ সম্প্রসারণ ও ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতার সাথে সম্পর্কিত সমসাময়িক মোগল দলিল-দস্তাবেজ পরীক্ষা করতে পারি। সৌভাগ্যবশত বদ্বীপটির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত এ ধরনের পারস্য ভাষায় দলিল-দস্তাবেজ প্রচুর পরিমাণে টিকে আছে; আমরা এখন এদিকেই নজর ফেরাবো।

৯ পল্লী দৃশ্যপটে মসজিদ ও দরগা

ভূমিটি চাষাবাদের আওতায় আনার পর ভূমির উৎপাদিত সামগ্রী অবশ্যই মসজিদের জন্য খরচ করতে হবে এবং একই সাথে তাঁর নিজের, তাঁর বংশধরদের ও তাঁর উপর নির্ভরশীলদের প্রয়োজনও মেটাতে হবে। এবং তাঁকে অবশ্যই শক্তিশালী রাষ্ট্রটির টিকে থাকার জন্য কায়মনোবাক্য সহকারে প্রার্থনা করতে হবে।

... চট্টগ্রামে আওরঙ্গজেবের মোহরযুক্ত সনদ (১৬৬৬)

মোগল রাষ্ট্র ও কৃষিজ ব্যবস্থা

আকবরের সময় থেকে মোগলরা দুটি পর্যায়ে তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভারতীয়দের একীভূত করতে চেয়েছে। অভিজাত পর্যায়ে, তাঁরা মুসলমান ও অ-মুসলমান উভয় ধর্মের গোষ্ঠীপতিদের রাজকীয় বাহিনীতে আত্মস্থ করে নেওয়ার কৌশল অবলম্বন করেছে, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সম্ভাব্য শত্রুদের অনুগত সেবকে রূপান্তরিত করা হয়। তাঁরা সাম্রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য তার কৃষিজ ভিত্তি সম্প্রসারিত করতে চেয়েছে, আর তা করা হয়েছে বনজ ভূমিরাজিকে কৃষিজ খামারে রূপান্তর এবং সেসব ভূমিতে বসবাসকারী আধা যাযাবর বনজ-মানুষদের স্থায়ী কৃষকে পরিণত করে। অষ্টাদশ শতকের একটি রাজস্ব দলিলে দেখা যায়:

শাহজাহানের সময় (১৬২৭-৫৮) থেকে এটা প্রথা হিসেবে চালু রয়েছে যে, কাঠুরে ও চাষীরা বন পরিষ্কার ও ভূমি চাষাবাদের জন্য তাঁর সৈন্যদের সঙ্গী হিসেবে নেবে। সরকার ব্যবহৃত লাঙল দান করবে। সংক্ষিপ্ত মেয়াদের পাট্টা (রাজস্ব হার নির্ধারিত দলিল) দেওয়া হয়, (এবং তা) প্রথম বছরে সরকারের নির্ধারিত দাবি থাকে বিঘা প্রতি এক আনা। *রায়তদের* (কৃষক) সহৃদয়তার সাথে খুশি রাখা এবং স্থানটি জন-অধ্যুষিত করার জন্য *চৌধুরীদের* (মধ্যস্থতাকারী) নিয়োগ করা হয়। রাজকীয় আদেশ অনুযায়ী *পাট্টা* ইস্যু করা এবং প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন নিশ্চিত করে তারা। একটি সাধারণ নির্দেশও ছিল, যেই বন পরিষ্কার করবে এবং সেটাকে চাষাবাদের আওতায় আনবে, সেই ভূমি হবে তার *জমিদারি*।.... রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে লাঙল সরবরাহ করা হবে। এসব লাঙলের মূল্য দু থেকে তিন বছরের মধ্যে জমিদারের নিকট থেকে নেওয়া হবে। প্রতিটি হাল *মিরকে* (অর্থাৎ যার চারটি বা পাঁচটি লাঙল আছে)

শনাক্ত করা হবে এবং দসতর (পরিকর-যা শোভাবর্ধনের জন্য উর্দির অংশ হিসেবে কোমরে কিংবা এক কাঁধের উপর ঝোলা কাপড়ের ধীর্ঘ ফালি বা পাগড়ি তথা সম্মানসূচক চিহ্ন) প্রদান করা হয়, যাতে সে বনজঙ্গল পরিষ্কার করে ভূমিকে চাষাবাদের আওতায় আনতে পারে। এভাবে ভাল আচরণের মাধ্যমে জলাভূমি ও জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিকে চাষাবাদের আওতায় আনার লক্ষ্যে অন্যান্য অঞ্চল ও সুবা (প্রদেশ) থেকে মানুষ ও রায়তদের আকর্ষণ করা হয়।[১]

শাহজাহানের উত্তরসুরি আওরঙ্গজেবের (১৬৬৮-১৭০৭) একটি তারিখবিহীন নির্দেশে চাষাবাদের জমি বৃদ্ধির ব্যাপারে একইভাবে গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে, ভূমি থেকে কোন কৃষক পালিয়ে গেলে, স্থানীয় রাজস্ব কর্মকর্তাগণ (আমিল) 'এর কারণ চিহ্নিত করবে এবং সাবেক জায়গায় ফিরিয়ে আনার জন্য তাকে প্রলোভিত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করবে।'[২] এ ধরনের আবেদনে রাষ্ট্র যে শক্তিশালী অবস্থানে ছিল না, স্পষ্টতই তা বোঝা যায়। বাস্তবিকই, শ্রমের বিপরীতে ভূমির ব্যাপক উদ্বৃত্ত প্রাক-আধুনিককালে ভারতে সাধারণভাবে এবং ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগেও বাংলায় দেখা যেত।[৩]

এ ধরনের উদ্ধৃতি যদি রাষ্ট্রের নীতির প্রতিফলন করে থাকে, তবে বাংলায় তা কিভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল? প্রদেশটির অপেক্ষাকৃত পুরাতন, অধিকতর বসতিপূর্ণ অংশ তথা পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমাংশে মোগল কর্মকর্তারা কায়স্থ ও অন্যান্য *জমিদার* শ্রেণীর মাধ্যমে পূর্ণ হারে প্রধানত হিন্দু কৃষকদের নিকট থেকে ভূমিকর আদায়

---

১. *হকিকত-ই সুবা বিহার* (পারসিয়ান এম এস.)। ১৭৬৫ সালে বাংলার রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার লাভের পরপরই ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাগণ বাংলা ও বিহারের ভূমি ভোগদখলের অধিকারের উৎস সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করে। এসব অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত দলিলপত্রের একটি ছিল এই পাণ্ডুলিপিটি, যা Wilhelm Pertsch, *Handschriften-Verzeichniss der Koniglichen Bibliothek zu Berlin* (Berlin: A. Asher, 1888), Persische Handschriften, No 500, 4: 484 এর *Kaifiyat-i Suba Bihar* শিরোনামে তালিকাভুক্ত ছিল। বার্লিনের রয়্যাল লাইব্রেরি থেকে তা পরপরই মারবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে স্থানান্তরিত হয়। এস. নুরুল হাসানের "Three Studies of Zamindari System," in *Medieval India A Miscellany*, vol. 1 (Bombay: Asia Publishing House, 1969), 237-38 থেকে উদ্ধৃতি ও সংক্ষিপ্তসার গ্রহণ করা হয়েছে।

২. Jadunath Sarkar, "The Revenue Regulations of Aurangzeb," *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, n.s., 2 no. 6 (June 1906): 236-35. Sarkar's translation.

৩. বদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত কুমিল্লা জেলার পল্লীতে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগেও উক্ত জেলার মানুষ প্রকৃতিগতভাবে ছিল যাযাবর এবং "ভূমি ছিল সহজলভ্য, (তারা) বসবাসের জন্য বিনা বাধায় নির্বাচন এবং পুনর্নির্বাচনের সুবিধা ভোগ করতো।" S.A Qadir, *Village Dhanishwar: Three Generations of Man-Land Adjustment in an East Pakistan Village* (Comilla: Pakistan Academy for Rural Development, 1960), 46.

করতো। কিন্তু পূর্ব ও দক্ষিণদিকের অকর্ষিত বন ও জলাভূমিতে সরকার স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে নতুন কৃষিজ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়েছিল। এই প্রভাবের ভিত্তি ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মীয়, কারণ সরকার স্থিতিশীল এবং সেইসাথে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা চাইতো। স্থানীয় পর্যায়ে মোগল কর্তৃপক্ষের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যসূচক মৌলিক স্থাপনা ছিল মসজিদ ও দরগা।

বাংলার ইতিহাসে পল্লীর মসজিদ

গণ-প্রার্থনার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট মসজিদ সব সময়েই ইসলামী সভ্যতায় মুখ্য গণ-প্রতিষ্ঠান হিসেবে অবস্থান করেছে। বিশাল স্থাপনা কিংবা সাদামাটা খড়ের কুড়েঘর যাই হোক না কেন, মসজিদ আল্লাহ'র কথা সম্মিলিতভাবে প্রকাশ করার অবকাঠামোর ব্যবস্থা করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে একই ধর্মে বিশ্বাসী গ্রামবাসী ও শহরবাসীদের একক সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে কাল্পনিকভাবে সমন্বয় সাধন করে। মসজিদ যেহেতু ইসলামের সামাজিক বাস্তবতার প্রত্যক্ষ মূর্ত প্রকাশ, তাই এটাই সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক পরিচিতি এবং সংহতি প্রকাশিত হয়। জুমার নামায আদায় করা হয় তথা জামে মসজিদে, যেখানে মুসলমানরা সপ্তাহে একবার সমবেত হয় এবং খতিব সাহেব খুতবা দেন তাঁর বেলায় এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ব্যক্তিগত বা কিছু লোকের জন্য নির্ধারিত নামাযের স্থানের বিপরীতে এসব মসজিদ সাধারণত স্থায়ী বসতিগুলোর পুরুষ মুসলমানদের লক্ষ্য থাকতো এবং স্থায়ী সমাজে পর্যাপ্ত সংখ্যক মুসলমান হলেই তাদের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার জন্য তা যত দ্রুত সম্ভব নির্মাণ করা হতো। ১ নম্বর টেবিলে (দেখুন দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষদিকে) প্রদর্শিত তথ্য অনুযায়ী বাংলায় মুসলমান শাসনের ছয় শত বছরের ইতিহাসে নির্মিত ১৮৮টি তারিখ সম্বলিত মসজিদ এখনো টিকে আছে। এগুলোর মধ্যে পূর্ণ ১৭৭টি তথা শতকরা ৬২ শতাংশ নির্মিত হয়েছিল ১৪৫০ থেকে ১৫৫০ সালের এক শত বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে। এগুলোর অধিকাংশই বদ্বীপটির পশ্চিমাংশে, বিশেষ করে প্রাচীন মুসলমান রাজধানী গৌড় ও পান্ডুয়ার কাছে, মোট সংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নির্মিত হয়েছিল বর্তমানকালের মালদহ ও মুর্শিদাবাদে। বিপরীতক্রমে, কুমিল্লা, রংপুর, খুলনা, যশোর ও বাকেরগঞ্জের মতো পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোর প্রতিটিতে সামান্য সংখ্যক মসজিদ দেখা যায় এবং ফরিদপুর ও নোয়াখালিতে একটিও নেই। অর্থাৎ তারিখ সম্বলিত মসজিদ এবং বদ্বীপের মুসলমানদের অবস্থানের মধ্যে নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে: টিকে থাকা মসজিদগুলো পশ্চিবঙ্গে বেশি এবং পূর্ববঙ্গে মুসলমান সমাজের প্রাধান্য বেশি। এবং তারিখ সম্বলিত মসজিদগুলো বিপুল সংখ্যায় যখন ১৪৫০ ও ১৫৫০ সালের দিকে আত্মপ্রকাশ করছিল, অথচ, বিপুল সংখ্যক মুসলমান সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশের প্রথম প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া

যায় ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষদিকে। তাহলে আমরা কিভাবে সময় ও স্থানের ব্যাপ্তিতে এসব মসজিদের আত্মপ্রকাশ এবং মুসলমান জনসংখ্যার প্রাধান্যের মধ্যকার বিপরীতমুখী অবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করবো?

এর জবাব হলো, ১ নম্বর টেবিল প্রদর্শিত উল্লিখিত মসজিদগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র খোদাইলিপিযুক্তগুলোই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শাসকমণ্ডলী বা অন্যান্য সম্পদশালী লোকদের বিপুল সম্পদ ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে নির্মিত এসব বৈশিষ্ট্যসূচক স্মারক স্থাপনায় ইট বা পাথরের মতো টেকসই সামগ্রী ব্যবহৃত হওয়ায় তা বর্তমানকাল পর্যন্ত টিকে আছে। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত ছোট ও সাদামাটা আরো অনেক মসজিদ বর্তমানকাল পর্যন্ত টিকে নেই এবং সেগুলোতে খোদাইলিপিও ছিল না। রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতাবিহীন অবস্থায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের বাঁশ ও খড়ে নির্মিত এসব মসজিদ বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে শত শত সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ করে।[৪] যেহেতু এসব প্রতিষ্ঠান সময় ও স্থানের ব্যাপ্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের সাথে ইতিবাচকভাবে সম্পর্কিত ছিল, তাই ধারণা করা যায়, সম্পদশালী কারো দানে নির্মিত জাঁকজমকপূর্ণ স্থাপনার চাইতে এসব সাদামাটা মসজিদই পল্লী এলাকায় ইসলামীকরণে অনেক বেশি সিদ্ধান্তসূচক ভূমিকা পালন করেছিল (দেখুন চিত্র ২২-২৪)।

কেন এবং কিভাবে এসব প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়েছিল? আমরা দেখেছি, সাম্রাজ্য পরিচালনা সাধারণভাবে মোগল নীতির লক্ষ্য ছিল দেশের সম্পদের উৎস তথা কৃষিজ ভিত্তি সম্প্রসারণ এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ও তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে অনুগত ক্ষমতাসীন শ্রেণী গঠন করা। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে যেখানে নতুন নতুন ভূমি চাষাবাদের আওতায় আনা হচ্ছিল, সেখানে প্রকাশ্যভাবে এগুলোর লক্ষ্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রকৃতিসম্পন্ন হলেও তা অর্জনের বৈশিষ্ট্যসূচক মাধ্যম ছিল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর কেন্দ্রীভূত স্থায়ী কৃষিজ সমাজের বিকাশ। তাই, পূর্ববাংলায়, রাষ্ট্র নতুন নতুন ভূমিতে চাষাবাদ সূচিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে হিন্দু ও

৪. মাদরাসা বা বিদ্যালয়ের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। যদিও বর্তমানকালে সুলতানি আমলের গুটিকতেক পাথরের ও ইটের বিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ টিকে আছে, কিন্তু হালকা-পাতলা উপাদানে তৈরি বিদ্যালয়গুলো পুরোপুরি বিলীন হয়ে গেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৬০৯ সালে আধুনিক রাজশাহীর বাঘা অতিক্রমের সময়ে সেখানে ছনের চালা ও মাটির দেয়াল দিয়ে তৈরি একটি মাদরাসা দেখতে পান। সেখানে উক্ত এলাকার শিক্ষক জনৈক হাওদা মিয়ার অধীনে অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করছিল। সরকার উক্ত শিক্ষক এবং তার প্রতিষ্ঠানটির ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য বাঘার আশেপাশের এলাকার রাজস্ব বরাদ্দ করে। বর্তমানকালে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি আর টিকে নেই, এমনকি সেটির কোন ভিত্তিপ্রস্তর এবং কারো উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার কোন খোদাইলিপিও নেই, যার মাধ্যমে তার সাবেক অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। দেখুন Jadunath Sarkar, "A Description of North Bengal in 1609 AD," *Bengal Past and Present* 35 (1928): 144.

মুসলমান উভয় ধর্মের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় তত্ত্বাবধান করা হতো। এগুলোর মধ্যে মুসলিম প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি ও অনেক বেশি প্রভাবশালী এবং সেগুলোর মাধ্যমে ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকগুলোতে ইসলামী মূল্যবোধ, চিন্তাধারা, পরিভাষা ও ধর্মাচার ধীরে ধীরে পল্লী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় দলিল-দস্তাবেজে এসব প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের জুমার নতুন নতুন জামায়াত *(ইকামাত-ই হালকা-জামায়াত)* প্রতিষ্ঠার কথা দেখা যায়।[৫]

বদ্বীপ জুড়ে সামাজিক সংগঠনের মৌলিক ইউনিট না থাকায় এবং *মৌজা* বা 'গ্রাম' কখনো দেখা না যাওয়ার কথার উল্লেখে এ ধরনের মন্তব্য খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত। উত্তর ভারতের মতো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্ষুদ্রতম বসতিচিত্র বদ্বীপের সদরে কখনো দেখা যায়নি, এমনকি মোগল এবং তারপরের বৃটিশ যুগেও নয়, তারা সবাই *মৌজা* শব্দটির ব্যবহারই অব্যাহত রেখেছিল।[৬] বরং সাবেক বা বর্তমান খাড়ি কিংবা নদীর তীরে বসতবাড়ি গড়ে উঠতে থাকে। অথবা প্রায়ই সেগুলো পুরো গ্রাম জুড়ে গুচ্ছাকারে অবিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে থাকতো। দুজন পল্লী সমাজবিজ্ঞানী পূর্ববাংলার পল্লী এলাকাকে অভিহিত করেছেন, 'একটি বিশাল, উন্মুক্ত গ্রাম। বন্যা এড়াতে মানুষ উঁচু জায়গায় বাড়ি নির্মাণ করে এবং যেহেতু উঁচু জায়গার সাথেই সাধারণত থাকে কিছুটা ঢালু স্থান বা টিলা, তাই তাদের বাড়িগুলো বানানো হয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামের মধ্যে কোন চিহ্ন না রেখে।'[৭] ও. এইচ. কে. স্পেট ও এ. টি. এ লেয়ারমন্থ মন্তব্য করেন, "বিশাল এলাকায় প্রকৃতপক্ষে কোনই 'প্যাটার্ন' নেই, যা পরিবেশের মতোই সমপ্রকৃতির।"[৮]

বাংলার ভৌগোলিক দৃশ্যপট সকল দিকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেমন সমতল এবং সমপ্রকৃতির, তেমনি সামাজিক ব্যবস্থাতেও কর্তৃত্বের সহজাত বন্ধনের অভাব রয়েছে। নিশ্চিতভাবেই, রক্ত সম্পর্কিত বন্ধনে (বংশ বা গোষ্ঠী) বাঙালি সমাজে একই পৈতৃক বংশধারা দেখা যায়। কিন্তু তা উত্তর ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান জাত্যাভিমানপূর্ণ *বেরাদরির,* যা পরিপূর্ণ বিকশিত হিন্দু বর্ণবাদী সমাজের জাতপাত প্রথার চেয়ে অনেক কম গোড়ামিপূর্ণ, মতো একই ধরনের দৃঢ় বা সামাজিক

---

৫. "Kanun Daimer Nathi," Chittagong District Collectorate Record Room, No. 64: bundle 78, case no. 5027; No. 7: bundle 62, case no. 4005.

৬. Peter J. Bertocci, "Elusive Villages: Social Structure and Community Organization in Rural East Pakistan" (Ph.D diss., Michigan State University, 1970), 11-14.

৭. Betsy Hartmann and James Boyce, *A Quiet Violence: A View from a Bangladesh Village* (London: Zed Press, 1983), 17.

৮. O.H.K. Spate and A.T.A. Learnmonth, *India and Pakistan: A General and Regional Geography*, 3d ed. (London: Methuen, 1967), 590. See the map of typical Bengali settlement patterns on p. 580.

তাৎপর্যমণ্ডিত ছিল না।[৯] এমতাবস্থায়, মোগল বাংলার পশ্চাদভূমির মতো স্থানে, যেখানে কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ছিল দুর্বল, সেখানে সামাজিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখা ছিল একটি মারাত্মক সমস্যা। এরিক হবসবাউম বলেন, 'আইনবর্জিত সমাজে প্রতিযোগী ইউনিটগুলোর মধ্যকার নৈরাজ্যের মধ্যে শক্তি খুব কমই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, বরং স্থানীয় শক্তিশালী বিন্দুর চারপাশে আবদ্ধ থাকে। এর বৈশিষ্ট্যসূচক আকার হচ্ছে পৃষ্ঠপোষকতা, এবং বৈশিষ্টসূচক ধারক হচ্ছে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী বা প্রভুত্বব্যঞ্জক ব্যক্তি এবং সাথে থাকে তার চারপাশে বিদ্যমান তার পার্শ্বচর ও নির্ভরশীলদের 'প্রভাবশালী' নেটওয়ার্ক এবং এর ফলে মানুষজনকে তাদের নিরাপত্তা নিতে হয় তার কাছ থেকে।[১০]

মোগল বাংলায়, মৌলিক গ্রাম বা প্রাধান্য সৃষ্টিকারী গোত্র, যাদের মাধ্যমে কর্তৃত্ব প্রকাশ করা যেত বা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব হতো, কঠোরভাবে সংগঠিত এ ধরনের ইউনিটের অনুপস্থিতির ফলে পৃষ্ঠপোষকতার স্থানীয় নেটওয়ার্কগুলো কর্তৃত্বের স্থানীয়ভাবে নির্দিষ্ট কেন্দ্রগুলোর চারপাশে জড়ো হতো। রালফ নিকোলাস এসব নেটওয়ার্কের ধর্মীয় ভিত্তি উল্লেখ করেন:

সর্বত্রই সীমান্তবর্তী সমাজে সামাজিক শৃঙ্খলা একটি মারাত্মক সমস্যা। বদ্বীপের ভাটি এলাকার মানুষ কঠোর ও স্বাধীন হিসেবে পরিচিত। লাঠি হাতে তাদের দক্ষতা সুবিদিত এবং বন্যার পর কৃষিজ ভূমির অবস্থান বদলে দেওয়ার পর এটাই হতো কোন জমিতে দাবি প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বদ্বীপের ভাটিতে কর্তৃপক্ষ ছিল দুর্বলভাবে সংগঠিত, সরকারি কর্তৃত্বের কেন্দ্রগুলো ছিল খুব কম ও অনেক দূরে দূরে ছিটানো। তাই ধারণা করা যায়, ইসলাম ও বৈষ্ণববাদের কার্যক্রম নৈরাজ্যকর সমান্তবর্তী সমাজে কর্তৃত্বের ব্যবস্থা করতো এবং তারা তা করতো শিথিলভাবে সৃষ্ট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে। এই সংস্থার বৈষ্ণব ধরন ছিল মণ্ডলী, তা সংগঠিত হতো কোন নির্দিষ্ট গুরুকে ঘিরে, যাতে তাঁর অনুসারীরা বলতো গোসাই এবং তারা প্রায়ই হতো একাধিক গ্রামের।

নিকোলাস বলেন, মণ্ডলীর সমমানের মুসলমান সংস্থাকে বলা হতো *মিল্লাত* (তথা ধর্মীয় গ্রুপ বা দল) বা সাদামাটাভাবে সমাজ এবং তা কোন *মোল্লাকে* ঘিরে সংগঠিত

৯. E.A Gait, "The Muhammadans of Bengal," in *Census of India, 1901*, vol. 6. *The Lower Provinces of Bengal and Their Feudatiries*, pt. 1 "Report" (Calcutta: Bengal Secratariat Press, 1902), 441.

১০. Eric Hobsbawm, *Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 20th Centuries* (New York: Norton, 1959), 32. একইভাবে মরক্কোর এটলাস পর্বতমালায় আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন দরবেশদের বংশধরগণ স্থানীয় যাযাবর গোত্রগুলোর মধ্যে পৃষ্ঠপোষকতা এবং প্রভাব সৃষ্টির একটি সংযোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। See Ernest Gellner, *Saints of the Atlas* (Chicago: University of Chicago Press, 1969) chs. 3-5.

হতো এবং তাকে অনেক সময় তার অনুসারীরা *পীর* হিসেবেও অভিহিত করতো।[১১] বদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বৈশিষ্ট্যসূচক মিল্লাতে আশি থেকে চারশত পর্যন্ত সদস্য থাকতো, তারা উৎসবের সময় একত্রে খাবার খেত, খৎনা, বিয়ে, মৃত্যু ইত্যাদি অনুষ্ঠানের রীতি নীতি একত্রে পালন করতো এবং সম্প্রদায়ের দুর্যোগকালে একত্রে প্রার্থনা করতো। উক্ত গ্রুপকে ধর্মীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী *মোল্লার* ব্যয় নির্বাহের জন্য *মিল্লাতের* প্রতিটি পরিবার মাসিক হারে ভাতা প্রদান করতো।[১২]

মধ্য ও উত্তর বাংলার পল্লী মুসলমান সম্প্রদায়গুলোর মধ্যেও কর্তৃত্বের এ ধরনের কাঠামো পাওয়া যায়। নৃতত্ত্ববিদ জন থর্প উল্লেখ করেন, মধ্য বদ্বীপীয় জেলা পাবনায় কোন দলভুক্ত সদস্যরা যখন সম্মিলিতভাবে 'পর্ব উদযাপন' করে, এবং একত্রে জন্ম-মৃত্যু সংক্রান্ত ধর্মাচারগুলো পালন করে, স্থানীয়ভাবে তাদেরকে একটি সমাজ বলা হয় এবং যারা একত্রে কোন একটি মসজিদে নামায পড়ে, তারা একটি জামায়াত হিসেবে পরিচিত। বাস্তব ক্ষেত্রে, জামায়াত ও সমাজের পরিধি একই হতে পারে; বিকল্পভাবে, এটি একধিক সমাজ নিয়েও গঠিত হতে পারে।[১৩] দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার মতো এখানেও যে কোন ঘটনার ক্ষেত্রে, 'গ্রাম' বা গোত্র নয়, বরং মসজিদ এবং এর সামাজিক-ধর্মীয় পরিধিই সামাজিক গতিশীলতার জন্য পরিচিতি সংহত করা ও কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। দুই পল্লী সমাজতত্ত্ববিদ উল্লেখ করেন, প্রতিবেশী রাজশাহী জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাটটি

১১. Ralph W. Nicholas, "Vaisnavism and Islam in Rural Bengal, in *Bengal: Regional Identity*, ed. David Kopf (East Lansing: Asian Studies Center, Michigan State University, 1969), 44.

১২. Ibid., বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার পশ্চিমাংশের সাথে সম্পর্কিত এই বিষয়টি পর্যবেক্ষণের জন্য দেখুন Robert Glasse, "La Societe musulmane dans le Pakistan rural de test," *Etudes rurales* 22-24 (1968): 202-4. এখানে ধর্মীয় ও অ-ধর্মীয় কর্তৃত্বের মধ্যকার প্রার্থক্য সৃষ্টি করে *মোল্লা ও মাতব্বর* হিসেবে পরিচিত নেতার ভূমিকা। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক মর্যাদার কারণে অবস্থান সৃষ্টিকারী মাতব্বর বিরোধের মীমাংসা, নিয়মভঙ্গের জন্য জরিমানা আরোপ এবং বহির্বিশ্বের সাথে সেখানকার সংযোগ রক্ষাকারীর দায়িত্ব পালন করেন।

১৩. *সমাজের* সংখ্যা বাড়ার কারণ ছিল জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি। জন থর্পের মতে, কার্যকর *জামায়াতের* সদস্য সংখ্যা প্রায় পাঁচশতে পৌছলে সেটিতে বিভক্তির অবস্থা সৃষ্টি হতো, কারণ সংখ্যাটি বেশি হলে দলগত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ হতো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এক্ষেত্রে দুটি *সমাজের* আত্মপ্রকাশ ঘটতো, অবশ্য উভয়টির সদস্যরাই একই *জামায়াত* ও একই মসজিদের সদস্য থাকতো। থর্পের অঞ্চল জরিপে দেখা যায়, *জামায়াতটির* পুরো সম্প্রদায় দুটি *সমাজে* বিভক্ত, প্রায় আশিটি বাড়ি, বা আনুমানিক ছয় শত মানুষ নিয়ে গঠিত। কিন্তু এই বিশাল গ্রুপটি শুধুমাত্র ঈদ উৎসব একসাথে উদযাপন করে। শুক্রবারের জুমার সময়ে *জামায়াত* সম্প্রদায়ের মাত্র ১০ থেকে ২০ শতাংশ মানুষ মসজিদে আসে এবং একসাথে নামায পড়ে। John Thorp, Personal communication, May 13, 1985.

বসতবাড়ির সমন্বয়ে পল্লী মসজিদের আওতায় থাকা সম্প্রদায়কে *জামায়াত* হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যা উত্তর ভারতের ক্ষুদ্রতম গ্রামের সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১৪] আরো উত্তরদিকের বেলায় তা বেশি প্রযোজ্য। ১৯৩৭ সালে দিনাজপুর জেলার পল্লী এলাকায় জরিপ চালিয়ে করুণাকেতন সেন বলেন, 'অনেক গ্রামে *জামায়াত-ঘর* নামে প্রার্থনার জন্য কুড়েঘর আছে।' যেসব গ্রামে তা একাধিক আছে, সেখানে স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীরা নানা দলে বিভক্ত এবং প্রত্যেকেই কোন না কোন *জামায়াত-ঘরের* সাথে সম্পৃক্ত।[১৫] করুণাকেতন সেন এখানে 'গ্রাম' বলতে যাই বুঝিয়ে থাকুন না কেন, রাজশাহী, পাবনা ও কুমিল্লার পল্লীর মতো দিনাজপুরের পল্লীতেও মসজিদই *(জামায়াত-ঘর)* ছিল মুসলমানদের সামাজিক সংগঠনের কার্যকর ইউনিট।

বাংলার পল্লীসমাজে বর্তমানকালের মসজিদের অব্যাহত সামাজিক তাৎপর্য এমন এক যুগের উত্তরাধিকার, যখন *আলেম* ও *পীরদের* ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তাদের প্রতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যম হিসেবে মসজিদ ও দরগাগুলো-কর্তৃত্বের সংযোগবিন্দু হিসেবে প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেছিল, যার সাথেই নতুন কৃষক সম্প্রদায়গুলো অঙ্গীভূত হয়েছিল এবং যাদের সাথে সম্পর্ক থাকাকে উক্ত সম্প্রদায়গুলো মনে করতো নির্ভরশীল *(বা বাসতাগান)* ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি আকৃষ্ট লোকজন শুধুমাত্র ধর্মীয় নেতার অনুসারী হিসেবেই থাকতো না বরং হিন্দু সমাজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে সাবেক স্থানীয় জেলে ও জুম চাষী এসব লোক দলবদ্ধ কৃষক হিসেবেও বিরাজ করতো। তাই বাংলায় ইসলামীকরণ সম্প্রসারমান অর্থনৈতিক সীমান্তের সাথে সম্পর্কিত রূপান্তরের সাধারণ বিষয় ছিল, যা মোগল আমলে সবচেয়ে নাটকীয়ভাবে সংগঠিত হয়েছিল। বদ্বীপের প্রান্তবর্তী দুজেলা চট্টগ্রাম ও সিলেটে প্রাপ্ত ব্যতিক্রমধর্মী ফারসি ভাষার দলিল-দস্তাবেজ ভালমতো পরীক্ষা করে আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখবো।[১৬]

চট্টগ্রামের পল্লীতে মসজিদ ও দরগার বিকাশ, ১৬৬৬-১৭৬০

কর্ণফুলী নদীর মোহনায় অবস্থিত চট্টগ্রাম শহরটিতে অন্তত ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে মানববসতি শুরু হয়।[১৭] পঞ্চদশ শতকের প্রথমদিকে বাংলার স্বাধীন

১৪. দেখুন Hartmann and Boyce, *Quiet Violence*, 11.

১৫. Karnaketan Sen, "Notes on Rural Customs of Dinajpur Districts," *Journal of the Asiatic Society of Bengal* 3 (1937), 38. Emphasis mine.

১৬. যেহেতু সিলেট ও চট্টগ্রামের শহরগুলো সুপরিচিত পাহাড়গুলোতে অবস্থিত, তাই জেলা কালেকটরেট ভবনগুলোও উঁচু ও শুষ্ক জায়গায় স্থাপিত এবং সেগুলোর দলিলপত্রসমূহ অত্যন্ত ভালভাবে সংরক্ষিত আছে। নিচু এলাকার জেলাগুলোতে প্রায়ই হানা দেওয়া বন্যায় এ ব্যাপারে এতোটা ভাল অবস্থায় থাকতে পারেনি।

১৭. দেখুন Nani Gopal Majumder, *Inscription of Bengal*, vol. 3 (Rajshahi: Varendra Research Society, 1929), 158-63.

সুলতানদের সংক্ষিপ্ত সময়কাল এবং ষোড়শ শতাব্দীতে[১৮] মাঝে মাঝে কিছু সময় ছাড়া ১৪৫৯ সালের পর থেকে পরবর্তী দুই শতাব্দীকালের অধিকাংশ সময়ে শহরটি এবং তার পশ্চাদভূমি ছিল আরাকান রাজাদের নিয়ন্ত্রণে। প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী উপকূলীয় এই রাজ্যের রাজধানী ছিল উপকূল থেকে প্রায় ১৫০ মাইল দূরের মাইয়হাং-এ।[১৯] দীর্ঘদিন নগরীটি ছিল ভারত মহাসাগরের জানালা; সুলতানদের নিয়ন্ত্রণে থাকার সময়ে এটা মুসলমানদের হজ্জযাত্রা ও তৈরী সামগ্রী রফতানির প্রধান বন্দর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে চট্টগ্রামে দলত্যাগী অনেক পর্তুগীজ বসতি স্থাপন করেছিল, তারা গোয়াস্থ পর্তুগীজ ভাইসরয়ের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অবস্থিত এই নিরাপদ স্বর্গে অবস্থান করে ব্যক্তিগত বাণিজ্য ও সামরিক তৎপরতা চালাতো এবং কার্যকরভাবে বাঙালি সমাজে মিশে গিয়েছিল।[২০]

---

১৮. এই আমলে চট্টগ্রামের পরিবর্তনশীল নিয়ন্ত্রণকারীদের-গৌড়, ত্রিপুরা ও আরাকানের ইতিহাসের জন্য দেখুন M.A. Rahim, "Chittagong under the Pathan Rule in Bengal," *Journal of the Asiatic Society of Bengal* 18, no. 1 (1952): 21-30, and Suniti Bhushan Qanungo, "Chittagong during the Afghan Rule, 1538-1580," *Journal of the Asiatic Society of Bengalesh* 21, no 2 (1976); 54-75.

১৯. ১৪৩৩ সাল থেকে বার্মার স্বাধীন কর্তৃপক্ষ যদিও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল, কিন্তু তবুও তারা বাংলা সালতানাতের নিকট থেকে ব্যাপক মাত্রায় মুসলমান সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল: তারা নিজেদেরকে "সুলতান" হিসেবে পরিচিত করতো, তারা মুসলমান ধর্মবিশ্বাসের পদক ব্যাবহার করতো, এবং তাদের বৌদ্ধ নামের পাশাপাশি তারা মুসলমান নামও গ্রহণ করতো। তারা সমুদ্র থেকে খুব দূরবর্তী ভূমিতে বাস করতো না, বিশেষভাবে ক্রীতদাসের জন্য বাংলায় অভিযান চালাতো। এই কাজের ফলেই মোগলরা ১৬৬৬ সালে চট্টগ্রামে অভিযান পরিচালনা করার তাগিদ অনুভব করে এবং তা নিজেদের করে নেয়, আরাকানিরা প্রায়ই দলত্যাগী পর্তুগীজ অভিযাত্রী ও সৈনিকদের সাথে যোগ দিত। তবে পর্তুগীজরা দৃশ্যত বদ্বীপের বাইরে তাদের বন্দীদের বিক্রি করতো, এবং আরাকানের রাজারা অধীনস্থদের করদ হিসেবে তাদেরকে সংগ্রহ করতো এবং কৃষক হিসেবে বসতি স্থাপন করতে দিতো। তাদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। Godfrey E. Harvey, *History of Burma from the Earliest Times to 10 March 1824* (1925; reprint, London: Frank Cass & Co., 1967), 139-40, 144; Jadunath Sarkar, "The Conquest of Chatgaon, 1666 AD" *Journal of the Asiatic Society of Bengal* 3, (1907): 415, 417; D.G.E. Hall, *Burma* (London: Hutchinson's University Library, 1950), 57-62.

২০. ১৬৯৭ সালে নগরীটি সফরকারী ফ্রঁসোয়া পাইরার্ড উল্লেখ করেন: বাংলার এই উপকূলের বন্দরগুলোতে বিপুল সংখ্যক পর্তুগীজ স্বাধীনভাবে বসবাস করে; তারা নির্বাসিত ব্যক্তিদের মতোই নিজেদের জীবনের ব্যাপারে খুবই মুক্ত। তারা কোন দুর্গ, নির্দেশ বা পুলিশ ছাড়াই শুধুমাত্র যানবাহন নিয়ে বসবাস করে, এবং তারা দেশটির স্থানীয় অধিবাসী হিসেবে থাকে, অতীতের কৃতকর্মের জন্য তারা ভারতে (তথা গোয়ায়) ফেরার সাহস পায় না, এবং তাদের মধ্যে কোন পুরোহিত নেই। জাঁ গারী (*Jean Gari*) নামে তাদের একজনকে বাকিরা খুবই মান্য করে থাকে; বাংলার রাজার জন্য তিনি দশ সহস্রাধিক লোকের একটি বাহিনীর নেতৃত্ব দেন, যদিও তিনি পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ করেন না, কারণ তিনি তাদেরকে বন্ধু মনে করেন।" Pyrard, *Voyage*, 1: 334.

১৬৬৬ সালে মোগল জয়ের পূর্বে চট্টগ্রামের পশ্চাদভূমি ছিল কৃষিজ চাষাবাদের দিক থেকে অনুন্নত, ঘন অপ্রবেশযোগ্য জঙ্গলে ঢাকা। ১৫৯৫ সালে আবুল ফজল চট্টগ্রাম শহরকে 'জঙ্গল ঘেরা'[২১] হিসেবে অভিহিত করেন। ১৬২১ সালে মির্জা নাথান লিখেন, মোগল সৈন্যরা বর্তমান চট্টগ্রাম জেলা দিয়ে প্রবাহিত কর্ণফুলী নদীর ঢাল দিয়ে 'এমনকি একটি পিঁপড়ার পক্ষেও চলাচল অসম্ভব এমন একটি জঙ্গলাকীর্ণ পথ,' দিয়ে অগ্রসর হয়।[২২] ১৬৬৫-৬৬ সালে চট্টগ্রামে মোগল অভিযানের সমসাময়িক এক বিবরণীতে শিহাবউদ্দিন তালিশ উল্লেখ করেছেন, অভিযান শুরুর পূর্বে ঢাকায় মোগল সেনানায়করা তাদের সৈন্যদের হাজার হাজার কুঠার দিয়েছিল যার মানে দাঁড়াচ্ছে সেনাবাহিনী আক্ষরিক অর্থেই ফেনি থেকে কর্ণফুলী নদী দিয়ে চট্টগ্রাম উপকূলে পৌঁছার জন্য ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ বের করে নিয়েছিল, যে এলাকাকে শিহাবউদ্দিন বর্ণনা করেছেন 'পুরোপুরি জনমানবহীন এলাকা'।[২৩]

চট্টগ্রামের অভ্যন্তরভাগে সে সময়ে বসবাসকারী লোকদের কালো চামড়ার ও দাড়িবিহীন বা সামান্য দাড়িযুক্ত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।[২৪] অন্য কথায় গোত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মোগল বা তুর্কী-ইরানি এবং তারা ছিল পুরোপুরি অন্য রকম। আবুল ফজল লিখেন, 'তাদের ধর্ম হিন্দু ও মুসলমান উভয় থেকেই ভিন্ন। বোনরা তাদের আপন যমজ ভাইদেরও বিয়ে করতে পারে এবং তারা শুধুমাত্র মা ও পুত্রের মধ্যে বিয়ে থেকে বিরত থাকে। তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসেবে বিবেচিত সাধুপুরুষরা *ওয়ালি* নামে পরিচিত এবং তাদের শিক্ষা সংশয়হীনভাবে অনুসরণ করা হয়।'[২৫] তাই চট্টগ্রামে ইসলামীকরণ ইতিমধ্যেই হিন্দু সামাজিক ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত জনসাধারণের মধ্যে হয়নি, বরং সেই সব আদিবাসীদের মধ্যে হয়েছিল, যাদেরকে মোগল দৃষ্টিভঙ্গিতে হিন্দু বা মুসলমান কোনটাই ছিল না বলে বলা হয়েছে। তাদের সমাজে বিদ্যমান নিকটাত্মীয়দের মধ্যকার বিবাহরীতি হিন্দু বা মুসলমান রীতির বহির্ভূত হওয়ায় ধারণা করা যায়, তারা সভ্যতার সংস্পর্শ পেয়ে থাকলেও তা ছিল সামান্য। সাধু পুরুষদের

২১. Abul Fazl Allami, *Ain-i Akbari* (Lucknow ed.) 2: 79; trans., 2: 137. ১৯০৮ সালের চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হয়, বাস্তব কারণেই বলা যেতে পারে ১৬৬৬ সালে মুসলমান বিজয়ের সাথে সাথেই চট্টগ্রামের রাজস্ব ইতিহাসের সূচনা হয়েছে। উল্লিখিত সালটির পূর্বে জেলাটির অধিকাংশ জায়গা ছিল জঙ্গলে ঢাকা, তবে এখানে সেখানে অভিবাসী বসতি স্থাপনকারীরা ইচ্ছামতো ছোট ছোট বসতি স্থাপন করেছিল।" L.S.S.O' Malley, *Eastern Bengal District Gazetteers: Chittagong* (Calautta: Bengal Secretariat Book Depot, 1908), 136.

২২. Nathan, *Baharistan*, trans. Borah, text, fol. 272b; trans., 2: 632.

২৩. Jadunath Sarkar, "Shaista Khan in Bengal (1664-66)," *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, no. 6 (June 1906): 409-11

২৪. Abul Fazl Allami, *Ain-i Akbari* (Lucknow ed.) 2: 74; trans., 2: 132.

২৫. Ibid., text, 2: 74-75; Trans., 2: 132.

(ওয়ালি) সংশয়হীন অনুসরণের বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ আমরা দেখবো চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে ইসলামী সভ্যতার একেবারে প্রাথমিককালের প্রতিনিধিদের স্থানীয় পর্যায়ে সাধু পুরুষ হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা হিসেবে ১৭৯৮ সালে উক্ত অঞ্চলে দায়িত্বপালনকারী ফ্রানসিস বুকানন বলেন, এসব মানুষ জুম ভিত্তিক চাষাবাদে নিয়োজিত ছিল। বুকানন লিখেন,

আমার মনে হয়, জুম হলো বাংলার পূর্ব প্রান্তের পাহাড়গুলোতে বসবাসরত বর্বর উপজাতীয়গুলোর অদ্ভুত ধরনের চাষাবাদ। শুষ্ক মওসুমে এসব স্থানের লোকজন পাহাড়ি এলাকার সব ঝোপঝাড় সমূলে কেটে ফেলে। কিছু সময় শুকানোর পর সেগুলোতে আগুন দেওয়া হয়, এর ফলে বিশাল বিশাল বৃক্ষ ধ্বংস হয়। তবে এসব গাছ বড় হলে কাজের এই অংশটি প্রায়ই বেশ সফল হয়। পুরো এলাকা এখন ছাইয়ে ঢাকা, প্রথম বৃষ্টিতেই তা ভিজে যায় এবং সারের কাজ করে। মওসুমের প্রথম বর্ষণে মাটি নরম হওয়ার সাথে সাথেই চাষীরা বপনের কাজ করে। কোমরে একটি ছোট ঝুড়ি বেঁধে, তাতে জুম চাষে লাগানো হবে এমন সব ধরনের গাছের বীজ বাছবিচারবিহীনভাবে রাখে। এসব গাছের মধ্যে রয়েছে প্রধানত ধান, তুলা, মরিচ, নীল ও বিভিন্ন ধরনের ফল। তারপর চাষী এক হাতে লোহার ফলাযুক্ত খুরপি নিয়ে অনিয়মিত দূরত্বে মাটিতে গর্ত করে, তবে সাধারণত একটি থেকে আরেকটি গর্তের দূরত্ব হয় এক ফুট। এসব গর্তের প্রতিটিতে সে অন্য হাতে ঝুড়ি থেকে নির্বিচারে কিছু বীজ নিয়ে ফেলে দেয়, শস্যের পরিচর্যার দায়িত্ব প্রকৃতির উপর ছেড়ে দিয়ে সে চলে যায়।...... পরের বছর চাষীরা জুম চাষের জন্য জঙ্গলে ঢাকা আরেকটি স্থান নির্বাচন করে, কারণ এ ধরনের উর্বরা শক্তির জন্য সার হিসেবে ছাইয়ের প্রয়োজন হয়। যখন সাবেক এলাকার জঙ্গল চলনসই গোছের হয়, তখন চাষীরা আবার সেখানে যায় এবং তাতে বড় বড় গাছপালা না থাকায় কাটার কাজ সহজতর হয় এবং ভূমি অনেক ভালভাবে পরিষ্কার করা যায়।[২৬]

জুম চাষাবাদে জমিগুলো স্থায়ীভাবে পরিষ্কারের প্রয়োজন না থাকায় এ ধরনের কাজে খুব বেশি শ্রমের প্রয়োজন হয় না। আর এর মাধ্যমে ঘন অধ্যুষিত জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটানোর মতো পর্যাপ্ত শস্যও উৎপাদিত হয় না। অন্যত্রের মতো এখানেও জুম চাষ থেকে লাঙল, গবাদি পশুর ব্যবহার এবং ধান চাষের পদ্ধতি সম্বলিত খামার

---

২৬. Francis Buchanan, "An Account of a Journey Undertaken by Order of the Bd. of Trade through the Provinces of Chittagong and Tipperah in Order to Look Out for the Places Most Proper for the Cultivation of Spices, March-May 1798" (British Museum, London, Eur. MSS, Add. 19286), 46-47.

ভিত্তিক পরিবর্তনের ফলে নাটকীয়ভাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। এসবের ঠিক পরপরই দ্রুততার সাথে ঘটে ১৬৬৬ সালের মোগল বিজয়।

১৬৬৫ সালে মোগল রাজদরবার বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খানকে বাংলার ভাটির এলাকাগুলোতে নৌপথে হামলা ও লুণ্ঠনকারী আরাকানি ও পর্তুগীজ দস্যুদের দমনের লক্ষ্যে তাদের আশ্রয়স্থান চট্টগ্রাম দখল করার জন্য একটি তড়িৎ অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেয়। ১৬৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বুজুর্গ উমিদ খানের নেতৃত্বে ৬৫০০ সৈন্য ও ২৮৮টি রণতরী ঢাকা ত্যাগ করে এবং ১৬৬৬ সালের জানুয়ারিতে উপকূলীয় জঙ্গলাকীর্ণ করিডোর দিয়ে পথ করে নিতে থাকে। একমাস পর চট্টগ্রামে পৌছে মোগলরা তিনদিন আরাকানীদের অবরোধ করে রাখে এবং ১৬৬৬ সালের ২৬ জানুয়ারি নগরদুর্গের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।[২৭] নগরীটিকে সাথে সাথেই ফৌজদারের (সামরিক অধিনায়ক) একটি নতুন মোগল *সরকার* বা জেলার সদর দফতরে পরিণত করা হয়, যার দায়িত্ব থাকে প্রশাসনিক বিষয়সমূহ দেখার সাথে সাথে মুখ্য রাজস্ব কর্মকর্তা *(আমিল)* হিসেবেও কাজ করা। এই সময়ে জেলাটিতে বিপুল সংখ্যক হিন্দু অভিবাসীও বসতি স্থাপন করে, এদের অনেকে ব্যবসায়ী হিসেবে অভিযানে অংশ নেওয়া সেনাবাহিনীর সাথে এসেছিল এবং বাকিরা আসে কেরানি হিসেবে, কারণ মোগলরা অন্যান্য স্থানের মতো এখানেও হিন্দু আমলাতান্ত্রিক বিশেষজ্ঞদের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিল।[২৮] এই তড়িৎ অভিযানের শরিক ৬৫০০ সৈন্যের অধিকাংশই জল বা স্থলপথে আরাকানীদের হামলা প্রতিরোধের জন্য উক্ত এলাকার সেনাছাউনিতে অবস্থান করতে থাকে। সামরিক বাহিনীতে তাদের সেবার প্রতিদানে তাদেরকে ছোট, করমুক্ত ভূমি দেওয়া হয় এবং সেগুলোকে চাষাবাদের আওতায় আনার স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে সামরিক নিরাপত্তার অতিপ্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেলে এসব ভূমি ফের চট্টগ্রাম সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় এবং সৈন্যরা কর আদায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্ষুদে ভূস্বামী বা জমিদারে পরিণত হয়।[২৯] অবশ্য এসব লোক পরিষ্কারকরণ কার্যক্রমে নিজেদের নিয়োজিত করেনি। তারা বরং বনের কোন কোন অংশের বংশানুক্রমিক গোষ্ঠীপতি হিসেবে বহাল থাকে এবং আরো কর্মক্ষম লোকদের বন পরিষ্কারকরণ এবং সেটা চাষাবাদের আওতায় আনার অত্যন্ত কঠিন কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদান করে।

মোগল বিজয়ের অব্যবহিত পরই চট্টগ্রামের পশ্চাদভূমি জুড়ে মসজিদ ও দরগার বিস্তৃতি শুরু হয়। ১৭৭০ সালের এক বৃটিশ রিপোর্টে দেখা যায়, জেলার সবচেয়ে ভাল

২৭. Jadunath Sarkar, "Shaista Khan," 257.

২৮. L.S.S.O' Malley, *Eastern Bengal District Gazetteers: Chittagong*, 53.

২৯. H.J.S. Cotton, *Memorandum on the Revenue History of Chittagong* (Calcutta: Secretariat Press, 1880), 3-4.

জমিগুলোর পুরো দুই-তৃতীয়াংশই ১৬৬৬ সাল থেকে 'দাতব্য *সনদের* আওতায়।'[৩০] এসব দলিলপত্র তথা *সনদ* মোগল সম্রাটের নামে চট্টগ্রামের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা জারি করেছিলেন এবং রাজস্ব আদায়ের ক্ষুদ্রতম ইউনিট *পরগনায়* কর্মরত ক্ষুদে কেরানিকে *(মুতাসাদ্দি)* উদ্দেশ্য করে লেখা। *সনদগুলো* জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলসমূহ ধারাবাহিকভাবে মোগল কর্তৃপক্ষ থেকে মুসলমান পবিত্র ব্যক্তিদের নামে উৎসর্গকৃত শত শত মসজিদ ও দরগা নির্মাণ বা ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত একটি উদীয়মান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের কাছে হস্তান্তরের সাক্ষ্য দিচ্ছে। *সনদে* এই হস্তান্তরকে ওয়াকফ অর্থাৎ এসব ভূমির ব্যক্তিগত ব্যবহার অস্বীকার করা এবং তা মসজিদ, মাদরাসা, হাসপাতাল, দরগা ইত্যাদি মুসলমান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সহায়তার জন্য সংরক্ষিত হিসেবে অভিহিত করা হয়নি। বরং মসজিদ বা দরগার *মোতাওয়াল্লিদের* সরাসরি নিষ্কর ভূমি মঞ্জুর করা হয়েছে এবং এই নিশ্চয়তাও দেওয়া হয়েছে, *মোতাওয়াল্লিদের* বংশধরও এসব দান অব্যাহতভাবে ভোগ করবে। তাই, মঞ্জুরিপ্রাপ্তরা তাদের প্রশাসনিক কর্তৃত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দকৃত জমির কার্যত ও আইনসম্মত মালিক ছিল।[৩১] ফলে, এসব মঞ্জুরি বদ্বীপটির এই অংশে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রক্রিয়ার পথ সৃষ্টি করে: জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি ধানক্ষেতে পরিণত হলো এবং আদিবাসী মানুষেরা ধান-চাষী কৃষক হলো, সাথে সাথে উভয়ই অর্থনৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে একটি নতুন সম্প্রদায়ের অনুগত হলো।

১৬৬৬ থেকে ১৭৬০ সাল পর্যন্ত বন পরিষ্কার এবং স্থায়ী কৃষিজ বসতি স্থাপনের লক্ষ্যে চট্টগ্রামের মোগল কর্তৃপক্ষের পথপ্রদর্শকদের মোট ২৮৮টি নিষ্কর জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি মঞ্জুরির কথা জানা গেছে।[৩২] এসব মঞ্জুরীপ্রাপ্তদের মধ্যে ছিল মসজিদের

৩০. Ibid., 13.

৩১. এসব মঞ্জুরিতে ইসলামী *ওয়াকফ* ও ব্যক্তিগত মঞ্জুরি উভয় উপাদান থাকার কথা প্রকাশ করছে। *ওয়াকফ* ছিল নীতিগতভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ও স্থায়ী প্রকৃতির, অন্যদিকে *ইনাম* বা *মাদাদ-ই মা'শের* মতো মঞ্জুরিগুলো ছিল ব্যক্তিগত ও বাতিলযোগ্য। অবশ্য, বাস্তবে, এই সম্পূর্ণ পৃথক বৈশিষ্ট্যটি অনুসরণ করা হতো না। গ্রেগরী কজলোউস্কি লক্ষ্য করেছেন, "এমনকি মসজিদ ও বিদ্যালয়ের জন্য দান ব্যক্তিগত মাত্রার হয়ে যেত, কারণ কর্মচারিরা এ থেকেই জীবিকা নির্বাহ করতো।" তাই *ওয়াকফ* মঞ্জুরিগুলো বলতে যেগুলো প্রতিষ্ঠানগুলোকে এবং স্থায়ী প্রকৃতি সম্পন্ন ছিল সেগুলোকেই বিবেচনা করা হয়েছে এবং *ইনাম* বা *মাদাদ-ই মা'শ* মঞ্জুরিগুলো ব্যক্তিগত ও উত্তরাধিকার সূত্রে মঞ্জুরিপ্রাপ্ত ব্যক্তির বংশধররা পেত। দেখুন Kazlowski, *Muslim Endowments and Society in British India* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 24-25.

৩২. চট্টগ্রাম জেলা কালেকটরেটে সংরক্ষিত মোগল আমলের দলিলপত্রগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র *লা-খারাজ* বা নিষ্কর মঞ্জুরিগুলোর সাথে সম্পর্কিতগুলোই টিকে আছে। এগুলো টিকে থাকার কারণ ছিল, ১৭৬০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন শুরু হওয়ার পর বৃটিশরা ঘোষণা করে, সাবেক আমলের নিষ্কর মঞ্জুরিগুলোর প্রতি তারা সম্মান প্রদর্শন করবে, তার অর্থ দাঁড়ায়, এ ধরনের ভোগদখলের প্রমাণ হিসেবে মোগল দলিলপত্রের অধিকারীরা তা সংরক্ষণের বেশ জোরালো উৎসাহ পেয়ে থাকবে।

মোতাওয়াল্লি, মুসলমান সাধু পুরুষদের দরগার *মোতাওয়াল্লি*, এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কহীন ধার্মিক মুসলমান, হিন্দু মন্দিরের সেবায়েত এবং ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, (দেখুন তালিকা ৬)। মোট মঞ্জুরীর ২৬২টি তথা শতকরা ৯১ শতাংশ দেওয়া হয়েছিল মুসলমানদের এবং রাজকীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে হস্তান্তরের মোট বনজ ভূমির ১১,১৯৫.৪ একর তথা ৮৭ শতাংশ পেয়েছিল মুসলমানরা। মঞ্জুরী একক বৃহত্তম অংশটি পেয়েছিল পল্লীর মসজিদ-বাঁশ খড় আর মাটির তৈরি বৈশিষ্ট্যসূচক সাদামাটা কাঠামো, যা ২২-২৪ নম্বর চিত্রে প্রদর্শন করা হয়েছে।[৩৩] ১৭২০-এর দশকে এসব পল্লী মসজিদ পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ করে, চট্টগ্রামের পশ্চাদভূমি জুড়ে এ সময় পঞ্চাশটি এ ধরনের অবকাঠামো গড়ে ওঠে।

৬ নম্বর মানচিত্রে, ১৭২০, ১৭৩০, ১৭৪৫ ও ১৭৬০ সালের দিকের এসব মঞ্জুরী চট্টগ্রাম মহানগর এবং কর্ণফুলী উপত্যকার উত্তর ও দক্ষিণে পার্বত্য এলাকা ঘিরে থাকা সমতল ভূমিতে এসব মসজিদ ও দরগা এবং ক্ষুদ্র পরিসরে হিন্দু প্রতিষ্ঠানসমূহ ছড়িয়ে পড়ার ভৌগোলিক বিন্যাসের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এতে শুধুমাত্র ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্প্রসারণ চিত্রই দেখানো হয়নি, বরং সেই সাথে কৃষিজ সমাজের অগ্রগতিও প্রদর্শিত হয়েছে, কারণ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা মানে বন কাটা ও পরিষ্কারকরণ। এমনকি মঞ্জুরীকৃত ভূমিসমূহ চিহ্নিতকরণে *সনদে* ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহও প্রমাণ করছে অর্থনৈতিক সীমান্তের পূর্বগামী অভিযাত্রায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কী মাত্রায় পুরোভাগে ছিল: লোকালয়ের নিকটবর্তী স্থানে বরাদ্দকৃত মঞ্জুরীতে প্রায়ই অভিহিত

বাস্তবিকই, এই উদ্দেশ্য এতো শক্তিশালী ছিল যে, কিছু কিছু বাঙালি উদ্যোমী ব্যক্তি তাদের নিজস্ব "মোগল" দলিলপত্র নকল করে তাদের দাবি জোরালো করতে থাকলে বৃটিশরা হতাশ হয়ে পড়ে। এ আবিষ্কারের প্রেক্ষাপটে এসব মঞ্জুরির বৈধতা তদন্তের পর সেগুলো অবৈধ হিসেবে ঘোষণার বিষয়টি নিয়ে চট্টগ্রামের ডিপুটি কালেকটরেটে অনেকগুলো শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। তা করতে গিয়েই ১৮১৯ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত পুরো জেলাটিতে মোগল ভূমি রেকর্ডগুলো বৃটিশরা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করে। যে মোট ২৮৮ টি দলিল টিকে আছে, তার কারণ ছিল সেগুলোকে পরীক্ষার পর বৈধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এ ধরনের মঞ্জুরি প্রদান করা অনেক মূল সনদ সময়ের পরিক্রমায় হারিয়ে গিয়েছিল। তারপরও টিকে থাকা সনদগুলো প্রাথমিক তথ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের প্রতিনিধিত্ব করছে। এই শুনানির সারসংক্ষেপের জন্য দেখুন *Correspondence on the Settlement of the Noabad Lands in the District of Chittagong* (Calcutta: Bengal Secretariat, 1871), 1: 20-21, 59-61, and Cotton, Memorandum. ইংলিশ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক তত্ত্বসহ শুনানির সারসংক্ষেপ এবং তার ফলে উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে সৃষ্ট ব্যাপক বিক্ষোভের জন্য দেখুন Abu Mohammad Waheeduzzaman, "Land Resumption in Bengal, 1819-1846" (Ph.D diss., University of London, 1969).

৩৩. চিত্রটিতে ১৯১৯ থেকে ১৮৪৮ সালে চট্টগ্রামের ডিপুটি কালেকটরের শুনানির সারসংক্ষেপের নথিপত্রগুলোও ছিল।

টেবিল ৬: ১৬৬৬-১৭৬০ সময়কালে সরকার চট্টগ্রামের নিষ্কর-ভূমি বন্টন

	মসজিদ		মুসলমান দরগা		মুসলমান দাতব্য		হিন্দু মন্দির বা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়	
	সংখ্যা	একর	সংখ্যা	একর	সংখ্যা	একর	সংখ্যা	একর
১৬৬৬-১৬৯৯	১	১৬৬	-	-	২	২৬২.৬	-	-
১৭০০-১৭০৯	২	৩৮.৪	১	৮৯.৬	১	১৬.৬	-	-
১৭১০-১৭১৯	৪	২৮৮.৩	১	২৫৬	৯	৫১৭	১	২০৯.৬
১৭২০-১৭২৯	৫০	১,৫৮৩	১১	৩৯১.৮	১১	১১১.৬	৩	৩৯২
১৭৩০-১৭৩৯	৩০	১,১১৮	১৪	২৮১.৬	৫	৮২	৩	৭৮.৪
১৭৪০-১৭৪৯	৩১	১,৬০৬.৪	১৬	৩৮৬	১১	২৩৭.২	৫	১৩৯.৬
১৭৫০-১৭৬০	৩২	৩,১২০.৫	২০	৪২৮	১০	২১৪.৮	১৪	৮১৭.৬
মোট	১৫০	৭,৯২০.৬	৬৩	১,৮৩৩	৪৯	১,৪৪১.৮	২৬	১,৬৩৭

মন্তব্য: যেসব মূল সূত্রে এসব দেওয়া হয়েছিল তাতে জমির এলাকার ইউনিট হিসেবে বলা হয়েছিল দুন, যা দু ধরনের। এক মগি দুনে জমির পরিমাণ হয় ৬.৪ একর, অন্যদিকে শাহি দুনে তা আগেরটির চেয়ে চারগুণ বেশি অর্থাৎ তার পরিমাণ ২৫.৬ একর। প্রতিটি মাপেরই ১৬ কানিতে করা হয় এক দুন। দেখুন: J.B Kindersley, Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Chittagong (Alipore: Bengal Government Press, 1938), p.17

করা হয়েছে মানবভূগোল[৩৪] হিসেবে, পশ্চাদভূমিগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রাকৃতিক ভূগোল[৩৫] হিসেবে। অনেক *সনদে* মঞ্জুরীকৃত এলাকাকে অন্যান্য মঞ্জুরীর সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৭২৩ সালে হাটহাজারিতে একটি সূফী দরগা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দকৃত ২৫.৬ একর জঙ্গলের অবস্থান ছিল, 'মালিক দৌলতের *খয়রাতের* (দানকৃত স্থান) পূর্বদিকে, মুহাম্মদ রেজার *খয়রাতের* উত্তরদিকে এবং আবদুল গফুরের

৩৪. উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৭৫৪ সালের একটি সনদে চট্টগ্রাম নগরীর মোটামুটি বসতিপূর্ণ এলাকায় চৌদ্দ একর জমি মঞ্জুরির কথা বলা হয়েছে, মঞ্জুরিকৃত এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে এভাবে "রাজকীয় মহাসড়কের পূর্বে, লম্বা পর্বতগুলোর পশ্চিমে, নূর খানের জমিজমা ও বাগানের দক্ষিণে এবং মুহাম্মদ খানের রাস্তা ও দীঘির উত্তরে। "Kanun Daimer Nathi," Chittagong District Collectorate Record Room, No. 208: bundle 64, case no. 4122.

৩৫. বাঁশখালি থানার সীমান্ত অঞ্চলের একটি মসজিদের সহায়তার জন্য ১৮৪৬ সালের একটি মঞ্জুরিতে মঞ্জুরীকৃত এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে এভাবে, "সাগরের পূর্বে, কুলখালি *নালার* দক্ষিণে, হামতলা *নালার* পশ্চিমে, এবং খাতখালি *নালার* উত্তরে।" Ibid., No. 182: bundle 33, case no. 2188.

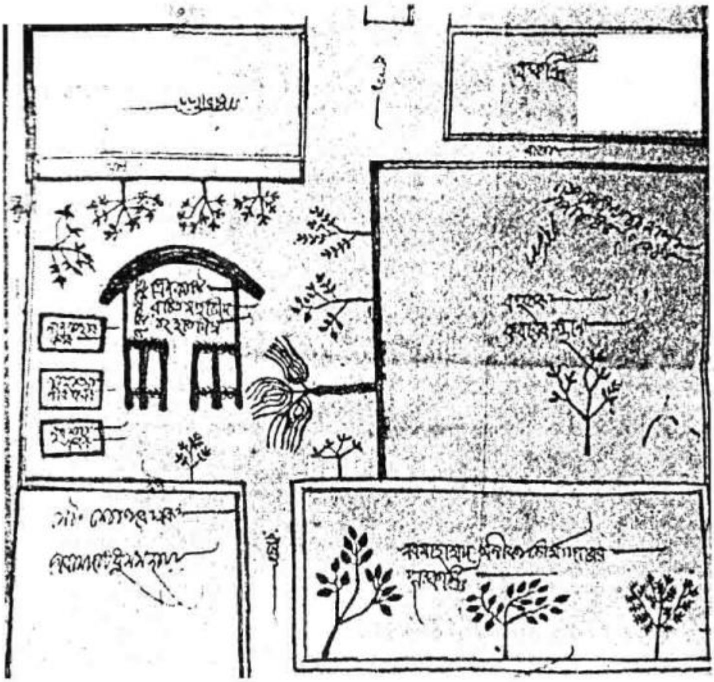

চিত্র ২২। ১৭৫৯ সালে স্থাপিত ফটিকছড়ি থানার সুন্দরপুরের বাঁশের বেড়ার মসজিদ। "Kanun Daimer Nathi," Chittagong District Collectorate Record Room, bundle 62, case no.4005.

খয়রাতের দক্ষিণদিকে।'৩৬ মঞ্জুরীকৃত এলাকার অবস্থান অন্যান্য মঞ্জুরীর মাধ্যমে চিহ্নিতকরণের ফলে তা সেগুলোর ঘনত্ব এবং সেই সাথে চট্টগ্রাম পশ্চাদভূমিতে পূর্ববর্তী বসতির অনুপস্থিতির কথা প্রকাশ করে। পরিশেষে, এভাবে ভূমি চিহ্নিত করার মাধ্যমে চট্টগ্রামের আমিল এবং তার স্টাফ বাংলার সাবেক বনভূমির দৃশ্যপটে স্থান এবং সামাজিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসূচক মোগল অনুভূতি প্রকাশ করেছে।৩৭

চট্টগ্রামে জারিকৃত সর্বপ্রাচীন দলিল তথা ১৬৬৬ সালের ২ সেপ্টেম্বরের তারিখ সম্বলিত একটি *সনদে* এসব মঞ্জুরীর বিশেষ প্রক্রিয়ার বিষয়টি ফুটিয়ে তোলে।

৩৬. Ibid., No. 45 : bundle 56, case no. 3626.

৩৭. মানববসতি কিংবা ভৌগোলিক যেভাবেই চিহ্নিত করা হোক না কেন, এসব মঞ্জুরি প্রমাণ করেছে যে, মোগল প্রশাসকগণ সীমানা চিহ্নিত ও পরিধি শ্রেণীবদ্ধ করার মাধ্যমে ভূমির স্বীকৃতি দিত। যদিও আধুনিক অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এভাবে সীমানা চিহ্নিতকরণের ধারণাটি ইংরেজরাই ভারতে প্রবর্তন করেছিল, কিন্তু এসব তথ্যে সীমানা চিহ্নিতকরণের সুস্পষ্ট থাকায় বোঝা যাচ্ছে বৃটিশ শাসনের পূর্বেই এখানে গ্রামের গড়পরতা হিসেবে নয়, সুনির্দিষ্টভাবে ভূমি চিহ্নিত করা হতো। দেখুন W.C. Neale, *Economic Change in Rural India* (New Haven: Yale University Press, 1962), 5-7, 20-34.

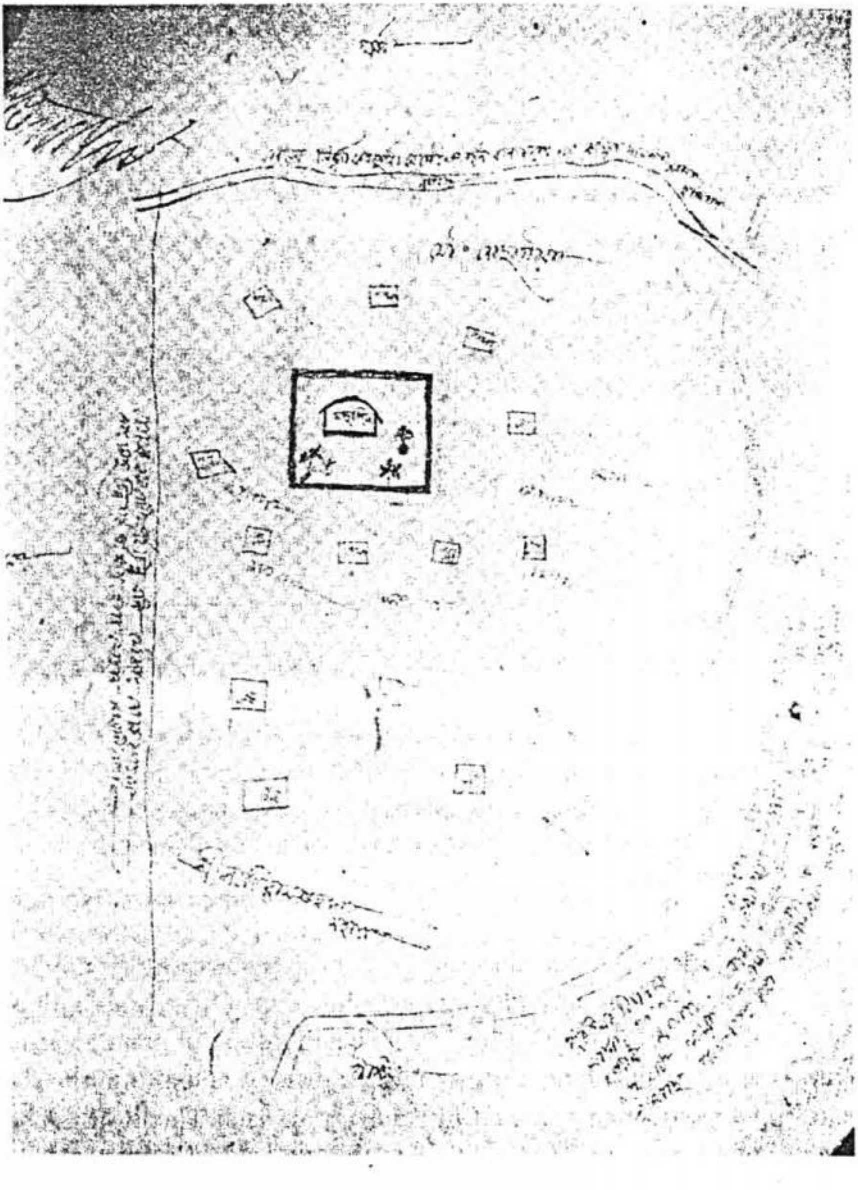

চিত্র ২৩। ১৭২০ সালে স্থাপিত সাতকানিয়ার লোহাগড়ার বাঁশের বেড়ার মসজিদ। রেখাচিত্রের তারিখ ১৮৪৩। "Kanun Daimer Nathi," Chittagong District Collectorate Record Room, bundle 29, case no. 1808.

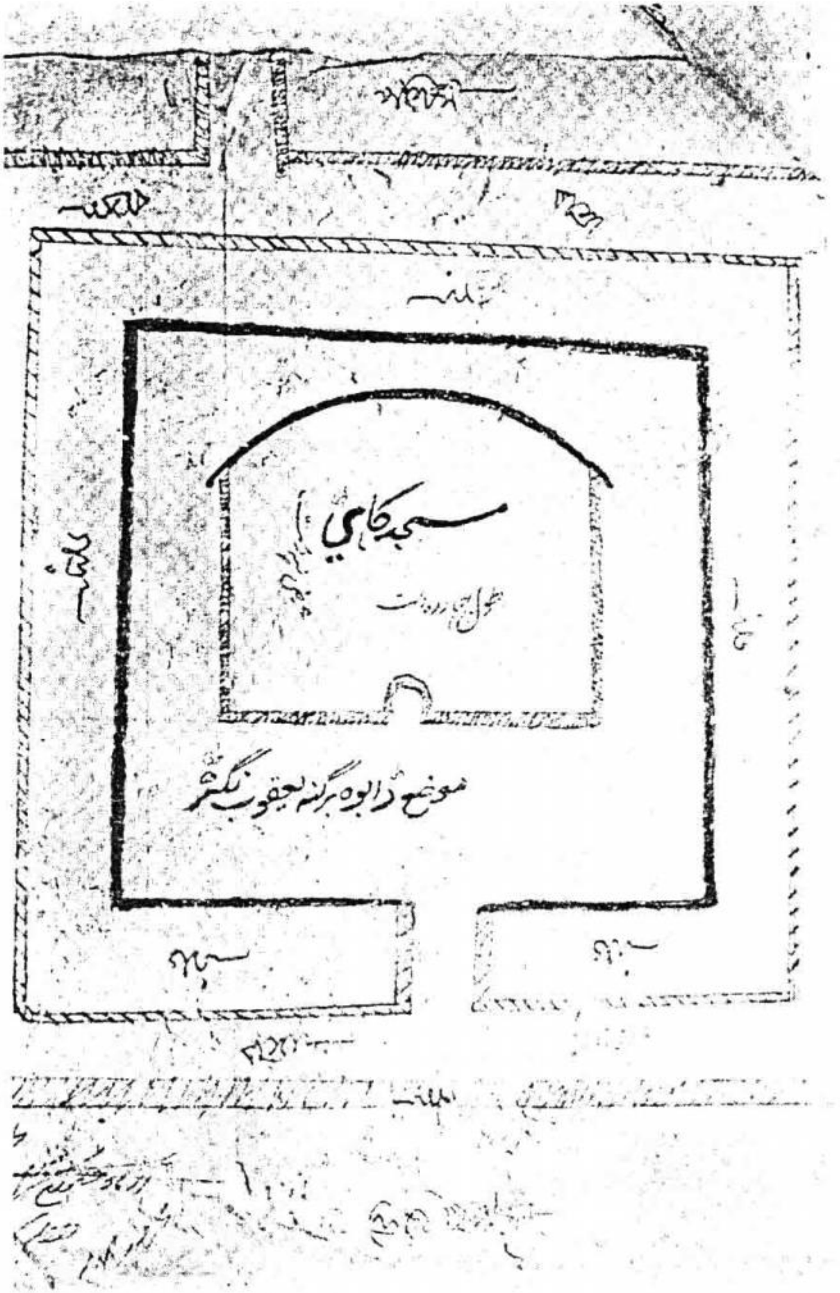

চিত্র ২৪। ১৭৬৬ সালে স্থাপিত হাটহাজারির দাবনার বাঁশের বেড়ার মসজিদ। "Kanun Daimer Nathi," Chittagong District Collectorate Record Room, bundle 51, case no. 3329.

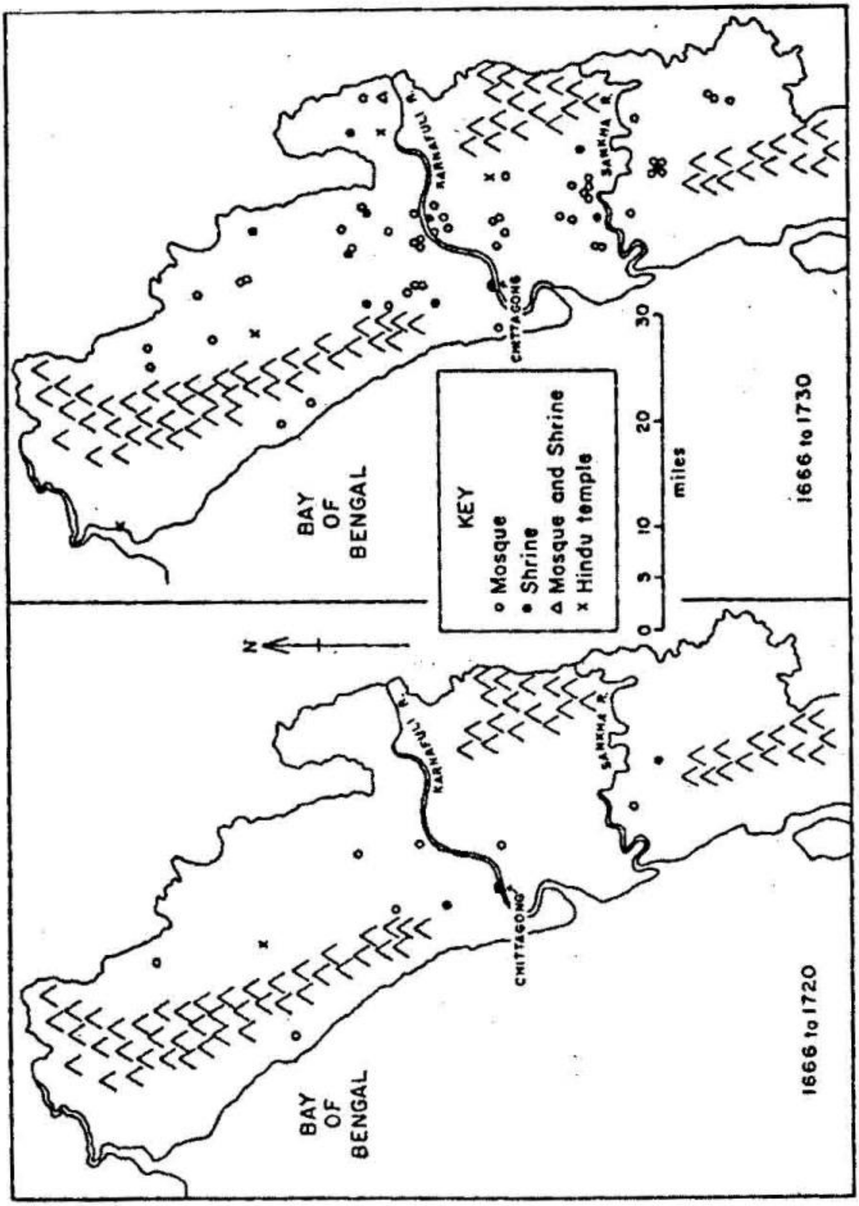

মানচিত্র ৬। সরকার চট্টগ্রামে মুসলমান প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্প্রসারণ, ১৬৬৬-১৭৬০।

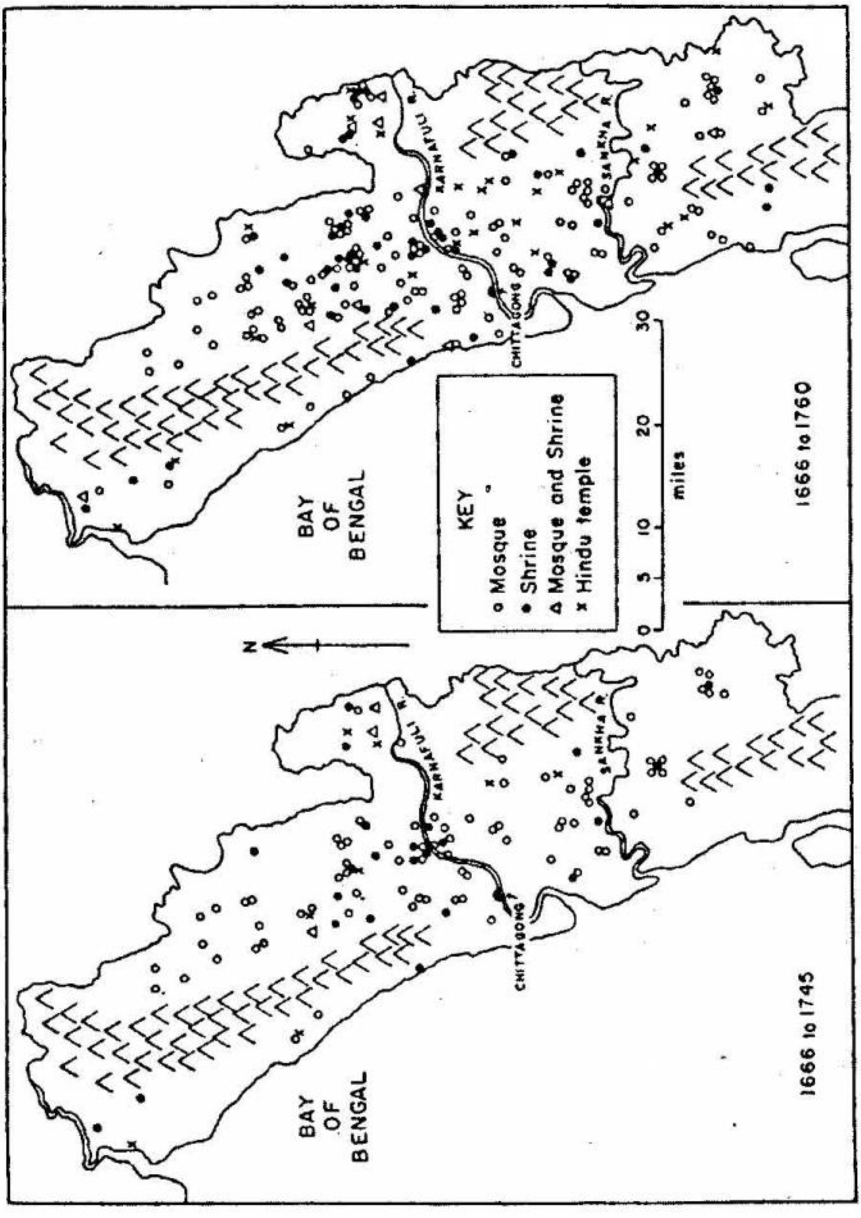
BAY OF BENGAL
KEY
o Mosque
• Shrine
Δ Mosque and Shrine
x Hindu temple
0 5 10 20 30
miles
1666 to 1760
KARNAFULI R.
SANKHA R.
CHITTAGONG
N
BAY OF BENGAL
KARNAFULI R.
SANKHA R.
CHITTAGONG
1666 to 1745

মানচিত্র ৬ (চলমান)।

সরকার ইসলামাবাদের (অর্থাৎ চট্টগ্রাম) বর্তমান ও অতীতের রাজস্ব সার্কেলের *(পরগনা) মুৎসুদ্দি* (কেরানি), *মুয়ামিল* (পরিমাপকারী), *চৌধুরী* (হেডম্যান), *কানুনগো* (হিসাবরক্ষণকারী) ও কৃষকরা (*রায়ত* ও *মুজারি*) জানবে যে:

শাহ জয়নাল আবেদিন জানিয়েছেন যে, তাঁর অনেক নির্ভরশীল আছে এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন, যেখানে অনেক ফকির ও লোকজন আসা-যাওয়া করে। কিন্তু মসজিদটি রক্ষণাবেক্ষণের সামর্থ্য তাঁর নেই, তাই তিনি আশাবাদী, সরকার তাঁকে কিছু জমি দান করবে।

বিষয়টি তদন্তের পর, রাজস্ব বিভাগ রাজস্ব হিসাবের বাইরে, এবং নয়াপাড়া ও *পরগনা* হাভেলি চট্টগ্রামের অন্যান্য স্থানে অবস্থিত মোট ছয় *শাহি দুন* ও *আট কানি* (অর্থাৎ ১৬৬.৪ একর) জঙ্গলভূমি মসজিদের ব্যয়ভার নির্বাহ ও উল্লিখিত লোকদের ভরণপোষণের জন্য দান হিসেবে নির্ধারণ করা হলো। ভূমিটির চাষাবাদের আওতায় আনামাত্র ভূমির উৎপাদিত সামগ্রী মসজিদের ব্যয়ভার নির্বাহ এবং একই সাথে তাঁর নিজের, তাঁর বংশধরদের ও তাঁর উপর নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মিটাতে ব্যয়িত হবে। এবং তাঁকে অবশ্যই একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের জন্য কায়মনোবাক্যে দোয়া করতে হবে। তাঁর ও তাঁর বংশধরদের কোন ভূমি রাজস্ব বা ভূমি-বহির্ভূত রাজস্ব, মহাসড়ক কর, সেতু কর, বিশেষ শুল্ক, কিংবা সরকারের রাজস্ব বিভাগ বা প্রশাসন থেকে জারিকৃত অন্য কোন ধরনের কর দিতে হবে না। এমনকি তিনি প্রতিবছর নতুন সনদ নিতে বাধ্য নন। এই নির্দেশ কার্যকর করতে পর্যাপ্ত যত্ন নাও। তারিখ ২রা রবি, ১০৭৭।[৩৮]

সাম্রাজ্যের কৃষিজ ভিত্তি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এসব মঞ্জুরীর অর্থনৈতিক লক্ষ্য প্রায় সকল সনদে বিদ্যমান একটি বাক্যের 'সম্মত হওয়া গেল, ভূমিটি চাষাবাদের আওতায় আনা। ------- পরই গ্রহণকারীর বিশেষ পন্থায় ভূমির ফসল ব্যবহারের প্রত্যাশা থেকে বোঝা যায়।[৩৯] মসজিদ ও দরগার জন্য মঞ্জুরীর ধর্মীয় লক্ষ্য ছিল পল্লী এলাকায় ইসলামী ধর্মবিশ্বাস জোরদার করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর মানে ছিল সাদামাটা পল্লীর মসজিদ এবং সেগুলোতে কর্মরত সাধারণ পদাধিকারী ও আলেমদের সহায়তা করা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৭২১ সালে বোয়ালখালির কাধুরখিলের একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত *সনদে* কার্পেট ও বাতির খরচ ছাড়াও মসজিদের নিষ্কর ভূমি *খতিব, ইমাম, মোয়াজ্জিন, মাসাল্লিম* (ধার্মিক ব্যক্তি ও প্রচারক), *ফাতিহা আবেদিন* (বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী) ও *জারুব-কেশ* (ঝাড়ুদার) এর বেতন প্রদানে ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে।[৪০] অন্যান্য *সনদে* মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ

৩৮. Chittagong District Collectorate Record Room, "Kanun Daimer Nathi," No.1: bundle 59, case no. 3863.

৩৯. Ibid., No. 54: bundle 40, case no. 2545. *Muqarrar numuda shud ki abad va taraddud numuda........*

৪০. Ibid., No. 31: bundle 77, case no 4971.

(তারমিম) বা ঈদের মতো মুসলমানদের প্রধান প্রধান উৎসবের মতো ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপনের কথা বলা হয়েছে।[৪১] এমনকি কোন প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা ছাড়াও অন্যান্য ইসলামী আদর্শের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা দৃষ্টিগোচর হয়। যেমনটি দেখা যায়, ১৭১৫ সালে পটিয়ার বাক্কাইনে কুরআন তিলাওয়াতের শর্তে মুহাম্মদ মনোয়ার ও শেখ মুহাম্মদ জাফরকে আট একর জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিদানের ঘটনায়।[৪২] একইভাবে ১৭৪৮ সালে একই থানায় হুলাইনে কুরআন তিলাওয়াত ও *ফাতিহা* পাঠের জন্য শেখ ইমাম উল্লাহকে ১৪.৪ একর জমি মঞ্জুর করা হয়েছে।[৪৩]

রাজনৈতিকভাবে এসব মঞ্জুরীর লক্ষ্য ছিল সীমান্তে মোগল কর্তৃত্বের মূল গভীরতর করা। উপরোল্লিখিত ১৬৬৬ সালের *সনদে* উদ্ধৃত মঞ্জুরী গ্রহীতাকে 'অবশ্যই কায়মনোবাক্যে শক্তিশালী রাষ্ট্রটির টিকে থাকার জন্য দোয়া করতে হবে,' এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সরকার ও খোদার মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও সরকার এবং মঞ্জুরী গ্রহণকারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ একটি সম্পর্ক সৃষ্টি করা হয়েছে। কোন দলিলেই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার এই শর্তটি উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়নি। বরং কম গুরুত্বপূর্ণ না হলেও মঞ্জুরীর উপর নির্ভরশীলদের *(বা বাসতিগন)* হিসেবে বর্ণিতদের আনুগত্য কামনায় রাষ্ট্রের আগ্রহ অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়। এসব লোকই বন পরিষ্কারকরণ ও প্রতিষ্ঠান স্থাপনে মঞ্জুরীর সহায়তাপুষ্ট হয়ে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত ভূমি চাষাবাদের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে থাকে এবং পরিশেষে তাঁর অধীনস্থে পরিণত হয়। অনেক দলিলপত্রে প্রকাশ্যভাবেই কোন-না-কোন সাধুপুরুষের অনুসারীদের সহায়তা দেওয়ার উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে, যেমনটি দেখা যায় ১৭২৫ সালে তাজউদ্দিন ও জিয়াউদ্দিনের বেলায়, তারা তাদের সন্তান ও 'নির্ভরশীল' সহায়তা করার জন্য হাটহাজারিতে একটি জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি পেয়েছিলেন।[৪৪] ১৭৪৫ সালে তিন ব্যক্তি-মির সাঈদউল্লাহ, গোলাম হোসেন ও আফজাল খলিফ জানান, তাদের অনেক নির্ভরশীল রয়েছে, যাদেরকে সহায়তা করার সামর্থ্য তাদের নেই। তাদের ভরণ-পোষণের জন্য রাষ্ট্র একই থানায় ৩০.৪ একর জমি মঞ্জুরি দেয়।[৪৫] অন্যান্য মঞ্জুরিতে বলা হয়, মসজিদ বা দরগার ব্যয়ভার নির্বাহের পর ভূমির উৎপাদিত সামগ্রীর উদ্বৃত্ত অংশ মঞ্জুরী গ্রহণকারীর প্রতি নির্ভরশীলদের সহায়তার জন্য ব্যয়িত হবে।[৪৬] সংক্ষেপে, সরকার সীমান্ত এলাকার সামাজিক রাজনৈতিক তৎপরতার কেন্দ্র হিসেবে মসজিদ ও দরগাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল

৪১. Ibid., No. 85: bundle 68, case no 4314.
৪২. Ibid., No. 12: bundle 30, case no 1937.
৪৩. Ibid., No. 193: bundle 71, case no 4526. See also Ibid., No. 238: bundle 27, case no 1628. and No. 265: bundle 62, case no. 4002.
৪৪. Ibid., No. 54: bundle 40, case no 2545.
৪৫. Ibid., No. 165: bundle 28, case no 1751.
৪৬. এই ঘটনাটি শেখ আহমদ শাহের সাথে সম্পর্কিত, তিনি ১৭২০ সালে পটিয়া থানার পশ্চাদভূমিতে একটি খড়ের মসজিদ বানিয়েছিলেন। Ibid., No. 26a: bundle 69, case no 4404.

এবং সেখানে এসব প্রতিষ্ঠান যেমন তাদের নিজস্ব পৃষ্ঠপোষক গঠন করেছিল, তেমনি সরকারও তার উপর নির্ভরশীল পৃষ্ঠপোষক শ্রেণী গঠন করতে চেয়েছিল।

চট্টগ্রামের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উত্থান

সীমান্ত এলাকায় মসজিদ ও দরগাসমূহের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে চট্টগ্রামে মোগল কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। এটা ছিল যৌক্তিক, কারণ প্রাদেশিক বা রাজকীয় পর্যায় থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম নগরীতে অবস্থিত জেলা কার্যালয়েও না হওয়ায় এবং সীমান্ত এলাকায় ঘন বন কাটার মতো কঠিন কাজ সম্পন্ন করার জন্য জনশক্তি ও সংগঠন খুঁজে নিতে হচ্ছিল। সরকার তৃণমূল পর্যায়ে সেসব উদ্যোগকে বৈধতা প্রদান ও সমর্থন দেওয়ার চেয়ে বেশি কিছু করেনি। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলা দখলের কয়েক দশক পরে ১৭৯৮ সালে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, কিভাবে মোগল আমলে চট্টগ্রামের পশ্চাদভূমি ক্রমান্বয়ে লাঙলের আওতায় এসেছিল। ফ্রানসিস বুকানন বলেন:

বাংগালিদের গৃহীত নতুন ভূমি পরিষ্কারকরণের কাজের প্রক্রিয়ায়, *দিওয়ান, ফৌজদার* বা এ ধরনের কোন গণ্যমান্য লোক জেলার বনজ ভূমির কিছু অংশ মঞ্জুরী হিসেবে পায়। সামন্য পুঁজি সম্বলিত বিভিন্ন লোক তা থেকে কিছু কিছু অংশ *পাট্টা* বা ইজারা নেওয়ার আবেদন করে এবং তাদের নিজেদের অংশ পরিষ্কারকরণ কাজে এসব লোক প্রায়ই *জমিদার* বা মূল মঞ্জুরী প্রাপ্তদের নিকট থেকে সাময়িক সহযোগিতা হিসেবে প্রায়ই কিছু অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে। তবে এই অর্থ ঋণে পরিণত হয় এবং সামর্থ্য হওয়ার পর তারা তা ফেরত দিতে বাধ্য থাকে।

শীতের মওসুমে ঝোপঝাড় ও ছোটখাট গাছপালা কাটার মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। কয়েকদিন এগুলো শুকানোর পর সেগুলো পোড়ানো হয় এবং বৃষ্টির সূচনাতে ভূমি কর্ষণ করা হয় এবং একই সাথে গবাদি পশুর শক্তি এবং শিকড়ের প্রতিরোধও দেখা যায়। তারপর ধান বোনা হয় এবং সামান্য শস্য উৎপাদিত হয়। *সরদার* বা তদারককারী এবং আটজন শ্রমিক আট কানি (৩.২ একর) জমির এই কাজ করতে সক্ষম বলে ধরা হয়। দ্বিতীয় বছরের কার্যক্রমে থাকে বড় বড় গাছের বৃহত্তর অংশ কাটা সেগুলো পোড়ানো এবং প্রথম বছরের চাষাবাদের পর সৃষ্ট ঝোপঝাড় ও বনতলের শিকড়-বাকর তুলে ফেলা। আবার বৃষ্টির সূচনায় বীজ বপন করা হয় এবং এবার ফসল হয় অপেক্ষাকৃত ভাল। একজন *সরদার* ও দুজন শ্রমিক আট কানি জমির এই কাজ করতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

তৃতীয় বছরেও আবার সেই ঝোপঝাড় যতদূর সম্ভব কাটার মাধ্যমে কাজ শেষ হয় এবং কেটে ফেলা গাছের মূলগুলো উপড়ানো ও জ্বালানো হয়। দ্বিতীয় বছরের মতো একই সংখ্যক লোক নিয়োগ করা হয়। চতুর্থ বছরে পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে যায়

এবং স্বভাবিক খাজনা পরিশোধ করা হয়। প্রথম তিন বছর কিছুই দেওয়া হয় না। দুব্যক্তি ও দুটি বলদ আট কানি জমি চাষাবাদ করতে পারে, যা এখানে স্বাভাবিক আকারে কারো নিয়ন্ত্রণে থাকে। সমগ্র চট্টগ্রামে লাঙলের সাথে বলদের মতো গরুও জুড়ে দেওয়া হয়।[৪৭]

এটা নিশ্চিত যে, প্রথমত ভূমি পরিষ্কারকরণের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় মানুষের উদ্যোগ থাকে, সরকারের নয়। দ্বিতীয়ত আমরা দেখেছি, শ্রমিকদের আগাম নগদ অর্থ প্রদান করার মাধ্যমে *জমিদার* বা আসল ভূস্বামীদের গৃহীত ভূমিকা। এবং তৃতীয়ত আমরা দেখেছি, 'গণ্যমান্য গোছের লোকের' সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, যিনি বনজ ভূমির মঞ্জুরী পেয়ে শ্রমিকদের সেখানে নিয়োগ করেন এবং তারা বিনিময়ে তাঁর নিম্নে অবস্থানকারী অংশীদারে পরিণত হয়।

আমরা যদি অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে সেই শতকের শেষদিকে বুকাননের বর্ণিত ব্যবস্থাপনায় প্রয়োগ করি, তবে মোগল *সনদে* ব্যবহৃত শ্রেণীবিন্যাস তাৎক্ষণিকভাবে বোধগম্য হয়ে যায়। ১৭৯৮ সালে বুকাননের উল্লিখিত 'গণ্যমান্য গোছের লোক' আর মোগল *সনদে* বর্ণিত বন পরিষ্কারকরণ ও কৃষিকাজ সূচনার জন্য স্থানীয় লোকদের কর্মশক্তিতে সংঘবদ্ধকারীরা একই ব্যক্তি। এসব 'গণ্যমান্য গোছের লোক' কোথা থেকে এসেছিল, দলিলপত্রে তা বলা না হলেও তাদের নামের সাথে প্রায়শই ব্যবহৃত পদবিগুলোতে তাদের সামাজিক ভিত্তির সূত্র প্রদান করেছে। বারবার এসেছে এমন পদবির মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে শেখ (২৩), *চৌধুরী* (১১), *খন্দকার* (৯), *হাজী* (৮), *তালুকদার* (৭), *শাহ* (৪), *ফকির* (৪), *সৈয়দ* (৩), *দরবেশ* (৩), ও *খান* (৩)। *চৌধুরী, তালুকদার* ও *খান* হিসেবে চিহ্নিত ২১ জন স্পষ্টতই এসব মঞ্জুরি পাওয়ার আগেই পল্লী ভূস্বামী অভিজাত সম্প্রদায়ের সদস্য ছিল এবং এই সম্ভাবনা ভালমতো থাকে যে, তাদের সবাই তাদের ভূমির করমুক্ত সুবিধা পাওয়ার জন্য তারা মসজিদ বা দরগা নির্মাণ করেছিল বা সহায়তা করেছিল। বাকিরা ইসলামের সাথে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে সম্পৃক্ত ছিল। বৃহত্তম শ্রেণী 'শেখরা' হতে পারে হয় অনানুষ্ঠানিক সাধু পুরুষ বা *আলেম* শ্রেণীর সদস্য। ফারসি ভাষার খন্দকার শব্দটির অর্থ 'যে পড়ে' হলেও এই পদবিধারীরা মূলত অনুষ্ঠানাদিতে কুরআন তিলাওয়াতের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। *হাজি* মানে যারা মক্কায় গিয়ে হজ্জ করে এসেছেন এবং সৈয়দরা হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বংশধর হিসেবে দাবিদার। *শাহ, ফকির ও দরবেশ*-এই সব অবশিষ্ট পদবিধারীদের *পীর বা* সাধুপুরুষ বোঝানো হয়েছে।

তাদের মূল যেখানেই হোক না কেন, এসব লোকই জঙ্গলকে ধানক্ষেতে রূপান্তর, বনভূমিকে মোগল ও ইসলামী সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং বনজ সম্প্রদায়কে সেই

৪৭. Buchanan, "An Account of a Journey," 37-38.

সংস্কৃতিতে একীভূত করার কাজে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। তারা উদ্যোক্তাও ছিল, এক হাতে বন পরিষ্কারের জন্য স্থানীয় *জমিদারদের* নিকট থেকে প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব গ্রহণ করতো এবং অন্য হাতে অংশীদার হিসেবে স্থানীয় শ্রমিকদের উক্ত জমিতে কাজ করানোর ব্যবস্থা করতো। এই শেষোক্ত ব্যক্তিরা বুকাননের মতে যারা ছিল ইজারা গ্রহণকারী চাষী তারা মোগল *সনদে* 'নির্ভরশীল' (বা *বাসতিগান*) হিসেবে উল্লিখিত। এবং পরিশেষে, স্থানীয় কাঠামোর শীর্ষে অবস্থানকারীদের বুকানন এবং ফারসি দলিল-দস্তাবেজ উভয়তেই *জমিদার* বা মূল ভূস্বামী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের নিকট থেকেই বন পরিষ্কারকরণের কাজ শুরু করার অধিকার অর্জন করতো মাঠ পর্যায়ের সংগঠকরা।

বুকাননের ১৭৯৮ সালের বিবরণ অনুযায়ী চট্টগ্রামের উঁচু এলাকায় আদিবাসী জনগণের মধ্যে ইসলামীকরণ এবং কৃষিকরণ তখনো তেমনভাবে সাধিত হয়নি, কারণ তিনি উত্তর চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের পার্বত্য এলাকার উপজাতীয় মানুষদের জুম চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত তুলা, ধান (দৃশ্যত আতপ চাল), আদা 'এবং অন্যান্য ফসল বাঙালিদের কাছে বিক্রি করে বিনিময়ে লবণ, মাছ, মৃৎপাত্র ও লোহা সংগ্রহ' করতে দেখেছেন।[৪৮] তিনি এসব লোকের অনেককে শিবের পূজারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৪৯] তখনো বনে বসবাসকারী এসব লোকের মধ্যে সম্পত্তির অধিকারের ধারণা ছিল বলে মোগল বা ইউরোপীয়ান সূত্রগুলো উল্লেখ করেনি। বুকানন বলেন, 'বনসমূহকে সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হতো না, কারণ প্রত্যেক চাষীই সেখানে যেতে পারতো এবং পছন্দমতো কাঠ সংগ্রহ করতে পারতো।[৫০] আমরা বিপরীতক্রমে মোগল মঞ্জুরীপ্রাপ্তদের মধ্যে মালিকানার তীব্র অনুভূতিসূচক মনোভাব দেখি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৭৩৪ সালে জনৈক শাহ পীরের খাদেমরা দরগাটি রক্ষণাবেক্ষণের ও মুসাফিরদের ব্যয়ভার বহনের জন্য সীতাকুণ্ডের জঙ্গলে ৬০ একরের বেশি জায়গা লাভ করে। কিছু সময় পরে, দরগার *মোতাওয়াল্লি* স্থানীয় কাজির আদালতে এই মর্মে একটি অভিযোগ দায়ের করে, জনৈক তেজ সিং উক্ত দরগার মালিকানার জমিতে একটি বাজার বসিয়েছে এবং সেই সাথে দৃঢ়তার সাথে উক্ত বাজারটি সরানোর দাবি জানানো হয়।[৫১] মোগলদের কাছে, সীমান্তে স্থায়ী মালিকানা প্রতিষ্ঠায় সম্পদের আইনগত নির্ধারিত ধারণা রাষ্ট্রশক্তির সমর্থন হিসেবে গণ্য হতো।

---

৪৮. Ibid., তিনি লিখেন, "সেখানে পাহাড়ের ঢালুতে যত ধান জন্মাতো নীচু ভূমিতে ততটা হতো না।" Ibid., 50.

৪৯. তিনি লিখেন, সীতাকুণ্ডের পূর্বদিকের নীচু পাহাড়গুলো "মগ ও টিপেরাদের ছোট ছোট গোত্রগুলো দখল করে আছে, তারা জুম চাষ করে, এবং পাহাড়ের উপরে উৎপাদনের দেবতাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। Ibid., 20.

৫০. Ibid., 36.

অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে চট্টগ্রামের উঁচু ভূমিতে কৃষিজ সীমান্ত না পৌঁছালেও বুকানন উল্লেখ করেছেন, ভাটির এলাকায় প্রাকৃতিক বনজ ভূমি সাম্প্রতিককালে কৃষিজ খামারে রূপান্তর করা হয়েছে। সাতকানিয়া থানার দক্ষিণ দিকের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'সেসবের অনেকগুলোতে এখনো বৃক্ষের কাণ্ড রয়ে গেছে, যা আমি আজ অতিক্রম করলাম। এতে প্রমাণিত হচ্ছে, কত বিলম্বে এগুলো পরিষ্কার করা হয়েছে।' চকোরিয়া থানার উত্তর দিক সম্পর্কে তিনি বলেন, 'মাত্র ১৩ বা ১৪ বছর আগে এই উপত্যকার উঁচু জমিতে চাষাবাদ শুরু হয়েছে। এখনো নতুন ভূমি গৃহীত হচ্ছে এবং মাঠের সর্বত্র বৃক্ষের কাণ্ড রয়ে গেছে।'[৫২] খামারভিত্তিক চাষাবাদ শুধুমাত্র সর্বদক্ষিণে শেষ হয়েছে, কারণ তিনি মন্তব্য করেছেন, 'দক্ষিণে (রামু নদীর) পুরো একলাকাই বিশাল বন, কুড়ালের সহায়তা ছাড়া সেখানে প্রবেশ অত্যন্ত দুঃসাধ্য।'[৫৩] বুকানন আরো লক্ষ্য করেছেন, 'নতুন কর্ষিত ভূমির অধিকাংশের মালিকানা হিন্দুদের, তারা বিচারক ও কালেকটরদের আদালতে কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছে এবং মুসলমানদের চেয়ে বেশি অর্থনৈতিকভাবে...সমৃদ্ধ; তারা অতিদ্রুত এসবের গভীরে প্রবেশ করছে। অবশ্য চট্টগামে জনসংখ্যার বড় অংশ এখনো মুসলমান অভিবাসী নিয়ে গঠিত।'[৫৪] তার শেষ পর্যবেক্ষণটি সর্বপ্রথম (১৮৭২) আদমশুমারিতে যথার্থ প্রতিপন্ন করে, তাতে দেখা যায়, সাতকানিয়া থানায় মুসলমান জনসংখ্যা ৭৮.১ শতাংশ এবং চকোরিয়া ও রামু থানা সম্বলিত কক্সবাজার মহকুমায় তা ৭৮ শতাংশ।[৫৫] হিন্দুদের সম্পর্কে বুকাননের মন্তব্যে দেখা যাচ্ছে, ঢাকা ও বাকেরগঞ্জের মতো চট্টগ্রামেরও সামাজিক ক্রমধারাপরম্পরায় শীর্ষস্থানে অনুপস্থিত *জমিদারদের* প্রাধান্য ছিল। ভূমি পুনরুদ্ধার কাজে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও তাদের পৃষ্ঠপোষকতার রেখা নিচের কৃষকদের মধ্যে ছিল না, উপরের ক্ষমতাসীন শ্রেণীর সাথে—যারা ছিলেন 'বিচারকের ও কালেকটরের আদালতে।'[৫৬] একবার *জমিদার* স্বত্ব অর্জনের পর এসব লোক তাদের কৃষিজ প্রজাদের কাছে রাজার সমতুল্য প্রথা গ্রহণ করতো। বুকানন বিরূপভাবে বাংলার প্রসঙ্গে সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন, 'প্রতিটি হিন্দু *জমিদার* অন্তত রাজা হিসেবে অভিহিত হন এবং এ ধরনের প্রতিটি ব্যক্তিকেই তাদের *রায়ত* ও চাকররা মহারাজা

৫১. "Kanun Daimer Nathi," Chittagong District Collectorate Record Room, No. 121: bundle 51, case no. 3320.

৫২. Buchanan, "An Account of a Journey," 29, 31.

৫৩. Ibid., 52.

৫৪. Ibid., 36.

৫৫. H. Beaverly, *Report on the Census of Bengal, 1872* (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1872), lxvi.

৫৬. একদিকে সরকারের সাথে হিন্দু জমিদারদের জোটবদ্ধতা, এবং অন্যদিকে অন্তর্বর্তী পৃষ্ঠপোষক হিসেবে চাষীদের সাথে সম্পর্ক থাকার বিষয়টিতে ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রং লাগে, যা ১৯৪৭ সালের বিভক্তিকে ত্বরান্বিত করে।

হিসেবে অভিহিত করে থাকে। একজন *জমিদার* হিসেবে রাজা আমাদের দরবারে অনুগত কিন্তু তার নিজের এলাকায় সে নিরঙ্কুশ এবং জীবন ও মৃত্যুর অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার অধিকারী।'[৫৭]

সংক্ষেপে, ১৭৯৮ সালে বর্ণিত ভূমিস্বত্ব কাঠামোতে চট্টগ্রামের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার অধীনস্থ তিনটি ধাপ ছিল। সর্বশীর্ষে ছিল *জমিদার*, প্রধানত হিন্দু এসব ব্যক্তি বন পরিষ্কার বা কৃষিকাজের প্রক্রিয়া থেকে দূরে দূরে থাকতো এবং ক্ষুদে রাজার মতো আচরণ করতো। পরের ধাপে ছিল বুকাননের ভাষায় 'গণ্যমান্য গোছের ব্যক্তি,' তারাই ছিল মুখ্য ব্যক্তিত্ব, *জমিদারের* নিকট থেকে জঙ্গল পরিষ্কারের অধিকার লাভ করে সেই কাজ সম্পন্ন করার জন্য শ্রমিক ভাড়া করতো। এটা হতো হয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কোন সদস্যের মাধ্যমে কিংবা নিষ্কর মর্যাদা পাওয়ার জন্য কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সহায়তাকারী ক্ষুদে ভূস্বামী। বিশেষত সাহসী উদ্যোক্তা এবং সাধারণ মুসলমান এসব ব্যক্তিত্ব স্থানীয় জনশক্তিকে পরিচালনা করতো। পরিশেষে ছিল সাধারণ শ্রমিক, যারা চার বছর জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি পরিষ্কারের শ্রম প্রদান করার পর নিয়মিত কৃষিজীবী হিসেবে কাজ করতে প্রস্তুত হতো। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, বুকানন অপরিষ্কারকৃত জঙ্গলের অধিবাসীদের কোন এক মাত্রায় শিব পূজারী অমুসলমান হিসেবে এবং ইতিমধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভূমির চাষীদের মুসলমান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এটা তাই বলে দিচ্ছে চট্টগ্রামের চাষযোগ্য নীচু এলাকার জনগণের মধ্যে কৃষকীকরণ এবং ইসলামীকরণের প্রক্রিয়া হাতে হাতে হয়েছিল।

তিনটি প্রত্যক্ষ পন্থায় ধর্মীয় সম্প্রদায় তাদের ভূমির মালিকানা লাভ করেছিল: দান, ক্রয় এবং পথ প্রদর্শন। প্রথম পদ্ধতিটি বুকানন অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে দেখেছেন, যখন লোকজন দলিলপত্র প্রদর্শন করে দেখাতো কোন বৈধ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদেরকে উক্ত জমি দান করেছে। মোগল দলিলপত্রে সরদার, চৌধুরী বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বারংবার ব্যবহৃত জমিদার (ভূস্বামী) হিসেবে বর্ণিত এসব কর্তৃপক্ষের মধ্যকার মুসলমানরা খুব সম্ভব ১৬৬৬ সালে চট্টগ্রামে বুজুর্গ উমিদ খানের অভিযানে অংশগ্রহণকারী মোগল সৈন্যদের বংশধর। তাদের মধ্যকার হিন্দুরা উক্ত অভিযানে শরিক কেরানি বা রাজস্ব এজেন্টদের বংশধর এবং অষ্টাদশ শতকে বুকানন বর্ণিত ভাষ্য অনুযায়ী প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে নৈকট্যকে ব্যবহার করে তারা তাদের নিজেদের নামে নতুন নতুন ভূমির বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল। কোন আবেদনকারীকে জঙ্গল পরিষ্কার ও একটি মসজিদ বা দরগা নির্মাণের কর্তৃত্ব দিয়ে এসব স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সনদে নাম থাকা আবেদনকারীদের পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হতো। এটারও প্রমাণ পাওয়া যায়, মধ্য অষ্টাদশ শতক নাগাদ পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে সীমিত ছিল

৫৭. Buchanan, "An Account of a Journey," 162, 163.

না; অনেক হিন্দু চৌধুরী মসজিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতো এবং অনেক মুসলমান চৌধুরী মন্দিরের পৃষ্ঠপোষকতা করতো। ১৭০৫ সালের মতো সময়ে, আওরঙ্গজেবের দীর্ঘ ও উত্তাল শাসনকালের শেষদিকে, ফটিকছড়ি থানার হিন্দু চৌধুরী ঠাকুর চাঁদ স্থানীয় এক কাজিকে একটি মসজিদ নির্মাণ ও তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৭.৫ একর জঙ্গল দান করেন।[৫৮] ১৭৪০ সালে রাউজান থানার দুই হিন্দু চৌধুরী মনোহর ও জগদীশ বনে নির্মিত একটি মসজিদের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য শিকুর মুহাম্মদ পাহলোয়ানকে ৭৬.৮ একর দান করেন।[৫৯] একইভাবে ১৭৪০ সালে রাঙুনিয়া থানার মুসলমান চৌধুরী মির ইব্রাহিম জনৈক মুকুন্দরামকে ৩.২ একর দেবোত্তর তথা মন্দির বা বিগ্রহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিষ্কর জমি মঞ্জুর করেন।

দানের মাধ্যমে গৃহীত সাধারণভাবে সম্পৃক্ত 'শেখ'-এর মতো ধর্মীয় পদবিধারী একজন মুসলমান পথপ্রদর্শক জঙ্গলে যেত এবং স্থানীয় কোন গোষ্ঠীপতির নিকট থেকে কর্তৃত্বের একটি দলিল নিশ্চিত করে স্থানীয় শ্রমের সাথে একটি মসজিদ বা দরগা নির্মাণ করতো। দলিলে জানানো হতো যে, গোষ্ঠীপতি অনুন্নত জঙ্গলে একটি নির্দিষ্ট অংশ শেখকে দান করেছে। শেষোক্ত ব্যক্তি তখন উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চাষাবাদের আওতায় আনার প্রয়াস চালানো কিংবা তা ইতিমধ্যেই চাষাবাদের আওতায় আনা জমির মালিকানা স্বত্বের বৈধ স্বীকৃতির জন্য আনুষ্ঠানিক অনুরোধসহ স্থানীয় মোগল কর্তৃপক্ষের কাছে দলিলটি পেশ করতো। আবেদনকারীর দাবির সত্যতা যাচাইয়ের পর চট্টগ্রামের রাজস্ব কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম সরকারের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার নামে এবং মোগল সম্রাটের সীলমোহর সম্বলিত একটি সনদ জারি করার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আবেদনকারীর জিম্মাদারি *(তাওলিয়াত)* ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের নামে প্রদত্ত ভূমির সরকারি স্বীকৃতি নির্ধারিত হতো। এই প্রক্রিয়ায় আবেদনকারী কার্যকর থেকে আইনসঙ্গত ভূস্বামীত্ব লাভ করতো, সনদে নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে তার সহায়তার সাপেক্ষে উক্ত জমির মালিকানা ভোগ করতো।[৬০] প্রকৃতপক্ষে গোষ্ঠীপতিকে এ ধরনের শেখদের তাদের জঙ্গলাকীর্ণ অংশ দানের পন্থাটি ছিল প্রাচীন ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকতার নজিরের অনুসরণ। বৌদ্ধ,

---

৫৮. "Kanun Daimer Nathi," Chittagong District Collectorate Record Room, No. 7: bundle 62, case no. 4005.

৫৯. Ibid., No. 136: bundle 63, case no 4404.

৬০. একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রক্রিয়াটি ফুটিয়ে তোলা যায়। ১১৪৫ হিজরীর ২রা রমজানে (তথা ১৭৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি) জনৈক দরবেশ মুহাম্মদের অনুকূলে ইস্যু করা একটি *সনদ* বোয়লখালি থানার গোমদান্দিতে অবস্থিত এক বুজুর্গ ব্যক্তির মাযার ও একটি মসজিদ উভয়টির *মোতাওয়াল্লি* হিসেবে তাঁকে স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং তাঁকে উক্ত প্রতিষ্ঠান দুইটির ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ষোল একর জঙ্গলভূমি মঞ্জুর করা হয়। *সনদটির* প্রথমার্ধের বর্ণনা থেকে, যেখানে সাধারণত আবেদনকারীর আবেদন সংযোজিত থাকে, আমরা জানতে পারি, দরবেশ মুহাম্মদ মসজিদ ও দরগাটির *জিম্মাদারি*

জৈন ও হিন্দু আদর্শের প্রেক্ষাপটে সংসারী মানুষ মঠ বা ব্রাহ্মণ্য স্থাপনায় ভূমি দান করার মাধ্যমে ধর্মীয় মর্যাদা লাভ করতো এই ব্যবস্থার ফলে দানকারী অনুগ্রহভাজন ও দানগ্রহণকারী পৃষ্ঠপোষকের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন সুদৃঢ় হতো।[৬১]

ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অনেক সদস্য আইনসম্মতভাবে মালিকানার অধিকারী গোষ্ঠীপতি বা সরদারদের নিকট থেকে অনুন্নত বনাঞ্চল ক্রয় করতো। এসব ক্ষেত্রে, ভূমির হস্তান্তর চিরায়ত ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকতার নজির হিসেবে দানকারী ও গ্রহণকারীর মধ্যকার সম্পর্ক জোরদার হতো না। বিপরীতে নগদ অর্থের ব্যবহারের ফলে লোকজন পৃষ্ঠপোষকতার ঐতিহ্যবাহী দৃষ্টান্ত এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতির লোকদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির ধারণা পাশ কাটাতে পারতো। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৭২৫ সালে রাউজান থানার পাঁচকাইন পরগনার শেখ আবদুল ওয়াহাব পরগনার হিন্দু সরকার জগদীশ চৌধুরীর নিকট থেকে ১৬.৪ একর নিষ্কর ও অনুন্নত জঙ্গলভূমি ক্রয় করে। নতুন মালিক তখন ভূমিটি মুহাম্মদ খানকে দান করে, যার পিতা সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল।[৬২] এখানে দান এবং ক্রয় উভয়টিই হয়েছে, কারণ একজন হিন্দু ভূস্বামী জঙ্গলভূমি একজন মুসলমান মধ্যস্থতাকারী পৃষ্ঠপোষকের কাছে বিক্রি করেছে এবং সে মসজিদ নির্মাতাকে তা দান করেছে। চৌধুরীরা সারাসরি মসজিদ বা দরগার *মোতাওয়াল্লিদের* কাছে জঙ্গলভূমি বিক্রি করেছে, এমন নজিরও প্রচুর আছে। ১৭৪৮ সালে শেখ মুহাম্মদ আকবর ও মুহাম্মদ আব্বাস মোগল কর্তৃপক্ষকে জানান, তারা তাদের এলাকার সরদারদের (চৌধুরী ও তালুকদার) নিকট থেকে ৩৮.৪ একর জমি ক্রয় করেছেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন। অবশ্য মসজিদটির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য আরো ভূমি প্রয়োজন হওয়ায় তারা পরিষ্কারকরণ এবং চাষাবাদের জন্য প্রস্তুত করার জন্য অতিরিক্ত জঙ্গলভূমির আবেদন

শুরুতে পেয়েছিলেন *পরগনা* যাকাবনগরের *চৌধুরি* বা হেডম্যান জনৈক আবদুল মজিদের নিকট হতে, এই রাজস্ব সার্কেলেই প্রতিষ্ঠান দুইটির অবস্থান ছিল। দরবেশ মুহাম্মদ তাঁর আবেদনে বলেন, আবদুল মজিদ তাঁকে একটি দলিল বা *খয়রাত-নামা* দিয়েছেন, যাতে মসজিদ ও দরগাটির *জিম্মাদারি* তাঁর উপর বর্তেছে এবং তাঁকে ষোল একর জমিও দিয়েছেন। এখন আবেদরকারীর প্রয়োজন হলো এতে মোগল স্বীকৃতি এবং এই মঞ্জুরীটি নিশ্চিতকরণ। *সনদে* বলা হয়, "*কানুনগোর* রেকর্ড এবং উপরে বর্ণিত দলিলপত্র পরীক্ষার পর জানা গেছে যে উপরোল্লিখিত ভূমি মসজিদ ও দরগাটির ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য নির্ধারিত।" সংক্ষেপে বলতে গেলে, *পরগণাটির চৌধুরী* মঞ্জুরিটির উদ্যোগ নেন এবং *পরগণার কানুনগো* তা সত্যায়িত করেন এবং চট্টগ্রামের মোগল কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত তা নিশ্চিত করেন। Ibid., No. 110: bundle 17, case no 632.

৬১. See Barbara S. Miller ed. *The Powers of Art: Patronage in Indian Culture* (New Delhi: Oxford University Press, 1992), 1-8, 19-167.

৬২. "Kanun Daimer Nathi," Chittagong District Collectorate Record Room, No. 55: bundle 38, case no.2431.

করেন এবং তাদেরকে সেজন্য ১৯.২ একর জমি দেওয়া হয়।[৬৩] দশ বছর পর হাটহাজারি থানার পটিয়ার মুহাম্মদ সরদার মোগল কর্তৃপক্ষকে জানান, ইসলাম প্রচারক ও ইমামদের সহায়তা, মসজিদের ঈদ উৎসব এবং সেখানকার দরগায় সমাহিত জনৈক দরবেশের উরস উদযাপনের জন্য তিনি তার পরগনার চৌধুরী ও জমিদারদের নিকট থেকে ১৬ একর জমি ক্রয় করেছেন। তিনি এখন উক্ত জমির নিষ্কর মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।[৬৪]

এসব ঘটনা প্রমাণ করছে, নগদ অর্থভিত্তিক অর্থনীতি কিভাবে বনে মানুষ ও সম্পদের গতিশীলতার ব্যবস্থা করেছে, ভূমি পুনরুদ্ধার করেছে এবং সাবেক বনজ ভূমিতে মসজিদ-কেন্দ্রিক বসতি স্থাপন সম্প্রসারণ করেছে। ত্রয়োদশ শতকে তুর্কীরা বাংলায় তাদের প্রতিষ্ঠিত করার পর থেকেই এখানে অবশ্যই মুদ্রা হিসেবে রৌপ্য ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল। ষোড়শ শতকের শেষদিকেই কবি মুকুন্দরাম বন পরিষ্কারকরণ ও কৃষিজ কার্যক্রম প্রক্রিয়ার সাথে নগদ অর্থের গতিশীলতার সংযোগ দেখিয়েছেন।[৬৫] আর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয়ান ও এশিয়ান বণিক-বিনিয়োগকারীরা বাংলায় অর্থ প্রচলনের আকার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে, ফলে উপরোল্লিখিত উন্নয়নের জন্য মুসলমানদের কাছে হিন্দু চৌধুরীদের বনভূমি বিক্রির মতো লেনদেনকে সম্ভব করে তোলে। অধিকন্তু বাঙালি সমাজে মুদ্রায়নের ফলে লোকজন ভূমির নতুন অর্থ উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়। আগে যা ছিল ধর্মাচারের বস্তু, বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠানে দান করে ধর্মীয় সম্মান লাভ করা যেত, তাই এখন অবাধে হস্তান্তরযোগ্য সামগ্রীতে পরিণত হলো। ভূমিলাভের তৃতীয় ও সবচেয়ে সাধারণ ব্যবস্থাটির অধিকারী ছিল দৃশ্যত ঊর্ধ্বতন জমিদারদের দাবিহীন অঞ্চলের জঙ্গল পরিষ্কারকারী ব্যক্তি ও তাদের বংশধররা। এসব ক্ষেত্রে, দান কিংবা ক্রয়ের নয়, বরং পথ প্রদর্শকদের প্রাথমিক বসতি স্থাপনকারীরা ভূমিটি অর্জন করতো, তারা এবং তাদের বংশধররাও *জঙ্গল-বাড়ি মৌরসি* বা 'জঙ্গল কাটার উত্তরাধিকার' হিসেবে নিষ্করভাবে ভোগের অধিকার দাবি করতো। আমরা দেখেছি, জনৈক শেখ মোমিনের পত্র মুহাম্মদ সাদিক ১৭২২ সালে মোগল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করছেন, বর্তমান রাউজান থানাস্থ এলাকায় তিনি ও তার উপর নির্ভরশীলরা ৫৭.৬ একর জঙ্গল পরিষ্কার এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন। তিনি তাঁর অধিকারে থাকা ভূমিতে

৬৩. Ibid., No. 188: bundle 57, case no 3736.

৬৪. Ibid., No. 220: bundle 78, case no 3736.

৬৫. *চণ্ডি-মঙ্গলে* দেবী চণ্ডি কাব্যের নায়ক কালকেতুকে একটি মূল্যবান আংটি দেন বিক্রি করার জন্য যাতে সেই টাকা দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে তার সম্মানে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করা যায়। জমি কৃষিকাজের উপযুক্ত হওয়ার পর নবলব্ধ জমিতে প্রতিষ্ঠা সহজতর করার জন্য কালকেতু তার লোকদের আগাম ধান, বীজ ও নগদ টাকা প্রদান করেন। মুকুন্দরাম, *কবিকঙ্কন চণ্ডি*, ২৯০, ২৯৫-৯৬, ৩৫৪-৫৫। দেখুন Bhattacharya, "La Deesse," 33.

'প্রচলিত প্রথা অনুসরণ' করার কথা উল্লেখ করে দাবি করেন তিনি *জঙ্গল-বাড়ি মৌরসি* সুবিধা ভোগ করছেন। তিনি এখন তাঁর দাবির প্রতি মোগল স্বীকৃতি চাচ্ছেন, যাতে করে তিনি তার উপর নির্ভরশীলদের সহায়তা করতে পারেন।[৬৬] উর্ধ্বতন ভূস্বামীর অনুপস্থিতিতে সাদিক নিজেই উক্ত জমির কার্যকর *জমিদারে* পরিণত হয়েছেন।

এসব পথপ্রদর্শকদের রাজনৈতিক পরিচিতি মঞ্জুরীতে বর্ণিত বন্ধনের মাধ্যমে মোগল রাষ্ট্রের সাথে একীভূত হয়ে থাকলেও তাদের ধর্মীয় পরিচিতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে নিহিত ছিল। অনেকে ছিল স্থানীয় সাধু পুরুষ যাদেরকে জনপ্রিয়ভাবে নতুন করে পরিচিত করা হয়েছে মুসলমান সাধু পুরুষ। অনেক সাধুপুরুষকে আরো পরিবর্তিত করে সূফীসাধক হিসেবে এবং অন্যদেরকে জনপ্রিয়ভাবে মধ্যপ্রাচ্যের বংশোদ্ভূত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অনেকে দৃশ্যত ছিলেন আবুল ফজলের ভাষ্যে বর্ণিত বাঙালি ওয়ালি, যাদেরকে প্রাক-মুসলমান সময়ে চট্টগ্রামের পশ্চাদভূমির স্থানীয় মানুষ শ্রদ্ধা করতো।[৬৭] উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৭২৩ ও ১৭৩৩ সালে কালীদেবীর নামের সাথে সম্পর্কিত কালী শাহ্ নামক এক 'দরবেশের' নির্ভরশীল ও তার স্থানীয় দরগার জন্য ২৫.৬ একর জঙ্গল দেওয়া হয়।[৬৮] একই কথা প্রযোজ্য জনৈক শেখ কালীর ক্ষেত্রে, যিনি ১৭৬০ সালে রাউজান থানায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন,[৬৯] ১৭২৫ সালে বোয়ালখালি থানার চরণদীপে জনৈক জঙ্গল পীরের নামে একটি দরগা আত্মপ্রকাশ করে, যার নামের ধরন দেখে মনে হয় তিনি বনের সাধু পুরুষ ছিলেন।[৭০] এসব ক্ষেত্রে, চট্টগ্রামের বনের স্থানীয় *ওয়ালি* বা সাধু পুরুষরা দিল্লীস্থ সম্রাটের প্রাসাদ পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বিস্তৃত পৃষ্ঠপোষকতার বিশাল নেটওয়ার্কের সর্বনিম্ন স্থানে ক্ষুদে অনুসারী হিসেবে মোগল ধর্মীয়-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অঙ্গীভূত হয়ে পড়তেন। অবশ্য, মসজিদ ও দরগার সাথে তাদের সম্পৃক্ততার কারণে তারা ইসলামী সভ্যতার প্রতিনিধির ভূমিকাতেও অংশ নিতেন।

---

৬৬. Kanun Daimer Nathi," Chittagong District Collectorate Record Room, No. 37: bundle 39, case no.2513.

৬৭. বদ্বীপের এই অংশে বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্য কর্তৃক সাধুপুরুষদের আত্মস্থ করে নেওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদ আর.সি টেম্বল। ১৯২৫ সালে তিনি বদর আলম ধর্মমত সম্পর্কে লিখেন, "বৌদ্ধদের কাছে তিনি একজন *নাথ* হিন্দুদের কাছে একজন *দেব* বা অধস্তন ঈশ্বর, মুসলমানদের কাছে দরবেশ এবং চীনাদের কাছে ভূত। প্রাচ্যের সর্বত্র ভূত বা অতিলৌকিক সত্তার উপাসনার মতোই তাঁরটিও করা হয়, ধর্মমত নির্বিশেষে সকল লোকগাঁথায় তাঁকে বিশ্বাস করা হয়, এবং অন্য সব উদাহরণের মতো প্রাচীন 'প্রাক-ধর্মের' যুগের সর্বপ্রাণেশ্বরবাদের মতো তা টিকে আছে। অন্য সব ঘটনার মতো স্থানীয়ভাবে দরবেশ, সমুদ্রগামী মুসলমানদের মাঝে কিংবদন্তি-সম এই দরবেশ তাদের প্রধান শহর চট্টগ্রামে পীর বদর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। Temple, "Buddermokan," *Journal of the Burma Research Society* 15 (1925): 9.

৬৮. "Kanun Daimer Nathi," Chittagong District Collectorate Record Room, "Kanun Daimer Nathi," No. 64: bundle 56, case no.3626.

৬৯. Ibid., No. 248: bundle 79, case no 5099.

৭০. Ibid., No. 6: bundle 71, case no 4503.

সংক্ষেপে, চট্টগ্রামের বনে বসবাসকারী মানুষদের সম্মোহনী শক্তিসম্পন্ন সাধু পুরুষদের শিক্ষা অনুসরণের প্রবণতায় বহিরাগতকে এই শ্রেণীতে খাপ খাওয়ানোর সুযোগ করে দিত এবং সেই সমাজে তাদের নিজেদের একজন হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেত। পরবর্তীতে, এ ধরনের বিদেশী সাধু পুরুষরা বা তাদের বংশধররা ক্ষুদে ভূস্বামী হিসেবে রাজস্ব আমলাতন্ত্রে মিশে যাওয়ায় তাদের আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব নিয়মিতকরণ হয়ে পড়ে, যেমনটি পীর উমর শাহের পুত্রদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। তারা নোয়াখালিতে তাদের সাধুপুরুষ পিতার পরিষ্কার করা এলাকার জমিদারে পরিণত হয়েছিল। ১৬৬৬ সালে মুহাম্মদ বারবাক মাগরেবি, নামটির মাধ্যমে সাধুপুরুষটির উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার সাথে সম্পর্কিত বোঝা যায়, চট্টগ্রামের বনে বসতি স্থাপন করেন এবং তিনি ও তাঁর অনুসারীরা একটি মসজিদ নির্মাণ করেন ও তার ব্যয়ভার মেটানোর জন্য মোগলদের দেওয়া ১৬৬.৪ একর জঙ্গল পরিষ্কার করেন। এক শতাব্দী পর তার অনুসারীদের বংশধররা উক্ত ভূমির নিষ্কর অধিকার দাবি করেন এই যুক্তিতে যে, তারা আদি জঙ্গল-পরিষ্কারকারকদের (জঙ্গল-বাড়ি মৌরসি) বংশধর এবং তাই আইনসঙ্গতভাবে তাদের উত্তরাধিকার স্বীকৃত।[৭১] আরেক ঘটনায়, ১৭১৭ সালে শাহ লুতফুল্লাহ খন্দকার নামক এক সূফীকে ব্যক্তিগত দান (মাদাদ-ই মা'স) হিসেবে সাতকানিয়া থানায় ১০৮.৮ একর দেওয়া হয়। ১৭০৪ সালে তার প্রতিষ্ঠিত গ্রামটির নাম দেওয়া হয় 'মুনিমাবাদ' বা 'দাতার চাষকৃত এলাকা' এবং সূফীর অনুসারীদের বংশধররা এই যুক্তিকে উক্ত ভূমির অধিকার দাবি করেন যে, তাদের পূর্বপুরুষরা প্রথমে জঙ্গল পরিষ্কার করেছিলেন।[৭২] একইভাবে ১৭২৬ সালে আবদুল ওয়াহাব নামক জনৈক খতিব (স্থানীয় ধর্ম প্রচারক) পটিয়া থানায় একটি ইটের মসজিদ নির্মাণ করেন এবং মাত্র এক দশক পর তাঁর নাতি এনায়েত মুহাম্মদ শুধুমাত্র মসজিদ সংলগ্ন জমিরই উত্তরাধিকারই নয়, সেই সাথে অঞ্চলটির চৌধুরী হিসেবেও দাবি করেন।[৭৩] এসব ঘটনা ম্যাক্স ওয়েবারের 'আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের নিয়মিতকরণ' ধারণাকেই ফুটিয়ে তোলে: ধর্মীয় আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের অধিকারী হিসেবে স্বীকৃত ব্যক্তিদের বংশধরদের উক্ত ভূমির স্থাবর স্বত্বের অধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা।[৭৪] সাধুপুরুষ বা তাদের বংশধররা যদি ভূস্বামী হয়ে থাকে, তবে বাংলা সীমান্তের সামাজিক মর্যাদার নমনীয়তার কারণে বিপরীতটিও সত্য। ওয়েবারের 'আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের নিয়মিতকরণ'-এর বিপরীতে কারো পক্ষে 'আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের পরিত্রীকরণ' করা সম্ভব, কারণ সাহসী উন্নয়নকারী কিংবা এমনকি সরকারি কর্মকর্তারাও স্থানীয়ভাবে আসমানি শক্তির সাথে মধ্যস্থতা করতে

৭১. Ibid., No. 1: bundle 59, case no 3863.
৭২. Ibid., No. 20: bundle 44, case no 2792.
৭৩. Ibid., No. 70 : bundle 51, case no 3321.
৭৪. Max Weber: *The Theory of Social and Economic Organization, ed. Talcott Parsons* (London: Free Press of Glencoe, 1964), 363-81.

সক্ষম দরবেশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।[৭৫] আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি, খুলনা ও যশোরের জঙ্গল পরিষ্কারের জন্য স্মরণীয় পঞ্চদশ শতকের তুর্কী কর্মকর্তা খান জাহান আলী পরবর্তীকালে দক্ষিণ বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় মহান দরবেশ হিসেবে উন্নীত হন। চট্টগ্রামে শেখ মানিকের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। সমসাময়িক সূত্রগুলোতে *পরগনা* ফতেহপুরের জমিদার হিসেবে বর্ণিত শেখ মানিক ১৭১৫ সালে সরকারি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন, তিনি হাটহাজারি থানার পশ্চিমপতিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন। প্রতিষ্ঠানটি রক্ষণাবেক্ষণের সামর্থ্যের অপর্যাপ্ততার অভিযোগ করে তিনি চাষাবাদের জন্য কিছু বনভূমি বরাদ্দের আবেদন করেন। রাষ্ট্র তাকে ৫৪.৫ একর জমি প্রদান করে এবং তাকে মসজিদটির বৈধ *মোতাওয়াল্লি* হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। মসজিদটি নির্মাণের চল্লিশ বছর পর ১৭৫৫ সাল নাগাদ, মরহুম শেখ মানিকের কবরের উপর একটি মাযার নির্মাণ করা হয় এবং তাঁর পুত্র জাফর মুহাম্মদ মাযারের *মোতাওয়াল্লি* হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৭৫৫ সাল নাগাদ মাযারটির এমনভাবে প্রাতিষ্ঠানিককরণ হয়ে যায়, যে কোন আমলাতান্ত্রিক সরকারের অনুরূপ পন্থায় এখান থেকে জারি করা দলিল-দস্তাবেজে নিজস্ব কায়দায় সীলমোহরের ছাপ মারা হতে থাকে: 'শেখ মানিকের মাযার'।[৭৬]

এ ধরনের ঘটনায় সূফীবাদের জনপ্রিয় পরিভাষাসমূহ জনশ্রুতি অনুযায়ী নতুন সমাজ বিনির্মাণে কার্যকর ব্যক্তিদের প্রতি আরোপিত হয়ে যায়। প্রাতিষ্ঠানিক সূফীবাদের সংস্কৃতি যদিও *পীর* ও *মুরিদ* বা *ওস্তাদ* ও *সাগরেদ* এই অপ্রতিসম শ্রেণীতে বিভক্ত করে, যা সূফীবাদকে কর্তৃত্বের একটি মানানসই মডেল দিয়ে থাকে, পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখে-রাষ্ট্রের প্রান্তভাগের অঞ্চলসমূহে শ্রম সংগঠন ও গতিশীল করার কাজের জন্যও তা খুবই অপরিহার্য বিষয়। পূর্ব বাংলার বনজ সীমান্ত জুড়ে সূফীদের আত্মপ্রকাশে তাই অবাক হওয়ার অবকাশ আছে সামান্যই।

সিলেটের ধর্মীয় সম্প্রদায়

বাংলার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত সিলেট মুসলমান বিজয়ের সময়ে ছিল চট্টগ্রামের মতো ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে একটি রাজকীয় মঞ্জুরীতে বলা

---

৭৫. ১৯০৮ সালে সংকলিত চট্টগ্রাম গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হয় যে, "একটি জেলায় যেখানে অতি সম্প্রতি জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়েছে যে, পরিষ্কারকরণের কঠোর পরিশ্রমের স্মৃতি তখনো মানুষের মনে জাসন্দক এবং তা দেখা যায় *জঙ্গবাড়ি* (জঙ্গল পরিষ্কারকারী), *তালুকদার, আবাদকার* (প্রথম চাষাবাদকারী) ইত্যাদি পদবির মাধ্যমে তা প্রকাশ পেত। আর এটা স্বাভাবিক যে, প্রথমে পরিষ্কারের দাবিকারী ও তার উত্তরসূরিরা উক্ত পদবিটি নিয়ে গর্ব করবে। O' Malley, *Eastern Bengal District Gazetteers: Chittagong*, 153.

৭৬. "Kanun Daimer Nathi," Chittagong District Collectorate Record Room, No. 15: bundle 68, case no.4317.

হয় এই অঞ্চলের অংশ বিশেষকে বর্ণনা করা হয়েছে, 'জনমানব বসতিপূর্ণ এলাকার বাইরে। সেখানে প্রকৃতি ও কৃত্রিমতার মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। অঞ্চলটি ছিল বন্য প্রাণী ও বিষাক্ত সরীসৃপে পরিপূর্ণ। পুরো এলাকাটি ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা'।[৭৭] বর্তমানে সিলেট ও মোমেনশাহি জিলা হিসেবে পরিচিত এই স্থানটির দক্ষিণাঞ্চলীয় অনেক এলাকাই তখন ছিল পানিতে প্লাবিত এবং সেখানে অনার্য জেলে সম্প্রদায়, প্রধানত কৈবর্তরা, বসবাস করতো।[৭৮] বাস্তবিকই বর্তমানের সিলেট জিলার মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ছিল এক সময়ে একটি বিশাল হ্রদ। তবে দশম শতাব্দীর শেষদিক থেকে দ্বাদশ শতকের প্রথমদিকে জিলার উত্তরাংশের শ্রীহট্টে একটি আধা-স্বাধীন হিন্দু রাজবংশের আত্মপ্রকাশ ঘটে।[৭৯] এর সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা গোবিন্দ (আনুমানিক ১০৫০) তার রাজধানী নগরীতে, যা সম্ভবত সিলেট শহরের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশে বলে ধারণা করা হয়ে থাকে, পাথরের একটি বিশাল কৃষ্ণ মন্দির নির্মাণ করেন। সেখানে তিনি 'অসংখ্য' রণতরী, পদাতিক সৈন্য, অশ্বারোহী ও হাতির এক বিরাট বাহিনী মোতায়েন করেন।[৮০] তবে এ সময়ের ব্রাহ্মণকরণ প্রক্রিয়া অঞ্চলটির বনজ ও জলমগ্ন পশ্চাদভূমিতে বসবাসরত স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোর (কৈবর্ত, দাস ও নমো) মধ্যে সামান্যই জায়গা করে নিতে পেরেছিল।

তুর্কীদের অঞ্চলটি জয়ের প্রায় চল্লিশ বছর পর ১৩৪৫ সালে ইবনে বতুতার সিলেট সফরের সময় নদীর বিশাল উপত্যকাটি একটি স্থিতিশীল ও বিকাশমান হিন্দু জনঅধ্যুষিত ছিল। মরক্কোর পর্যটক লিখেন, (মেঘনা) নদীর তীরে তীরে ডানে এবং বায়ে, পানি-চাকা, উদ্যান ও গ্রামসমূহ রয়েছে, যেমনটা আছে মিসরে নীল নদের তীর জুড়ে। হাবঙ্গের (হবিগঞ্জ থেকে দশ মাইল দক্ষিণে) পৌত্তলিক অধিবাসীরা সংরক্ষিত (জিম্মি), তাদের উৎপাদিত অর্ধেক ফসল নিয়ে নেওয়া হয়; অধিকন্তু তাদেরকে কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে হয়। নদীতে পনের দিন ধরে নৌকায় ভাসতে ভাসতে আমরা অনেক গ্রাম, ফলবাগান ও একটি বাণিজ্য কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলাম।[৮১]

সিলেটে পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মুসলিম শাসন সম্পর্কে সামান্যই জানা যায়, সীমান্তবর্তী এই সীমান্ত শহরে পুরো সুলতানি আমলে এমনকি একটি মুদ্রাও প্রকাশিত হয়নি। আকবর যখন ষোড়শ শতকের শেষভাগে বাংলার পশ্চিমাংশ জয় করেন, তখন দক্ষিণাঞ্চলীয় সিলেট জিলার পাহাড়ি ও জঙ্গলাকীর্ণ এলাকাগুলো অগ্রসরমান মোগল

৭৭. Niyogi, *Brahmanic Settlements*, 41.

৭৮. K.N. Gupta, "On Some Castes and Caste-Origins in Sylhet," *Indian Historical Quarterly* 7 (1931): 725-26.

৭৯. Kamalakanta Gupta, *Copper-Plates of Sylhet*, vol 1 (Sylhet: Lipika Enterprise, 1967), 196-97.

৮০. Ibid., 190, 199,n.

সেনাবাহিনীর নিকট থেকে পলায়নপর আফগান গোষ্ঠীপতিদের আশ্রয় এলাকায় পরিণত হয়। ১৬১২ সালে মোগলদের সিলেট জয়ের পরও অঞ্চলটি বাংলার বন্য পূর্ব' হিসেবে বহাল থাকে, কারণ আমরা সেখানে মোগল উপস্থিতির বিচ্ছিন্ন তথ্য পাচ্ছি।[৮২] অবশ্য, ১৬৬৬ সাল থেকে অঞ্চলটিতে ধীরে ধীরে সূচিত কৃষিজ প্রবৃদ্ধির স্পষ্ট প্রমাণ পাই। ৭ ও ৮ নম্বর টেবিলে প্রদর্শিত, যা ১৬৬৬ ও ১৭৬০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সিলেট ফৌজদারের অফিস থেকে অনুমোদিত মঞ্জুরীর সারসংক্ষেপ, তথ্যে এই সময়ে রাষ্ট্র থেকে বেসরকারি হাতে হস্তান্তরিত জঙ্গল এলাকার পরিমাণ প্রকাশ করছে। যদিও এই সময়ে ছাব্বিশ জন *ফৌজদারের* মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন হিন্দু,[৮৩] কিন্তু তবুও হিন্দু প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ হস্তান্তর হতে দেখা যায়। বস্তুত ব্রাহ্মণকে তার ধর্মপরায়ণতা বা পাণ্ডিত্যের পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা নিষ্কর ভূমি *ব্রহ্মোত্তর* ছিল হস্তান্তরের বৃহত্তম অংশ, প্রতিটির গড় আকার ছিল ২২.৯ একর। চট্টগ্রামের মতো সিলেট সদর দফতরের মোগল কর্তৃপক্ষ এসব মঞ্জুরীর সূচনা করতো না: স্থানীয় জমিদার ও সিলেটের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ইতিপূর্বে সম্পাদিত সমঝোতা সিলেটের মোগল *ফৌজদার* শুধুমাত্র নিশ্চিত করতো। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৭২১ সালে এক সনদে স্থানীয় *জমিদারদের* আগের দান সম্পাদনের দলিলটির স্বীকৃতি দেওয়া হয়, 'হিন্দু বিজ্ঞানে দক্ষতা সম্পন্ন' জনৈক মহাদেব চ্যাটার্জিকে উক্ত দলিলে ৩৯ একর (১০ কুলবা) জঙ্গলভূমি দান করা হয়েছিল।[৮৪] ব্রহ্মোত্তর অধিকাংশ মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছিল ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য ও হিন্দু জ্ঞানে তার দক্ষতার কারণে।[৮৫]

---

৮১. Ibn Battuta, *Rehla*, trans. Mahdi Husain, 241.

৮২. ১৬৩৬ সালে সিলেটের ফৌজদার মুহাম্মদ জামান তেহরানিকে মোগলদের কামরূপ অভিযানের সঙ্গী হওয়ার জন্য তলব করা হয়, কারণ "তিনি দেশটিতে অনেক বছর বসবাস করায় এ ব্যপারে প্রতিটি বিষয়ে তার ভাল জানাশোনা ছিল। Inayat Khan, *Shah Jahan Nama*, trans., A. R. Fuller, ed. W.E. Begley and Z. A. Desai (Delhi: Oxford University Press, 1990), 235.

৮৩. S. N. H. Rizvi, ed., *Bangladesh District Gazetteers: Sylhet* (Dacca: Bangladesh Government Press, 1975), 68-71.

৮৪. "ইলম-ই হিন্দাবি ইসতিদাদ-ই কামাল দারাদ।" সনদটিতে শর্তারোপ করা হয় যে, ভূমিটি ভট্টাচার্যের মালিকানায় হস্তান্তর করতে হবে, যাতে তাঁরা সেটাকে চাষাবাদের আওতায় আনতে পারে, তাতে উৎপাদিত সামগ্রী তাঁর প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং তিনি অবশ্যই রাষ্ট্রের দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করবেন। Sylhet District Collectorate Record Room, "Register of Sanads," 17: 60.

৮৫. ১৭৪৪ সালে জারি করা এক সনদে জনৈক মহাদেব চক্রবর্তীকে "হিন্দু জ্ঞানে পারদর্শী" ("ইলম-ই হিন্দাবি মাহারাত-ই তামাম দারাদ") হিসেবে বর্ণনা করে বলা হয়, তার জীবিকা নির্বাহের কোন অবলম্বন নেই। মঞ্জুরীটিতে স্থানীয় *জমিদারদের* প্রদত্ত ১.৯৫ একর জঙ্গলভূমিতে ব্রাহ্মণের 'মালিকানা' (বা তাশারিফ-ই উ) নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় এজেন্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়। Ibid., 19: 317.

হিন্দুদের বা হিন্দু প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদান করা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মঞ্জুরী ছিল দেবোত্তর, হিন্দু মন্দির বা বিগ্রহের সেবায়েতকে দেওয়া নিষ্কর ভূমি। ১৭২০ সালের ৮ই ডিসেম্বরে একটি মঞ্জুরীতে বলা হয়: চাকলা সিলেটের অধিবাসী মধু দাস সেনের বাড়িতে একটি সুসজ্জিত ঠাকুর আছে। দেবতার পূজার উপকরণের অভাব থাকায় সেখানকার *পূজারীকে* সহায়তার জন্য এবং এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানটির উন্নতির জন্য রাজস্ব হিসেবের বাইরে থাকা ৭০ কুলবা (২৭৩ একর) জঙ্গল-ভূমি দেবোত্তর হিসেবে রাম দাস সেনকে প্রদানের অনুরোধ করা হচ্ছে। এলাকাটি চাষাবাদের আওতায় এনে তার উৎপাদন পূর্বোল্লিখিত স্থান এবং তার ব্রাহ্মণ পূজারীদের ব্যয়ভার বহন করা হবে।[৮৬]

সিলেটের মোগলরা *বৈষ্ণবোত্তর* নামক মঞ্জুরীর মাধ্যমে বৈষ্ণবদের এবং *শিবোত্তর* নামক মঞ্জুরীর মাধ্যমে শৈবদের পৃষ্ঠপোষকতাও করতো। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৭২৫ সালে গোবিন্দ দাস নামক এক বৈষ্ণব *বৈরাগিকে* 'সম্মানিত করার উপযুক্ত,- *মুসতাহাক-ই ওয়াজিবুর-রিয়াত,* আরবি ফারসি এই পরিভাষাটি যে কোন প্রখ্যাত মুসলমান আলেম বা সূফীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-অভিহিত করে সরকার তাকে চার *কুলবা* (১৫.৬ একর) জঙ্গলাকীর্ণ জমি মঞ্জুরী দেয়।[৮৭]

চেরাগি নামক মঞ্জুরী প্রদান করা হতো মুসলমান দরবেশদের দরগার জন্য। অনেক ঘটনায়, স্থানীয় রাজস্ব কর্মকর্তারা শুধুমাত্র ইতিপূর্বে মূলত স্থানীয় *জমিদারদের* হস্তান্তরকে স্বীকৃতি দিত।[৮৮] অন্যান্য ঘটনায়, বন পরিষ্কার করে সেখানে উৎপাদিত ফসল দরগার জন্য ব্যয় করা হবে, এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করে পথপ্রদর্শকরা জমি বরাদ্দের জন্য অনুরোধ করতো।[৮৯] চট্টগ্রামে প্রাপ্ত *সনদগুলোর* মতো এখানেও ইতিমধ্যেই নির্মিত মসজিদের জন্য নিষ্কর জমি মঞ্জুরী পেত *মাদাদ-ই-মাশ* নামে আরো একটি শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিবর্গ। এ ধরনের একটি মঞ্জুরীতে দেখা যায়, জনৈক শেখ মুহাম্মদ বনে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন, কিন্তু তিনি ইমাম *(চুরগার), মুবাল্লিগ* ও

---

৮৬. Ibid., 17: 14.

৮৭. Ibid., 10:

৮৮. একইভাবে ১৭৫৫ সালে স্থানীয় একটি দরগা ও মসজিদে *ফাতিহা* পাঠকারীদের জন্য রহমান বখশ নামক একজন *ফকিরকে* স্থানীয় *জমিদার* ও *তালুকদারগণ* ২১ একরের (৫.৫ *কুলবা*) বেশি অনুন্নত জঙ্গলভূমি প্রদান করে। Ibid., 19: No.607. একই কথা প্রযোজ্য নাসির আলী ফকিরের ক্ষেত্রে, একই উদ্দেশ্যে হিন্দু ভূস্বামীগণ ১৭৫৪ সালে তাঁকে ৩.৯ একর জমি দিয়েছিল। Ibid.,17: 215.

৮৯. উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৭৩৪ সালের ১লা জানুয়ারি সরকার শেখ আহমদ হাজীর দরগার খাদেম সৈয়দ মাহদিকে ১৩ একর অনুন্নত জঙ্গলভূমি দান করে। সরকার নির্দেশ দেয় যে, ভূমিটি থাকবে সৈয়দের মালিকানায়, এবং এর রাজস্ব দরগাটিতে বাতি জ্বালানো এবং সেখানে কুরআন তিলাওয়াতে ব্যয়িত হবে। Ibid.,11: 351.

মুয়াজ্জিন এবং অন্যান্য ব্যয়ভার বহনে অক্ষম বলে জানান। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ১৭৪৯ সালের ২৫শে জুলাই সিলেট সরকার 'শেখ মুহাম্মদের মসজিদ ও বাড়ি এবং সেই সাথে তার সন্তানদের ব্যয়বার মেটনোর জন্য' ৩৯০ একর (১০০০ *কুলবা*) জঙ্গল বরাদ্দ করে।[৯০] সিলেট শহরের প্রখ্যাত দরবেশ শাহ জালালের দরগার খাদেমদের জন্য সর্বপ্রাচীন মঞ্জুরীটিও ছিল *মাদাদ-ই-মাশ*। ১৬৬৩ সালে ১১ই আগস্ট তারিখে এই দলিলে ৭৮.২ একর (২০ *কুলবা*) জঙ্গলভূমি মঞ্জুর করা হয়।[৯১] তাই আওরঙ্গজেবের আমল (১৬৫৮-১৭০৭) থেকে দ্বিতীয় আলমগীরের আমল (১৭৫৪-৫৯) পর্যন্ত দরগাটির খাদেমগণ অব্যাহতভাবে মোগল পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন।[৯২]

ব্যাপকভাবে সমর্থিত না হলেও, এ মর্মে অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, ১৬৭২-৭৩ সালে রক্ষণশীল সম্রাট আওরঙ্গজেব নির্দেশ দেন, হিন্দুদের প্রদত্ত *মাদাদ-ই-মাশ* ফিরিয়ে নিতে হবে এবং ভবিষ্যতে উক্ত ধরনের মঞ্জুরী শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।[৯৩] কিন্তু ফারসি একটি প্রবাদ আছে, *'দিল্লী দূর আস্ত্'*। সম্রাটের শাসনকালে সিলেটে মোগল কর্মকর্তারা ১৬৭২-৭৩ সালের নির্দেশের পর আগের চেয়ে বেশি হারে হিন্দুদের *মাদাদ-ই-মাশ* মঞ্জুর করতে থাকেন।[৯৪] ৭ নম্বর টেবিলে অবশ্য দেখা যায়, দ্বিতীয় আলমগীরের শাসনকালে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের মধ্যে এসব মঞ্জুরি বেশ হ্রাস পাচ্ছে। এ সময় ৪১টি *মাদাদ-ই-মাশের* মধ্যে মুসলমানদের জন্য জারি করা ৩৮টি। অধিকন্তু সকল আমল মিলিয়ে আয়তনের হিসাবে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানরা নয় গুণ বেশি পেয়েছে-দুই সম্প্রদায়ের লোকদের প্রাপ্তি ছিল যথাক্রমে গড়ে ২৬.২ একর ও ১৭০.১ একর।

চট্টগ্রামের মতো সিলেটে মঞ্জুরীতে রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য। ১৭৫৩ সালের একটি সনদে বলা হয়, ৪৩, ৮৭. ৫ একরের (১১২৫ *কুলবা*)

---

৯০. Ibid.,21: 594.

৯১. Ibid.,No. 353.

৯২. এসব মঞ্জুরীর মধ্যে ছিল আওরঙ্গজেবের (Ibid.,16: 388; 21: no. 353; 338), মোহাম্মদ শাহের (Ibid.,16: 9; no. 639 no "Register of Sanads," 351 & 374), আহমদ শাহের (21,no. 496.) এবং দ্বিতীয় আলমগীরের (19 nos. 358 & 578)।

৯৩. Irfan Habib, *Agrarian System of Mughal India, 1556-1707* (Bombay: Asia Publishing House, 1963), 311.

৯৪. সম্রাটের আদেশের পর যেখানে ১৬৭৩ থেকে ১৭০৭ সাল পর্যন্ত চৌদ্দটি এ ধরনের মঞ্জুরী জারি করা হয়েছে, সেখানে তাঁর নির্দেশের আগে (১৬৫৮-৭২) জারি করা হয়েছে এগারোটি। অপর তিনটির তারিখ অনিশ্চিত। দেখুন "Register of Sanads," Sylhet District Collectorate Record Room, 17: 75, 243: 18, nos.94, 154, 279; nos. 334, 618, 619; 20,nos. 851, 853, 959; 21, nos. 397, 400.

টেবিল ৭: সংখ্যার হিসেবে ১৬৬০-১৭৬০ সময়কালে সরকার সিলেটের নিষ্কর মঞ্জুরী হিসেবে জঙ্গলভূমি বিতরণ

					মাদাদ-ই-মাশ		
শাসনামল	ব্রহ্মোত্তর	দেবোত্তর	বিষ্ণোত্তর	শিবোত্তর	হিন্দু	মুসলমান	চেরাগি
আওরঙ্গজেব (১৬৫৬-১৭০৭)	৪	১	-	-	২৩	৮	১
শাহ্ আলম (১৭০৭-১৭১২)	১	-	-	-	-	-	-
ফররুখ শিয়র (১৭১৩-১৭১৯)	-	-	-	-	২	-	-
মুহাম্মদ শাহ (১৭১৯-১৭৪৮)	৩৩৭	৫৪	২	৩	২২	৫৫	৩৯
আহমদ শাহ (১৭৪৮-১৭৫৪)	৯১	২৭	১	১	৬	৩৫	১৩
আলমগীর দ্বিতীয় (১৭৫৪-১৭৫৯)	৯৫	২৫	১	-	৩	৩৮	২০
মোট	৫২৮	১০৭	৪	৪	৫৬	১৩৮	৭৩

টেবিল ৮: আয়তনের (একর) হিসেবে ১৬৬০-১৭৬০ সময়কালে সরকার সিলেটের নিষ্কর মঞ্জুরী হিসেবে জঙ্গলভূমি বিতরণ

					মাদাদ-ই-মাশ		
শাসনামল	ব্রহ্মোত্তর	দেবোত্তর	বিষ্ণোত্তর	শিবোত্তর	হিন্দু	মুসলমান	চেরাগি
আওরঙ্গজেব (১৬৫৬-১৭০৭)	৩৯	৩.৯	-	-	৭৬০.৫	১,২৪৮	১৯৫
শাহ্ আলম (১৭০৭-১৭১২)	৩৯	-	-	-	৭৫	-	-
ফররুখ শিয়র (১৭১৩-১৭১৯)	-	-	-	-	৪২.৯	-	-
মুহাম্মদ শাহ (১৭১৯-১৭৪৮)	৬১৪৬.৪	২৫৯৩.৫	৭.৮	৩৫.১	৪২৯	৯৪২৯.৩	১০৫৩
আহমদ শাহ (১৭৪৮-১৭৫৪)	২,৭৪১.৭	৮৮৯.২	৩.৯	৩.৯	১৪০.৪	১২,৯৮৭	৬০৮.৪
আলমগীর দ্বিতীয় (১৭৫৪-১৭৫৯)	৩,১৪৩.৪	১,২০৫.১	১৫.৬	-	১৩২.৬	৮৪৫৫.২	১,৫৭৯.৫
মোট	১২,১০৯.৫	৪,৬৯১.৭	২৭.৩	৩৯	১,৫৮০.৪	৩২.১১৯.৫	৩,৪৩৫.৯
গড় আকার	২২.৯	৪৩.৮	৬.৮	৯.৭	২৮.২	২৩৬.১	৪৭.১

মন্তব্য: মূল সূত্রে এসব পরিসংখ্যান *কুলবা* *একক*ে দেওয়া ছিল। আরবি শব্দ 'কুলবা'র মানে 'লাঙল' আর বাংলায় উক্ত পরিমাণ এলাকাকে বলা হয় হাল তথা 'লাঙল'। মোগল সিলেটে, এক কুলবায় ১২ কেদার, এক *কেদারে* ৪ *পোয়া*, এক *পোয়ায়* ৩ *যষ্ঠী*, এক *যষ্ঠীতে* এক বর্গ *কাহান*, এক *কাহানে* ২ *নাল*, এক *নালে* ৬.২৫ *দস্তা*। আর এক *দস্তায়* ২১.৬২৫ ইঞ্চি, তাই ৪৩,৫৬০ বর্গফুটে এক একর, এক *কুলবায়* ৩.৯ একর। দেখুন: কমলাকান্ত গুপ্ত, শ্রীহট্টের ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা, ২৬।

মতো বিশাল জঙ্গলভূমি *মাদাদ ই মাশ* হিসেবে ইমাম, ছাত্র, আসা-যাওয়াকারী, শ্রমিক এবং মৌলভি মুহাম্মদ রাবির সংগঠন ও তার সন্তানদের' দেওয়া হলো।[৯৫] তিন বছর পর আরেক *সনদে* প্রদত্ত নির্দেশে, রাজস্ব হিসেবের বাইরে থাকা অথচ চাষাবাদের যোগ্য *(জঙ্গল-ইয়ে খারিজ-ই জাম, লাইক আল জিরাত)* ৯৭৫ একর (২৫০ *কুলবা*) একই 'সংগঠন'কে (*দাসতগাহ*) দেওয়া হয়, তবে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যসহ। এটা ব্যবহৃত হবে একটি মসজিদ, একটি বাড়ি, একটি কুরআন স্কুল, নির্ভরশীল, যাতায়াতকারী ও ফকিরদের ব্যয়ভার মেটানোর জন্য। শ্রমিক এবং মৌলভি মুহাম্মদ রাবির সংগঠনের ভাল কাজের এবং শিশু ও নির্ভরশীলদের জন্য একটি মাদাদ-ই মাশও।.... এ ব্যাপারে একমত হওয়া গেল, পূর্বোক্ত ভূমি চাষাবাদের আওতায় আনামাত্র উৎপাদিত ফসল মসজিদ, কুরআন স্কুল, যাতায়াতকারী ও ফকির, সেই সাথে তার নিজের প্রয়োজন, তার সন্তান ও নির্ভরশীলদের ব্যয়ভার মেটাতে ব্যয়িত হবে এবং তিনি নিজেকে রাষ্ট্রের দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্য দোয়া করার কাজে ব্যস্ত রাখবেন।[৯৬] এসব দলিলে মৌলভি মুহাম্মদ রাবিকে ব্যাপক সম্মোহিত কর্তৃত্ব এবং সাংগঠনিক সামর্থ্য সম্বলিত ব্যক্তি হিসেবে দেখা যায়। তার 'সংগঠনের' সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের পরিচিতি আমরা জানি না, তবে দুটি মঞ্জুরী মিলিয়ে ৫৩৬৩ এক জমির বন পরিষ্কার করে তাতে চাষাবাদ করার জন্য তাকে অবশ্যই বিপুল জনশক্তিকে পরিচালনা করতে হয়েছিল। মুহাম্মদ রাবির শ্রমিকশক্তি, তাঁর মসজিদ, কুরআন স্কুল সবই সেই ভূমিতে উৎপাদিত ফসলে চলতো, তাই ধারণা করা যেতে পারে, মাঠ শ্রমিকরাও ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

পূর্ব বাংলার সাধারণ চিত্রের মতো সিলেটের নতুন নতুন গ্রামের প্রতিষ্ঠাতাগণ স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোর ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা গঠনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৮৯৮ সালে যখন সিলেটের বনে বসতি স্থাপনের কিছু জীবন্ত স্মৃতি তখনো অটুট ছিল, উত্তর সিলেটের জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক স্মরণ করেন, যখনই একটি নতুন গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হতো, প্রতিষ্ঠাতা ভূস্বামী শাক্ত হিন্দু হলে কালী দেবীর একটি মন্দির নির্মিত হতো, তিনি বৈষ্ণব হলে একটি বিষ্ণু মন্দির নির্মিত হতো। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ যদি বৈষ্ণব হতো, তবে তারা রাধা ও কৃষ্ণের একটি আখড়া নির্মাণ করতো। এলাকাটিতে সাপের উপদ্রব থাকলে পৃষ্ঠপোষক দেবতা হতো সর্পদেবী মনসা এবং

---

৯৫. "দার ওয়াজ-ই মাদাদ-ই মা'শ-ই চুগারি ভা খার্জ-ই তালাবা ভা সাদির-ও-ভারিদ বা ফালাত ভা কারামাত-ই দাস্তগা-ই মৌলভি মোহাম্মদ রাবি মা'হু ফারজানদান।" Ibid.,vol. 21, no. 608.

৯৬. "দার ওয়াজ-ই খার্জ-ই মাসজিদ, খানা, ভা মাদরাসা, ভা মুতায়াল্লিকান ভা সাদির-ও-ভারিদ ভা ফুকারা; ভা মাদাদ-ই মা'শ-ই ফালাত ভা কারামাত-ই দাস্তগাহ-ই মৌলভি মোহাম্মদ রাবি ভা ফারজানদান ভা মুতায়াল্লিকান-ইশ----মুকারার গাস্তা, কি আরাজি-ইয়ি মাজকুর-রা আবাদ সাকতা, আজ মুহাসিল-ই আন খারজি মাসজিদ ভাব মাদরাসা ভা সাদির-ও-ভারিদ ভা ফুকারা ভা মা-ইয়াহতাজ-ই খুদ ভা ফারজানদান ভা মুতায়াল্লিকান-ইশ নামাদা, বা দুয়াগু-ইয়ি দাওয়াম-ই দৌলাত---[ইশতিঘাল] বাশান্দ।" Ibid., no. 609.

মুসলমানরা যদি গ্রামটির প্রতিষ্ঠাতা হতো তবে কোন মুসলমান পীরের একটি দরগা প্রতিষ্ঠিত হতো।[৯৭] অন্য কথায়, মঞ্জুরী যদি হিন্দু বা হিন্দু প্রতিষ্ঠানকে *(ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, বিষ্ণোত্তর, শিবোত্তর)* দেওয়া হতো তবে স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোকে হিন্দু ব্যবস্থায় সাংস্কৃতিক বলয়ে অঙ্গীভূত করার ঝোঁক সৃষ্টি হতো। অন্যদিকে, মুসলমানদের মাদরাসা, মসজিদ বা দরগা প্রতিষ্ঠার জন্য দেওয়া হলে তাদেরকে ইসলামী ব্যবস্থার সাংস্কৃতিক বলয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হতো। এসব প্রথমদিককার প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে তৎপরবর্তী জনসংখ্যার চিত্র বিবর্তিত হয়।

সিলেটে যদিও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বন মঞ্জুরীতে হিন্দুরা সংখ্যার দিক থেকে মুসলমানদের ছাড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু দুটি কারণে এই পার্থক্যের মধ্যে সমতা বিধান হয়েছিল। প্রথমত রাষ্ট্র হিন্দুদের থেকে মোটের হিসেবে অনেক বেশি পরিমাণ বনজ ভূমি হস্তান্তর করেছিল মুসলমানদের কাছে, ফলে মঞ্জুরীকৃত এলাকায় বসবাসরত অধিক সংখ্যক আদিবাসী মানুষের কাছে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠানগুলো বেশি প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত মুসলমানদের প্রদত্ত মঞ্জুরীতে প্রায়ই শুধুমাত্র মঞ্জুরীপ্রাপ্তদের 'নির্ভরশীলদের কথাই উল্লেখ করা হতো না, সেই সাথে বন পরিষ্কার এবং শ্রমিকদের নির্দিষ্ট এবং অব্যাহত কাজে নিয়োজনকারী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কথাও বলা হতো। মৌলভি মুহাম্মদ রাবির পরিশ্রমপূর্ণ কাজ *'দসতগাহ'* বা 'সংগঠনের' জন্য প্রদত্ত মঞ্জুরী শুধুমাত্র শ্রমিকদের জন্যই দেওয়া হয়নি বরং সেই সাথে শ্রমিক ও আনুষ্ঠানিক ইসলামের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টিকারী মসজিদ ও কুরআন স্কুলের জন্যও প্রদান করা হয়েছিল। অন্যদিকে মুসলমান মঞ্জুরীতে পরিলক্ষিত সমাজ-বিনির্মাণকারী ব্যবস্থা বা নির্ভরশীলদের ব্যয়ভার বহন করার কথা *শাক্ত* ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব *বৈরাগীদের* প্রদত্ত মঞ্জুরীতে দেখা যায় না।

অর্থাৎ মুসলমান মঞ্জুরীতে ইসলামী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সাথে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার সরকারি কর্মকাণ্ডসমূহকে প্রকাশ্যে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। উপরোল্লিখিত উদাহরণসমূহ প্রাক আধুনিক বাঙালি কাব্যে উল্লিখিত ধর্মীয় ও কৃষিজ সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে পূর্ববাংলায় বৃটিশদের সংগৃহীত লোক-ঐতিহ্য এবং এখনো পল্লী এলাকায় প্রাপ্ত ঐতিহ্যের সত্যতা প্রতিপন্ন করছে। পূর্ববর্তী ঐতিহ্যসমূহে অষ্টাদশ শতকের কোন এক সময়ে নোয়াখালিতে আগমনকারী পীর উমর শাহের মতো খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বদের দেখা যায়, যারা স্থানীয় বাঙালিদের শ্রমিকদলে সংগঠিত করেছিলেন এবং তাদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেছিলেন (দেখুন অষ্টম অধ্যায়ের মাঝামাঝিতে)। মোগল আমলে মধ্যপ্রাচ্য থেকে কিভাবে লোকজন হবিগঞ্জ অঞ্চলে এসেছিল, কিভাবে তারা স্থানীয় জনসাধারণকে জঙ্গল কাটা ও ধান চাষে নিয়োজিত

৯৭. P.N. Bhattacharjee, "Folkcuatom and Folklore of the Sylhet District of India," *Man in India* 10, no. 1 (January-March 1930): 133.

করেছিল, সেসব গল্প এখনো প্রচলিত। সম্প্রদায়গুলোর ইসলামী পরিচিতি অর্জনের ফলে তারা তাদের নেতৃবৃন্দকে ইসলামী সভ্যতার এবং বিশেষভাবে প্রাতিষ্ঠানিক সূফীবাদের সংস্কৃতির সাথে যথাযথ হয় এমন পবিত্র পরিচিতিতে ভূষিত করেছিল, যার প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলা সীমান্ত জুড়ে সাধু পুরুষদের কবরসমূহে দরগার ব্যাপকতায়।

সারাংশ

পূর্বাঞ্চলীয় বদ্বীপে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম দিকের তুলনায় স্থায়ী কৃষিজজীবন অনেক কম বিকশিত হওয়ায় অন্যান্য সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার চেয়ে ইসলাম অনেক বেশি উন্নয়নশীল কৃষিজ সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। রাষ্ট্র সমর্থিত পথপ্রদর্শকরা সাবেক বনজ এলাকায় ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে সীমান্তে তিনটি বিষয়-খামার ও বনের মধ্যকার পার্থক্য সৃষ্টিকারী অর্থনৈতিক সীমান্ত, মোগল ও অ-মোগল প্রশাসনের মধ্যকার পার্থক্য সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক সীমান্ত এবং ইসলামে ও অ-ইসলামের মধ্যকার পার্থক্য সৃষ্টিকারী ধর্মীয় সীমান্ত একটিতে একাকার হয়ে যায়।

অবশ্য, বাংলার অগ্রসরমান সীমান্তে শুধুমাত্র ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহই একমাত্র মাধ্যম হিসেবে বিকশিত হয়নি। চট্টগ্রাম ও সিলেট উভয় বনেই হিন্দু দেব-দেবীদের সাথে সম্পৃক্ত পথপ্রদর্শক ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঘিরে নতুন নতুন সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। বাস্তবিকই, সক্রিয় বদ্বীপ সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এতো উর্বরা হয়ে পড়েছিল যে, এমনকি খ্রিস্টান পথপ্রদর্শকরাও মোগল পৃষ্ঠপোষকতার সুবিধা ছাড়াই প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৭১৩ সালে ফরাসি জেসুইট পেরে বারবিয়ার চট্টগ্রাম এবং বর্তমানের নোয়াখালি জেলার অভ্যন্তরভাগে সফর করেন, সেখানে তিনি স্থানীয় এক গির্জার মাধ্যমে সংগঠিত খ্রিস্টান কৃষক সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পান। তিনি লিখেন,

> চট্টগ্রাম থেকে পাঁচদিনের দূরত্ব আমরা বিকল্প পথে একদিনে সম্পন্ন করে ভুলুয়া নামক স্থানে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পেলাম। ঈশ্বর নিজেই সাথে সাথে তা রক্ষা করেন এবং পরিচালনা করেন: কারণ কোন মিশনারির সেখানে যাওয়া বিরল ব্যাপার।...

এসব খ্রিস্টানের প্রধান হলেন একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি, তাঁর পাঁচ পুত্রের সবাই বিবাহিত। তাদের পরিবার এবং তাদের সাথে জড়ো হওয়া শ্রমিক বাহিনী (উর্বরা জমি সংগ্রহ করে) তিন থেকে চার শত লোকের একটি গ্রাম গঠন করেছে। তাদের কঠোর জীবন এবং প্রধানের সতর্কতা ও মনোযোগে তারা সর্বোত্তমভাবে নির্দোষ রয়েছে।[৯৮]

যে বৃদ্ধ ব্যক্তিটির (ভিইলার্ড) সাক্ষাৎ বারবার পেয়েছিলেন তাকে তিনি 'le chef de

ces Chretiens' হিসেবে উপস্থাপন এবং চিহ্নিত করায় মনে হচ্ছে সে কোন ইউরোপীয়ান নয়, বরং একজন বাঙালি খ্রিস্টান, কারণ ফরাসি পর্যটককে তার সাথে কথা বলার জন্য একজন দোভাষীর সাহায্য নিতে হয়েছিল।[৯৯] স্পষ্টতই ব্যক্তিটি স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল, কার্যত সে স্থানীয় সম্প্রদায়ের একজন ক্ষুদে জমিদার হিসেবে ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব উভয়টিই প্রদান করতো।[১০০] এক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন হিন্দু বা মুসলমান নয় বরং একটি পূর্ণাঙ্গ খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান বাংলা সীমান্তে কৃষজ উন্নয়নের সাথে বেড়ে ওঠেছে।

বাংলার কৃষিজ সীমান্তে হিন্দু এবং এমনকি খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ঘটলেও মুসলমান সম্প্রদায়ই মোগল জেলা রাজস্ব কর্মকর্তাদের নিকট থেকে পৃষ্ঠপোষকতার সিংহভাগ পেয়েছে। তারাই আদিম জঙ্গলের রাষ্ট্র-স্বীকৃত নিয়ন্ত্রণের বৃহত্তম অংশটি অর্জন করে সেই জমি ধানচাষের জন্য প্রস্তুত করতে অধিকাংশ স্থানীয় শ্রমিককে আকৃষ্ট করেছে এবং তাদের নির্মিত মসজিদ বা দরগাসমূহ ক্ষুদ্রাকৃতির অঞ্চলসমূহকে অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় রূপান্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে। অধিক পৃষ্ঠপোষকতার ফলে অন্যান্য ধর্মীয় পরিচিতিতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিকাশের তুলনায় পল্লী মুসলমান সম্প্রদায়ের বিকাশে অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

তবে এখানে বা অন্যত্র ধর্মীয় পরিবর্তনের ব্যাখ্যা হিসেবে স্রেফ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাংস্কৃতিক মাত্রা হিসেবে কিংবা বদ্বীপের জনসাধারণের বিনা বাধায় গৃহীত বিশ্বাস ও ধর্মাচারের চিরন্তন ও নির্দিষ্ট পদ্ধতি হিসেবে ইসলামকে উপলব্ধি করা ভুল হবে। প্রাক-আধুনিক বাংলায় নাটকীয় আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ার সময়ে ইসলাম সৃষ্টিশীলভাবে 'বিশ্ব-বিনির্মাণের' আদর্শ হিসেবে বিবর্তিত হয়েছিল যে আদর্শ ছিল বন-পরিষ্কারকরণ ও কৃষিজ সম্প্রসারণের, শুধুমাত্র স্বীকৃতি প্রদান নয়, বরং সীমান্তে সংঘটিত ব্যাপক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের কাঠামো নির্মাণ করেছিল। অধিকন্তু একদিকে ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাক-আধুনিক বাংলার

৯৮. H. Hosten, S.J. "The Earliest Recorded Episcopal Visitation of Bengal, 1712-1715," *Bengal Past and Present* 6 (July-December 1910): 210. Trans, Hosten.

৯৯. সে ছিল সম্ভবত চট্টগ্রাম শহরের কোন দলত্যাগী, পর্তুগীজ মিশনগুলোর মাধ্যমে ধর্মান্তরিত দুই সহস্রাধিক লোক তখন একটি স্থানীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায় হিসেবে সেখানে বসবাস করতো। Ibid.,207.

১০০. উক্ত সমাজপতির স্থানীয় জনসাধারণের মধ্য থেকেই, নোয়াখালির বাইরে থেকে আনতে হয়নি, তার শ্রমশক্তি সংগ্রহ করার বিষয়টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, "তাদের সাথে জড়ো হওয়া শ্রমিক বাহিনী (উর্বরা জমি সংগ্রহ করে)" শব্দটি থেকে। ফরাসি মূল ভাষ্য ছিল: " les gens de travail qui se sont ranges aupres d'eux (car ils ont pris des terres a cultiver)." *Lettres edifiantes et curieuses des missions etrangeres* (Paris: J.G. Merigot, 1781), 13: 282-83.

অন্যদিকে, পূর্ব বাংলায় ইতিমধ্যেই বিদ্যমান ধর্মীয় ঐতিহ্যগুলো সে সময়ে তাদের মাঝে বিস্তৃত পল্লীর মসজিদ ও দরগার সাথে সম্পৃক্ত কৃত্যাদি, ধর্মাচার ও বিশ্বাসের মিশ্রণকে জায়গা করে দেয়। এই প্রক্রিয়ায়, ইসলামী ও বাঙালি বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং অতিলৌকিকতা গতিশীল ও সৃষ্টিশীল উপায়ে মিশে যায়, সেই বিষয়টির দিকেই এখন আমরা নজর দেব।[১০১]

১০১. এই প্রক্রিয়ায় "সৃষ্টিশীলতার সাথে খাপ খাওয়ানোই " সম্ভবত সেরা বর্ণনা। চলমান প্রক্রিয়ায় সংস্কৃতি পরিবর্তনের যে বিষয়টিতে আমি সক্রিয়, সৃষ্টিশীল ভূমিকাকে সার্বিকভাবে উপস্থাপন করেছি, তা 'মিশনারি' বা অন্যান্য বাহকদের ভূমিকার বিপরীত এবং আমি এ ব্যাপারে আমার শিক্ষক জন আর. ডব্লিউ. স্মেইলের নিকট বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ঋণী। ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাস লেখার সময়ে অধ্যাপক স্মেইল অনেক আগেই লক্ষ্য করেছেন, "স্মরণ রাখতে হবে, পরিবর্তনশীল গ্রুপের পরিবর্তনের গ্রহণ হলো নতুনত্বের অপরিহার্য বিষয়-এবং তাই কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না, বলপ্রয়োগে সংস্কৃতি পরিবর্তনের শেষ বিশ্লেষণে, ঔপনিবেশিক আমলে শেষদিকে ইন্দোনেশিয়ায় সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সমস্যা আলোকপাতে আমরা সৃষ্টিশীলের সাথে খাপ খাওয়ানোকে গ্রহণ করতে পারি।" John R.W. Smail, "On the Possibility of an Autonomous History of Modern Southeast Asia," *Journal of Southeast Asian History 2, no. 2 (July 1961): 91.*

১০ বাংলায় ইসলামের মূল বিস্তার

কিতাব থাকিতে কেন ভূতের ডরে মরা।

বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে জনৈক মোল্লা (১৪৯৪)

ঢাকা বা মুর্শিদাবাদের মোগল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পূর্ববাংলার অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত শত শত ছোট ছোট মসজিদ ও দরগা জঙ্গলকে চাষযোগ্য জমিতে রূপান্তর এবং মোগল রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত স্থিতিশীল অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ বিনির্মাণের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছিল। অবশ্য, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এসব প্রতিষ্ঠানই আবার তাদের আর্থ-সামাজিক প্রভাবের আওতায় থাকা গ্রুপগুলোর মধ্যে নজিরবিহীনভাবে ইসলামের অতিলৌকিক ও মানবিক কর্তৃত্বের ধারণা বিকশিত করেছিল। সপ্তদশ শতকের শেষদিকে ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকের দলিল-দস্তাবেজে মসজিদ ও দরগাসমূহে মোগল সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় শুক্রবারের নতুন নতুন জমায়েত *(ইকামাত-ই-হালকা-ই-জুমা)* চালুর কথা এবং সেসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি উক্ত সম্প্রদায়গুলোকে 'নির্ভরশীল'(বা *বাসতাগান*) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

চাষাবাদের জন্য সদ্য পরিষ্কারকৃত জঙ্গলভূমিতে এ ধরনের জমায়েত গ্রাম্য মসজিদ ও দরগাগুলোতে *ফাতিহা* জাতীয় যেসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো সেগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। মৃতের জন্য দোয়া কামনায় আয়োজিত *ফাতিহা* নামক অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরাটি *তিলাওয়াত* (পাঠ) করা হতো এবং সেই নামেই অনুষ্ঠানটির নামকরণ করা হয়েছে এবং এর শেষে ভোজের ব্যবস্থা থাকতো। অনেকটা মহানবীর (সা) শিয়া উত্তরসুরিদের *(ইমাম)* জন্য আয়োজিত বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠানের মতো ছিল এটি।[২] একইভাবে মুসলমান সাধু পুরুষ তথা স্থানীয় দরবেশদের স্মরণেও *ফাতিহা-ই-দরবিশি* নামের বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো।[৩] গ্রাম্য মসজিদ বা দরগার পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের

---

১. "Kanun Daimer Nathi," Chittagong District Collectorate Record Room, No. 64: bundle 78, case no.5027; No. 7: bundle 62, case no.4005.

২. *Fatiha-yi imamin-i aiyam-i Ashura*, Ibid., No. 251: bundle 55, case no. 3568; No. 127, bundle 63, case no. 4049; No. 232: bundle 30, case no. 1935.

৩. উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ১৭৪৯ সালে মোগল সরকার সাতকানিয়া থানার শেখ জানউল্লাহকে তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত দরগায় *ফাতিহা-ই দরবিশি* অনুষ্ঠানের জন্য তাঁকে ২৫.৬ একর জঙ্গলভূমি মঞ্জুর করে। Ibid., No. 196: bundle 19, case no 1093.

তালিকায় প্রায়ই 'ফাতিহা নেতৃবৃন্দ', 'ফাতিহা তিলাওয়াতকারীগণ,' বা স্রেফ 'কুরআন তিলাওয়াতকারী' হিসেবে উল্লেখ করা হতো।'[৪]

এ ধরনের সাদামাটা অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত পরিণতি ছিল পূর্ববঙ্গের ধর্মীয় বিশ্বে আল্লাহ এবং তাঁর সাথে সম্পর্কিত ক্ষুদ্রতর প্রতিনিধিদের ধর্মমতের প্রচার। এই প্রক্রিয়াকে সাধারণভাবে 'ধর্মীয় ধর্মান্তর' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়, তবে এই বাক্যের ব্যবহারের জন্য 'ধর্ম' এবং 'ধর্মান্তর' উভয় শব্দ সম্পর্কেই সম্যক উপলব্ধি প্রয়োজন। নৃতত্ত্ববিদ মেলফোর্ড স্পিরোর প্রস্তাবিত সংজ্ঞা অনুযায়ী ধর্ম হলো 'সাংস্কৃতিক স্বতঃসিদ্ধ অতিমানবীয় সত্তার সাথে সম্পর্কিত সাংস্কৃতিকভাবে বিন্যস্ত মিথস্ক্রিয়ার একটি প্রতিষ্ঠান,'[৫] এখানেও এটিকে গ্রহণ করা হয়, তবে অন্য যেসব পরিবর্তনই সাধিত হোক না কেন, কোন সমাজের একটি নতুন ধর্মীয় পরিচিতি অর্জন সেই সমাজের স্বতঃসিদ্ধ অতিমানবীয় সত্তার পরিচিতির পরিবর্তনের সাথে বিবর্তিত হবে। প্রাক-আধুনিক বাংলায় ইসলামীকরণের প্রক্রিয়ার উৎসের সন্ধানে আমরা তাই আল্লাহ এবং সেই সাথে মানবসমাজ ও আল্লাহ'র মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবস্থানে রাখার জনপ্রিয় প্রথা হিসেবে গৃহীত ইবলিস (শয়তান), আদম, মুহাম্মদ (সা), জিবরাইল ফেরেশতা, *জিন* ও *আওলিয়া* বা *পীর-দরবেশের* মতো অন্যান্য সাধু পুরুষের মতো ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্ব প্রদান করা বিষয়গুলোর দিকে নজর দেব। এই প্রক্রিয়ায় যখন ধর্মান্তর পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়, তখন হয়তো বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে, কারণ এর মাধ্যমে সাদামাটাভাবে পূর্ববর্তী কোন ধর্মীয় পরিচিতি পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে তার স্থানে একটি নতুন পরিচিতি গ্রহণ করার একটি আকস্মিক ও সম্পূর্ণ রূপান্তরের অর্থ প্রকাশ করে। বাস্তবে, সাধারণভাবে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের মতো বাংলায় একটি সামাজিক বিষয় হিসেবে ইসলামীকরণের প্রক্রিয়া এতো ধীরে ধীরে সংঘটিত হয়েছিল যে, তা প্রায় অস্ফুটই থেকে গেছে।

অধিকন্তু, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আলোকে এই প্রক্রিয়ায় তিনটি বিশ্লেষণধর্মী স্বতন্ত্র বিষয়কে, যার প্রতিটিরই ইসলামী ও ভারতীয় অতিমানবীয় প্রতিনিধিদের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে, উপলব্ধি করা যায়। এগুলোর একটিকে আমি অন্তর্ভুক্তিকরণ: দ্বিতীয়টিকে শনাক্তকরণ (কিংবা চিহ্নিতকরণ) এবং তৃতীয়টিকে স্থানচ্যুতকরণ হিসেবে অভিহিত করছি। অন্তর্ভুক্তিকরণ শব্দটি দিয়ে বাংলার

৪. *মুসাল্লিন-ই ফাতিহা, বা ফাতিহা-খানি* যেমনটি আছে Ibid., No. 31: bundle 77, case no. 4971; No. 40: bundle 47, case no. 3054 -এ। 'কুরআন পাঠের' অন্য নাম ছিল *কুরআনখানি বা তিলাওয়াত*, যেমনটি দেখা যায় No. 65: bundle 73, case no. 4677; No. 72: bundle 63, case no. 4100; No. 113: bundle 35, case no 2296 -এ।

৫. Melford E. Spiro, "Religion: Problems of Definition and Explanation," in *Anthropological Approaches to the Study of Religion*, ed. Michael Banton (London: Tavistock Publication, 1969), 96.

অতিলৌকিক জগতে আগে থেকে বিদ্যমান স্থানীয় দেবদেবীর সঙ্গে ইসলামী অতিলৌকিক ধারণাগুলো গ্রহণের প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়েছে। শনাক্তকরণ বলতে ইসলামী অতিলৌকিক প্রতিনিধিসমূহের শুধুমাত্র বাঙালি প্রতিনিধিদের সাথে সহাবস্থান পরিত্যাগ করে প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর সাথে একীভূত হওয়ার, যেমন আরবি নাম আল্লাহ সংস্কৃতি নাম নিরঞ্জনে বদলে যাওয়া, প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়েছে। এবং পরিশেষে, স্থানচ্যুতিকরণ বলতে ইসলামী অতিলৌকিক প্রতিনিধিসমূহের স্থানীয় সৃষ্টিতত্ত্বের অন্যান্য দেবদেবীর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াটি বোঝানো হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিকরণ, শনাক্তকরণ এবং স্থানচ্যুতিকরণ এই তিনটি পরিভাষা দিয়ে শুধুমাত্র স্বর্পার্জিত শ্রেণীবিন্যাসকৃত, একটি খুবই জটিল ও গতিশীল প্রক্রিয়াকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বিন্যস্ত ও হৃদয়ঙ্গম করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

অন্তর্ভুক্তিকরণ

মনসা, চণ্ডি, সত্যপীর, ধর্ম বা দক্ষিণ রায়ের মতো দেশজ দেবতাদের প্রশংসা সম্বলিত প্রাক-আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, স্থানীয় সৃষ্টিতত্ত্বগুলো বিদেশী মুসলমানদের সূচিত নতুন অতিলৌকিক সত্তাদের স্থান করে দেওয়ার জন্য সম্প্রসারিত হচ্ছে।[৬] উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমরা দেখেছি, ১৬৮৬ সালে রচিত কাব্যগ্রন্থ রায়-মঙ্গল-এ বাঙালি ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায় ('দক্ষিণের রাজা') ও মুসলমান পথপ্রদর্শক বদি গাজি খান উভয়ের প্রশংসা করা হয়েছে। এই কাব্য অনুযায়ী, উল্লিখিত দুজনের মধ্যকার সংঘাতের মীমাংসা একজনের পরাজয় বা অন্যজনের স্থানচ্যুতির মাধ্যমে হয়নি, বরং বদি গাজি খানের একজন মান্যবর দরবেশের মর্যাদায় সমাসীন হওয়া এবং দুজনের মধ্যে সহাবস্থানের মাধ্যমে হয়েছিল, তারা দুজনেই দক্ষিণ বাংলার সুন্দরবনের বনাঞ্চলে যৌথ ধর্মীয় কর্তৃত্বের অধিকারী হন। এই যৌথ কর্তৃত্ব প্রতিফলিত হয়, মুসলমান দরবেশের সমাধিতে ব্যাঘ্র দেবতার মাথার প্রতীক স্থাপনের মাধ্যমে। অবশ্য দুজনে একটি একক ধর্মীয় সত্তায় পরিণত হননি, বরং পারস্পরিক স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে বহাল থাকেন। দেশজ ও বৈবাহিক বিধিনিষেধ উচ্চতর পর্যায়েও পালন করা হতো। দক্ষিণ রায় ও বদি গাজি খানের মধ্যকার সংঘাতের নিরসন হিন্দু দেবতা কৃষ্ণ বা ইসলামী নবী মুহাম্মদ (সা) করেননি, বরং অর্ধেক কৃষ্ণ ও অর্ধেক মুহাম্মদের প্রতিনিধি হিসেবে ভিন্ন এক একক ব্যক্তিত্ব

৬. Bhattacharyya, "Tiger-Cult and Its Literature," 49-56; Tarafdar Hussain *Shahi Bengal*, 17-18, 164-66, 233-35; P.K. Maity, *Historical Studies in the Cult of the Goddess Manasa* (Calcutta: Punthi Pustak, 1966). See esp. Asim Roy, *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal* (Princeton: Princeton University Press, 1983).

করেছেন।[৭] অর্থাৎ ইসলামী অতিলৌকিক সত্তাসমূহ পুরোপুরি চিহ্নিত করা না হলেও দুটি পর্যায়ে দেশজ সত্তাসমূহের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিল।[৮]

স্থানীয় দেব-দেবীদের পাশাপাশি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্তি চারণ কবিদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মুখে মুখে প্রচলিত সমৃদ্ধ লোক পালাগানেও দেখা যায়। যেহেতু সাধারণত বন্দনার পর গাওয়া হতো তাই এগুলো ছিল সাধারণভাবে পল্লী কবির কাছে স্থানীয় শক্তিধর হিসেবে বিবেচিত অতিলৌকিক সকল সত্তার আবাহনের প্রতিভূ, তাই এসব পালা সেসব নিরক্ষর শ্রোতাদের ধর্মীয় পরিমণ্ডল সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করে। সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতকে চট্টগ্রাম জেলার গাঁথা 'নিজাম ডাকাইত' এর কয়েকটি সূচনা লাইন এখানে তুলে ধরা হলো।[৯]

পরথমে *(প্রথমে)* পরণাম করি পর্‌ভু করতার *(প্রভুকর্তা)*।
দোতীয়ে *(দ্বিতীয়ত)* পরণাম করি এই সির্‌জন *(সৃজন)* যাহার॥
তিরতীয়ে *(তৃতীয়ত)* পরণাম করি ভালা নুরনবী।

৭. Bhattacharyya, "Tiger-Cult and Its Literature," 49-50.

৮. বাংলার কোন কোন এলাকায় এ ধরনের অন্তর্ভুক্তি আধুনিককাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১৯৫৬ সালে উল্লেখ করা হয় যে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের জঙ্গলে জেলেরা পানিতে জাল ফেলার আগে সকল ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বনের দেবী *বনবিবির* বিশেষ *পূজা* করে থাকে। এই লক্ষ্যে তারা খড় ও বাঁশ দিয়ে একটি ছোট কুঁড়েঘর বানায়, তাতে বাঘের উপর উপবিষ্ট বনবিবির মাটি দিয়ে তৈরি মূর্তি স্থাপন করে। তার ডান পাশে থাকা দক্ষিণ রায়ের মূর্তির পাশে একজন শক্তিশালী, মজবুত গড়নের লোককে তলোয়ার হাতে দেখা যায়। তার পেছনে আজমল নামের শ্মশ্রুধারী একজন মুসলমান *ফকিরকে* দাঁড়ানো অবস্থায় এবং দক্ষিণ রায়ের সামনে একটি দেহ ও এক বালকের কাটা মাথা থাকতে দেখা যায়। যদিও ১৯৫৬ সালের বর্ণনাটির নামসমূহ ও কার্যাবলী সপ্তদশ শতকের কবিতাটি থেকে ভিন্ন, কিন্তু উভয় বর্ণনার উপাদানগুলো-এক ব্যাঘ্র দেবতা, একজন সৈনিক, ইসলামের সাথে সম্পর্কিত একটি অতিলৌকিক সত্তা–শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অব্যাহত ছিল, তারা একে অন্যের নিকট থেকে পৃথক থাকলেও একক ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বের অধীনে ছিল। H. L. Sarkar, "Note on the Worship of the Deity *Bon Bibi* in the Sundarbans," *Journal of the Asiatic Society of Bengal* 22, no. 2 (1956): 11-12.

৯. বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে মৌখিকভাবে প্রচারিত এ ধরনের লোকজ সাহিত্য সংগ্রহ ও প্রকাশকারী দীনেশচন্দ্র সেন এই বিশেষ পালাগানটি চতুর্দশ শতকের বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সংগ্রহকারীর এই পথপ্রদর্শক সৃষ্টিটির উপর পরিচালিত সাম্প্রতিক গবেষণায় উপসংহার টানা হয়, ডি. সি. সেন অবশ্যই দেশপ্রেমের চেতনায় প্রভাবান্বিত থাকায় পালাগানটিকে অতীতের খুব বেশি সময় আগের হিসেবে অভিহিত করেছেন।----- 'প্রাচীনকালের রেখাপাতের' অস্পষ্টতা কিংবা সামাজিক বৈশিষ্ট্য যা, যেভাবে পরিচিত, তা'ছাড়া আর কোন যুক্তি প্রদর্শন না করায় এসব ঘটনায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। সন্দেহ নেই, এসবে পুরাতন এবং এমনকি সুপ্রাচীন অংশও আছে, কিন্তু তারপরও গল্পগুলোর সার্বিক আচরণ, তাদের আদর্শ এবং মনস্তাত্ত্বিক বক্তব্য এগুলোকে অনেক বেশি সাম্প্রতিক সময়ের বলে মনে হচ্ছে।" Dusan Zbavitel, *Bengali Folk-Ballads from Mymensingh and the Problem of Their Authenticity* (Calcutta: University of Calcutta, 1963), 14.

কিতাব কোরাণ মানম্ *(মানবো)* পর্‌ভুর নিজ বাণী॥
যেই কালে আছিল *(ছিল)* পরম ধেয়ানে *(ধ্যানে)*।
নূর মহম্মদের রূপ দেখিল নয়ানে॥
দেখিতে দেখিতে রূপ ইত্ *(স্নেহ)* উপজিল।
মহব্বতের জন্য কামেল মহম্মদ সির্‌জিল॥
মহম্মদকে কইর্‌ল *(করলেন)* পয়দা রবিকুলের সাই।
তার শেষে কইরাছে পয়দা এই সব দুনিয়াই॥
যদি সে মহম্মদ নবী না হইত সিরজন।
না হইত আর্সকোর্স *(খোদার আসন)* এ তিন ভুবন॥
আবদুল্লা আমিনা মানম, মানি তানার পদ।
যার গর্ভে পয়দা হইল দুনিয়ার মহম্মদ॥
পচ্ছিমেতে *(পশ্চিমে)* মানি আমি মক্কা এ স্তান।
উর্‌দিশেতে মানি আমি মোমিন মোসলমান॥
তার পচ্ছিমে মানি আমি মদিন সহর।
সেই জাগাতে আছে আমার রছুলের কয়ব্বর (কবর)॥
রছুলের বেটী আলমকূটী *(পৃথিবীতে পূজনীয়া)* বিবি ফাতেমা।
সক্কলে ডাকিত মা, আলী-এ ডাইক্‌ত না॥
উত্তরেতে মানি আমি নিমন্ত কেদার।
যাহার হিমন্তে হিম সকল সংসার॥
পূর্বদিগে মানি আমি পুবের যাত্রা ভানু।
বিন্দাবনে মানব আমি রাধার শোভা কানু॥
দক্ষিণেতে মানি আমি ক্ষীর নদী সাইগর *(সাগর)*।
একূল ও কুল দুইকুল ভাইঙ্গ্যা মধ্যে বালুচর॥
চাইরদিকে মানি আমি চাইর নিকামান *(সুন্নি মুসলমানদের চার মাযহাব)*
হেটে মানি বসুমাতা উপরে আশমান॥
রাউন্যা গেরামে মানি মাতা ইছামতী।
নোয়াপাড়া গেরামে মানি বড়ো পীরের পাতি *(দরগা)*॥
ডাইন কুলে কুড়াল্যামুড়া বাঁকূলে ছির্‌মাই।
তার মধ্যদি চলি গেল্‌গৈ সত্যের কানাই॥
ছোডো ছোডো দলা-মারি *(ছোট ছোট টুকরা করে)* বাঁধাই আছে চর।
শঙ্খ নদী উডি বলে মোরে রৈক্ষা কর॥
এই সব মাইন্যা আমি সীতার ঘাটে যাই।
সীতসন্তী মাওরে মানি রঘুনাথ গোঁসাই॥[১০]

১০. Dinesh Chandra Sen, ed. and trans. *Estern Bengal Ballads*, 2: 283-84. The text is to be found in *Pracin Purba Banga Gitika*, ed. Ksitish Maulik

স্পষ্টতই, যে এলাকায় এই পালাটি গাওয়া হতো, এর মাধ্যমে সেখানকার ধর্মীয় সংস্কৃতিতে অতিলৌকিক সত্তার বিস্তৃত বর্ণালী দেখা যায়, নিকটস্থ পীর ও নদীগুলো থেকে শুরু করে দূরবর্তী হিমালয় এবং এমনকি ভারতীয় দর্শনের বিশালত্বও অনুধাবন করা যায়। সর্বোপরি বন্দনাটিতে ইসলামী অতিলৌকিক সত্তাসমূহ কত সহজে একটি পরিবর্তনশীল, সম্প্রসারণশীল সৃষ্টিতত্ত্বে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, তাই ফুটিয়ে তুলেছে। অধিকন্তু রায়-মঙ্গল কাব্যে কবি এসব সত্তাকে একটিকে আরেকটির সাথে মিশিয়ে দেননি, বরং সেগুলোকে পৃথক পৃথক পরিচিতিতে দেখিয়েছেন।

কাব্যটিতে দেশজ ও বহিরাগত উভয় ধর্মীয় আদর্শসমূহ অন্তর্ভুক্ত করেছে। একদিকে আমরা দেখি মা ইছামতী, বসুমাতা (মাতা হিসেবে পৃথিবী), সীতা ও রাধার মতো নারী সত্তায় পরিস্ফুটিত ঐশ্বরিক শক্তিতে বাঙালিদের অটল বিশ্বাস। এটাও তাৎপর্যপূর্ণ যে, এই বিশ্বাস ইসলামী ইতিহাসের প্রখ্যাত মহিলাদের পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে: বিশেষভাবে শ্রদ্ধার আসনে বসানো হয়েছে নবীজীর মা আমিনা, তাঁর কন্যা ফাতেমা, আলী ছাড়া যাকে সবাই 'মা' বলে ডাকে (প্রকৃতপক্ষে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পুণ্যবতী স্ত্রীদেরই সকলে 'মা' বলে ডাকে)। অন্যদিকে কাব্যে এটাও দেখানো হয়েছে, দ্বীপটিতে পুরোপুরি বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও ধারণাটি বাংলার পল্লীর ধর্মীয় পরিমণ্ডলে ঢুকে পড়েছে। আলোর (নূর) প্রতি গুরুত্বারোপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে আলোকের সম্পৃক্তকরণ এবং খোদার তাঁকেই দেখার ইচ্ছায় বিশ্বসৃষ্টি করা, সবই আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে মোগল সরকারি দলিল দস্তাবেজে পরীক্ষা করে দেখেছি-অর্থাৎ বাংলায় ইসলামী আদর্শ প্রচারে সিদ্ধান্তসূচক ভূমিকা পালনকারী অনেকে সূফী রূপক ধারণায় পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

এসব পালাগানে পূর্ববাংলায় প্রতিষ্ঠিত নতুন নতুন মসজিদ ও দরগার যে কথা বলা হয়েছে, তা ৮ম ও ৯ম অধ্যায়ে আলোচিত মোগল দলিলপত্রে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। মোগল *সনদে* যখন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠাকে মোগল আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে বাংলার পালাগানে পল্লীর মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে একই প্রক্রিয়াকে মূল্যায়ন করেছে। বর্তমানের মোমেনশাহি জেলায় ষোড়শ শতকের 'লীলা কন্যা-কবি কঙ্কা পালা'য় বর্ণিত কাহিনী বিবেচনা করা যায়। পালাটিতে বলা হয়েছে:

এমন সময়ে কিবা হইল শুন বিবরণ।
কইব সগল কথা শুন দিয়া মন॥
সাগ্‌রিদ লইয়্যা পঞ্চ পীর একজন॥
গোচারণ মাঠে আইস্যা দিল দরশন॥
বটগাছের তলাখানি চাঁছিয়া ছুলিয়া।
বাস করে পীর দরগা স্থাপন করিয়া॥

নামডাকি *(লোকপ্রসিদ্ধ)* পীর তার বড় হেক্‌মত *(ক্ষমতা)*।
ধূলা দিয়া ভাল করে রুগী আসে যত॥
অন্তরের কথা পীর না দেয় কইবারে।
আপুনি কইয়া যায় অতি সুবিস্তারে॥
মাটী দিয়া বানায় মেওয়া কিবা মন্ত্রবলে।
শিশুগণে ডাইক্যা তারার *(তাদের)* হস্তে দেয় তুইলে॥
অবাক হইল সবে দেইখ্যা কেরামত।
দরশন করিতে আইসে লোক শতে শত॥
যে যাই না *(যা কিছু)* মানত করে সিদ্ধি হয় তার।
হেকমত জাহির হইল দেশের মাঝার॥
চাউল কলা সিন্নি কত আইসে নিতি নিতি *(প্রত্যহ)*।
মোরগ ছাগল কইতর *(কবুতর)* নাই তার ইতি *(শেষ)*॥
সাগরেদে জবাই কইর‍্যা সিন্নি লাগায়
সিন্নির কণিকামাত্র পীর নাই সে খায়॥
গরিব দুঃখীরে সিন্নি বিলায় ডাকিয়া।
কিছুই না রাখে ফকির ভোগের লাগিয়া॥[১১]

যদিও জ্ঞাত কোন মোগল সনদে এই ব্যক্তি বা তার নির্মিত মসজিদ সম্পর্কে কোন কিছু পাওয়া যায় না, তবে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচিত অনেক পীর এবং মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত লোকদের মতো তিনিও সম্ভবত জঙ্গল পরিষ্কার, একটি ধান-চাষী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা এবং মসজিদ নির্মাণের জন্য মঞ্জুরীর আকারে সরকারি সহায়তা হিসেবে নিষ্কর ভূমি পেয়েছিলেন। অন্যান্য ঘটনার মতো এক্ষেত্রেও তার সম্মোহনী গুণাবলী ও কেরামত প্রদর্শনের শক্তির কারণে এই পালায় পীরকে আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মনে করা হতো। গ্রামবাসীরা সম্ভবত তার উপর মানুষের পৃথিবী এবং তার মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত অলৌকিক শক্তির মধ্যবর্তী লোকের মর্যাদা আরোপ করেছিল।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগের সর্বপ্রথম আদমশুমারিতে বাংলার এই অংশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রেক্ষাপটে ধরে নেওয়া যায়, এই সাধু পুরুষের মধ্যস্থতাকারীর মর্যাদা স্থানীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আনুগত্য অ-ইসলাম থেকে ইসলামে

(Calcutta: Mukherjee Publishers, 1972), 4: 310. (অনুবাদে শ্রী দীনেশচন্দ্র সেনের *মৈমনসিংহ গীতিকার* মূল গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে– অনুবাদক)

১১. Dinesh Chandra Sen, ed. and trans. *Eastern Bengal Ballads*, 1: 219-20. The text is to be found in *Pracin Purba Banga Gitika*, ed Ksitish Maulik, 3: 33. (অনুবাদের উদ্ধৃতিগুলো শ্রী দীনেশচন্দ্র সেনের *মৈমনসিংহ গীতিকার* বাংলা গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে– অনুবাদক)

রূপান্তরের কাজটি সহজতর করতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু এর মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে কি বোঝানো হয়েছে? ষোড়শ শতকের মোমেনশাহিতে 'ইসলাম' ও 'অ-ইসলামের' মধ্যকার পার্থক্যকে কারো পক্ষেই বিংশ শতকের শেষভাগের মতো একই ধরনের মনে করা সম্ভব নয়। বাস্তবিকই, ইসলামকে সুনির্দিষ্ট ও দৃঢ় কাঠামোর মধ্যকার বদ্ধ ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিতকরণের ধারণাটি ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের সংস্কার আন্দোলনগুলোর ফল, অন্যদিকে প্রাক-আধুনিক সময়ে পল্লী বাংলায় 'অ-ইসলাম' ও 'ইসলামের' মধ্যে পার্থক্যকারী সীমারেখাকে সহজে ভেদ্য, হালকা ও স্থানান্তরযোগ্য বলে মনে হতো। বস্তুত, সে ধরনের কোন সীমারেখা আদতে হয়তো ছিলই না। উল্লিখিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার মতো সপ্তদশ শতকের জনপ্রিয় সাহিত্য দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাবলী সমাধানে সহায়তা করতে সক্ষম লৌকিক ও অতিলৌকিক যে কোন সত্তাকে গ্রহণ করার মতো উল্লেখযোগ্য মাত্রায় স্বাধীনতা ভোগকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবর্তিত হয়েছিল।

এক্ষেত্রে আমরা আধুনিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণার অন্তর্দৃষ্টি থেকে উপকৃত হতে পারি। আধুনিক নাইজেরিয়ার ইয়োরোবা লোকদের মধ্যে ধর্মীয় পরিবর্তন সম্পর্কে নৃতত্ত্ববিদ জে. ডি. ওয়াই. পিল লিখেন, 'সুসংহত ধর্ম একটি পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়, যার কার্যকারিতা ব্যক্তি নিজেই বিবেচনা করে থাকে, অপেক্ষাকৃত প্রস্তুত ব্যক্তিটি প্রতিশ্রুতিশীল অন্যান্য পদ্ধতিও বের করতে সচেষ্ট হয়। শুধুমাত্র সরলতার কারণে সে কোন একটি পদ্ধতির উপর পুরোপুরি নির্ভর করবে না বা অন্যান্য পদ্ধতিতে অগ্রাধিকার দেবে না।'[১২] একইভাবে মেলফোর্ড স্পিরো সেন্ট্রাল ক্যারোলিনেসের (পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায়) ইফালাক জনগোষ্ঠীর অতিলৌকিক শক্তির প্রতি ভয়াবহ গোঁড়ামির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেন, "আমি একদল ইফালাক লোককে রোগ নিরাময় অনুষ্ঠানে যে অতিলৌকিক শক্তির রোগ নিরাময়ে সাহায্য কামনা করা হয় তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা জবাব দিল, 'সে শক্তিশালী কিনা, আমরা জানি না, হতে পারে, নাও হতে পারে। না হলে আমরা তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেব।' (অর্থাৎ আমরা আর তার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবো না।"[১৩] ১৯৫০ এর দশকে ইগোর কপিটফ বেলজীয় কঙ্গোর (বর্তমান জায়ারে বা ডি আর কঙ্গো) সুকু জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাসের গোঁড়ামির ব্যাপারে মন্তব্য করেন। তিনি লিখেন,

সুকু সংস্কৃতিতে বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে যে, দুর্ভাগ্য সৃষ্টির সংস্কৃতি-প্রদত্ত সমস্যার সমাধান করতে কোথাও না কোথাও, কোন না কোনভাবে অন্যান্য পদ্ধতি বিরাজ করছে-সেসব পদ্ধতি অন্যদের কাছে হয়তো আগে থেকেই জানা বা এখনো

১২. J.D.Y. Peel, "Syncretism and Religious Change," *Comparative Studies in Society and History* 10 (1967-68): 124-25.

১৩. Melford Spiro, "Religion and the Irrational," in *Symposium on New Approaches to the Study of Religion*, ed June Helms (Seattle: American Ethnological Society, 1964), 110.

অনাবিষ্কৃত। এই সহায়ক কর্মপন্থা গ্রহণের ধারণাটি কোন প্রযুক্তির বারবার উদ্ভাবন ও পরীক্ষার নতুন পন্থার প্রায় অনুরূপ। ----পুরাতন ওষুধের দর্শনীয় ব্যাপক উপস্থিতির মানে এটা নয় যে নতুন বৃহত্তর কার্যকারিতার গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে অবিশ্বাস, একইভাবে ডিজেল ইঞ্জিনের গ্রহণ মানে এই নয়, বাষ্পীয় শক্তির নীতিমালা প্রত্যাখ্যান। কোন আবিষ্কার ব্যর্থ বলে প্রতীয়মান হয়, তখন পুরাতনের প্রমাণিত প্রযুক্তির কাছে ফিরে যাওয়াটা একটা যৌক্তিক পদক্ষেপ।[১৪]

বাংলায় ধর্মীয় পরিবর্তনের পর্যায়ে বৈশিষ্ট্যসূচক ধর্মীয় অনুভূতিতে ঠিক এই প্রায়োগিক মনোভাবকেই আমি বলেছি অন্তর্ভুক্তিকরণ।

সংক্ষেপে, এখানকার মানুষের কোন উপাদানের যুক্ত হওয়া মানে অন্য উপাদানের বাদ পড়া সংক্রান্ত শূন্য-যোগ-খেলা সৃষ্টিতত্ত্বের পুরোপুরি বিপরীত বিশ্বদর্শনের অধিকারী ছিল বলে ধারণা করা হয়। বাঙালি সম্প্রদায়গুলো যখন তাদের পল্লী ব্যবস্থায় আমরা যাকে 'ইসলামী' বলি সেই পদ্ধতিতে বা বিশ্বাসে একীভূত হতে শুরু করে, তারা এগুলোকে সেই ব্যবস্থায় আগে থেকে বিদ্যমান অন্যান্য পদ্ধতি বা বিশ্বাসের প্রতি চ্যালেঞ্জ মনে করেনি, পুরোপুরি পরিত্যাগ করা অনেক পরের ব্যাপার। ষোড়শ শতকের মোমেনশাহির পল্লীতে যে সাধুপুরুষটির আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, তখন স্থানীয়ভাবে ধারণা করা হয়েছিল, তিনি নতুন কিছু নিয়ে এসেছেন, গ্রামবাসীরা ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করেনি এমন কোন নতুন অতিলৌকিক শক্তিতে তার গম্যতা রয়েছে। প্রত্যেকে তার অতিপ্রাকৃত দক্ষতা এবং রোগ নিরাময়ে ও অন্যদের মনের খবর পড়তে তার সামর্থ্যে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু তার আবির্ভাবে অন্যান্য বিশ্বাসের-চণ্ডি বা মনসাদেবী, কৃষ্ণ দেবতা বা ব্যাঘ্র দেবতার তথা-অতিলৌকিক শক্তির আয়ত্তে আনতে সক্ষম হিসেবে বিবেচিত উপরোক্তদের প্রতি বিরাজমান আনুগত্য পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়নি। সেই সাধুপুরুষটিও গ্রামে এসে মহা আড়ম্বরে ঘোষণা করেননি যে, একটি নতুন যুগের সূচনা হলো বা নতুন বিশ্বের আত্মপ্রকাশ ঘটলো। সুকুদের সম্পর্কে কপিটফ যা লিখেছেন, 'নতুন বিশ্বের প্রতিশ্রুতির বদলে আমরা বরং সেই পুরাতন বিশ্বকে মোকাবেলার নতুন জনপ্রিয় কৌশলের আবিষ্কার দেখি।'[১৫] পুরাতন সমস্যাবলী সমাধানের নতুন 'জনপ্রিয় কৌশল' গ্রহণের এই উন্মুখতা, পরবর্তী প্রজন্মগুলোকে যাকে 'ধর্মান্তরকরণ' বলেছে, এটা পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় রূপান্তরের অবস্থা না হলেও এই পথই ছিল সেদিকে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

চিহ্নিতকরণ

একটি সম্প্রসারণশীল, একর্ডিয়ন সদৃশ (accordionlike) সৃষ্টিতত্ত্বে স্থানীয় অতিলৌকিক সত্তাসমূহের সাথে ইসলামী সত্তার স্রেফ অন্তর্ভুক্তির বিশ্লেষণাত্মক বৈশিষ্ট্য

---

১৪. Igor Kopytoff, "Classifications of Religious Movements: Analytical and Synthetic," (Seattle: American Ethnological Society, 1964), 78-79.
১৫. Ibid., 80.

ছিল অতিলৌকিক সত্তাসমূহকে একটির সাথে অন্যটির পরিচিত করানোর প্রক্রিয়া। এর একটি উৎকৃষ্ট নমুনা হলো গুজরাটের উপকূলীয় শহর বেরাভালে ত্রয়োদশ শতকের একটি মসজিদে আরবি ও সংস্কৃত দুই ভাষার লিপি। ১২৬৪ সালের তারিখ সম্বলিত লিপিটিতে বলা হয়, হরমুজের ইরানি বণিক নূরউদ্দিন ফিরোজ মসজিদটি নির্মাণের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আরবি ভাষ্যে মসজিদটিতে যার উপাসনা করা হয়, তাকে আল্লাহ হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং নূরউদ্দিনকে বলা হয়, 'সমুদ্র-মানবদের সুলতান, বণিকদের সুলতানদের সুলতান,' এবং 'ইসলাম ও মুসলমানদের সূর্য'। অন্যদিকে একই লিপির সাংস্কৃতিক ভাষ্যে সর্বোচ্চ দেবতাকে অভিহিত করা হয় বিশ্বনাথ ('বিশ্বের প্রভু'), শূন্যরূপ ('নিরাকার'), ও বিশ্বরূপ ('নানা রূপের') হিসেবে। অধিকন্তু, এতে বলা হয়, মসজিদটি নির্মাণের বছর 'বিশ্বনাথের পূজারী নৌচালকদের (নাবিক) শিক্ষক (বোধক) রাসূল মুহাম্মদের ৬৬২' সাল। অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষ্যে মসজিদটির উপাস্য দেবতা হিসেবে বিশ্বনাথ এবং ইসলামের নবীকে বোধক-তথা 'শিক্ষক', 'প্রবীণ' বা 'জ্ঞানী মানুষ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে মসজিদটির নির্মাতা নূরউদ্দিন ফিরোজকে ধর্ম-বন্ধু বা 'ধর্মের সমর্থক' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে-অর্থাৎ সৃষ্টিতত্ত্ব/ সামাজিক ব্যবস্থাকে চিরায়ত ভারতীয় চিন্তাধারায় অনুধাবন করা হয়েছে।[১৬] সুতরাং আরবি ভাষ্যে মুসলমান পৃষ্ঠপোষকের বিশ্বদর্শন উপস্থাপন করা হয়েছে আর সাংস্কৃতিক ভাষ্যে কাছাকাছি অবস্থানরত ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে তাদের বোধগম্য ভাষায় ইসলামের খোদাকে বিশ্বনাথ, ইসলামের নবীকে একজন ভারতীয় বোধক এবং এই নির্দিষ্ট মসজিদটির পৃষ্ঠপোষককে 'ধর্ম-বন্ধু'হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংক্ষেপে, স্থানীয় গুজরাটি মানুষ আল্লাহকে নিবেদন করে প্রতিষ্ঠিত একটি স্থাপনাকে দেখেছে বিশ্বনাথের জন্য কারো নিবেদন হিসেবে।

ষোড়শ শতক থেকে বাংলা সাহিত্যে রোমান্স, মহাকাব্য, উপাখ্যান ও ভক্তিমূলক কবিতায়-আমরা একই ধরনের শনাক্তকরণ দেখতে পাই।[১৭] ষোড়শ শতকের কবি হাজি মুহাম্মদ আরবিতে বলা আল্লাহকে গোঁসাই (সংস্কৃত 'প্রভু')[১৮], সৈয়দ মর্তুজা

১৬. D.C. Sircar, "Veraval Inscription of Chaulukya-Vaghela Arujuna, 1264 AD." *Epigraphia Indica* 24 (1961-62): 141, 150.

১৭. ত্রয়োদশ শতক থেকে বাংলায় তুর্কী মুসলমানরা বেরাভাল মসজিদের মতো আরবী উৎসর্গ খোদাইলিপি সম্বলিত অনেক মসজিদ নির্মাণ করেছে। যদিও দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এখন পর্যন্ত একটি মসজিদেও সংস্কৃতি বা বাংলা লিপি পাওয়া যায়নি, যার মাধ্যমে আমরা সেখানকার মসজিদ ও তাতে যার উপাসনা করা হয়, তার সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি। শুধুমাত্র প্রাক-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমেই আমরা বেরাভাল দ্বিভাষিক খোদাইলিপিতে ফুটিয়ে তোলা চিহ্নিতকরণের বিষয়টি দেখতে পাই।

১৮. Haji Muhammad, *Nur Jamal* (Dhaka University Library MS. No. 374, sl. 260), fol. 6 mc. Cited in Asim Roy, "Islam in the Environment

মহানবীর মেয়ে ফাতিমাকে জগৎ-জননী (সংস্কৃত 'বিশ্বের মাতা')[১৯] এবং সৈয়দ সুলতান আদম, ইব্রাহিম ও মূসার খোদাকে প্রভু (সংস্কৃত) কিংবা বারবার নিরঞ্জন (সংস্কৃত যার কোন রং নেই অর্থাৎ আকারবিহীন)[২০] হিসেবে শনাক্ত করেছেন। পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতকের কবি আলী রাজা আল্লাহকে নিরঞ্জন, ঈশ্বর, জগদীশ্বর ও করতার হিসেবে অভিহিত করেছেন।[২১] এমনকি পূর্ব সীমান্তে বনজ পথপ্রদর্শকরা যখন ইসলামী ধর্মাচারের প্রতিষ্ঠানিকীকরণের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন, তখন বাঙালি কবিরা এসব ধর্মাচারের গভীরতর ব্যঞ্জনা খুঁজে লোকবিদ্যা এবং এমনকি মূলত বিদেশী বিশ্বাসের অতিলৌকিক সত্তাকে স্থানীয় সংস্কৃতিতে বিদ্যমান সে ধরনের সত্তার মাধ্যমে চিহ্নিত করেছেন।

পারসো-ইসলামী রোমান্টিক সাহিত্যে বাংলা ভাষায় স্রেফ অনুবাদ না করে এসব কবি আরো অগ্রসর হয়ে পারসো-ইসলামী সভ্যতার পুরো ব্যাপ্তিকেই বাঙালি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নিয়ে আসার প্রয়াস চালিয়েছেন।[২২] এসবের মধ্যে রয়েছেপারসো-ইসলামী নান্দনিকতা এবং সাহিত্যের সংবেদনশীলতা, সেই সাথে ধর্মশাস্ত্র ও অতিলৌকিক সত্তা। তাই নীল নদকে চিহ্নিত করা হয়েছে গঙ্গা নদী হিসেবে, বাইবেলের মিসরের পটভূমিতে রচিত কোন গল্পকে বাঘ আর হাতিতে পরিপূর্ণ অন্ধকার জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এসব গল্পের গ্রামগুলোতে দেখা যায় প্রচুর কলা ও আমগাছ, ময়ূর ও কথা বলতে পারা তোতা পাখি; মানুষ মাছ, ভাত, ঘি আর মিষ্টি দৈ খায়, পান চিবায়;

---

of Medieval Bengal" (PhD. diss., Australian National University, 1970), 194.

১৯. Saiyid Murtaza, *Yoga-Qalandar* (Dhaka University Library MS. No. 547, sl. 394), fol. la. Cited in Asim Roy, "Islam in the Environment," 299.

২০. Saiyid Sultan, *Nabi-Bamsa*, ed. Ahmed Sharif (Dhaka: Bangla Academy, 1978), 1: 1ff. অনুবাদে আহমদ শরীফ সম্পাদিত *নবী-বংশের* বাংলা সংকলন ব্যবহার করা হয়েছে– অনুবাদক)।

২১. Ali Raja, *Jnana-Sagara* (Dhaka University Library MS. No. 146b, sl. 9), fols. 109, 215, 216, Cited in Asim Roy, "Islam in the Environment," 299.

২২. শিক্ষিত সমাজের এসব সদস্য প্রকৃতপক্ষে পারস্যকরণের দীর্ঘ ঐতিহ্য বিনির্মাণ করেছেন। ত্রয়োদশ শতকের শুরু থেকেই পারস্য মনোভাবাপন্ন তুর্কী ও বাঙালিদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংযোগের পরিণতিতে অনেক ফারসি শব্দ ও বাকধারা বাংলা ভাষায় মিশে গেছে। এসব শব্দ এতোটাই স্থানীয় হয়ে পড়েছে যে বর্তমানকালের বাঙালিরা সেগুলোর বিদেশী উৎসের ব্যাপারে সচেতন নয়। ১৯৬৬ সালে শেখ গোলাম মাকসুদ হিলালি ফারসি উৎসের নয় সহস্রাধিক বাংলা শব্দ ও অভিব্যক্তির একটি অভিধান প্রকাশ করেন। দেখুন Shaikh Ghulam Maqsud Hilali, *Perso-Arabic Elements in Bengali*, ed. Muhammad Enamul Haq (Dacca: Central Board for Development of Bengali, 1967).

মহিলারা চন্দনের প্রলেপ দেয় আর সিল্কের শাড়ি, কাচ ও সোনার চুড়ি দিয়ে সাজে। প্রত্যেকেই নতুন ধান ক্ষেতের মিষ্টি ঘ্রাণ অনুভব করে।[২৩]

কবিদের এ ধরনের সাহিত্যিক *সঞ্চারণের* কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। স্বকীয় সামাজিক ব্যবস্থার ব্রাহ্মণ্য ধারণা এবং তার সমর্থিত আদর্শগত কাঠামো আগে থেকেই কোন-না-কোনভাবে প্রকাশিত হওয়ায় ধান সীমান্তের পূর্ববঙ্গের পল্লীর জনসাধারণ হিন্দু মহাকাব্যগুলোর সাথে পরিচিত ছিল। ষোড়শ শতকের একজন কবি বলেছেন, 'হিন্দু মুসলমান সব বাড়িতেই' ভারতের ক্লাসিক মহাকাব্য *মহাভারত* পঠিত হয়। একই শতাব্দীর আরেক কবি লিখেন, '*রামায়ণ* মহাকাব্যে রামের তার প্রিয়তমা পত্নী সীতাকে হারানোর কাহিনী শুনে কেঁদে ফেলে।[২৪] বৈষ্ণবদের প্রতি এ ধরনের সহানুভূতি ছাড়াও এই সময়ের মানুষ *মঙ্গল-কাব্য* সাহিত্যে মনসা ও চণ্ডির মতো বাঙালির লোকজ দেব-দেবীর গৌরবময় কীর্তি, শক্তি ও দয়ার উচ্চকিত প্রশংসায় পরিব্যাপ্ত ছিল। তাই ইসলামী ঐতিহ্যের রোমান্টিক কাহিনীগুলোকে ধর্মীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধ দেশীয় ভিত্তিতে টেনে আনাটা মোটেই বিস্ময়কর নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইউসুফ ও জুলেখার জনপ্রিয় ইরানি গল্পকে অষ্টাদশ শতকের একটি বাঙালি সংস্করণে সুস্পষ্টভাবে বাঙালি বৈষ্ণব ভক্তিবাদ আন্দোলনের মূল প্রতিপাদ্য কৃষ্ণের প্রতি রাধার ভালবাসা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। বাইবেলে ইউসুফের (যোশেফ) বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এভাবে,

> তোমার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো, আর তোমার চোখ ভ্রমর কালো। তোমার ভ্রু কামের (হিন্দু ভালবাসার দেবতা) ধনুকের মতো এবং তোমার কান সরোবরের পদ্মের মতো। তোমার কোমর শিকারী বাঘিনীর মতো সরু। তোমার হাঁটা পাখির মতো হালকা, যা দেখে জ্ঞানীরা বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। তোমার দেহ মুক্তার মালার মতো। তাই কোন রমণীই তোমার মোলাকাত থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারে না।[২৫]

একইভাবে, ষোড়শ শতকের চট্টগ্রাম অঞ্চলের মহাকবি সূফী সৈয়দ সুলতান হাওয়া বিবিকে বাঙালি সৌন্দর্যে সাজিয়ে তুলতে কার্পণ্য করেননি। তিনি (হাওয়া) চন্দন লেপন করেন, চুলে মতি আর ফুলের মোহন খোপা বাধেন। চোখে কাজল দেন, কণ্ঠে দেন গজমতি হার। তার কপালের সিঁদুরের সৌন্দর্যে আদম বিস্মিত হলো কারণ এটাকে তার মনে হয়েছে, 'আকাশেত দিবাকর ভ্রমে প্রতিনিত'।[২৬]

২৩. See Mannan, *Emergence and Development*, 86-102; Roy, "Islam in the Environment," 315-21.

২৫. Mannan, *Emergence and Development*, 99. Mannan's Translation.

২৪. Asim Roy, "The Social Factors in the Making of Bengali Islam," *South Asia* 3 (August 1973): 29.

২৬. Saiyid Sultan, *Nabi-Bamsa*, (অনুবাদে আহমদ শরীফ সম্পাদিত *নবী-বংশের* বাংলা সংকলন ব্যবহার করা হয়েছে– অনুবাদক)।

এসব সাহিত্যের বাঙালি মুসলমান লেখকরা সচেতনভাবে ইসলামী চিত্রকল্প ও ধারণাকে লোকজ বাঙালি ও হিন্দু ধর্মীয় ধারণায় সিক্ত পল্লীর ন্যূনতম মুসলমান জনসাধারণের কাছে পুরোপুরি পরিচিত পরিভাষায় উপস্থাপন করেছেন।[২৭] অবশ্য এই কাজ করতে গিয়ে তাঁরা তীব্র মনোঃকষ্ট পেয়েছেন। যদিও তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন ইসলামী ধারণা প্রচারের জন্য যথাযথ সাহিত্যিক বাহন হচ্ছে আরবি, কিন্তু তাঁদের বাঙালি শ্রোতাদের তা বোধগম্য না হওয়ায় সেই ভাষা তাঁরা ব্যবহার করতে পারছিলেন না। এই উভয় সংকট প্রসঙ্গে সপ্তদশ শতকের কবি আবদুন নবী লিখেন, বাংলায় ইসলামী গ্রন্থ লিখতে গিয়ে তার মনে আল্লাহর শাস্তির ভয় প্রবেশ করেছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি সেই ভয় দূর করে এই কাজে অগ্রসর হয়েছেন।[২৮] সৈয়দ সুলতানের মনের মধ্যেও একই সুর দেখা যায়। তিনি লিখেন,

খোদা রসুলের কথা কেহ না সোভরে।
গ্রহশত বসযুগে অন্দ গোঞাইল
দেশীভাসে এহি কথা কেহ না কহিল।
দুঃখ ভাবি মনে মনে করিলুম ঠিক
রসুলের কথা যত কহিমু অধিক
কর্মদোষে বঙ্গেত বাঙালী উৎপন
না বুঝে বাঙ্গালী সবে আরবী বচন।
তাই আপনা দীনের বোল এক না বুঝিল।[২৯]

বাঙালি সংস্কৃতি এবং ইসলামের 'বৈদেশিকতার' উপলব্ধির মধ্যকার টানা-পোড়েনের এ ধরনের প্রকাশ পল্লী অভিজ্ঞতায় বহিরাগতদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যসূচকভাবে বিরাজমান ছিল-তারা বাংলার প্রাক-আধুনিক মুসলমান শিক্ষিত শ্রেণীর সদস্য হন বা বাংলার ভ্রমণকারী ইউরোপীয়ান বা আধুনিককালের পর্যবেক্ষক যাই হোন না কেন।

---

২৭. আমরা যেমনটি ৫ম অধ্যায়ে দেখি, অ-বাঙালি সূত্রগুলো সৈয়দ সুলতানের আমলে কবির এলাকায় পল্লী মুসলমান সম্প্রদায়ের উত্থানের কথা বলছে। ১৫৬৭ সালে সিজার ফেডেরিসি সন্দ্বীপে মুসলমানদের বসবাস দেখতে পান, এই বিশাল দ্বীপটি প্রকৃতপক্ষে চট্টগ্রাম জেলার উত্তরাংশ সীতাকুণ্ড থেকে দেখা যেত, যেখানে সৈয়দ সুলতান বাস করতেন এবং উল্লিখিত তারিখের প্রায় ২০ বছর পর রচনায় মশগুল হয়েছিলেন।

২৮. Abd al-Nabi, *Vijay-Hamza*, quoted in Muhammad Enamul Huq, *Muslim Bangla Sahitya*, 2d ed. (Dacca: Pakistan Publications, 1965), 214-15. Translated by Rafiuddin Ahmed, "Conflict and Contradictions in Bengali Islam: Problems of Change and Adjustment," in *Shariat and Ambiguity in South Asian Islam*, ed. Katherine p. Ewing (Berkley and Los Angeles: University of California Press, 1988), 122.

২৯. উদ্ধৃতি, আহমদ শরীফ, *সৈয়দ সুলতান: তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭২), ২০৩.

কিন্তু পল্লীর জনসাধারণের মধ্যে এ ধরনের টানা-পোড়েনের সমস্যার সৃষ্টি হয়নি কিংবা তারা হয়তো তা লক্ষ্যই করেনি। তাদের কাছে দেশজ কিছুর সাথে বৈদেশিক কিছুর চিহ্নিতকরণ–অর্থাৎ বাংলার সাথে আরবির–বিস্তৃত সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফল, যার পরিণতিতে আল্লাহ এবং তার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন অতিলৌকিক সত্তা ধীরে ধীরে স্থানীয় সৃষ্টিতত্ত্বে মিশে গিয়েছিল। আধুনিক পশ্চিম আফ্রিকা সম্পর্কে নৃতত্ত্ববিদ জ্যাক গুডি যা বলেছেন, তা একইভাবে বাংলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য: 'আমি পশ্চিম আফ্রিকায় এমন কোন সমাজের কথা জানি না, যারা তাদের নিজস্ব শ্রেয়তর খোদাকে (High God) মুসলমানদের আল্লাহ এবং খ্রিস্টানদের জেহোভার সাথে চিহ্নিতকরণ করেনি। প্রক্রিয়াটি ধর্মান্তর ছিল না, বরং ছিল চিহ্নিতকরণ। আসলে তা ছিল অন্যত্রকে এখানে আনার জন্য পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।'[৩০] এটার একটা চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় পৌত্তলিক গ্রীকদের মধ্যে খ্রিস্টধর্মের প্রাচীনতম প্রচারে। প্রথম খ্রিস্টীয় শতকে এথেন্সের কাউন্সিলে বক্তৃতা করার সময়ে পোপ পল ঘোষণা করেন:

এথেন্সের মানুষেরা, আমি নিজে থেকেই জানি ধর্মীয় সকল ব্যাপারে আপনারা কত ভীষণ রকমের খুঁতখুঁতে, কারণ আপনাদের পবিত্র পর্বতমালা সপ্রশংসভাবে ধীরে ধীরে প্রদক্ষিণ করার সময় আমি অবহিত হয়েছি যে, আপনাদের একটি ভিন্ন লেখা আছে; এক অজ্ঞাত ঈশ্বর। সত্যিকার অর্থে আমি যে ঈশ্বরের কথা ঘোষণা করছি বাস্তবে আপনারা তা না জেনেই তার উপাসনা করছেন।[৩১]

এথেন্সের দেবমণ্ডলীকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যানের বদলে পল গ্রীকদের তাদের শুধুমাত্র তাদের ধর্মীয় অস্বস্তির প্রশংসাই করেননি বরং স্থানীয় দেবতাদের মধ্যেই খ্রিস্টানত্ব চিহ্নিত করেছেনএবং পরিণতিতে 'পুরাতন' থেকে 'নতুন' রূপান্তর ছিল সম্ভব এবং গ্রহণযোগ্য।[৩২]

প্রাক-আধুনিক বাংলায় কিংবদন্তির সাধুপুরুষ সত্য পীরের ধর্মমতের ইতিহাসে চিহ্নিতকরণের নজির দেখা যায়। এই ধর্মমত সম্পর্কিত শতাধিক গ্রন্থের খোঁজ পাওয়া গেছে, যার অধিকাংশই অষ্টাদশ শতকের পর থেকে এবং প্রাচীনতমটি ছিল ষোড়শ শতকের।[৩৩] তাই এই ধর্মমত সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে পূর্ব বাংলার পল্লী এলাকা

---

৩০. Jack Goody, "Religion, Social Change, and the Sociology of Conversion," in Changing Social Structure in Ghana, ed. Goody (London: International African Instute, 1975), 103.

৩১. Acts 17: 22-23.

৩২. "দি লু দাগা" (The Lo Dagaa) (পশ্চিম আফ্রিকার জনগণ) প্রথমে খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণকে ধর্মান্তর হিসেবে বিবেচনা করেনি, কারণ নতুন ধর্মমতটির প্রবর্তন অন্যান্য দেবতার স্থানচ্যুতির সাথে সম্পর্কিত ছিল না। Jack Goody, "Religion, Social Change, and the Sociology of Conversion," 103.

জুড়ে বিস্তৃত ক্ষুদ্রাকৃতির খড়ের মসজিদ ও দরগাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা কৃষিজ সম্প্রদায়গুলোর বিকাশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সত্য পীরের প্রশংসায় রচিত প্রাথমিক সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক সীমানার ব্যাপারে কঠোরতামুক্ত এবং বাংলার প্রাক-আধুনিক ধর্মীয় পরিবেশে 'ছড়িয়ে' থাকা বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বাস ও রীতিনীতির সাথে অবাধে মিশে যেতে পারে এমন একটি লোকজ সমাজের চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। ধর্মমতটিকে নিবেদন করা ১৬৬৪ সালে কবি শংকরাচার্য রচিত গ্রন্থে সত্য পীরকে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের নাতি (এক কন্যার পুত্র), সেই সুবাদে মুসলমান হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। কৃষ্ণহরি দাস রচিত অপর সংস্করণে আল্লাহ'র বন্দনা এবং নবীদের কাহিনী দিয়ে শুরু হয়েছে। কিন্তু একই গ্রন্থে সত্য পীরকে দেবি চাঁদবিবির অবতার হিসেবে কলিযুগে মানুষের সকল দুর্ভোগ থেকে রক্ষার জন্য পৃথিবীতে এসেছেন বলে বলা হয়েছে। অন্যান্য গ্রন্থে সত্য পীরকে স্পষ্টভাবে সত্য নারায়ণ হিসেবে চিহ্নিত করার ফলে তাকে ব্রাহ্মণ্য দেবতা বিষ্ণুর অবতার হিসেবে মনে করা হয়।[৩৪]

অনেক বিশেষজ্ঞ সত্য পীরের ধর্মমত এবং সেই সাথে সাধারণভাবে বাঙালি লোকজ ধর্মকে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে সমঝোতা হিসেবে বিবেচনা করেন।[৩৫] কিন্তু এ ধরনের চিন্তা স্রেফ প্রাক-আধুনিককালের ধর্ম সম্পর্কে ঔপনিবেশিক ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে গঠিত অতিবিস্তৃত ধারণাকে সমর্থন করে এবং স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেওয়া হয় বাংলায় 'হিন্দু' ও 'ইসলাম' এই দুটি ভিন্ন ধর্মের তথা দুটি পৃথক ও আত্মনিয়ন্ত্রিত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব কম-বেশি অনন্তকাল ধরে বিদ্যমান ছিল। এই উপলব্ধির উপর গুরুত্বারোপ ছিল ঔপনিবেশিক বাঙালি সমাজের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মেরুকরণকে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদসহ রাজনৈতিকভাবে সচেতন গ্রুপগুলোর কাছে পৌঁছে দেওয়া। আর এটা ছিল সেই সময়ে যখন মুসলমানরা সত্য পীরের উপাসনা ছেড়ে দিয়েছে এবং সত্য নারায়ণ শুধুমাত্র হিন্দুদের দ্বারা পূজিত পুরোপুরি

---

৩৩. ১৯৯০ সালের জুলাই মাসে টনি কে, স্টুয়ার্টের সাথে যোগাযোগ। যদিও সত্যপীরের ধর্মমতের পর্যালোচনাটি ছিল সূচনার মতোই, কিন্তু তবুও স্টুয়ার্ট সত্যপীর সাহিত্যের অনুবাদের নমুনারাজি ও সময়ের পরিক্রমায় ধর্মমতটির বিবর্তন নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছেন।

৩৪. Dinesh Chandra Sen, *The Folk Literature of Bengal* (1920; reprint, Delhi: B.R. Publishing Corporation, 1985),99-102.

৩৫. আধুনিক লোকাচারবেত্তা ডি.সি সেন সত্যপীর ধর্মমতকে "হিন্দু ও মুসলমান" উভয়ের সংমিশ্রণে সৃষ্ট সঙ্কর ধর্মমত হিসেবে ব্যাখ্য করেছেন। তিনি লিখেন, "যখন দুটি সম্প্রদায় এতো ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গেল এবং তারা একে অন্যের মাধ্যমে এতো প্রভাবান্বিত হয়ে পড়লো যে তার পরিণামে একটি একক দেবতার সৃষ্টি হলো যাকে হিন্দু ও মুসলমান সবাই উপাসনা করতে লাগলো। তার নামটি আরবী শব্দের সাথে সংস্কৃত শব্দের মিলেমিশে গঠিত হলো। তাকে বলা হলো সত্যপীর।" Dinesh Chandra Sen, *History of Bengali Language and Literature* (Calcutta: University of Calcutta, 1954), 677.

হিন্দু দেবতা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেছে।[৩৬] বাস্তবে এ ধরনের মেরুকরণকৃত ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো যদিও এমন এক সময়ে বিবর্তিত হয়েছিল যখন লোকজ পর্যায়ে ধর্মীয় পরিচিতি ছিল অনেক কম আত্মসচেতন এবং ধর্মীয় পদ্ধতিসমূহ ছিল আধুনিককালের চেয়ে অনেক বেশি উন্মুক্ত।

অবশ্য, ঔপনিবেশিক সময়ে বা তারপর থেকেই মানুষ কেবল প্রাক-আধুনিক বাঙালি ধর্মীয় সংস্কৃতির মেরুকরণকৃত ভাবমূর্তি গ্রহণ করেছে, তা নয়। এমনকি সমসাময়িক ইউরোপীয়ানরা বাঙালি সমাজকে দুরঙের চশমা দিয়ে দেখেছে। ফরাসি পর্যটক ফ্রানকোইস পাইরার্ড ১৬০৭ সালের দিকে লিখেন, 'মুসলমান ও পৌত্তলিক সবাই (গঙ্গার) পানিকে পবিত্র বিবেচনা করে এর দ্বারা সব পাপ ধুয়ে যায় বলে মনে করে, ঠিক যেমন আমরা (পাদরি বা ধর্মগুরুর কাছে) স্বীকারোক্তিকে (কনফেশন) মনে করি।'[৩৭]

লেখক এখানে নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক চেতনায় পরিপুষ্ট বিংশ শতকের বাংলার কথা বলেননি বরং সপ্তদশ শতকে নিজস্ব সাম্প্রদায়িক চেতনায় পরিপুষ্ট ক্যাথলিক ইউরোপের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। নিকটস্থ আরব ইসলামের সাথে ফ্রান্সের সংঘাতের দীর্ঘ ইতিহাসের বিষয়টি বিবেচনায় এনে একজন 'মুসলমানের' বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পাইরার্ড পূর্ব থেকেই জ্ঞাত ছিলেন এবং সেই ধারণায় গঙ্গা নদীর পবিত্রতার বিষয়টি নিশ্চিতভাবেই অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বদ্বীপীয় সমাজকে পুরোপুরি পারস্পরিক স্বতন্ত্র দুটি সামাজিক-ধর্মীয় সম্প্রদায়ে সরাসরি বিভক্ত হিসেবে কল্পনা করে ফরাসি পর্যটক মহোদয় 'হিন্দু' প্রথায় 'মুসলমানদের' বর্ণাঢ্য অংশগ্রহণে স্বাভাবিকভাবে হতবাক হয়েছেন।

প্রাক-আধুনিক বাঙালি সমাজকে তার নিজস্ব পরিস্থিতিতে উপলব্ধির জন্য ডি. সি. সেনের[৩৮] মতো আধুনিক পর্যবেক্ষক, ফ্রানকোইস পাইরার্ডের মতো সমসাময়িক বহিরাগত এবং সৈয়দ সুলতানের মতো সমসাময়িক মুসলমান অভিজাত সদস্যদের দুটি বিভক্ত শ্রেণীতে ভাগ করার ধারণাটি মুলতবি রাখতে হবে, কারণ তাদের সবাই ইসলামের নিয়মাত্মক ধারণায় অবহিত ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান এই দুটি পৃথক এবং আত্ম-সংযত সামাজিক গ্রুপকে দেখার বদলে সেই সময়ের মানুষদের 'সহজাতভাবে' সাম্প্রদায়িক সীমানার ঊর্ধ্বে উঠে রীতিনীতি পালনকারী বাঙালি গ্রামবাসীদের একটি একক অবিভক্ত জনসাধারণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়, যারা জীবনের স্বাভাবিক জ্বালা-যন্ত্রণা প্রশমনের চলমান সংগ্রামে অতিলৌকিক শক্তি লাভের জন্য অনির্ধারিতভাবে

৩৬. Ibid., 677-78. Sen, *The Folk Literature*, 100-101. Sarat Chandra Mitra, "On the Worship of Deity Satyanarayana in Northern India," *Journal of the Anthropological Society of Bombay* 9, no. 7 (1919): 768-77.
৩৭. Pyrard, *The Voyage*, 2: 336.
৩৮. See n. 35 above.

বেশ কিছু প্রখ্যাত হাতিয়ার-একজন সাধুপুরুষ এখানে, সেখানে একটি পবিত্র নদী-গ্রহণ করতো। প্রাক-আধুনিক মোমেনশাহির পালাগান সম্পর্কে ডুসান ব্যাভিটেলের অভিমত, সেগুলো 'হিন্দুর বা মুসলমানের সংস্কৃতি থেকে সৃষ্ট নয়, বরং একটি একক বাঙালি লোকজ-সংস্কৃতি'[৩৯] প্রাক-আধুনিক বাঙালি লোকজ ধর্ম সম্পর্কেও হয়তো একই কথা বলা যায়।

স্থানচ্যুতকরণ

ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ার তৃতীয় মাত্রাটি-স্থানীয় সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে বাঙালি অতিলৌকিক সত্তাসমূহকে স্থানচ্যুতকরণ এবং তাদের স্থানে ইসলামী সত্তাকে স্থাপন-স্পষ্টতই ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথমদিকে দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, যখন ফরায়েজি ও তারিখে মুহাম্মাদির মতো ইসলামী সংস্কার আন্দোলনগুলোর স্রোতে বাঙালির পল্লীগুলো ভেসে গিয়েছিল। এসব আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল বাঙালি ইসলামে বিদ্যমান সকল ধরনের দেশজ বিশ্বাস ও রীতিনীতির পালন বাতিল করে দিয়ে সেখানে আল্লাহ ও নবী মুহাম্মদের (সা) প্রদত্ত ব্যবস্থা পুরোপুরি অনুসরণ।

ঊনবিংশ শতকের সবচেয়ে প্রভাবশালী সংস্কার কর্মসূচি হিসেবে ফরায়েজি আন্দোলনের সূচনা করেন হাজি শরিয়তুল্লাহ (মৃত্যু ১৮৪০), সাধারণ পল্লী পরিবারে জন্মগ্রহণকারী এই ব্যক্তিটি ১৭৯৯ সালে আঠারো বছর বয়সে হজ্জ করতে মক্কায় যান। ইসলামের পবিত্রতম শহরটিতে তার উনিশ বছরের ধর্মীয় শিক্ষালাভের সময়ে আরববিশ্ব নিজেই ওহাবিদের উদ্দীপ্ত ও সংস্কার আন্দোলনের আওতায় এসেছিল। ১৮১৮ সালে দেশে ফেরার পর হাজি শরিয়তুল্লাহ ইতিপূর্বে হজ্জ করার আগে যেসব রীতিনীতি তার কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল, এখন ওহাবি আরবে প্রচলিত ব্যবস্থার আলোকে সেগুলোকে ইসলাম থেকে ব্যাপক বিচ্যুতি হিসেবে দেখতে পেলেন। ১৮১৮ সাল থেকে ১৮৪০ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁর বাঙালি স্ব-ধর্মাবলম্বীদের সংস্কারে নিজেকে নিয়োজিত করেন। সময়ের পরিক্রমায় বাঙলায় ইসলামের ত্রাণকর্তা তথা প্রায় অসাধারণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে কিংবদন্তিতে পরিণত হন,[৪০] যার কর্মকে ১৯০৩-৬ সালের দিকে জনৈক চারণ কবি বর্ণনা করেন-

---

৩৯. Zbavitel, *Bengali Folk-Ballads*, 133.

৪০. হাজি শরিয়তুল্লাহ'র সমাধিফলকে তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছিল, "শিয়া ও অবিশ্বাসীদের এবং সকল বিভ্রান্তির কবল থেকে ধর্মকে রক্ষাকারী, সকল মিথ্যা ও অসার দম্ভ বিরুদ্ধে সঠিক পথের নির্ভীক যোদ্ধা, মেঘ যেমন সূর্যকে আড়াল করে তেমনি অন্ধকারের ঢেকে রাখা ইসলামকে মুক্তকারী" হিসেবে। Muin-ud-Din Ahmad Khan, *History of the Faraidi Movement in Bengal (1818-1906)* (Karachi: Pakistan Historical Society, 1965), p xxxiii.

তখন তুমি কোথায় ছিলে, যখন হাজি শরিয়তুল্লাহ এখানে (বাংলায়) এসেছিলেন?
তিনি ফাতিহা প্রথার বিলোপ, কবর পূজা ও অজ্ঞ মোল্লাদের দৌরাত্ম বন্ধ করেন।
তিনি যখন বাংলায় পা রাখেন, তখন সারা দেশ শিরক আর বিদায়াতে ছেয়ে ছিল।
সব বিদায়াত বিলোপ করা হলো এবং আকাশে ইসলামের সূর্য উজ্জ্বল হয়ে
উঠলো।

(ইরেজি থেকে অনুবাদ)[৪১]

১৮৯৪ সালে জেমস ওয়াইজ ঊনবিংশ শতকের সংস্কার আন্দোলনটিকে সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে, 'অজ্ঞ ও সাধারণ কৃষকদল যারা সাম্প্রতিকালে তাদের হিন্দু আবরণ ছুড়ে ফেলেছে, যা দীর্ঘদিন তাদের ধর্মকে বিকৃত করেছিল।'[৪২] কিন্তু উপরের কবিতাটি প্রমাণ করে হাজি শরিয়তুল্লাহ'র সংস্কার আন্দোলনটি শুধুমাত্র 'হিন্দু আবরণ' ছিন্ন করা ছিল না, তার চেয়ে আরো বড় কিছু ছিল। হাজি শরিয়তুল্লাহর প্রয়াসের মধ্যে ফাতিহা পাঠ ও মাযার পূজা বন্ধ করা এবং 'বিকৃত' মোল্লাদের প্রভাব খর্ব করার কথায় বদ্বীপটিতে ইসলাম সর্বপ্রথম মূল বিস্তারের সময়কার অত্যাবশ্যক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ দূর করার উদ্যোগের ইঙ্গিত দিচ্ছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রাদেশিক মোগল কর্মকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত দরগাগুলো ব্যতীত মোল্লা ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অন্যান্য সদস্যদের পক্ষে পূর্বাঞ্চলীয় বদ্বীপের সম্প্রসারণশীল ধান সীমান্তে নতুন সৃষ্ট বসতিগুলোতে ফাতিহা পাঠ অর্থাৎ কুরআন পড়ার কোন প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি থাকতো না।

অপর মুসলমান সংস্কারক কেরামত আলীর (মৃত্যু ১৮৯৪) প্রভাবে বদরপীর ও পাঁচ পীরকে উদ্দেশ্য করে প্রার্থনাকারী নোয়াখালির মাঝিরা তারপর থেকে শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করতে লাগলো।[৪৩] সৃষ্টিকর্তা পর্যায়ে এ ধরনের তৎপরতার সমান্তরালে একই তৎপরতা চলে মানুষের পর্যায়ে। ইতিপূর্বে যেসব বাঙালি সুনির্দিষ্টভাবে মুসলমান হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছিল না, এবার তারা আরবী পদবি গ্রহণ করতে লাগলো, যা ছিল ইসলামী আদর্শসমূহের সাথে গভীরতর সম্পর্কের নিশ্চিত চিহ্ন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯১১ সালে প্রকাশিত নোয়াখালির ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হয়, 'সম্প্রদায়টির শেখ ও নিম্নতর শ্রেণীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ জেলাটির আদিবাসী উপজাতীয় বংশধর' এবং 'চাঁদ, পাল ও দত্ত পদবিধারী (মুসলমানদের) এখনো উক্ত জেলায় দেখা যায়।'[৪৪] কিন্তু ১৯৫৬ সাল

৪১. Cited in ibid., 8.

৪২. Wise, "Muhammadans of Eastern Bengal." 68.

৪৩. Risley Collection, "Reports on the Religious and Social Divisions amongst the Mohamedans of Bengal" (India Office Library, London, Eur. MSS. No. E 295), 9: 417.

৪৪. Webster, *Eastern Bengal and Assam District Gazetteers: Noakhali*, 39.

নাগাদ দেখা যায়, উক্ত জেলার মুসলমানদের মধ্যে উল্লিখিত ধরনের নাম বাস্তবেই অদৃশ্য হয়ে গেছে, আর 'সংস্কারক আলেমদের প্রভাবের' কারণে তা আরবী পদবিতে রূপান্তরিত হয়েছে।[৪৫]

তারপর ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে, অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাঙালি মুসলমানরা তদানীন্তন সময়ে আরবের কেন্দ্রভূমিতে বিদ্যমান বিশ্বাস ও রীতিনীতির প্রতি ক্রমবর্ধমান হারে সচেতন হয়ে উঠে এবং মুসলমান হিসেবে তারা সেসব বিশ্বাস ও রীতিনীতির সাথে একীভূত হওয়ার প্রয়াস চালায়।[৪৬] সচেতনতার এই অন্তর্ভুক্তির কারণ কী কী ছিল তা অত্যন্ত পরিচিত: ভারতের খ্রিস্টান মিশনারীদের ইসলাম সম্পর্কে বিষোদগার, মুদ্রণ প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে সংস্কারবাদী সাহিত্যের প্রচার, ঔপনিবেশিক শাসনের প্রেক্ষাপটে মুসলমান ও অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, বাষ্পচালিত নৌপ্রযুক্তি এবং আরবে হজ্জযাত্রায় দ্রুততায়। ১৮৯১ সালে নৃতত্ত্ববিদ এইচ এইচ রিজলে লিখেন, 'এমনকি দূরবর্তী মক্কা কাছে নিয়ে আসা হলো। কুকের স্টিমার ও ফিরতি টিকেটগুলো ভারতে বিশ্বাসীদের নাগালে পৌঁছে গেল; আর মুসলমান মিশনারি ও হাজিরা পূর্ববাংলায় গোড়া বিশ্বাসের ধীর অথচ দৃঢ় পুনর্জীবন ঘটালো।'[৪৭]

অবশ্য এটা ভাবা ভুল হবে, স্থানীয় সৃষ্টিতত্ত্বসমূহে বিশুদ্ধকরণের আন্দোলনগুলো উবিংশ শতকে বা বিংশ শতকে সীমাবদ্ধ ছিল বা তা ছিল 'আধুনিকতাবাদের' সূচনার প্রতিক্রিয়ার পরিণতি।[৪৮] আরবে ইসলামের প্রথম উত্থান এবং প্রাক-আধুনিক বাংলায় পরবর্তী বিকাশ উভয়টির ক্ষেত্রেই সামাজিক ও ধর্মতাত্ত্বিক উভয় ধরনের গতিশীলতার সাথে ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের পরিস্থিতির তুলনা করা যায়।প্রাথমিক আরব, প্রাক-আধুনিক বাংলা এবং আধুনিক বাংলা-তিনটি ক্ষেত্রের সবটিতেই লঘুতর বা নিম্নতর

---

৪৫. A. K. Nazmul Karim, *Changing Society in India and Pakistan: A Study in Social Change and Social Stratification* (Dacca: Oxford University Press, 1956), 132.

৪৬. উদাহরণ হলো, মুসলমান পুরুষদের লম্বা দাড়ি রাখতে বলা হয়, মহিলাদের শাড়ি পরতে বা পায়ে বা নখে মেহদি রাঙাতে নিরুৎসাহিত করা হয়, এবং আরবরা পঙ্গপাল খায়, এই যুক্তিতে সবাইকে ঘাসফড়িং খেতে তাগিদ দেওয়া হয়। দেখুন Wise, "Muhammadans," 56; *The Cambridge History of Islam*, ed. P.M. Holt et al. (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 2: 77.

৪৭. H.H. Risley, *Tribes and Castes of Bengal* (reprint, Calcutta: Firma Mukhopdhyay, 1981), 1; xxx.

৪৮. ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য দেখুন Bruce B. Lawrence, Defenders of God (New York: Harper & Row, 1989), এখানে লেখক ইসলামী সংস্কার আন্দোলনগুলোর "আধুনিকত্ব" সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।

অতিলৌকিক সত্তাসমূহ একটি একক খোদার সার্বভৌমত্বের আওতায় বা অধীনে লীন হয়ে গেছে, যেটাকে ম্যাক্স মুলার বলেছেন, 'ধর্মীয় যৌক্তিককরণ'।[৪৯]

এগুলোর প্রথমটি, আরবে ইসলামের উত্থানের ঘটনাটি, সার্বিকভাবে মুসলিম বিশ্বের মতো বাংলাতেও পরবর্তী পর্যায়গুলোর আদর্শে পরিণত হয়। দ্বিতীয় থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত সূত্রগুলো একেশ্বরবাদী ধর্মমতের ধীরে ধীরে বিবর্তনের কথা প্রকাশ করে, তা ছিল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর (মৃত্যু ৬৩২) আমলে আরবীয় উপদ্বীপের আত্মস্থ করে নেওয়া পৌত্তলিক ধর্মমতের উত্তরসুরি ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত ইহুদি রীতি এবং ইহুদি সৃষ্টিতত্ত্ব ধারণা। দ্বিতীয় খ্রিস্টীয় শতকে একটি নেবাতিনীয় লিপিতে আল্লাহকে উত্তর-পশ্চিম আরবে একটি আরব গোত্রের পৃষ্ঠপোষক দেবতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৫০] পঞ্চম শতাব্দীতে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের দুই শতাব্দী আগে, একটি গ্রীক সূত্র জানাচ্ছে, উত্তর আরবের সম্প্রদায়গুলো তাদের প্রতিবেশী পৌত্তলিক প্রভাবে কলুষিত হওয়া সত্ত্বেও মূসার আমলের হিব্রু ধর্ম অনুসরণ করে। তারা ইহুদিদের মতো খৎনা করায়, শূকর খাওয়া থেকে বিরত থাকে এবং 'অন্যান্য ইহুদি কৃত্য ও প্রথা পালন করে।' সূত্রটি আরো জানায়, ইহুদিদের নিকট থেকে এসব আরব জানতে পেরেছে, তারা ইসমাইল ও হাজেরার মাধ্যমে ইব্রাহিমের বংশধর।[৫১] ৬৬০-এর দশকে জনৈক আরমেনীয় লেখকের লেখা হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জ্ঞাত প্রাচীনতম জীবনীতে আরবের নবীকে একজন বণিক হিসেবে বর্ণনা করেছে, যিনি তাঁর জনগণের মধ্যে ইব্রাহিমের ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ইব্রাহিমের বংশধর হিসেবে আল্লাহ'র প্রতিশ্রুত ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি বিশ্বাসীদের নেতৃত্ব দিয়ে ফিলিস্তিনে নিয়ে গেছেন।[৫২]

---

৪৯. "সিদ্ধান্তসূচক বিবেচ্য ছিল এবং বহাল আছে: কোন ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে কোনটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছিল, তাত্ত্বিকভাবে সর্বোচ্চ ঈশ্বর নাকি নিম্নতর অতিলৌকিক সত্তাসমূহ ও ভূত? ----- যৌক্তিককরণের (অনুপাত) প্রক্রিয়াটি সার্বজনীন খোদার শ্রেষ্ঠত্বকে অগ্রাধিকার দেয়, এবং কোন দেবমণ্ডলে ধারাবাহিক পরিস্ফুটনের পরই কোন না কোনভাবে যৌক্তিক নীতিমালার প্রচারণা চলে, কারণ সব সময়েই পেশাদার ধর্মপ্রচারকগণ যৌক্তিকরণের ধারণা প্রচার করেন বা ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বদের যৌক্তিকতার অভাব থাকে। Max Weber, *The Sociology of Religion*, trans. Ephraim Fischoff (Boston: Beacon Press, 1964), 20, 22.

৫০. See J. T. Milik, "Inscriptions grecques et nabateennes de Rawwafah," appended to P.J. Parr, G.L. Harding, and J.E. Dayton, "Preliminary Survey in N.W. Arabia, 1968," *Bulletin of Archaeology* 10 (1971): 54-58.

৫১. *The Ecclesiaiastical History of Sozomen, Comprising a History of the Church from AD 324 to AD 440*, trans. Edward Walford (London: H.G. Bohn, 1855), 309-10.

৫২. Bishop Sebeos, *Historie d'Heraclius*, trans. F. Macler (Paris: Imprimerie nationale, 1904), 94-96. Cited in Patricia Crone and Michael Cook, *Hagarism: The Making of the Islamic World* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 6-7.

তারপর দ্বিতীয় শতক থেকে সপ্তদশ শতকে আল্লাহ দ্বিতীয় শতাব্দীর এক আরব গোত্রের পৃষ্ঠপোষক দেবতা থেকে ইব্রাহিমের খোদার মতো সকল আরবের শ্রেয়তর খোদায় (High God) পরিণত হয়। এই বিবর্তন প্রক্রিয়া কুরআনেও দেখা যায়।

হযরত মুহাম্মদের মিশনের আগে পশ্চিম আরবের গোত্রগুলো অপেক্ষাকৃত গৌণ দেবতাসমূহ বা গোত্রীয় দেবতাদের বাদ দিয়ে আল্লাহর প্রতি ক্রমবর্ধমান হারে মনোযোগ প্রদান করছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা) যখন ধর্ম প্রচার শুরু করলেন, আল্লাহ তখন 'কাবার প্রভু' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন (কুরআন ১০৬ : ৩)[৫৩]। অবশ্য অন্যান্য স্থানে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য আরব দেবতাদের সুনির্দিষ্টভাবে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এভাবে 'এগুলো কতগুলো নাম বৈ নয়, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছো। এর সমর্থনে আল্লাহ কোন দলিল নাযিল করেননি।'[৫৪] এই আয়াতে একেশ্বরবাদী আদর্শের চূড়ান্ত বিজয়, আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য দেবতাদের শুধুমাত্র অকার্যকর হিসেবে বাতিলই করে দেওয়া হয়নি, বরং পুরোপুরি অস্বীকার করে বিবর্তিত প্রক্রিয়ার সমাপ্তির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ধর্মীয় যৌক্তিকরণের এ ধরনের প্রক্রিয়া আমরা প্রাক-আধুনিক বাংলাতেও বারবার পাই, বিশেষ করে সৈয়দ সুলতানের উচ্চাভিলাষী সাহিত্যিক প্রয়াস নবী-বংশে যা দেখা যায়। ষোড়শ শতকের শেষদিকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিকশিত এই কবি ও স্থানীয় সূফী এমন এক সময়ে কাব্যটি রচনা করেছেন, যখন দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বদ্বীপীয় বনজ

৫৩. কুরআন ৩৬: ২৩, ৪৩, ৮৬, ৫৩, ২৬। কেউ কেউ বলে থাকেন, ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবে আল্লাহ ছিলেন নিম্নতর খোদা (lesser agency)। এটার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। বাস্তবে, আরব পৌত্তলিকরা আল্লাহকে তাদের খোদাদের স্রেফ একজন হিসেবে বিবেচনা করতো না। বিপরীতে, তারা তাঁকে সমগ্র বিশ্বের সর্বোচ্চ শাসক হিসেবে বিবেচনা করে তাঁর উপাসনা করতো। নিম্নতর খোদা হিসেবে তারা কাবাঘর কিংবা অন্যত্র যেসব মূর্তি স্থাপন করেছিল, সেগুলোর মধ্যে একটিকেও 'আল্লাহ' বলা হতো না। পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, আমরা তাদের ইবাদত এজন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্'র নিকটবর্তী করে দেয়। সূরা ৩৯: ৩। আরবরা একথাও বিশ্বাস করতো তারা ইবরাহিম (আ)-এর প্রথম পুত্র ইসমাইল (আ)-এর বংশধর। আর ইবরাহিম (আ) ছিলেন এক আল্লাহর উপাসক। তাই তারা যে আল্লাহর কথা বিশ্বাস করবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এমনকি মহানবী (সা)-এর জন্মের আগে ইয়েমেনের আবরাহা যখন কাবাঘর ধ্বংস করতে এসেছিল, তখনও আরব পৌত্তলিকরা মূর্তির অবয়বে থাকা কোন নিম্নতর খোদার কাছে প্রার্থনা জানায়নি, বরং, এক খোদার কাছেই পবিত্র ঘরটি রক্ষার মিনতি জানিয়েছিল। এ থেকেও বোঝা যায়, আরব পৌত্তলিকরাও সব সময়েই আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিল। ধারণা করা হয়, মুসলিম বিদ্বেষী খ্রিস্টান মিশনারি Dr. Robert Morey রচিত *The Moon-God Allah in the Archeology of the Middle East* গ্রন্থটি উপরোক্ত প্রশ্নটি সৃষ্টির উৎস। এর জবাবের জন্য Shabbir Ally রচিত *Reply To Dr. Robert Morey's The Moon-God's Myth & Other Deceptive Attacks On Islam* গ্রন্থটি পাঠ করা যেতে পারে। –অনুবাদক

৫৪. কুরআন ৫৩: ২৩, কেউ কেউ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার কিংবা কিছু ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলার চেষ্টা করেন ইসলাম ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে পৌত্তলিকতা থেকে। প্রাক-ইসলামী আরবের গোত্রগুলো প্রধানত পৌত্তলিক থাকায় কেউ কেউ ইসলামের উৎস হিসেবে পৌত্তলিকতার কথা বলে থাকেন। তাঁরা আরো

পশ্চাদভূমিতে সবেমাত্র লাঙলের কৃষি ও কুরআনের প্রকাশ শুরু হয়েছে। বাঙালি মুসলমানদের 'জাতীয় ধর্মীয় মহাকাব্য'[৫৫] হিসেবে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বাইশ হাজারের বেশি শব্দ সম্বলিত নবী-বংশ শুধুমাত্র আকারের কারণেই মহাকাব্য নয়, বরং তার একটি মুখ্য লক্ষ্যও আছে: আদম, নুহ, ইব্রাহিম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মদের মতো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, রাম ও কৃষ্ণসহ হিন্দু দেবমণ্ডলীর প্রধান দেবতাদের আল্লাহ'র উপর্যুপরি নবী হিসেবে চিহ্নিত করা।

এ প্রসঙ্গে আমরা সৈয়দ সুলতানের সার্বিক প্রয়াসকে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর প্রাচীনতম ইসলামী জীবনীর লেখক মধ্য অষ্টম শতকের আরবের ইবনে ইসহাকের

উল্লেখ করেন, ইসলাম প্রতিষ্ঠার আগে কাবা ঘরে মূর্তি রাখা হতো। কেউ কেউ এমনকি হজ্জ অনুষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত কুরবানীকে পৌত্তলিক আমলের উধিয়াহ'র তুলনা করেন। অথচ সবাই জানে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সময়ে হিজাজের (যে স্থানে মক্কা ও মদিনা অবস্থিত) মানুষ ছিল মূর্তিপূজারী পৌত্তলিক। মহানবী (সা)-এর প্রথম মিশনই ছিল মানব-সৃষ্ট ঠুনকো খোদার বদলে বিশ্বের এক ও একমাত্র আল্লাহ্'র দিকে নেওয়া। মহানবীর নিজের গোত্রও ছিল পৌত্তলিক এবং তিনি তাদের কাছেই প্রথম একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি এক আল্লাহর প্রতি তাঁর কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সবাইকে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত করতে সক্ষম হন। প্রথমত এটা মনে রাখতে হবে, ইসলাম আরবের জনগণকে পৌত্তলিকতার অন্ধকার থেকে একেশ্বরবাদের আলোতে নিয়ে আসে। শেষ নবীর নেতৃত্বে সাবেক মূর্তিপূজারীরা নিজ হাতে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলে এবং কাবাকে পবিত্র করে। ইতিহাসের এই অধ্যায়টি নিয়ে কোনই সংশয় নেই। এই ঘটনা সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। দ্বিতীয়ত হযরত ইবরাহিম (আ)-এর সময় থেকেই কাবা ঘরের তাৎপর্য বহাল রয়েছে। মূর্তিপূজার প্রচলনের অনেক আগেই ঘরটি এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য হযরত ইবরাহিম (আ) ও হযরত ইসমাইল (আ) নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে আরবরা পৌত্তলিকতায় মগ্ন হয় এবং কাবাঘরে মূর্তি স্থাপন করে। বলা যায়, মহানবী (সা) কাবাঘরের মূল বিশুদ্ধতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। পবিত্র হজ্জের সময়ে যেসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে সেগুলোর প্রবর্তন মহানবী (সা) করেননি। বরং সেগুলো হযরত ইবরাহিম (আ) ও তাঁর পুত্র হযরত ইসমাইল (আ)-এর সময় থেকে প্রচলিত ছিল এবং সেগুলো আরবদের মধ্যে জাগরূক ছিল। পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে হযরত ইবরাহিম কখনো পৌত্তলিক ছিলেন না। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : অতঃপর আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছি যে, ইবরাহিমের দীন অনুসরণ করুন, যিনি একনিষ্ট ছিলেন এবং শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। –সূরা আন-নাহল ১৬: ১২৩।

আপনি বলে দিন: আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন–একাগ্রচিত্ত ইবরাহিমের বিশুদ্ধ ধর্ম। তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। আপনি বলুন: আমার নামায, আমার কুরবানী, এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। –সূরা আন'আম ৬: ১৬১-১৬২

এ থেকে কি বোঝা যায় না, ইসলাম পৌত্তলিকতার সকল উৎসের বিরোধিতা করছে। তাছাড়া পৌত্তলিকতাবাদ থেকে সৃষ্ট কোন ধর্ম কি তার উৎসের এতো সমালোচনা করতে পারে? হজ্জের সময়ে কুবানীর তাৎপর্যও সবার জানা: সবাই জানে আল্লাহর জন্য ইবরাহিম (আ) তাঁর পুত্র হযরত ইসমাইল (আ)-কে কুরবানী করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাই কুরবানীর ঐতিহ্য পৌত্তলিকদের সৃষ্ট নয়, বরং হযরত ইবরাহিম (আ) থেকে সূচিত। –অনুবাদক

৫৫. Syed Sajjad Husain, ed. and trans. *A Descriptive catalogue of Bengali Manuscripts in Munshi Abdul Karim's Collection*, by Munshi Abdul Karim and Ahmad Sharif (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1960),xxiv.

(মৃত্যু আনুমানিক ৭৬৭) সৃষ্টিকর্মের সাথে তুলনা করতে পারি। উভয় ব্যক্তিই সূচনা থেকে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাস লেখার প্রয়াস চালিয়েছেন। এই কাজে তারা উভয়ে তাদের সৃষ্টিকর্ম দুটি বড় অধ্যায়ে ভাগ করেছেন: প্রথম অংশে হযরত মুহাম্মদের পূর্ববর্তী সকল নবীর বিস্তারিত জীবনী টানা হয়েছে-যাকে ইবনে ইসহাকের গ্রন্থে শিরোনাম হয়েছে কিতাব-আল-মুবতাদা 'শুরুর গ্রন্থ'-এবং দ্বিতীয় অংশটি শুধুমাত্র নবী মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য নিবেদিত। এই প্রস্তুতি গ্রহণ উভয় সৃষ্টিকর্মকে একটি শক্তিশালী পরিকল্পিত কর্মপন্থা প্রদান করেছে। ইতিহাসবেত্তা গরডন নিউবি বলেন, 'ইবনে ইসহাকের কিতাব আল-মুবতাদায় বিশ্বের সকল ইতিহাসকে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মের নবী ও সাধুপুরুষদের গ্রহণ করায় সময়ের পরিক্রমায় ইসলামের আগমনের অনিবার্যতা এবং পরিশেষে মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদীদের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া আব্বাসী সাম্রাজ্যের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।' অধিকন্তু বাইবেল ও কুরআনের ভাষ্য হিসেবে কিতাব আল-মুবতাদা 'ইসলামকে ইহুদী ও খ্রিস্টধর্মের উত্তরসুরি হিসেবে মুসলমানদের দাবিকে বেগবান' করেছে।[৫৬] একই কায়দায় বাইবেলীয় চরিত্রগুলোর সাথে বৈদিক, বৈষ্ণব ও শৈব দেবতাদের সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে নবী-বংশ এই দাবিই জোরদার করছে, ইসলাম শুধুমাত্র ইহুদী বা খ্রিস্টধর্মের নয়, বরং সেইসাথে প্রাক-আধুনিক বাংলার ধর্মীয় ঐতিহ্যেরও উত্তরসুরি।

কিতাব আল-মুবতাদা ও নবী-বংশের কাঠামোগত সামঞ্জস্য দুটি সৃষ্টিকর্মের আত্মপ্রকাশের একই ধরনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে উদ্ভূত। উভয় লেখকই সীমান্ত পরিস্থিতিতে বেঁচে ছিলেন, যেখানে ধর্মীয় ও সামাজিক সীমান্তগুলো ছিল ব্যাপক অন্তঃপ্রবাহে এবং ইসলাম রাজনৈতিকভাবে প্রাধান্যমূলক অবস্থায় থাকলেও আরো পুরাতন বিশ্বাসে বিশ্বাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার তুলনায় ইসলাম ছিল নতুন ও জনসংখ্যার দিক থেকে সংখ্যালঘিষ্ঠ। অধিকন্তু উভয় ক্ষেত্রেই মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক পরিচিতি তখনো পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়নি এবং তা তখনো ছিল গঠনের প্রাথমিক প্রক্রিয়ায়। এ ধরনের 'সীমান্তগত' পরিস্থিতিতে সাহিত্যিক সৃষ্টিশীলতার পরিবেশকে উৎসাহিত করায়[৫৭] ইবনে ইসহাক ও সৈয়দ সুলতান উভয়েই

৫৬. Gordon Darnell Newby, *The Making of the Last Prophet: A Reconstruction of the Earliest Biography of Muhammad* (Columbia: University of South Carolina Press, 1989), 7,3.

৫৭. কর্নেল ফ্লেইশার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন (মৃত্যু ১৪০৬) ও মোস্তফা আলীর (মৃত্যু ১৬০০) সাহিত্য-জীবন মূল্যায়নেও একই বিষয় লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা উভয়েই যে সীমান্তবর্তী পরিবেশে বসবাস করেছিলেন এবং যেখানে বসে লিখেছিলেন, তার মাধ্যমে তাঁরা ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। দেখুন Fleischer, "Royal Authority, Dynastic Cyclism, and Ibn Khaldunism in Sixteenth-Century Ottoman Letters," *Journal of Asian and African Studies* 18, nos. 3-4 (983): 216.

বৃহত্তর, অ-মুসলমান সমাজের পারিপার্শ্বিকতায় তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পরিচিতি সংজ্ঞায়িত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। উভয়েই পূর্ববর্তী নবীদের ঐতিহাসিক ও ঐহিক ভূমিকা পালন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়তী জীবনে সম্পর্কে তারা যে পূর্বাভাস করেছিলেন, তা সুনির্দিষ্ট করার প্রয়াস চালান। এ ধরনের কৌশল শুধুমাত্র বৃহত্তর সম্প্রদায়টির সাথে তাদের নিজেদেরটির গুরুত্বপূর্ণ সংযোগই প্রতিষ্ঠা করেনি, সেই সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর তাদের নিজেদের মৌলিকত্বও দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছেন।

ইবনে ইসহাক তাঁর কিতাব আল-মুবতাদা'র বিশাল অংশ লিখেছিলেন ৭৬০-এর দশকে বাগদাদে। উত্তরের তদানীন্তন ইসলামী পশ্চাদভূমি পশ্চিম আরবের মক্কা ও মদিনা থেকে দূরে অবস্থিত বাগদাদ ছিল সাবেক সাসানীয় পারসি রাজবংশের রাজধানীর কাছে এবং সেখানে মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ভাল সম্ভাবনা ছিল এবং তা হয়েও ছিল। সেই সময় ইরাক ও ইরানের জনসংখ্যার দশ শতাংশেরও কম ছিল মুসলমান এবং বাকিরা ছিল প্রধানত খ্রিস্টান, ইহুদী ও জরথুস্ত্রীয়।[৫৮] খ্রিস্টান ও ইহুদী ধর্মগ্রন্থগুলোর অনেক চরিত্র কুরআনেও দেখা যাওয়ায় ইসলামী জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধির জন্য ইবনে ইসহাকের মতো পণ্ডিতগণ পরিশ্রম সহকারে ইহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়গুলোর প্রতিনিধিদের নিকট থেকে উক্ত বাইবেলীয় চরিত্রগুলোর সাথে সম্পর্কিত লোক-জ্ঞান সংগ্রহ করেন।[৫৯] ইসলাম-বহির্ভূত এসব সামগ্রী তখন নতুন মুসলমান সম্প্রদায়ের সাথে পুরাতন সম্প্রদায়গুলোর সংযোগ সাধনে সম্প্রদায়, ইতিহাস এবং নবুয়তের বিবর্তিত ধারণার সাথে খাপ খেয়ে যেত এবং একই সময়ে পুরাতন সম্প্রদায়গুলো থেকে নতুনটির পার্থক্যও রচনা করতো।

তাই অষ্টম শতাব্দী নাগাদ একটি ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিচিতি নির্মাণের জন্য অগ্রসর হওয়া অধিকাংশ সৃষ্টিশীল শক্তির হদিস ইতিমধ্যেই পবিত্র স্থান ও স্মৃতিধন্য নগরীতে পরিণত হওয়ায় ইসলামের মূল কেন্দ্র মক্কা ও মদিনায় আর পাওয়া যায় না। বরং নতুন ধর্মটির অধিকাংশ শক্তিই উত্তরে চলে গিয়েছিল, যেখানে আরব মুসলমানরা আরো পুরাতন সভ্যতাসমূহের মুখোমুখি হয়েছিল এবং সেগুলোর সাথে সমাঝোতায় পৌঁছেছিল। কিন্তু বাগদাদ দীর্ঘ সময় সীমান্তবর্তী সমাজ হিসেবে বহাল থাকেনি। ইবনে ইসহাকের জীবদ্দশায় সেখানে সাংস্কৃতিক গঠনপর্ব এবং মতবাদগত গতিশীলতা বিদ্যমান ছিল, আর তা ছিল আব্বাসীয় শক্তি সংহত হওয়ার সামান্য পূর্ববর্তী সময়ে,

৫৮. Richard Bulliet. *Conversion to Islam in the Medieval Period: An Essay in Quantitative History* (Cambridge: Mass., Harvard University Press, 1979), 44.

৫৯. Newby, *The Making of the Last Prophet*, 10. প্রথমদিককার মুসলমান মুহাদ্দিস আল-বুখারির মতে, মহানবী (সা)-এর সময়ে "ইহুদীরা হিব্রু ভাষায় তাওরাত পড়তো এবং তা আরবীতে ইসলামের জনগণের কাছে ব্যাখ্যা (আরবী *ফাসারা*) করতো। উদ্ধৃতি প্রাগুক্ত, ১২।

ইসলামী মাযহাবগুলো সংগঠিত রূপ নেওয়ার আগে এবং বাগদাদ নিজেই সীমান্তবর্তী শহর থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও সম্প্রসারণশীল ইসলামী সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিশাল মহানগরীতে উন্নীত হওয়ার পূর্বে। ইরাক, সিরিয়া ও ইরানের অধিকাংশের ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার এই সময়টাতে প্রাক-ইসলামী সংশ্লিষ্ট ইতিহাস গুরুত্বহীন হয়ে পড়ায় এবং ইবনে ইসহাকের সৃষ্টিকর্মের অংশবিশেষ প্রাক-ইসলামী নবীদের নিয়ে কাজ করায় কিতাব আল-মুবতাদা কৌলীন্য হারিয়ে ফেলে এবং শীঘ্রই তার প্রচার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।[৬০]

কিতাব আল-মুবতাদার আটশত বছর পর রচিত হলেও সৈয়দ সুলতানের নবী-বংশও মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক-ধর্মীয় আত্ম-সচেতনতার বিবর্তনের একই পর্যায় অতিক্রম করেছিল। তাই, এখানেও যুগপৎভাবে পূর্ববর্তী ঐতিহ্যসমূহের সাথে ইসলামের সাদৃশ্য এবং সেগুলো থেকে এটার বৈসাদৃশ্য প্রদর্শনের একই প্রবণতা দেখা যায়। সৈয়দ সুলতান শুধুমাত্র আদমের খোদাকে সংস্কৃত প্রভু বা নিরঞ্জন নামেই চিহ্নিত করেননি, তিনি ইসলামে খোদার প্রেরিত বার্তাবাহক হিসেবে নবীর ধারণাকে ভারতীয় ধারণা অবতার বা দেবতার বিশেষ রূপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৬১] কবি মহাকাব্যটির একেবারে সূচনাতেই এসব ধারণা স্থাপন করেছেন। কবি ভারতের পৌরাণিক সাহিত্যের সমৃদ্ধ কল্পনায় লিখেন, 'যেহেন আছএ ননী গোরস সহিত/ তেনমতে আছএ প্রভু জগত ব্যাপিত' (দুধের মধ্যে যেমন ননী থাকে, তেমনি খোদাও বিশ্বে বিদ্যমান), তিনি তাঁর অবতার হিসেবে মুহাম্মদের আকারে প্রকাশ করেছেন।[৬২] তিনি ভারতীয় দেবতার অতিলৌকিক কর্মকাণ্ডকে সূফী ধারণায় পাশাপাশি স্থাপন করেছেন। বৃন্দাবনে ভালবাসা ব্যক্ত করতে কৃষ্ণকে সৃষ্টির বৈষ্ণব ভাবাবেগ প্রকাশ করে কবি সূফী

---

৬০. See Ibid., 8-14.

৬১. যদিও আরবী নবীর *সাথে সংস্কৃতি অবতারের* সামঞ্জস্য সৈয়দ সুলতানের জন্য অভিনব ছিল না, কিন্তু তবুও বলা যায়, ইতিহাসে ভারতীয় সভ্যতার সাথে ইসলামের সাক্ষাতে তা ঘটেছে খুবই বিরলভাবে। এ ধরনের সামঞ্জস্যের সর্বপ্রথম নজির দেখা গেছে ১০২৭ ও ১০২৮ খ্রিস্টাব্দে (হিজরী ৪১৮ ও ৪১৯) লাহোরে গজনির মুহাম্মদ সুলতান মাহমুদের মুদ্রিত মুদ্রায়। এসব মুদ্রায় সুলতান মাহমুদ ঈমানের ইসলামী ঘোষণার সংস্কৃত অনুবাদ মুদ্রণ করেছিলেন, যাতে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে খোদার অবতার হিসেবে "অব্যক্তম" বলা হয়েছিল। অবশ্য ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের সবচেয়ে মৌলিক ধারণাকে ভারতীয় ধর্মীয় পরিমণ্ডলে অনুবাদ করার এই সাহসী উদ্যোগটি ভারতীয় মুদ্রার ইতিহাসে ছিল অদ্বিতীয় ঘটনা এবং এ ধরনের প্রয়াস আর চালানো হয়নি। দেখুন D.C. Sircar, *Studies in Indian Coins* (Delhi: Motilal Banarsidass, 1968), 19. সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে ইসমাইলি ঐতিহ্যেও *অবতার* ধারণা দেখা যায় মহানবীর (সা) জামাতা আলীকে *বিষ্ণুর* দশম *অবতার* হিসেবে চিহ্নিত করার ঘটনায়। দেখুন Azim Nanji, *The Nizari Ismaili Tradition in the Indo-Pakistan Subcontinent* (Delmar, N.Y.: CaraVan Books, 1978), 110-20.

৬২. Saiyad Sultan, *Nabi-Bamsa*, 1: 2. (অনুবাদে আহমদ শরীফ সম্পাদিত *নবী-বংশের* বাংলা সংকলন ব্যবহার করা হয়েছে–অনুবাদক)

রূপকথার আশ্রয় নিয়ে বলেছেন, নিরঞ্জন আয়নায় প্রতিফলিত তাঁর নিজের ছবির দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকেন এবং আকাশ ও ফেরেশতাদের সৃষ্টির পূর্বে তিনি *নূরে মুহাম্মদি* (মুহাম্মদের আলো) সৃষ্টি করেন।[৬৩] সৈয়দ সুলতান এমনকি চারটি বেদকে খোদার ('নিরঞ্জন', 'করতার') ধারাবাহিকভাবে মহাজনদের ('মহামানব') প্রত্যেককে একটি করে আসমানি কিতাব প্রদানের ঘটনা হিসেবে অভিহিত করেন। সে অনুযায়ী মানুষের কাছে নিরঞ্জনের শিক্ষা প্রচার এবং বেদের ব্যাখ্যার জন্য ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করা হয়েছে।[৬৪] বাংলার অপেক্ষাকৃত পুরাতন ধর্মীয় ও সামাজিক পরিমণ্ডলকে অস্বীকার করার বদলে মহাকাব্যটি বাংলার সামাজিক-ধর্মীয় অতীতের সাথে ইসলামের সংযোগ সাধন কিংবা অন্তত ব্রাহ্মণদের মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থগত ঐতিহ্যের সাথে হলেও সম্পর্কিত করা হয়েছে।

বাস্তবিকই, গ্রন্থটি মূল শিরোনাম-নবী-বংশ অর্থাৎ 'নবীর পরিবার' বাঙালি দেবদেবী এবং হিব্রু নবীদের বৃহত্তর 'পরিবারের' মধ্যে হযরত মুহাম্মদকে স্থাপনে লেখকের প্রয়াসের ইঙ্গিত করে। ঘরোয়া সমস্যা সমাধানে পরিবারের সদস্যদের মতো নবী-বংশের ইসলামী ব্যক্তিত্বরাও প্রায়ই ভারতীয় ধরনের উভয় সংকট বা জটিল পরিস্থিতি মীমাংসার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। চিরায়ত ভারতীয় চিন্তাধারার আলোকে কবি লিখেন, এমনকি মানুষ সৃষ্টির আগে 'ধর্ম' বা 'কর্তব্য' ভুলে যাওয়া ফেরেশতা ও জিনদের মধ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য একজন নবী সৃষ্টি করেছেন।[৬৫] এবং জনপ্রিয় মহাকাব্য রামায়ণের সমস্যাসংকুল যবনিকাপাত টানার জন্য সেই সূত্র ধরে সীতার মা ক্ষিতি দেবীর মাটি থেকে আদমকেও সৃষ্টি করা হয়েছে। রামের কাছে মেয়ে সীতার বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক রটানোর ঘটনায় লজ্জিত ক্ষিতির অভিযোগ শুনে নিরঞ্জন ফেরেশতাদের বলেন, আদমের মাধ্যমে আমি ক্ষিতিকে প্রতিপালন করবো এবং আমি ক্ষিতির মাটি থেকে আদমকে সৃষ্টি করবো।[৬৬]

তবে এটা বিবেচনা করা ভুল হবে, গুটিকতেক গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও পরিভাষা সাদামাটাভাবে যুক্ত করে রচিত নবী-বংশ মূলত 'হিন্দু' মহাকাব্য কিংবা এটি স্রেফ বিদেশী দেবতাদের স্থানীয় দেবতাদের মধ্যে চিহ্নিতকরণের একটি 'সংমিশ্রিত' কর্ম। ধর্মতত্ত্বের মৌলিক দিক থেকে কবি স্পষ্টতই ভারতীয় নয়, বরং জুডিও-ইসলামী চিন্তাধারা অনুসরণ করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তিনি বলেছেন, খোদার ('নিরঞ্জন') প্রত্যেক নবী/অবতারকে তাঁর সময়ের উপযোগী কিতাব দেওয়া হয়েছিল এবং নবুয়তের জুডিও-ইসলামী একবার/একমাত্র আবির্ভূতের ধারণায়, যার বিপরীতে ভারতীয় ধারণা হলো দেবতার বারংবার মনুষ্যরূপে আবির্ভাব।

৬৩. Ibid., 3,4, 6.
৬৪. Ibid., 24-25.
৬৫. Ibid., 11-12.
৬৬. Ibid., 38.

অধিকন্তু, মহাকাব্যটিতে চিরায়ত ভারতীয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মহাজাগতিক ইতিহাসকে পর্যায়ক্রমিক উত্থানের যুগ এবং ধ্বংসের যুগ হিসেবে বর্ণনা করা হয়নি। বরং সৈয়দ সুলতানের মতে, প্রত্যেক নবী/অবতারের সময়ে প্রচারিত ধর্ম কলুষিত হওয়ায় খোদা একেশ্বরবাদী বিশ্বাস প্রচারের জন্য পরবর্তী নবীদের পাঠিয়েছেন এবং সবশেষে সবচেয়ে ক্রটিমুক্ত নবী/অবতার মুহাম্মদকে পাঠিয়েছেন। কবি বলেন, চারটি বেদে খোদা ('করতার') মুহাম্মদের নবুয়তী মিশনের আগমনের কথা উল্লেখ করেছেন।[৬৭]

অর্থাৎ মহাকাব্যটিতে ধর্মীয় যুগের পর্যায়ক্রমিক নয়, বরং রৈখিক ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে, যা মানুষের ব্যাপারে খোদার চূড়ান্ত নবুয়তী হস্তক্ষেপের দিকে অগ্রসর হয়েছে। তাই চূড়ান্তভাবে তা নবুয়ত এবং মানুষের ইতিহাসে খোদার ভূমিকা সম্পর্কিত কুরআনিক ধারার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটাও সত্যি যে, কবি নিরঞ্জনের সাথে আল্লাহকে এবং অবতারের সাথে নবীকে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সা)-কে মধ্যপ্রচ্যের নবীদের ও ভারতীয় দেবতাদের দীর্ঘ শৃঙ্খলের একেবারে শেষে দেখানো হয়েছে এবং তাঁকে নিয়ে সংশয় সৃষ্টি করা হয়নি বা অন্য কেউ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়তী মিশনের চূড়ান্ত অবস্থা ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে সৈয়দ সুলতানের সৃষ্টিকর্ম তাই যৌক্তিকভাবে বাংলার ধর্মীয় পরিমণ্ডল থেকে অন্য সকল নবী/অবতারকে স্থানচ্যুত করেছে। এক্ষেত্রে, সৈয়দ সুলতানের স্বাতন্ত্র্য হলো এই যে, পূর্ববর্তী বাঙালি কবিরা বাঙালি সৃষ্টিতত্ত্বে আল্লাহকে শুধুমাত্র অন্তর্ভুক্ত করা বা সেসব সৃষ্টিতত্ত্বের দেবতাদের সাথে আল্লাহকে চিহ্নিত করেছেন। আর কবি তাঁর নিজের সময়ে বিরাজমান সমগ্র হিন্দু সামাজিক-ধর্মীয় ব্যবস্থাকে ইবলিশ বা অভিশপ্ত শয়তানের কাজ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেন, কাবিলের বংশধররা ইবলিশের শিক্ষা অনুযায়ী মানুষ, পাখি আর শূকরের মূর্তির পূজা করে।[৬৮] আর ইবলিশই বেদ খুঁজে পেয়ে সেটাকে পরিকল্পিতভাবে ক্রটিযুক্ত পুস্তকে পরিণত করেছে, আর ব্রাহ্মণরা অজ্ঞভাবে জনগণের কাছে সেটাই প্রচার করছে।[৬৯] এ কারণে বলা যায়, ব্রাহ্মণরা জনগণকে বিভ্রান্তিমূলক শিক্ষা দিচ্ছে, যার উদাহরণ হলো, মাটি থেকে সৃষ্ট মানুষকে মাটিতেই ফিরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে তারা মৃতদেহকে পুড়িয়ে ফেলছে।[৭০] আর ক্রটিযুক্ত গ্রন্থ থেকেই ব্রাহ্মণরা সেলাইযুক্ত পোশাকের পরিবর্তে সেলাইহীন কাপড় (অর্থাৎ ধুতি) পড়ার ধারণা পেয়েছে।[৭১] হাবিলের মৃত্যুর পর আদম ও হাওয়ার পুত্র

৬৭. Ibid., 25.
৬৮. Ibid., 181.
৬৯. Ibid., 242-43.
৭০. Ibid., 244.
৭১. Ibid., 252.

শিষ সেলাইযুক্ত কাপড় পরা শিখিয়েছেন, যার থেকেই পৃথিবীতে সঠিক পথের মানুষের বংশধর সৃষ্টি হয়েছে।[৭২]

সংক্ষেপে, ইসলামী অতিলৌকিক সত্তাসমূহকে ভারতীয় চিন্তাধারায় বর্ণনা না করে নবী-বংশে বরং ঠিক বিপরীতটিই করা হয়েছে: ব্রাহ্মণদের ইবলিশের পরিকল্পিতভাবে কলুষিত করা গ্রন্থসমূহের নির্বোধ শিক্ষক হিসেবে এবং হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার অবশিষ্ট অংশকে আদম ও হাওয়ার বিভ্রান্ত পুত্র কাবিলের বংশধর হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। শুধুমাত্র আদম ও হাওয়ার অপর পুত্র শিষের মাধ্যমে 'সঠিক পথে চলা' সম্প্রদায়ের তথা মুসলিম উম্মাহর বংশধারার সৃষ্টি হয়েছে। তাই মহাকাব্যটিতে ইসলামকে আগে থেকে বিদ্যমান বিশাল ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বের স্রেফ আরেকটি নামের চেয়ে অনেক বড় কিছু এবং 'আল্লাহকে' পরিচিত কোন দেবতার চেয়ে অনেক বড় হিসেবে উপস্থাপনের সচেতনতার একটি পর্যায় প্রতিফলিত করে। বরং পূর্ববর্তী আরব লেখক ইবনে ইসহাকের মতো সৈয়দ সুলতান ইসলামের আবির্ভাবকে অনন্য সৃষ্টি এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অপরিহার্য পরিণতি হিসেবে উপলব্ধি করেছেন।

সাহিত্য ও ইসলামীকরণ

বাংলায় অন্তত বদ্বীপের পূর্বাংশে ইসলামের বিকাশে যদিও অন্তর্ভুক্তিকরণ থেকে চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে বিচ্যুতিকরণের মতো ঘটনাবলী সুবিন্যস্ত বা সমরূপতায় প্রত্যক্ষ করা যায় না কিন্তু তবুও স্থানীয় অতিলৌকিক সত্তাগুলোর চূড়ান্ত বর্জনের একটি সাধারণ গতি দেখা যায়। অংশত, ষোড়শ শতক থেকে বাংলার সর্বভারতীয় এবং বস্তুত একটি বৈশ্বিক সভ্যতার সাথে অন্তর্ভুক্তির প্রেক্ষাপটে এটি ব্যাখ্যা করা যায়। ১৫৭৪ সালে আকবরের উত্তর-পশ্চিম বদ্বীপ জয়ের ঘটনার মধ্যেই পুরো বদ্বীপের উত্তর ভারতের সাথে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে একীভূত হওয়ার লক্ষণ ফুটে উঠে। পূর্বদিক সম্পর্কে বিশেষত্ব হচ্ছে, ষোড়শ শতকের শেষভাগের আগে পর্যন্ত এর পশ্চাদভূমি ছিল পশ্চিমদিকের তুলনায় অনুন্নত ও বিচ্ছিন্ন; তাই মোগল শক্তির সম্প্রসারণের ফলে শুধুমাত্র অপেক্ষাকৃত পুরাতন অংশের সাথে একীভূতই হয়নি, বরং সেই সাথে নতুন কৃষিজ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাও ঘটে। পশ্চিমবঙ্গ কিংবা এমনকি উত্তর ভারত থেকে আগত অভিবাসীদের কিছু অংশ এবং সাবেক জেলে বা জুমচাষীদের যারা সম্প্রতি কৃষিকাজে নিয়োজিত হয়েছে, তাদের নিয়ে গঠিত সমাজগুলো আদিম জঙ্গলকে ধানক্ষেতে রূপান্তরের সরকারের সাথে চুক্তিকারী উদ্যোক্তা পথপ্রদর্শকদের নির্মিত মসজিদ, দরগা বা মাদরাসাগুলোকে কেন্দ্র করে বৈশিষ্ট্যসূচকভাবে সংগঠিত হয়।

৭২. Ibid., 132-33.

অধিকন্তু পূর্ব প্রান্তেই প্রধানত রাজনৈতিক একীভূতের সাথেই স্থানীয় সৃষ্টিতত্ত্বে ইসলামী অতিলৌকিক সত্তার অনুপ্রবেশ ও শেষ পর্যন্ত মৌলিকত্বের সৃষ্টি হয়। এতে ইসলামী ধর্মীয় কর্তৃত্বের প্রকৃত মৌলিক অবদান রাখে, কোন ধর্মীয় নেতা জাদুকর বা অন্য কোন নশ্বর সত্তা নয়, বরং তা হলো লিখিত ধর্মগ্রন্থ–যা ছিল পুরোপুরি অবিনশ্বর ও অপরিবর্তনীয়। ইসলামে সাক্ষরতা ও আসমানি শক্তির মধ্যকার সম্পর্ক পুরোপুরি সুস্পষ্ট।[৭৩] অধিকন্তু বাংলায় প্রাধান্য বিস্তারের আগেই মুসলমানরা কুরআনকে কেন্দ্র করে একটি মহান বিশ্ব সভ্যতা নির্মাণ করেছিল এবং ইসলামী আইনের উপর বিশাল সাহিত্য রচনা করেছিল। তাই মুসলমানরা যখন তাদের ধর্মকে 'গ্রন্থের ধর্ম' হিসেবে বর্ণনা করে, তখন তা নিছক কাকতালীয় বিষয় থাকে না।

এটাও অবশ্যই সত্য যে, হিন্দু সংস্কৃতিও ধর্মগ্রন্থ নির্ভর। বৈদিক জ্ঞানের জীবন্ত ধারক হিসেবে বা অন্তত সেই জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য ধারাবাহিকতায় ব্রাহ্মণরা মুসলমান সাধুপুরুষরা যেভাবে মধ্যস্থতা করে এবং পরিণতিতে কুরআনের 'প্রতিনিধিত্ব' করে, অনেকটা সেভাবেই ধর্মগ্রন্থকেন্দ্রিক কর্তৃত্বের 'প্রতিনিধিত্ব' করে। তুর্কী বিজয়ের সময়ে বদ্বীপের পশ্চিমাংশের ঘন ও সামাজিক স্তরীভূত সমাজের অত্যন্ত গভীরে ব্রাহ্মণ নেতৃত্বাধীন ধর্মগ্রন্থভিত্তিক ধর্মীয় সংস্কৃতি প্রবেশ করেছিল। এমতাবস্থায় আরেকটি ধর্মগ্রন্থভিত্তিক ধর্মীয় সংস্কৃতি হিসেবে ইসলামের আত্মপ্রকাশ তেমন তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু ব্রাহ্মণিক সামাজিক-ধর্মীয় ব্যবস্থা বদ্বীপের পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়ার সময়ে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যেতে থাকে, ফলে প্রাক-সাক্ষরতাসম্পন্ন জনগণ ইসলামকে প্রতিরোধ করার মতো একটি কর্তৃত্বপূর্ণ কাঠামো পায়নি। এসব লোকদের মধ্যে সাদামাটা দরগা, মসজিদ, কুরআন স্কুল (মাদরাসা) সেখানে আগে থেকে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ে মৌলিকভাবে নতুন এবং অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি শক্তিশালী ধর্মীয় কর্তৃত্ব প্রদর্শন করে। আধুনিক পশ্চিম আফ্রিকায় ধর্মীয় পরিবর্তনের উপর গবেষণাকারী আই. ডি. ওয়াই পিল বলেন,

সাক্ষরতাহীন সমাজে অতীতকে বর্তমানের প্রয়োজনের দাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়, বিষয়গুলো ভুলে যাওয়া হয় এবং পৌরাণিক কাহিনী সমসাময়িকতার যথার্থতা প্রতিপন্ন করার জন্য গঠিত হয়; শব্দসমূহের সংজ্ঞার জন্য কোন অভিধান থাকে না। ----- ধর্মীয় ব্যবস্থায় মতবাদের কোন নৈর্ব্যক্তিক বা সার্বজনীন স্বীকৃত অনুভূতি থাকে না; কোন নির্দিষ্ট ধর্মনেতা বা পূর্বতনের ব্যাখ্যাকেই বৈধ বিশ্বাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু যেখানে ধর্মের মানে 'খোদা'র কথা' যেখানে সকল যুক্তি একটি অপরিবর্তনীয় লিখিত ভাষ্যের মাধ্যমে বিবর্তিত হয়, যেখানে সংকটময় মুহূর্তে

---

৭৩. পবিত্র কুরআনেই এই মৌলিক বিষয়টি বারবার ঘোষণা করা হয়েছে-অর্থাৎ "আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে, তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ। সূরা ১৬: ৮৯।

যারা নতুন বিশ্বাসের প্রণয়ন করেন, সেগুলো লিখিত রূপ গ্রন্থাকারে প্রকাশের মাধ্যমে তাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকেন, সেখানে ধর্ম থাকে একটি শক্ত ভিত্তিতে। 'কাঠামোগত বিস্মৃতি' কদাচিৎ সম্ভব; কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে অতীতের চিন্তাই বর্তমানের জন্য পালনীয় বলে গণ্য হয়; ধর্মকে নিরঙ্কুশ ও সার্বজনীন খোদা'র নিকট থেকে সঞ্চারিত বিধি বিধানের একটি ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা চিন্তাশীলের কাছে বহিরাগত বিষয় এবং সে যদি রক্ষা পেতে চায়, তবে অবশ্যই তার সাথে খাপ খাইয়ে নেবে ও তার প্রতি ঝুঁকে থাকবে।[৭৪]

পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মণরা হালকাভাবে ছড়িয়ে ছিল, পিলের বর্ণিত 'নির্দিষ্ট ধর্মনেতা বা পূর্বতনের' অনুরূপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন স্থানীয় ধর্মাচারী হিসেবে বিদ্যমানরা সাক্ষরতাসম্পন্ন বা ব্রাহ্মণ কোনটাই ছিল না। এটাও সত্যি যে, বাংলার পূর্বাংশের সমভূমিতে ছড়িয়ে পড়া মসজিদ নির্মাতা *মোল্লা* বা সম্মোহনী শক্তিসম্পন্ন *পীরগণ* হয়তো নিরক্ষর ছিলেন; অধিকন্তু, তাদের কর্তৃত্বের ভিত্তি ছিল আদিবাসী অমুসলমান ধর্মচারীদের মতোই প্রকৃতিগতভাবেই সম্মোহক। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো এই লোকগুলোই কুরআন তিলাওয়াতকারী ও ফাতিহা পাঠকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, ফলে তাঁরা আরবীতে স্রেফ আধা-সাক্ষরতাসম্পন্ন হলেও তাঁদেরকে লিখিত বাণীর কর্তৃত্বের প্রতিনিধি হিসেবে দেখা হতো, যা ছিল দেশজ ধর্মচারীদের সাময়িক, স্থানীয়কৃত ও ক্ষণস্থায়ী কর্তৃত্বের বিপরীত।[৭৫] তাই কুরআন তিলাওয়াতকারী, কুরআন স্কুল (মাদরাসা) ও 'ফাতিহা পাঠকারীদের' বদ্বীপে আগমনের ফলে প্রাক-মুসলমান পূর্ববঙ্গের তুলনামূলক পরিবর্তনশীল ও সম্প্রসারণশীল সৃষ্টিতত্ত্ব আল্লাহ'র শ্রেষ্ঠত্ব ও নবী মুহাম্মদ (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্বের অনুকূলে বিবর্তিত হতে শুরু করে। পিল এটাকে ধর্ম একটি 'শক্ত ভিত্তি' অর্জন করতে শুরু করলো হিসেবে অভিহিত করেছেন।

বাংলায় 'গ্রন্থের ধর্মের' এই বৃদ্ধি ছিল কাগজ ও কাগজ প্রস্তুত প্রযুক্তির বিকাশের পরিণতি। ত্রয়োদশ শতকে তুর্কীদের মাধ্যমে মধ্য এশিয়া থেকে উত্তর ভারতে প্রবর্তিত হওয়ার পর পঞ্চদশ শতকে কাগজ প্রস্তুতের প্রযুক্তি বাংলায় তালপাতাকে সরিয়ে নিজের স্থান করে নেয়।[৭৬] ১৪৩২ সালের দিকেই চীনা পর্যটক মা হুয়ান মন্তব্য

---

৭৪. Peel, "Syncretism," 139-40. See also Jack Goody, *The Logic of Writing and the Organization of Society* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), 1-44.

৭৫. অবশ্যই *মাদরাসার* ক্ষেত্রে (কুরআন স্কুল) গ্রন্থগত ইসলামের প্রতি সরকারের সমর্থন ছিল সুস্পষ্ট। উদাহরণ হিসেবে, ১৭৩২ সালের একটি *সনদে* দেখা যায় সিলেটে ৩৯০ একর জঙ্গল এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, এই ভূমি পরিষ্কার করার পর তাতে চাষাবাদ করা হবে, মাদরাসার ছাত্রদের জন্য তা ব্যয় করা হবে *(খারাজ-ই তালিবান-ই মাদরাসা)*। "Register of Sanads," Sylhet District Collectorate Record Room, 20, no. 932.

৭৬. Losty, Art of Book, 10-12, 113.

করেছেন, বাঙালিদের 'কাগজ সাদা এটা গাছের ছাল থেকে তৈরি হয় এবং তা হরিণের চামড়ার মতো নরম ও মসৃণ।'[৭৭] আর ষোড়শ শতকের শেষদিকে কবি মুকুন্দরাম বাংলার নগরগুলোতে মুসলমান কাগজ প্রস্তুতকারীদের (কাগজি) একটি পুরো সম্প্রদায়ের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন।[৭৮] প্রাক-আধুনিক বাঙালি সমাজে সাক্ষরতার প্রযুক্তিতে সৃষ্ট বৈপ্লবিক প্রভাব বোঝা যায় পারসো-আরবি শব্দভাণ্ডার থেকে উদ্ভূত কাগজ ও কলম শব্দ দুটি কিছুটা বিকৃত হয়ে বাংলায় অতিসাধারণ হয়ে পড়ার ঘটনায়। এটাও তাৎপর্যমণ্ডিত যে, বাংলার সম্প্রসারণশীল কৃষিজ সীমান্তে কাগজ প্রস্তুতির প্রযুক্তির সমসাময়িক হয়েছিল মুসলমান ধর্মীয় সম্প্রদায়, যাদের কর্তৃত্ব কাঠামো ছিল চূড়ান্তভাবে লিখিত বাণী তথা ধর্মগ্রন্থভিত্তিক। অবশ্য কাগজ উৎপাদনের সম্প্রসারণের *কারণেই* বাংলায় বা অন্যত্র ইসলামের বিকাশ হয়েছিল মন্তব্য করা স্থূলতম প্রযুক্তির ফলে অধিক সংখ্যায় পুস্তক প্রকাশের পথ সৃষ্টি করে, যার ফলে অন্তত সাক্ষরতার ধারণার বিস্তৃতি ঘটায় এবং এই ব্যাপকতর বিস্তৃতির ফলে ধর্মীয় কর্তৃত্বের সাথে লিখিত বাণীর সম্পৃক্ততা সৃষ্টি করে।

অবশ্য, 'গ্রন্থের ধর্ম' বিকাশে ব্যবহৃত হলেও বাস্তবে প্রশ্ন সৃষ্টি করে, কুরআন এমন এক ভাষায় লিখিত, যা বাঙালি সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে অপরিচিত। অধিকন্তু, কুরআন যেহেতু আরবীতে নাযিল হয়েছিল, তাই অন্যান্যের মতো বাংলাতেও খোদার বাণী বিকৃতির আশংকায় সম্পূর্ণ অনুবাদ থেকে বিরত থাকা হয়। আমরা দেখতে পাই, এমনকি জনপ্রিয় ইসলামী কাহিনীগুলোকেও বাংলায় অনুবাদে বাঙালি মুসলমানরা প্রচণ্ড রকমের অনিচ্ছুক ছিল। তবে তারা অবশ্যই অনারব অনেক মুসলমানের মতো আরবী বর্ণমালায় নিজস্ব ভাষায় রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিল, যেমনটি ঘটেছিল ইরান (আধুনিক পারস্য) ও উত্তর ভারতে (উর্দু)। আরবী হস্তাক্ষরে যেকোন ভাষার প্রতিবর্ণীকরণের ফলে শুধুমাত্র আরবী শব্দভাণ্ডারের সাথেই একাত্মতা হয় না, বরং সেই সাথে অনারব ও আরব মুসলমানের মধ্যকার মনস্তাত্ত্বিক বন্ধনও জোরদার হয়। বাস্তবিকই সপ্তদশ শতকে বাংলায়ও একই ব্যাপার সংগঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ঢাকা জাদুঘরে রক্ষিত ১৬৪৫ সালে কারবালায় হোসাইনের শাহাদাতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত মাকতুল হোসাইন বাংলায় লেখা হলেও তাতে বাংলা নয় বরং আরবী বর্ণমালা ব্যবহৃত

৭৭. Rockhill, "Notes on the Medieval India," 440. See also S.A.K. Ghori and Rahman, "Paper Technology in Medieval India," *Indian Journal of the History of Science* 2 (November 1966): 136. সার্বিকভাবে প্রাক-আধুনিক মুসলিম বিশ্বে কাগজ প্রস্তুত প্রযুক্তি ও প্রসারের জন্য দেখুন Johannes Pedersen, *The Arabic Book*, trans. Geoffrey French, ed Robert Hillenbrand (Princeton: Princeton University Press, 1984), 59-67.

৭৮. মুকুন্দরাম, *কবিকঙ্কন চণ্ডি*, ৩৪৬।

হয়েছিল।[৭৯] এটাও তাৎপর্যপূর্ণ যে সমসাময়িক আরো অনেক লেখক একই ধরনের প্রয়াস চালালেও[৮০] তা কখনো ফলপ্রসূ হয়নি, ফলে বাঙালি মুসলমানরা বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলমান সম্প্রদায় হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করলেও ভাষা ও বর্ণমালার ক্ষেত্রে নিজেদেরটিকেই বহাল রাখে।[৮১]

যেহেতু ইসলামী পাণ্ডুলিপি কখনো প্রাক-আধুনিক বাংলায় অনূদিত বা প্রতিবর্ণীকরণ হয়নি, তাই গণ-প্রার্থনার ধরনের বিপরীতে প্রথমে জাদুবিদ্যা সংক্রান্ত গণ-সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্তি দেখতে পাওয়া বিস্ময়ের কিছু নয়। সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গলে আমরা শুনতে পাই, কাব্যের অন্যতম হিন্দু চরিত্রের (চাঁদ সওদাগরের পুত্র লক্ষিন্দর) বাড়িতে অপশক্তির প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্যান্য তাবিজ-কবজের সাথে একখণ্ড কুরআনও রাখা হতো।[৮২] পূর্ববাংলার বরিশাল অঞ্চলের কবি বিজয়গুপ্তের ১৪৯৪ সালের দিকের রচনাতে আমরা আরো আগের মুসলমান ধর্মগ্রন্থের একই ব্যবহার দেখি।[৮৩] এক্ষেত্রে, লিখিত শব্দ কোন হিন্দু বাড়িতে নয়, বরং জনৈক মোল্লার হাতে দেখা যায়। 'হোসেনহাটিতে' স্পষ্টতই মুসলমান সাতজন তাঁতীর একটি দল, মনসা দেবীর লেলিয়ে দেওয়া সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয়ে সাহায্যের জন্য কাজির দরবারে যায়। কবি লিখেন:

কাজির ওস্তাদ এক নামেতে খালাস।
কেতাব কোরানে তার বড়ই অভ্যাস॥

মোল্লা বলে আমারে জিজ্ঞাসা যদি কর।
কেতাব থাকিতে কেন ভূতের ডরে মর॥
কেতাব লিখিয়া দাও গলে যেন থাকে।
তবে যদি ভূতের লঘে সে দোষ মোর লাগে॥

---

৭৯. Muhammad Khan, *Maqtul Husain*, Dhaka Museum MS. No. 2826, Acc. No. 6634.

৮০. উদাহরণের জন্য দেখুন Shaikh Muttalib, *Kifayat al-Mussalin*, Dhaka Museum MS. No. 18225, composed in 1856.

৮১. ১৯৬৭ সালের মতো সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি পরামর্শ দিয়েছেন যে, পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে ঐক্য জোরদার করার স্বার্থে উর্দুর মতো বাংলাও আরবী লিপিতে লেখার প্রচলন করা দরকার। কিন্তু বাঙালিরা এই উদ্যোগকে প্রতিহত করে এবং তারা কয়েক বছর পর পাকিস্তানের নিকট থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে তা অর্জনও করে। দেখুন Golam Morshed, "Cultural Identity of Former East Pakistan and Conflicting State Policies," *Journal of the Institute of Bangladesh Studies* 3 (1978): 69.

৮২. Dinesh Chandra Sen, *History of Bengli Language and Literature*, 674.

৮৩. Zbavitel, *Bengli Literature*, 161-62.

মোল্লার বচন এখন কাজির মনে লয়।
তাবিজ লিখিয়া তখন সকলেই লয়॥[৮৪]

এখানে আমরা একজন মুসলমান ধর্মনেতাকে বাংলার লোকজ সৃষ্টিতত্ত্বে পরিব্যাপ্ত (এবং এখনো পরিব্যাপ্ত) সর্বত্রগামী অশরীরী সত্তা তথা ভূত তাড়ানোর কাজ করতে দেখি।[৮৫] অধিকন্তু, মোল্লা স্পষ্টতই ধর্মগ্রন্থটিকে ধর্মীয় নির্দেশ জানার জন্য নয়, জাদুটোনার কাজে ব্যবহার করছেন, কারণ তিনি ভূত তাড়ানোর জন্য পবিত্র গ্রন্থ থেকে তিলাওয়াত করেননি, বরং কয়েকটি আয়াত লিখে তা তাবিজ হিসেবে গলায় পরতে বলেছেন এবং এই পন্থাটি রাষ্ট্র নিয়োজিত মুসলমান বিচারক তথা কাজি অনুমোদন করেছেন।[৮৬] তিন শতাব্দী আগে মোল্লারা যেমনভাবে করেছেন, বর্তমান সময়েও আরোগ্যলাভের জন্য ধর্মনেতাদের কুরআনের জাদুকরি ক্ষমতার ব্যবহার করতে দেখা যায়। ১৮৯৮ সালে ভূতে ধরা লোকদের চিকিৎসার জন্য সিলেটের এক *ওঝাকে* কুরআনের আয়াত ব্যবহার করতে দেখা যায়।[৮৭] এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পার্বত্য

---

৮৪. আবদুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস* (অনুবাদে বাংলা একাডেমীর প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে–অনুবাদক)। বিজয় গুপ্ত পদ্ম-পুরাণ।

৮৫. সমসাময়িক বাঙালি মুসলমান সমাজে, বিশেষভাবে পল্লী সমাজের মহিলাদের মধ্যে ভূতের অস্তিত্ব কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল, তা জানার জন্য দেখুন Therese Blanchet, *Meanings and Rituals of Birth in Rural Bangladesh* (Dhaka University Press, 1984), 50-63.

৮৬. ষোড়শ শতকের শেষদিকে মুকুন্দরাম লিখেন, মোল্লারাও মুসলমানদের দৈনন্দিন ধর্মাচার পালন করে এবং এই কাজের জন্য তারা গৃহকর্তার নিকট থেকে পারিশ্রমিক আদায় করে, যা হিন্দু সমাজে বিদ্যমান ব্রাহ্মণদের কার্যাবলীর সমান্তরাল: "মোল্লারা *নিকা* (বিবাহ) অনুষ্ঠান সম্পাদন করে চার আনা পারিতোষিক পায় এবং কলেমা পড়ে দম্পতিকে দোওয়া করে। সে (মোল্লা) একটা ধারালো ছুরি নিয়ে মোরগ জবাই করে এবং দশগণ্ডা কড়ি পারিতোষিক পায়। ছাগল জবাই করার জন্য মোল্লা পায় ছয় কড়ি এবং জবাই করা পশুর মাথাটাও।" মুকুন্দরাম, *কবিকঙ্কন চণ্ডি;* আবদুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস* (অনুবাদ বাংলা একাডেমীর প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে–অনুবাদক)।

৮৭. রিপোর্টটিতে বলা হয়, "লাঠি দিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তির চারপাশে একটি বৃত্ত আঁকা হয়, একই সময়ে *জাদুমন্ত্র* আবৃত্তি করা হতে থাকে; কিছু পরিমাণ সরিষার তেলের উপর কুরআনের আয়াত পড়া হয়, এবং একটি সলতে সেই তেলের উপর রেখে জ্বালানো হয় এবং ধোঁয়া আক্রান্ত ব্যক্তির নাকে প্রবেশ করে। *ভূতের* কাছে তা অসহ্য মনে হয় এবং সে আছর করা ব্যক্তির মাধ্যমে কথা বলতে বাধ্য হয়। *ওঝা* তখন *ভূতকে* তার নাম, ঠিকানা এবং কিভাবে উক্ত ব্যক্তির উপর *আছর* করলো তা জিজ্ঞাসা করে এবং সে জবাব দেয়। *ওঝা* তখন *ভূতের* সম্রাট সুলায়মান বাদশার নামে *ভূতকে* প্রতিশ্রুতি করতে বলে যে সে আর কখনো সেই দেহে প্রবেশ করবে না এবং তখন, সে সন্তুষ্ট হয়ে তার জাদুর বৃত্তটি কেটে দেয় এবং ভূত চলে যায়। Bhattarchajee, "Folkcustom and Folklore," 19-20. এ ব্যাপারে থেরেস ব্লাংচেটের *ভূত* সম্পর্কিত মন্তব্যে বাঙালি লোকজ জীবনে তার প্রভাবের মৌলিক বর্ণনা পাওয়া যায়: "বলা হয়ে থাকে ভূতের উৎপত্তি উত্তরের পর্বতগুলোতে। সভ্যতার বিকাশের আগে

চট্টগ্রামের অমুসলিম চাকমা উপজতীয় *ওঝারা* তাদের আরোগ্যকারী ব্যবস্থায় মুসলমান ধর্মগ্রন্থ এবং ইসলামী অতিলৌকিক সত্তাসমূহের সাথে একীভূত হওয়ায় বদ্বীপের বাইরে এবং সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় ইসলামী ধর্মীয় সংস্কৃতির অব্যাহত অনুপ্রবেশের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।[৮৮] অন্যদিকে ইউরোপীয়ান পর্যবেক্ষকরা উল্লেখ করেছেন, বাঙালি মোল্লারা জাদুটোনায় নয়, বিধিবিধান হিসেবেও কুরআনকে ব্যবহার করে। ১৮৩৩ সালে ফ্রানসিস বুকানন উল্লেখ করেন, দিনাজপুরের পল্লীতে মোল্লারা বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, খৎনা ও কোরবানিতে দোয়া বা কুরআন থেকে তিলাওয়াত করে, জবাই করার আগে দোয়া পড়া না হলে কোন মুসলমানই সেই পশু বা পাখির গোশত খায় না।.... কাজিদের মতে, অনেক মোল্লা পড়তে পারে না, তারা দোয়া পড়ার সময় শুধুমাত্র গ্রন্থটির দিকে তাকিয়ে থাকে।'[৮৯] যদিও বুকাননের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী মোল্লারা পড়তে জানে না, কিন্তু তবুও গ্রামবাসীরা তাদেরকে লিখিত বাণীর অপরিসীম শক্তির মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বিবেচনা করতো, যা ছিল স্থানীয় ধর্মনেতাদের চেয়ে মৌলিকভাবে অনেক বড় ও অনেক স্থায়ী। একইভাবে, ১৮৯৮ সালের এক তথ্যে দেখা যায়, সিলেটের মুসলমান গ্রামবাসীরা 'তাদের পূর্বপুরুষদের মাগফেরাত কামনায়

ভূত ছিল ভূমির মালিক। কিন্তু তারপর 'মহান ধর্মগুলোর' আবির্ভাব ঘটে। এসবের শক্তিশালী ঈশ্বরগুলো *ভূতের* উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারতো। তাদের জ্ঞানী লোকেরা বা পুরোহিতরা *মন্ত্র* পড়ে ভূতকে বশ করতে পারতো। বাস্তবিকই সংস্কৃত ও আরবী উভয় মন্ত্রই *ভূতের* বিরুদ্ধে কার্যকর হতো। সেগুলোর লিখিত শব্দাবলীও (অর্থাৎ *তাবিজ*) একইভাবে কার্যকর হতো। সভ্য পন্থাগুলো সর্বত্র প্রবেশ করতে পারেনি এবং *ভূত*, এমনকি 'মহান ধর্মগুলোর' আবির্ভাব ঘটার পরও মানুষের উপর বিশেষভাবে মহিলাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতো। বিশ্বাস করা হতো, জঙ্গল বা জনবসতিহীন চরে *ভূত* বিপুল সংখ্যায় বাস করে। তবে শহরে তারা সংখ্যায় কম।" Blanchet, *Meanings and Rituals*, 54.

৮৮. ১৯৮৬ সালে বলা হয় যে এক *ওঝা* মস্তিষ্কবিকৃত এক চাকমা মহিলাকে সুস্থ করে তোলেন "উক্ত গ্রাম্য মহিলার উপর আছর করা দুষ্ট *ভূতের* প্রতি সকল ধরনের গালিগালাজ করে। তার পুরো দেহ নড়তে ও দুলতে লাগলো। সে তখন মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গ্রন্থরাজি থেকে কিছু *মন্ত্র* আবৃত্তি করতে লাগলো। সে আল্লাহ, হরি, মুহাম্মদ, কৃষ্ণ, কলেমা, ফাতিমা, এবং জাদুটোনার জন্য বিখ্যাত আসামের কামাখ্যার দেবদেবীদের নাম জপতে লাগলো, এবং মহিলার চারদিকে বৃত্ত রচনা করতে লাগলো। সে তখন দেটির উপর মৃদু আঘাত করতে লাগলো এবং রোগীর নাকে গরম সরিষার তেল ঢেলে দিল। *ওঝার* সাহায্যকারী একটি টিনের ক্যান পিটাতে লাগলো। *ওঝা* তখন ধূপ জ্বালালো ও রোগীকে ঝুকে ধোঁয়া টানতে বললো।" অনুষ্ঠান শেষ হলে এবং মহিলাটি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলে *ওঝাটি* তখন রোগীর অভিভাবকদের নির্দিষ্ট একজন পীরের *মাজারে* মানত প্রদান করতে বলে। আনওয়ারুল করিম, 'শ্যামানিজম ইন বাংলাদেশ,' বাংলাদেশ অবজারভার, ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬। শেষ বর্ণনাটি বেশ তাৎপর্যমণ্ডিত, কারণ এতে আরোগ্য অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে স্থানীয় একজন মুসলমান দরবেশের সাথে যোগসূত্র করার মাধ্যমে তথা গ্রামবাসীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টিকে ইসলামের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

৮৯. Buchanan, *A Geographical Statistical, and Historical Description*, 92.

তিলাওয়াত করতে মোল্লাদের নিয়োগ করে,'[৯০] অনেকটা এ ধরনের ধারণায় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে পল্লীর মসজিদ ও দরগাগুলোতে ফাতিহা নামক ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করতে সনদে বলা হতো।

এই সবকিছুই প্রগতিশীলভাবে সাক্ষরতার সংস্কৃতির পল্লীতে সম্প্রসারিত হতো- অর্থাৎ লিখিত ধর্মীয় গ্রন্থাবলী এবং সেগুলোর সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের (তারা সেসব গ্রন্থ পড়তে জানুক আর নাই জানুক) প্রতি কর্তৃত্ব প্রদান করার প্রবণতা প্রদর্শন করতো। সাক্ষরতার এই সম্প্রসারণরত সংস্কৃতি প্রকৃতিগতভাবেও যেসব অতিলৌকিক সত্তা সবচেয়ে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হতো সেসব ধর্মমতের প্রতি বর্ধিত হারে অনুরক্ত হতো। সংক্ষেপে, 'কর্তৃত্ব-হিসেবে-গ্রন্থের' ধারণা পূর্ব বাংলার পল্লী সমাজের সদা-বিস্তৃত মহলগুলোর মধ্যে বিকশিত হতে থাকায়-ষোড়শ শতক থেকে যা সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হতে থাকে-'গ্রন্থের ধর্ম' মতো আল্লাহকে সৃষ্টিতত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্বের উপর গুরুত্বারোপ করা হতে থাকে।

লিঙ্গ ও ইসলামীকরণ

বাংলায় ইসলামের বিবর্তন অর্থনৈতিক ভিত্তি ও আদর্শগত উপরকাঠামোর মধ্যকার জটিল সম্পর্কের কথা প্রকাশ করে, যা সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ববিদদের দীর্ঘস্থায়ী ইস্যু এটা প্রমাণিত যে, বদ্বীপের পূর্বাঞ্চলের আদিবাসী মানুষের সম্প্রসারণরত কৃষিজ সমাজের সাথে একীভূত হওয়ার ফলে তাদেরকে ধীরে ধীরে ইসলামীকরণের পথ দেখায় এবং এই প্রেক্ষাপটে একটি পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক ভিত্তি অনিবার্যভাবে আদর্শগত উপরকাঠামোর বা ইসলামের আকার দিতে থাকে। এটাও ঠিক যে, 'আল-কিতাব' এর নির্দেশিত যথাযথ সমাজের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রাক-আধুনিক বাংলায় ছড়িয়ে পড়া পারসো-ইসলামী জনপ্রিয় কাহিনীসমূহ একত্রে বদ্বীপের মুসলমান সংস্কৃতির বিবর্তন করেছিল। বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়গুলোর মহিলাদের পরিবর্তিত মর্যাদায় এই বিষয়টি সবচেয়ে বেশি দৃষ্টগোচর হয়।

নৈতিক পরিভাষায় পবিত্র কুরআনের 'বিশ্বাসী পুরুষ', 'বিশ্বাসী নারী' এবং 'মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী' বারবার উল্লেখের মাধ্যমে দুই লিঙ্গকে খোদার কাছে সম্পূর্ণভাবে সমান অবস্থানে রেখেছে (কুরআন, ৩৩ : ৩৫)। কিন্তু সামাজিক পরিভাষায়, নারীরা পুরুষের অধীনস্থ। এটা সত্য যে, সপ্তম শতাব্দীর আরবের প্রেক্ষাপটে মহিলাদের সম্মানিত করার কুরআনের বিধিবিধান ছিল নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল শক্তি: কুরআন মহিলাদের প্রতি ন্যায় আচরণ করার উপর গুরুত্বারোপ করেছে, মেয়ে শিশু হত্যা নিষিদ্ধ করেছে ও ক্রীতদাসীদের উত্তরাধিকারের অধিকার

---

৯০. Bhattarcharjee, "Folkcustom and Folklore," 139. Emphasis mine.

দিয়েছে বা উত্তরাধিকার ও তালাকের মতো ঘটনার ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য আইনগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু মহিলারা পুরুষদের অর্ধেক পরিমাণের উত্তরাধিকারী হয় এবং সাধারণভাবে তাদের জন্য পুরুষ তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন হয়, যা কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে দেখা যায়:

পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সেমতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং (মৃদুভাবে) প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না।[৯১] (৪ : ৩৪)

এই আয়াতের বিষয়বস্তুতে আল্লাহ, পুরুষ ও মহিলাদের কর্তৃত্বের কাঠামোগত পরম্পরার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। খোদা ও পুরুষরা হলো কর্তাবাচক এবং ঘটনা সম্পাদনকারী এবং নারীরা কৃতকর্মের বিষয়বস্তু; সূরা আন-নিসা (৪ : ১-৪৩) তথা 'নারী' শিরোনামের সূরাটির একটি বড় অংশ জুড়েই নারীদের প্রতি পুরুষদের আচরণ কেমন হবে, সেই সংক্রান্ত খোদার বিধিবিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

যে সময় সমাজ আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামী হয়ে পড়ে, শেষ পর্যন্ত বাংলাসহ, সেসবের অধিকাংশতেই এসব কিতাবী নিয়মকানুন ধীরে ধীরে সামাজিক বাস্তবতায় প্রতিফলিত হতে থাকে। প্রথম দিককার মুসলমানরা অনারব সভ্যতার অনুসারীদের সংস্পর্শে আসার সময় তাদের মধ্যে বিরাজমান সামাজিক রীতিনীতিতে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। তাই সপ্তম শতাব্দীতে মেষপালক আরবরা যখন ইরাক ও সিরিয়ার

৯১. *The Glorious Koran: A Bilingual Edition with English Translation, Introduction and Notes*, trans. Marmaduke Pickthall (London: George Allen & Unwin, 1976), Sura 4: 34. উত্তরাধিকারের ইসলামী বিধানটি উপলব্ধির জন্য পুরোপুরি ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। ইসলাম নির্ধারিত আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার আলোকেই তা করা হচ্ছে। ইসলাম নারী ও পুরুষকে সমান হিসেবেই সৃষ্টি করার কথা ঘোষণা করেছে। উভয়ই একই উপাদানে তৈরি বলে ঘোষণা দিয়েছে। এমনকি বাইবেলের মতো পৃথিবীর সকল অনাচার ও দুঃখের জন্য প্রথম নারী হাওয়াকেও দায়ী করেনি। তাছাড়া নারীর উপর পুরুষের এবং পুরুষের উপর নারীর শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাও বাতিল করে দিয়েছে। ইসলামে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাপন এবং বিবাহকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়। সাধারণভাবে পিতার মৃত্যুর সময়ে সন্তানরা প্রাপ্তবয়স্ক এবং বিবাহিতই থাকে। তাছাড়া বিয়ে সাধারণত একই আর্থ সামাজিক স্তরে হয়ে থাকে। ফলে পুত্র সন্তানদের অর্ধেক কন্যা সন্তান পেয়ে থাকলেও তার স্বামীও প্রায় একই পরিমাণের সম্পদ পেয়ে থাকে। আবার পুত্র সন্তানটির স্ত্রীও একইভাবে একটি অংশ লাভ করে। ফলে সার্বিক হিসাবে একে একটি সুষম বণ্টন হিসেবেই অভিহিত করা যায়। ইসলামের উত্তরাধিকার বিধান সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বর্তমানে সহজলভ্য। এগুলোও এ প্রসঙ্গে পাঠ করা যেতে পারে। –অনুবাদক

কৃষিজ সমাজ জয় করলো, তখন মুসলমান বিজয়ীরা গ্রীক এবং বিশেষভাবে ইরানি সভ্যতার একটি বড় অংশ আত্মস্থ করে নেয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বর্তমানে যাকে বলা হয় পর্দা ব্যবস্থা-বায়জানটেনীয় ও সাসানীয় সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান এই ব্যবস্থায় মহিলাদেরকে তাদের একান্ত বিষয়গুলো ছাড়া পুরুষদের সাথে সম্পর্কিত বাকিসব বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এবং মহিলাদের বাড়িতে নিজস্ব মহলে থাকতে হয় এবং তারা বাইরে বের হওয়ার সময় তাদেরকে বোরকা পরতে হয়।[৯২]

অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মহিলাদের পৃথক রাখা এবং বোরকা পরার বিষয়টি বাগদাদে আব্বাসীয় রাজদরবারে সরকারি নীতিতে পরিণত হয়। শীঘ্রই শহুরে মুসলমানদের সকল সামাজিক শ্রেণী রাজদরবারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করায় চতুর্দশ শতক নাগাদ পুরো আরব মুসলমান বিশ্ব থেকে মহিলারা প্রকাশ্য জীবন থেকে অদৃশ্য

৯২. Marshall Hodgson, *Venture of Islam*, 1: 342। বোরকা পরিধানের ফলে নিম্নতর শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত কায়িক পরিশ্রমের উপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, যা অনেকটা একাদশ ও দ্বাদশ শতকে চীনের উচ্চ শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে প্রচলিত পা বাঁধার প্রথার সাথে তুলনীয়। বোরকা বা পর্দা অনুসরণের জন্য কুরআনে বলা হয়েছে (সূরা ২৪: ৩১, ৩৩: ৫৯)। পর্দা, বোরকা কিংবা হিজাব সম্পর্কিত ইসলামী ব্যবস্থা নিয়ে অনেককেই সমালোচনামুখর হতে দেখা যায়। পশ্চিমা সমাজব্যবস্থার আলোকে, তাদের দর্শনে বিষয়টি দেখায় বিভ্রান্তি দেখা দেয়। সার্বিক বিবেচনায় বিষয়টি দেখলে তাতে ক্ষতিকর কিছু পাওয়া যায় না। প্রথমত ইসলাম শুধু নারীদের জন্যই পোশাকের বিধান প্রবর্তন করেনি, পুরুষদের জন্যও তা প্রদান করেছে। অবশ্য দু'য়ের পোশাকের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। পশ্চিমা, কিংবা আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু সমাজেও আদিকালে পর্দাব্যবস্থার প্রচলন ছিল। অনেকেই মনে করেন, প্রতিটি সভ্য সমাজেই এই ব্যবস্থা দেখা যায়। ইসলামে পর্দা মানে অবরোধ নয়। শুধুমাত্র পর্দার কারণে পূর্ববঙ্গের নারীরা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়েছে, তা বলা ঠিক নয়। বরং অন্যান্য কারণকে এড়িয়ে যাওয়া হয় এই অভিযোগের মাধ্যমে। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র নানাভাবে আক্রমণ করছে, পরিণতিতে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আসছে না। তছাড়া আগের মতো এখনো অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মুসলমান মহিলারা ঘরের বাইরের বিভিন্ন কাজ করছে। অধিকন্তু এক সময়ে এদেশে ভূমির তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যা ছিল কম। তাই মেয়েদেরও মাঠে কাজ করতে হতো। কিন্তু পরবর্তীতে তা আর বহাল থাকেনি। তাই অর্থনৈতিক কারণেও অবস্থাটির পরিবর্তন হয়ে থাকতে পারে। উপমহাদেশে অমুসলমান সম্প্রদায়ের মহিলারা পর্দা না করার কারণে আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে আছে, তাও ঠিক নয়। সেখানে অনেক স্থানে এখনো মেয়ে শিশুকে সাদরে গ্রহণ করা হয় না। মেয়ে শিশুর মৃত্যুর হারও অনেক বেশি। এমনকি বর্তমানে অত্যাধুনিক নানা পরীক্ষার মাধ্যমে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই মেয়ে শিশুকে হত্যার ঘটনা দেখা যায়। আর এসব ঘটনাই বলে দিচ্ছে, পর্দাব্যবস্থা না থাকলেও মেয়েরা সেখানে পুরুষদের মতো সমান হিসেবে চিহ্নিত হয় না। অবশ্য, পর্দা কতটুকু, কিভাবে এবং কখন করতে হবে তা নিয়ে ইসলামের নামে কেউ যদি নিজের মনগড়া বক্তব্য চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালায়, সেজন্য ইসলামকে দায়ী করা চলে না। বর্তমানে পর্দা সম্পর্কিত প্রচুর পুস্তক সহজলভ্য। বিষয়টি পুরোপুরি পরিষ্কারের জন্য সেগুলো দেখা যেতে পারে। –অনুবাদক

গ্রহণ করা তুর্কী, ভারতীয় ও পশ্চিম আফ্রিকান জনগণের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। তাই মহান আরব পর্যটক ইবনে বতুতা (মৃত্যু ১৩৭৭) দক্ষিণ আনাতোলিয়া, মধ্য এশিয়া ও মালদ্বীপে বোরকাহীন মুসলমান মহিলাদের দেখে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।[৯৩] ইবনে বতুতা মধ্য এশিয়ার তুর্কী মহিলাদের অসংযত সামাজিক কর্মকাণ্ডে বিশেষভাবে অবাক হয়েছিলেন।[৯৪]

বাংলাতেও ইসলামের আত্মপ্রকাশের আগে ও সময়ে, বহিরাগতরা একই ধরনের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছেন। পল্লী এলাকায় ইসলাম একটি শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের আগে ১৪১৫ সালে বাংলায় আগত মিং চিনা দূত ধানক্ষেতে কাজ করার কথা উল্লেখ করেন, 'নারী ও পুরুষরা মওসুম অনুযায়ী ধানক্ষেতে কাজ করে বা কাপড় বোনে।'[৯৫] পরের শতাব্দীর শেষদিকে তথা ১৫৯৫ সালের দিকে আবুল ফজল চট্টগ্রামে তাঁর প্রবেশের কথা লিখতে যেয়ে বলেন, 'কোন প্রধান ব্যক্তি যখন দরবার ডাকেন, তখন সামরিক ব্যক্তিদের স্ত্রীরাও উপস্থিত হবেন, অভিবাদন জানাতে শুধুমাত্র পুরুষরা উপস্থিত থাকতে পারে না।' বাংলা সম্পর্কে তিনি সাধারণভাবে মন্তব্য করেন যে, 'নারী ও পুরুষরা লুঙ্গি ছাড়া আর কিছুই পরে না। মহিলারাই প্রকাশ্য লেনদেনের অধিকাংশ কাজ করে।'[৯৬] আবুল ফজল যখন একথা লিখছিলেন তখন মুসলমান সম্প্রদায় সবেমাত্র বাংলার পল্লীতে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছিল, তাই তার মন্তব্যে বোঝা যাচ্ছিল, তখনো মহিলাদের বোরকা বা আলাদা রাখার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়নি।

যদিও একটি বিচ্ছিন্ন সমাজের নিয়মাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি অনস্বীকার্যভাবেই কিতাবী ইসলামের অংশবিশেষ গঠন করেছিল এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি বাঙালি জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে প্রবেশরত ইসলামী সাহিত্যিক কর্তৃত্বে ক্রমাগত বেশি করে দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। শ্রমের নিয়মাত্মক লিঙ্গ ভেদাভেদের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ষোড়শ শতকে রচিত আদম ও হাওয়ার কাহিনীর একটি বাঙালি সংস্করণে। সৈয়দ সুলতানের মহাকাব্য নবী-বংশে জিবরাইল ফেরেশতা আদমকে একটি লাঙল, একটি জোয়াল, বীজ ও দুটি বলদ দিয়ে উপদেশ দেন, 'নিরঞ্জন (আল্লাহ) আজ্ঞা হৈছে কৃষি হৈব ভাল (নিয়তি)।'[৯৭] আদম তখন বীজ বপন করলেন এবং ফসল তুললেন। একই সময়ে হাওয়াকে আগুন দেওয়া হলো এবং এর মাধ্যমে তিনি রান্নার কৌশল শিখলেন।[৯৮] সংক্ষেপে ঘরোয়া

---

৯৩. *Ibn Battuta: Travels in Asia and Africa*, trans. H.A.R Gibb (London: Routledge & Kegan Paul, 1929), 124, 146-47, 243-44, 321.

৯৪. Ibid., 146-47.

৯৫. Rockhill, "Notes on the Medieval India," 443. হু সিয়েন বদ্বীপের অভ্যন্তরভাগ মোটামুটি ভালভাবেই দেখেছিলেন, কারণ তিনি চট্টগ্রাম থেকে সোনারগাঁও হয়ে পাণ্ডুয়ায় গিয়েছিলেন।

৯৬. Abul Fazl Allami, *Ain-i Akbari* (Lucknow ed.) 2: 75, 76 trans., 2: 132, 134.

৯৭. Saiyad Sultan, *Nabi-Bamsa*, 1: 107-8. (অনুবাদে আহমদ শরীফ সম্পাদিত *নবী-বংশের* বাংলা সংকলন ব্যবহার করা হয়েছে—অনুবাদক)

৯৮. Ibid., 110.

জীবন হবে হাওয়ার ভাগ্য এবং আদমের পেশা হবে কৃষিকাজ। ১৭০০ সালের দিকে, ইসলামীকরণের প্রক্রিয়ার এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যখন বাঙালি পল্লীতে সূচিত রোমান্টিক সাহিত্যে তখন কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে মুসলমান কৃষকদের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছিল। শ্রমের লিঙ্গ ভিত্তিক বিভাজন এবং মহিলাদের দূরে রাখার প্রথা ইসলামী পশ্চাদভূমিতে অনেক আগে থেকেই দেখা গেলেও বাংলায় মুসলিম পল্লীগুলোতে তখনো দেখা যায়নি। ১৭০০ সালের দিকে দক্ষিণ সিলেটের বানিয়াচং শহরে মনসুর বয়াতির লেখা দেওয়ানা মদীনায় এক মুসলমান নারী কৃষকের মৃত স্বামীর জন্য বিলাপ করতে দেখা যায়। বিলাপে বলে,

মদিনা কান্দয়ে 'আল্লা কি লেখ্ছ কপালে।
বনের পংখী অইয়া যেমন উইড়া গেলে চইলে॥
পরাণের পংখী আমার পরাণ লইয়া গেলা।
পাষাণে বান্ধিয়া দিল্ রহিলা একেলা॥
একদিন তো না দেখ্যা থাকিতে পারিত।
কোন্ পরাণে কর্‌লা ইতে *(হীতে)* বিপরীত॥
লক্ষ্মী না আগণ *(অগ্রহায়ণ)* মাসে বাওয়ার দাওয়া মারি
(হেমন্তিক ধান তাড়াতাড়ি ঘরে তোলা)।
খসম মোর আনে ধান আমি ধান লাড়ি *(বিছিয়ে দেই)*॥
দুইজনে বস্যা (বসে) পরে ধান দেই উনা *(কুলা দিয়ে ঝাড়ি)*।
পোষ না মাসেতে যখন ছাবে সাইল ক্ষেত।
আমি না অভাগী পর দেই *(পাহারা দেই)* যত লেত খেত (যন্ত্রণা সহ্য করে)॥
উক্কায় *(হুক্কা)* ভরিয়া পানী তামুক ভরিয়া।
খসমের লাগ্যা থাকি পন্থ পানে চাইয়া॥
হায়রে পরানের বন্ধু রইলা কোন্ দেশে।
অভাগী কান্দিয়া মরে তোমার উদ্দেশ্যে॥
ক্ষেত না পেকিয়া *(কর্দমাক্ত করে)* কসম যখন দেখ গুছি (চারা গুজে দেয়)।
ভাত না রান্ধিয়া তার লাগ্যা থাকি বসি॥
জালা আগুয়াইয়া *(এগিয়ে)* দেই ক্ষেতের কাছেতে।
কত তারিপ *(প্রশংসা)* করে খসম *(স্বামী)* আসিয়া বাড়ীতে॥
কোন্ না পরাণে খসম রইলে ভুলিয়া।
মনের যে দুঃখে যায়রে অঙ্গ মোর জ্বলিয়া॥
হায়রে দারুণ আল্লা যদি আছিল মনে।
কেনে বা নিদয় অইলে দেখাইয়া স্বপনে॥
দারুণ মাঘ না মাসে শীতে কাঁপয়ে পরাণি।

পতাবর *(সকালে)* উঠা খসম সাইল ক্ষেতে দেয় পানী॥
আগুন লইয়া আমি যাই ক্ষেতের পানে।
পরাব অইলে *(শীতে কষ্ট পেতে থাকলে)* আগুন তাপাই দুইজনে॥
সাইলের দাওয়া মারি দুয়ে যতনে তুলিয়া।
সুখে দিন যায়রে আমরার ঘরেতে বসিয়া॥[৯৯]

কেউ যদি বর্তমানের বাঙালি মুসলমান সমাজকে প্রথমদিকে রচিত এই পালার সাথে তুলনা করে, তবে পর্দা ব্যবস্থা বাস্তবে পরিণত হওয়ার একটি পরিস্ফুট চিত্র দেখতে পাবে। এই পালায় যখন দেখা যাচ্ছে, নারী ও পুরুষরা একত্রে ধান কাটছে, শুকানোর জন্য ছড়িয়ে দিচ্ছে, চারাগাছ লাগাচ্ছে, তখন বর্তমানকালে শুধুমাত্র পুরুষরা এই কাজ করছে এবং মহিলারা শস্যকর্তনের পরবর্তী কাজগুলো তথা-ধান মাড়ানো, ভেজানো, সিদ্ধ করা, ধান ভানার কাজ করছে-সবই গোলাবাড়ির উঠানে সীমাবদ্ধ থেকে করতে হয়।[১০০] সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী মহিলা শ্রমের গৃহায়নের পেছনে মূল চালিকা শক্তি ছিল পর্দা ব্যবস্থাসহ যথার্থ ইসলামী আচরণের জনপ্রিয় হয়ে পড়া মহিলাদের আলাদা রাখার সেই ব্যবস্থা।[১০১] বিপরীতক্রমে হিন্দু প্রাধান্যপূণ সম্পৃক্ততা অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দী থেকে আরব মুসলমান সমাজগুলোতে নিয়মাত্মক বদ্বীপের পশ্চিমাংশে পল্লী নারীরা ফসল উত্তোলনপূর্ব মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমে অংশ নিত।[১০২] একইভাবে চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকায় জুম চাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোগল

---

৯৯. Dinesh Chandra Sen, ed. and trans. *Eastern Bengal Ballads*, 1: pt. 1: 307-8. (অনুবাদের উদ্ধৃতিগুলো শ্রী দীনেশচন্দ্র সেনের *মৈমনসিংহ গীতিকার* বাংলা গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে– অনুবাদক)

১০০. পর্দা ব্যবস্থা কিভাবে মহিলাদের বাড়ির বাইরের অর্থনৈতিক তৎপরতা থেকে বিরত রাখছে, তা বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, Mahmuda Islam, "Social Norms and Institutions," in *Situation of Women in Bangladesh*, ed. Mahmuda Islam et al. (Dacca: UNICEF, 1979), 225-64.

১০১. "সনাতন গ্রাম্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ এবং বিশেষভাবে সময়ে সময়ে গ্রামে আগত শ্রদ্ধাভাজন প্রচারকগণ সব সময়েই পুরুষদের প্রতি তাঁদের মহিলাদেরকে অভ্যন্তরভাগে রাখার জন্য ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করেছেন।" Tahrunnessa A. Abdullah and Sondra A. Zedienstein, *Villge Women of Bangladesh:* Prospects for Change (New York: Pergamon Press, 1982), 56. বিভিন্ন আর্থ সামাজিক শ্রেণীতে মহিলাদের পর্দা ব্যবস্থার কঠোরতার জন্য দেখুন Florence Mc Carthy, *The Status and Condition of Rural Women in Bangladesh* (Dacca: Ministry of Agriculture and Forests, 1978).

১০২. গড় আয়ু, সাক্ষরতার হার, অপুষ্টি, এবং মৃত্যুহার প্রভৃতি সূচক ব্যবহার করে অর্থনীতিবিদ প্রণব বর্ধন উল্লেখ করেন যে, পাঞ্জাব এবং রাজস্থানের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং উড়িষ্যায় মহিলাদের মর্যাদা অপেক্ষাকৃত উন্নত। বর্ধন ব্যাখ্যা করেন যে, এই পার্থক্য সংস্কৃত বা ধর্মের কারণে নয় বরং পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কারণে, যা উত্তরাঞ্চলীয় ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের চেয়ে ভিন্ন। তিনি বলেন,

প্রশাসন, মুসলমান পথপ্রদর্শক ও ধানচাষীদের আত্মপ্রকাশের আগে মহিলারা মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম–বপন, নিড়ানি, ফসল তোলা ও মাড়াই ইত্যাদি কাজ করতো এবং সাধারণভাবে সামাজিক বিধিনিষেধের বাইরে ছিল।[১০৩]

এতে ধারণা করা যায়, ষোড়শ শতক থেকে ন্যূনতম মুসলমান হয়ে পড়া সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে নারী ও পুরুষের মধ্যে শ্রমবিভাজন এবং পরিশেষে সেই দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করার নিয়মাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি আত্মপ্রকাশের মধ্যে সময়ের কিছু পার্থক্য ছিল। পুরুষদের বা ধর্মীয় সাক্ষরতার সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ধীরে ধীরে বিকাশের ফলে অর্থাৎ লিখিত বাণী প্রয়োগ করার ধারণা কারো দৈনন্দিন জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার বিধান ছিল ইসলামী অতিলৌকিক সত্তাগুলোর প্রতি ক্রমবর্ধমান হারে মনোযোগ দেওয়ার পরিণাম।

সারাংশ

১৭৯৮ সালে ইংরেজ পর্যবেক্ষক ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা ফ্রানসিস বুকানন সরকারি কাজে চট্টগ্রামের পার্বত্য ও জঙ্গলাকীর্ণ অভ্যন্তরভাগ সফর করেন এবং ঘটনাক্রমে তার দেখা মানুষদের ধর্ম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণের কথা লিখে

নয়– মহিলা শ্রম বেশি প্রয়োজন হয়। ধান চাষাবাদের এলাকাসমূহে বপনের কাজটি বিশেষভাবে মহিলাদের কাজ; অধিকন্তু আগাছা পরিষ্কার, ফসল তোলা এবং ধান মাড়াইয়ের কাজে মহিলাদের শ্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ থেকে বর্ধন মন্তব্য করেছেন, "মহিলাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্য প্রতিবেশগত অবস্থা এবং কোন অঞ্চলের উৎপাদনের সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত।" এটা সত্য যে হিন্দু প্রাধান্যপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গে ধান বপন, আগাছা পরিষ্কার, এবং ফসল তোলার কাজে মহিলারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করতো, এবং এর ফলে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের তুলনায় তাদের সামাজিক মর্যাদা ছিল উচ্চতর। কিন্তু মুসলমান প্রাধান্যপূর্ণ পূর্ববঙ্গে বদ্বীপের পশ্চিমাংশের মতোই অর্থনৈতিক ভিত্তি থাকলেও মহিলারা সাধারণত এসব কাজে অংশগ্রহণ করতো না। অন্য কথায়, বর্ধনের ধারণার বিপরীতে, অঞ্চলের অর্থনৈতিক ভিত্তি মহিলাদের সামাজিক মূল্য নির্ধারণ করতো না। অন্যদিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক চালক হিসেবে ইসলাম বাংলা বদ্বীপে তুলনামূলকভাবে মহিলাদের নিম্ন মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত ছিল। দেখুন Pranab K. Bardhan, "On Life and Death Questions," *Economic and Political Weekly*, August, 1974, 1302-4.

১০৩. Lucien Bernot, *Les Paysans arakanais du Pakistan oriental* (Paris: Mouton, 1967), 249-64. As the author notes: "Apres quelques jours passes dans les plaines des environs de Chittagong, en milieu bengali, ou les femmes, surtout les mususlmanes, sont invisibles le voyageur europeen est toujours surporis de renocontrer des les pemiers villages des collines, des groupes de femmes bavardes, interrompoant les conversations de leurs epoux, nullement effrayees par la venue de l'etranger. lui demandant ou il va, est son nom, s'il parle marma, lui offrant spontanement un cigare ou des fruits, de l'eau fraiche ou du betel." Ibid., 16.

রাখেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বুকাননের মতে, সীতাকুণ্ডের পার্বত্য এলাকার 'আরাকানি' মানুষেরা কোন এক বিশেষ ধরনের শিবের পূজারী।[১০৪] মধ্য চকোরিয়ায় তিনি বনে বসবাসরত তেল, মধু ও মোম সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহকারী মুসলমানদের দেখতে পান।[১০৫] আরো দক্ষিণে উখিয়ায় জুম চাষীদের মধ্যে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী দেখতে পেয়ে বলেন, 'গোঁড়া বার্মার চেয়ে বেশ ভিন্ন': তাদের পুরোহিতরা 'পাঙ্গরি' (pungres) হিসেবে পরিচিত এবং তাদের প্রধান ঈশ্বর হলো মহামুনি, একটি বিশাল তামার মূর্তিতে তার পূজা করা হয়।[১০৬] অন্যদিকে কক্সবাজার অঞ্চলে তিনি কোন ধরনের ধর্মীয় ধারণা খুঁজে পেতে ব্যর্থ হন। 'তারা বলে তারা কোন ঠাকুর (ঈশ্বর) জানে না এবং তারা কখনো মহামুনি, রাম বা খোদার উপাসনা করে না।'[১০৭] অর্থাৎ বৌদ্ধ, হিন্দু বা মুসলমান ধর্মের সৃষ্টিকর্তার সাথে তারা সম্পর্ক রাখে না। স্পষ্টতই অষ্টাদশ শতকের শেষ নাগাদ বাংলার সর্ব-পূর্বপ্রান্তের জুম চাষীদের মধ্যে গ্রন্থভিত্তিক ধর্ম সামান্যই স্থান করে নিতে পেরেছিল। এখানে আরবী আল্লাহ বা এর কাছাকাছি ফারসি খোদা বিদ্যমান আরো অনেক শ্রেয়তর খোদার একটি মাত্র ছিল।

১০৪. Buchanan, "Account of a Journey," 20.
১০৫. Ibid., 36.
১০৬. Ibid., 62-63.
১০৭. Ibid., 67.

টেবিল ৯ : বাংলায় ইসলামীকরণের ধর্মীয় রূপ

A=আদিবাসী শ্রেয়তর খোদা (High God)   B= ইসলামী শ্রেয়তর খোদা
a=আদিবাসী নিম্নতর সত্তা (lesser agency)   b= ইসলামী নিম্নতর সত্তা

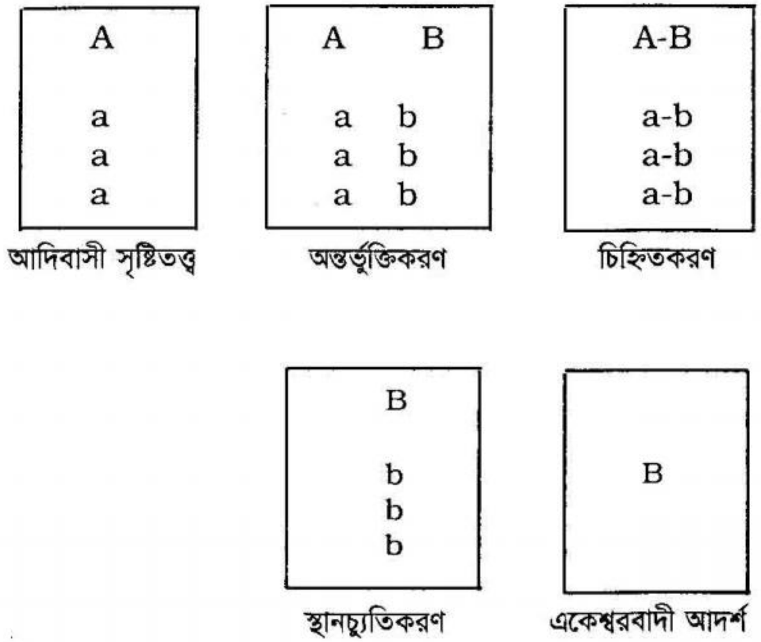

পূর্বসূরী ফ্রানকোইস পাইরার্ডের মতো বুকাননও দৃশ্যত বাংলার অভ্যন্তরে বিরাজমান ধর্মকে অনড়, রুদ্ধ ও পারস্পরিকভাবে বর্জনশীল ব্যবস্থা হিসেবে উপলব্ধি করেছেন, যেখানে প্রত্যেকের নিজস্ব সম্প্রদায় এবং প্রত্যেকের নিজস্ব অতিলৌকিক সত্তা আছে। পাইরার্ডের কাছে তারা হলো 'মুসলমান' ও পৌত্তলিক' এবং বুকাননের কাছে 'মহামুনি' (অর্থাৎ বৌদ্ধ), 'মুসলমান' ও 'হিন্দু'। কিন্তু পাইরার্ড ও বুকানন যা দেখেছেন, তা ছিল লোকজ পর্যায়ের সচ্ছিদ্র ও গতিশীল কল্পনাপ্রসূত স্পষ্ট কোন সীমান্তবিহীন ধর্মবিশ্বাস ও রীতিনীতি। বাস্তবে, বাঙালির লোকজ সৃষ্টিতত্ত্বের যথার্থ গতিশীলতার কারণে বাঙালিরা বহিরাগত আদর্শ ও সত্তার সাথে সৃষ্টিশীলভাবে মিথস্ক্রিয়া করতে পেরেছিল, যা ৯ নম্বর টেবিলে দেখানো হয়েছে। দেশজ ও ইসলামী উভয় সৃষ্টিতত্ত্বসমূহে এমন অতিলৌকিক সত্তাসমূহের প্রাধান্যপরম্পরা ছিল যার উচ্চতর

প্রান্তে কোন না কোন শ্রেয়তর খোদা (high god বা goddess) ছিল, যার অধীনে থাকতো নিম্নতর অতিলৌকিক সত্তাসমূহ। আল্লাহকে ইসলামী শ্রেয়তর খোদা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যার নীচেই ছিল নিম্নতর অতিলৌকিক সত্তাসমূহ, সেখানে নবী মুহাম্মদ (সা) ছিলেন উচ্চতর প্রান্তে এবং সম্মোহনী বিভিন্ন পীর ছিলেন নিম্নতর প্রান্তে। প্রথমদিকে সমসাময়িক পারসো-ইসলামী সংস্কৃতির অতিলৌকিক সত্তাসমূহকে স্থানীয় সৃষ্টিতত্ত্বে আগে থেকেই বিদ্যমান দেশজ শক্তিসমূহের পাশাপাশি সাদামাটাভাবে শুধু অন্তর্ভুক্ত করা হতো। সময়ের পরিক্রমায় এগুলো দেশজ সৃষ্টিতত্ত্বের সত্তাগুলোর সাথে চিহ্নিত হতে লাগলো এবং তারও পরে সেগুলো আগেরগুলোকে সরিয়ে নিজেদের স্থান করে নেয়।

অবশ্য, অন্য যেকোন বহিরাগত সত্তার মতো বাঙালি সৃষ্টিতত্ত্বে ইসলামী অতিলৌকিক সত্তাসমূহের অগ্রগতিতে সেগুলো সব সময়েই বিদেশী বিবেচনায় বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার জন্য একজন দেবতাকে শুধুমাত্র শক্তিশালী ও কার্যকর হিসেবেই বিবেচিত হলে চলবে না, সেই সাথে খাঁটি দেশজও হতে হবে।[১০৮] তাই বাংলায় ইসলামের সফলতার চূড়ান্ত কারণ নিহিত রয়েছে আরব সংস্কৃতিতে সূচিত এবং পরবর্তীতে হিব্রু, গ্রীক ও ইরানী সভ্যতায় যথাযথ হওয়া (ও যথাযথ করে নেওয়া) অতিলৌকিক সত্তাসমূহে ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাঙালি সভ্যতায় যথাযথ হওয়ার (ও যথাযথ করে নেওয়া) মধ্যে। প্রথমদিকে তা হয়েছে বাঙালি অতিলৌকিক সত্তার সাথে ইসলামী সত্তাটির সম্পর্ক বা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে। কিন্তু যখন আদম, হাওয়া ও ইব্রাহিমের মতো চরিত্রগুলো বাঙালি ইতিহাস ও সভ্যতার কেন্দ্রীয় আবহ সুরে পরিণত হলো, ইসলাম তখন বাঙালিদের কাছে সুগভীর ও প্রামাণ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো।

---

১০৮. বিংশ শতকের শেষদিকে চট্টগ্রামের একজন ভিক্ষুক, কেন সে খ্রিস্ট ধর্মে তার আগের ধর্মান্তরণের বিষয়টি পরিত্যাগ করছে, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঘোষণা করে, "বিদেশী কৃষ্ণের চেয়ে স্থানীয় কৃষ্ণ অনেক ভাল।" Risley Collection, "Reports on the Religious and Social Divisions," 9: 286-87.

উপসংহার

ভূতাত্ত্বিক জীবাশ্মের রেকর্ডের স্তরের মতোই মানচিত্রে বিরাজমান স্থানের নামও নীরবে ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষ্য দেয়। বাংলাতেও তারা অগোচরে বদ্বীপটির ইতিহাসের–বন-জঙ্গলের বিরুদ্ধে কৃষিজ সভ্যতার অগ্রাভিযানে–গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির বর্ণনা করছে। গ্রাম ও নগরসমূহের নামগুলো জলাভূমি বা বন পরিষ্কার করা এবং বাজার বসানো ও নগরকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা বলছে। 'নগর' বা 'পুর' (অর্থাৎ শহর) বলতে বোঝাচ্ছে এই প্রক্রিয়ার সমাপ্তি, যেমন কৃষ্ণনগর বা ফরিদপুর। 'হাট' 'বাজার' (তথা মার্কেট) বা 'গঞ্জ' (গুদামঘর) ইংগিত দিচ্ছে মুদ্রাকেন্দ্রিক অর্থনীতির এবং আন্দোলনটির বাণিজ্যিক ভিত্তির, যেমনটি দেখা যায় বাগেরহাট, কাশিমবাজার বা বাকেরগঞ্জ নামে। 'চাষাবাদকৃত এলাকা' (ফারসি আবাদ) দিয়ে এই প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায় (যেমন, মুর্শিদাবাদ) তথা একেবারে শুরুতে কেটে পরিষ্কারকরণের বিষয়টি বোঝাচ্ছে। একইভাবে, ইংরেজি শব্দ 'cut' এর সাথে সম্পর্কিত 'কাটি' দিয়ে বোঝাচ্ছে বদ্বীপের পূর্বাঞ্চলে অসংখ্য বসতি স্থাপন–এর উদাহরণ হচ্ছে বরিশালের স্বরূপকাঠি বা ঝালকাঠি।[১]

প্রাক-আধুনিক যুগে আরেকটি বড় বিষয় হচ্ছে বাংলায় ইসলামী সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা এবং বিবর্তন। অবশ্য, এটা ভুল হবে যদি ইসলামকে কোন এক স্তর বিশিষ্ট সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা স্থান, সময় ও সামাজিক শ্রেণীতে বিপুল সংখ্যক মানুষকে উপাসনার একটি দিকে একীভূত করে স্রেফ 'সম্প্রসারিত' হয়েছে। বরং, ধর্মটি নিজেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীতে অব্যাহতভাবে নতুন নতুন ব্যাখ্যায় অবহিত হয়ে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তাই, ত্রয়োদশ শতকে ইসলাম ছিল বদ্বীপের ক্ষমতাসীন তুর্কি বিজয়ীদের মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত এবং নগরগুলোতে, অন্তত, কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বিশেষভাবে চিশতি তরিকার সূফী দরবেশদের মাধ্যমে টিকেছিল। আরো পরে, মোগল জয়ের ফলে একটি নতুন অভিজাত আশরাফ মুসলমান শ্রেণীর–বদ্বীপের পশ্চিম থেকে অভিবাসিত বা তাদের বংশধরগণের জন্য–যারা ছিল সাধারণত প্রশাসক, সৈন্য, দরবেশ, আলেম, পণ্ডিত বা

১. H. Beveridge, *The District of Bakarganj: Its History and Statistics* (London: Trubner, 1876), 223.

বহির্বাণিজ্যের বণিক-অন্তঃপ্রবাহের সুযোগ করে দেয়। তাদের অধিকাংশই মোগল সাম্রাজ্যবাদের ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধের অনুসারী হলেও তাদের কাছে ইরানের সমৃদ্ধ চিত্রকলা ও সাহিত্য ছিল ইসলামী আদর্শ অনুসরণের একটি মাধ্যম। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে অবশ্য বাংলায় ইসলামী সভ্যতার প্রধান বাহকরা শহুরে আশরাফ ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন পূর্ব সীমান্তের কৃষক চাষী, যাঁরা ব্যতিক্রমধর্মী উপায়ে ইসলামকে তাঁদের কৃষিজ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

বাংলার প্রাক-আধুনিক যুগে এ দুটির কৃষিজ– প্রবৃদ্ধি ও ইসলামীকরণ– মিলন ছিল বিভিন্ন শক্তির ফল। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ১৩৪২ ও ১৫৯৯ সালের মধ্যবর্তী আড়াইশত বছরের ব্যবধানে অর্জিত সাংস্কৃতিক সমন্বয় বদ্বীপটিতে ইসলামীকরণে অবদান রাখে। বাংলায় প্রথম মুসলিম রাজবংশের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই যুগের সূচনা করেন সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ এবং এর সমাপ্তি ঘটে মোগল যুগের পূর্বেকার বদ্বীপের কার্যত শেষ স্বাধীন শাসক ঈসা খানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। উত্তর ভারতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ায় এবং পশ্চিম থেকে সামরিক বা প্রশাসনিক নিয়োগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই যুগে বাংলার শাসকরা স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে তাঁদের রাজনৈতিক বন্ধন সম্পৃক্ত করেন, বিশেষ করে ১৪১০ থেকে ১৫ সালে রাজা গণেশের অভ্যুত্থানের পর। এই সময়েই বদ্বীপটির সাথে ইসলামী মূল্যবোধ সমৃদ্ধ ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কের সংযোজন ঘটে। এটা ছিল একটা 'বিশ্ব ব্যবস্থা', ইমানুয়েল ওয়েলারস্টেনের সংকীর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়[২] নয়, বরং বৃহত্তর অর্থে সূফী-সাধক, হাজি, বণিক, অভিযাত্রী, আলেম ও সৈনিকদের লালিত বক্তব্য ও মূল্যবোধ প্রচারের এক ক্ষেত্র। এই উভয় ব্যবস্থার প্রকৃতি এবং বাংলার তার সাথে সম্পৃক্ততা দেখা যায় ১৩৪৫ সালে ইবনে বতুতার সিলেট সফরের মধ্যে; এই বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক বাণিজ্যিক কারণে নয়, বরং প্রখ্যাত সূফী সাধক শাহজালালের আধ্যাত্মিক দোয়া নেওয়ার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন।

অবশ্য, সুলতানি আমলের, বৈশিষ্ট্যসূচক রাজনৈতিক সমন্বয় এবং ভারত মহাসাগরীয় সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় বদ্বীপটির অন্তর্ভুক্তি গণধর্ম হিসেবে ইসলামের আত্মপ্রকাশের জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। এটা ঘটেছে অন্যান্য ঐতিহাসিক শক্তির প্রেক্ষাপটে, এগুলোর মধ্যে রয়েছে কৃষিজ সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু বদ্বীপের পশ্চিম থেকে পূর্বের পশ্চাৎদিকে সরে আসা। আর সেটি হয়েছিল বিশাল নদী ব্যবস্থার পূর্বদিকে স্থানান্তরের দীর্ঘমেয়াদী তৎপরতায় যা ধান উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মিঠা পানি ও পলি বয়ে এনেছিল, ফারনান্ড ব্রাউডেলের 'structure' বা 'Longue duree' বর্ণিত

২. See Immanuel Wallerstein, *The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century* (New York: Academic Press, 1974).

ব্যাপক প্রতিবেশগত প্রক্রিয়ার কালক্রমের অনুরূপ ছিল তা।[৩] সিদ্ধান্তসূচক ঘটনাটি ঘটে ষোড়শ শতকে গঙ্গানদী যখন পদ্মার সাথে সংযোজিত হয়, যার পরিণতিতে গঙ্গার প্রধান প্রবাহ সরাসরি বদ্বীপের পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্রে প্রবাহিত হতে থাকে।

কাকতালীয়ভাবে এই সময়েই আকবর পুরো বদ্বীপটি মোগল সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস শুরু করেন, পরিণতিতে উত্তর ভারতের সাথে বদ্বীপটির আড়াই শত বছরের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে। এতে করে গঙ্গার মাধ্যমে মোগল বিজয়ীরা সরাসরি জঙ্গলাকীর্ণ পশ্চাদভূমিতে চলে যায়, যা থেকে বাংলার সুলতানরা দূরে ছিলো। সেখানেই নতুন শাসকরা তাদের প্রাদেশিক সদর দফতর স্থাপন করে। নিশ্চিতভাবেই, ঢাকাকে মোগলদের প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিল কৌশলগত কারণে: পূর্বাঞ্চলের পশ্চাদভূমিতে আশ্রয় নেওয়া স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠিপতিদের বশ করার জন্য রাজা মানসিংহ ও ইসলাম খানের একটি অবতরণস্থানের প্রয়োজন ছিল। অবশ্য, ঢাকাকে নির্বাচিত করার মধ্যে সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য নিহিত ছিল, কারণ মোগলদের রাজনৈতিক শক্তি এমন এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়, যা কৃষিজ সম্প্রসারণের জন্য সবেমাত্র প্রতিবেশগতভাবে সবচেয়ে অনুকূল অবস্থায় পৌঁছেছে। অবাধ্য গোষ্ঠিপতিদের রাজকীয় কর্তৃত্ব স্বীকার করা মাত্র ঢাকার মোগল কর্মকর্তারা আরো স্থানীয় পর্যায়ে তাদের অধিপত্য বিস্তারের তৎপরতা শুরু করে। বদ্বীপের পশ্চিমাংশে যেখানে কার্যকর কৃষিজ ব্যবস্থা অনেক আগে বিদ্যমান ছিল, সেখানে মোগলরা গঙ্গার উজানের সমভূমির মতো বিদ্যমান জমিদারদের স্রেফ ধ্বংস বা আত্মস্থ করে নেয়। কিন্তু পূর্বাঞ্চলীয় পশ্চাদভূমি বস্তুত করতোয়ার পূর্বদিক থেকে পদ্মার দক্ষিণ ভাগ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা যা জলাভূমি বা বন-জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল— সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকেও ছিল ব্যাপকভাবে অনুন্নত। এখানে স্থানীয় অভিজাতদের বশ মানানোর চেয়ে বড় সমস্যা ছিল সে ধরনের একটি শ্রেণী সৃষ্টি করা এবং একই সাথে একটি কৃষিজ ভিত্তির বিনির্মাণ।

ফলে পূর্বদিকে কৃষিজ ও রাজনৈতিক সীমান্ত একাকার হয়ে যায়। সিলেট, চট্টগ্রামসহ সর্বত্রই সরকারের প্রয়াস ছিল ভূমির সাথে সম্পর্কিত আশ্রিত পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে তার কর্তৃত্ব গভীরতর করার রাজনৈতিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের সাথে সাথে চাষযোগ্য এলাকা সম্প্রসারণের অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জন। এসব লক্ষ্য অর্জনের একটি প্রধান মাধ্যম ছিল বনজ পশ্চাদভূমির কৃষিজ উন্নয়নের জন্য ভূমিদান করা। পুরো বদ্বীপের এ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া না গেলেও ঢাকা, বাকেরগঞ্জ, সিলেট ও চট্টগ্রামের মতো আধুনিক জেলাগুলোর তথ্যের আলোকে সাধারণ অবস্থা বোঝা যায়। যদিও বৈষ্ণব

৩. See Fernand Braudel, *La Mediterranee et le monde mediterraneen a l'epoque de Philippe II* (Paris: A. Colin, 1949). Translated by Sian Reynolds as *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II* (New York: Harper & Row, 1972).

মন্দির, শিব মন্দির ও অনেক ব্রাহ্মণ ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর বনজ এলাকা দান হিসেবে পেয়েছে, কিন্তু তবুও ভূমিদানের বড় অংশই পেয়েছে ইসলাম ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মোল্লা, মুবাল্লিগ (ইসলাম প্রচারক) ও পীরবর্গ– ব্যক্তিগণ যাঁরা বন পরিষ্কার এবং মসজিদ বা খানকা নির্মাণের কাজ তত্ত্বাবধান করতেন বা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতেন। এসব প্রতিষ্ঠান দেখতে সাদামাটা মনে হলেও এগুলোই দান হিসেবে পাওয়া এলাকার জঙ্গল পরিষ্কারকরণ ও ধান ক্ষেতে কাজ করার জন্য স্থানীয় বা দূর এলাকা থেকে আগত শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত নতুন সম্প্রদায়গুলোকে আকর্ষণ করতো এবং তাদের জন্য প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিরাজ করতো। এসব প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের কাজও করতো। ফলে সেগুলো পূর্ব সীমান্তে ইসলামের আদর্শ প্রচারের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। এইভাবে ইসলাম ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কৃষিজ উৎপাদনশীলতার সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে।

সংক্ষেপে, বাংলার পূর্বাঞ্চল শুধুমাত্র একটি কৃষিজ ও রাজনৈতিক সীমান্তই ছিল না, সেই সাথে সাংস্কৃতিকও ছিল এবং স্থানীয়ভাবে ইসলামকে বোঝাতো একটি সভ্যতা-বিনির্মাণকারী আদর্শ, একটি লাঙলের ধর্ম। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে সৈয়দ সুলতানের রচিত মহাকাব্য *নবী-বংশ* অনুযায়ী মানবজাতির পিতা আদমের মাটির অবয়ব বানানো হয়েছিল বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল সন্দ্বীপে। জিবরাইল ফেরেশতা তাঁকে সেখান থেকে আরবে যেতে বলেন এবং সেখানে গিয়ে তিনি মূল কাবাঘর [৪] নির্মাণ করেছিলেন। এই কাজ সম্পন্ন হলে জিবরাঈল তাঁকে একটি লাঙল, একটি জোয়াল, দুটি বলদ আর বীজ দিয়ে বলেছিলেন, 'নিরঞ্জন আজ্ঞা হৈছে কৃষি হৈব ভাল' (খোদার নির্দেশ হলো কৃষি হবে তোমার নিয়তি)। আদম তখন বীজ বপন করলো, ফসল তুললো, শস্য পিষলো এবং রুটি বানালো।[৫] বর্তমানকালের মুসলিম কৃষকরা একইভাবে আদমের মতো করে কাজ করছে। পাবনা জেলার চাষীরা পৃথিবীর যে মাটি দিয়ে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেটাকেই আদমের শক্তি এবং ভূমিচাষের তার সামর্থ্যের উৎস হিসেবে স্বীকার করে। তাদের মতে, জমিতে সফলভাবে চাষাবাদ করা সকল মানুষের মৌলিক কাজ, শুধুমাত্র তাদেরকে মাটি থেকেই সৃজন করা হয়েছে এইজন্যই নয়, বরং আল্লাহর নির্দেশেই আদম মাটিতে লাঙল লাগিয়েছিলেন। ভূমি আবাদের মাধ্যমেই আদম আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। তাই তাঁকে প্রথম মানুষ ও প্রথম মুসলমান হিসেবে পরিচিত করা যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়,

---

৪. Saiyid Sultan, *Nabi-Bamsa*, 1:88, 98, 103. (অনুবাদে আহমদ শরীফ সম্পাদিত *নবী-বংশের* বাংলা সংকলন ব্যবহার করা হয়েছে-অনুবাদক)।

৫. প্রাগুক্ত। ইতিমধ্যেই আদমের স্ত্রী হাওয়াকে জিবরাইল আগুন দিলেন, যার সাহায্যে তিনি রান্নাবান্নায় দক্ষতা অর্জন করলেন। দুধ জ্বাল দিয়ে তিনি বাংলার বিখ্যাত মিষ্টান্ন *সন্দেশ* তৈরি করলেন, যা কবির বর্ণনায় তুলনাহীন। ১১০।

আদমের বংশধর সকল মানুষ ভূমিতে চাষাবাদের মাধ্যমেই আল্লাহর প্রতি তাদের সর্বাত্মক আনুগত্য ও তাদের মনুষ্যত্ব প্রকাশ করতে পারে।[৬]

একই ধরনের ধারণা পাওয়া যায় সৈয়দ সুলতানের জুডিও-খ্রিস্টান-ইসলামী সভ্যতার সর্বোচ্চ প্রচারক ইব্রাহিমকে পরিচিত করানোর ব্যাপারে। একটি বনে জন্মগ্রহণ এবং বেড়ে উঠার পর ইব্রাহিম ফিলিস্তিনে যান এবং নিকটস্থ এলাকার গোত্রগুলোকে আকৃষ্ট করেন, স্থানীয় শ্রমিকদের পরিচালিত করে বন পরিষ্কার করেন এবং পবিত্র স্থান জেরুযালেমের উপাসনালয় নির্মাণ করেন, যেখানে নিরাঞ্জনের প্রার্থনা করা যায়।[৭] এটা সত্য যে, সৈয়দ সুলতানের লিপিবদ্ধ করা ইব্রাহিমের জীবনের প্রধান বিষয় হলো তার আরণ্যক উৎস, তার স্থানীয় গোত্রগুলো থেকে লোক নিয়োগ, বন পরিষ্কারে তার নেতৃত্বদান এবং প্রার্থনার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ–এটি নিখুঁতভাবে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী সময়কালে বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় একই ধরনের কাজে তৎপর শতশত পীর এবং আলেম উলামার জীবনের দর্পণ হিসেবেই দেখা যায়।

পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত জুড়ে সৃষ্ট শত শত ছোট ছোট মসজিদ, খানকা, দরগার ধর্মীয় কর্তৃত্ব আরো অনেক কিছুর সাথে একই সঙ্গে কাগজ তৈরীর প্রযুক্তির বিকাশ ঘটায়। পঞ্চদশ শতকে চিহ্নিত এবং ইসলামী সভ্যতার সাথে নির্ভুলভাবে শনাক্তকৃত– বাংলায় ব্যবহৃত 'কাগজ' ও 'কলম' উভয়ই ইরানি-আরবি থেকে আগত শব্দ– নতুন প্রযুক্তিটি লিখিত মাধ্যমে মৌখিক কর্তৃত্বের চেয়ে গুণগতভাবে ভিন্ন কর্তৃত্ব প্রকাশ করে। পল্লী এলাকায় পুস্তক এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিস্তারের ফলে রাষ্ট্রীয় আমলাতান্ত্রিক ক্ষেত্র বা বদ্বীপের নগরকেন্দ্রসমূহের সীমার অনেক বাইরেও 'সাহিত্যিক সংস্কৃতি' বিস্তৃতি ঘটে। সমসাময়িক সরকারি সূত্রগুলো পল্লীর মসজিদ ও খানকার সাথে সম্পর্কিত কুরআন পাঠকে তাদের সম্পদ প্রাপ্তির শর্ত হিসেবে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করে এবং পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বাঙালি সূত্রগুলো কুরআনের প্রতি জনপ্রিয় যাদুকরি ক্ষমতা আরোপ করে। বিশেষভাবে, সাহিত্য সংস্কৃতি আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একটি কর্তৃত্ব সহযোগে- যা অপরিবর্তনীয় লিখিতভাবে-উপস্থাপন করে, যা ইতিপূর্বে বনজ ধর্মাদর্শে ছিল অনুপস্থিত। অপেক্ষাকৃত পুরাতন নদী উপত্যকাগুলোর যেসব স্থানে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর

---

৬. যদিও ভূমি চাষী হিসেবে আদমের জীবন বাইবেলের জেনেসিসেও (৩ : ২৩) পাওয়া যায়, কিন্তু এ ধরনের সম্পর্ক কুরআনে দেখা যায় না। মুসলিম বিশ্বের মধ্যে, প্রথম কৃষক হিসেবে আদমকে বিবেচনা করা এবং আল্লাহর নির্দেশে চাষাবাদ করার বিষয়টি শুধুমাত্র বাংলাতেই দেখা হয়। তবে আল্লাহ আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, এই ধারণাটি জেনেসিস (২ : ৭) এবং কুরআন (১৫ : ২৬) উভয় স্থানেই দেখা যায়।

৭. Saiyid Sultan, *Nabi-Bamsa*, 1 : 348, 420-21. (অনুবাদে আহমদ শরীফ সম্পাদিত *নবী-বংশের* বাংলা সংকলন ব্যবহার করা হয়েছে–অনুবাদক)।

মধ্যে ইতিমধ্যেই হিন্দু সভ্যতা স্থান করে নিয়েছিল, তাদের থেকে পূর্বাঞ্চলের পশ্চাদভূমিতে বসবাসকারী সম্প্রদায়গুলো ছিল পৃথক এবং হিন্দু সভ্যতার স্পর্শ তারা পেয়ে থাকলেও তা ছিল খুবই সামান্য। পূর্ব প্রান্তে, তখন, ইসলাম শুধুমাত্র ষাঁড় ও লাঙলের নয়, একই সাথে গ্রন্থের ধর্ম হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করে।

অধিকন্তু, পূর্বাঞ্চলের লোক-ঐতিহ্যে ইসলাম একটি অপরিচিত বা প্রবেশাধিকার রহিত কিংবা সার্বিকভাবে গ্রহণ বা বর্জনের বদ্ধমূল ধারণা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল বলে মনে হয় না। বর্তমানে কেউ কেউ অভ্যাসজনিত চিন্তার কারণে ধর্ম নামক শব্দটিকে সুনির্দিষ্ট কাঠামোবিশিষ্ট কিছু বিশ্বাস ও আচার-আচরণ অনুশীলনের 'সংস্কৃতি-বাক্স' হিসেবে অভিহিত করতে পারে। কিন্তু প্রাক-আধুনিক বাংলা সীমান্তে ধর্মের এ ধরনের নিশ্চল বা সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নয়, বরং একটি গতিশীল উপাদান যাতে ইসলামী অতিপ্রাকৃতিক ধারণাগুলো, স্থানীয় অতিমানবীয় ধারণাগুলোর সাথে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছিল যা ধীরে ধীরে স্থানীয় মহাজাগতিক ধারণায় মিশে যেতে থাকে এবং নিজে থেকে গতিশীল থাকে। এই 'মিশে' যাওয়া এতো দীর্ঘ সময়ে সংঘটিত হয় যে, কেউ নির্দিষ্ট কোন 'ধর্মান্তরকরণের' সময়টি দেখাতে পারে না বা এমন কোন সময় দেখা যায় না, যখন জনসাধারণ নাটকীয়ভাবে অতীতের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করা অবস্থায় নিজেদের দেখতে পায়। ভারতের অন্য যে কোন স্থানের চেয়ে বাংলায় ইসলাম এতো বেশি স্থানীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল এবং বাংলার কৃষিজ সম্প্রসারণের দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ায় বিষয়টি এতো সুস্থিরভাবে চিহ্নিত ছিল যে, সৃষ্টিশীল এই সময়ে চাষবাসকারী শ্রেণীটি কিছু কিছু মুসলিম ও হিন্দু রচনায় এবং বিদেশী পর্যবেক্ষকদের মতো একে কখনো 'বিদেশী' হিসেবে মনে করেনি।[৮] বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের মতো সময় পর্যন্ত মুসলিম চাষীরা চাঁদ, পাল ও দত্ত ইত্যাদি স্থানীয় নাম বহাল রেখেছিল।[৯] প্রাক-আধুনিক বাংলার প্রেক্ষাপটে তখন 'হিন্দু' থেকে ইসলামে 'ধর্মান্তরিত' হয়েছে এটা বলা যথাযথ নয়। বরং আমরা যা দেখি, তা কৃষিজ সভ্যতার সম্প্রসারণ, যার সাংস্কৃতিক প্রতিপক্ষ ছিল আল্লাহর মতবাদের বিকাশ। এই দীর্ঘতর আন্দোলনটি বেশ কয়েকটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়েছিল: পূর্বগামী গতিশীলতা এবং পশ্চিম দিক থেকে নতুন বসতি স্থাপনকারীদের আগমন, সীমান্তবর্তী গোত্রগুলোর লোকদের সম্প্রসারমান কৃষিজ সভ্যতায় একীভূত করা এবং স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি যার সাথে হয়েছিল ক্রমবর্ধমান হারে ধান চাষের পরিব্যাপ্তি বা গতিবৃদ্ধি ও উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি। যেহেতু এই প্রবৃদ্ধিকর প্রক্রিয়া

---

৮. ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীগণ এবং হিন্দু ও মুসলমান সংস্কারকগণ সবাই নিজ নিজ যুক্তিতে ইসলামের 'বৈদেশিকতা'র উপর জোর দেন। কিন্তু এর ফলে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন শুরুর আগের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের অন্ধ থাকা উচিত নয়।

৯. Webster, *Eastern Bengal and Assam District Gazetters: Noakhali*, 39.

প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তিকে সমন্বিত করেছিল, আমরা পূর্ববাংলায় ধান উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তাকারী একটি আর্থ-সামাজিক পদ্ধতি এবং কৃষিজ জীবন প্রশ্নে একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশক ধর্মীয় আদর্শের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিল দেখতে পাই। তাই এটা বলতে গেলে বিস্ময়কর নয়, বিংশ শতকে বাঙালি মুসলমান গ্রামবাসীরা অকৃষিজ পেশায় সম্পৃক্ত হতে সম্ভাব্য সকল সময়ে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিল। ১৯১৩ সালে ঢাকা জেলায় পরিচালিত এক পল্লী জরিপে দেখা যায়, মুসলমানরা "তাদের আয়ের একমাত্র উৎস হিসেবে পুরোপুরিভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং তারা অন্য কোন ধরনের কাজকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে ও জীবনধারণের শেষ স্তরে পৌছানোর পূর্ব পর্যন্ত কখনো তাতে সম্পৃক্ত হয় না।"[১০] ১৯০৮ সালে খুলনা জেলার গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হয়, মুসলমান জনসাধারণ 'আধা হিন্দুজ, বিশেষ করে চণ্ডাল ও পোদ আদিবাসীদের বংশধর,' তারা 'অবশ্য জানে না বা স্বীকার করে না যে তারা ইসলামে ধর্মান্তরিত লোকদের বংশধর, তারা মনে করে তারা ভূমিকর্ষক।'[১১]

অবশ্য, এই ধরনের মনোভাব, প্রধানত শহরে বসবাসরত ক্ষুদ্র অথচ প্রভাবশালী শ্রেণী আশরাফরা পোষণ করতো না। তারা স্থায়ীভাবে মোগলদের শাসকসুলভ মনোভাব পোষণ করতো, উর্দু ও ফারসি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতো এবং সুনির্দিষ্টভাবে দাবি করতো তাদের পূর্বপুরুষরা বদ্বীপটির পশ্চিমদিক থেকে এসেছিল। ভূমি কর্ষণের কারণে পল্লীবাসীরা নিজেদেরকে ভাল মুসলমান মনে করলেও আশরাফ শ্রেণীটি লাঙল অবজ্ঞা করতো এবং এটা স্পর্শ করতে অস্বীকৃতি জানাতো।[১২] এই সামাজিক শ্রেণীর সদস্যরা সুনির্দিষ্টভাবে নিজেদের একটি বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করতে ভারতে আসা লোকদের উত্তরসুরি মনে করতো এবং স্থানীয় কৃষকদের সাথে যোগ দিয়ে তাদের মতো চাষী হতে চাইতো না। এখানেই পল্লীর মুসলমান এবং অকৃষিজ 'আশরাফ' শ্রেণীর মধ্যকার সামাজিক সংঘাতের ভিত্তি সৃষ্টি হয়েছিল এবং উনবিংশ ও বিংশ শতকে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলনগুলোর সময়ে তা আরো বেড়ে গিয়েছিল।[১৩] উপরোক্ত আলোচনার সারাংশ ভারতীয় ইতিহাসচিত্র এবং ইসলামী সমীক্ষা উভয়েরই গৎবাঁধা কাহিনী প্রত্যাখ্যান করে। এসব কাহিনীর একটিতে অষ্টাদশ

১০. Dhaka District Collectorate Record Room, "Mauza Notes," Rupganj Thana, Mauza Agla, No. 1063.

১১. O'Malley, *Eastern Bengal District Gazetteers: Khulna*, 65.

১২. ১৯০১ সালে নদীয়া জেলার মুসলমানদের উপর পরিচালিত এক জরিপ অনুযায়ী, আশরাফরা "তাদের জীবিকা হিসেবে চাষাবাদকে গ্রহণ করেননি। তারা চাষাবাদকে মর্যাদাহানিকর পেশা হিসেবে বিবেচনা করে এবং এ কারণে তারা এ থেকে দূরে থাকে।" Risley Collection, "Reports on the Religious and Social Division," 88.

১৩. Rafiuddin Ahmed, Bengal Muslims.

শতকের মোগল সাম্রাজ্যকে আশাহীনভাবে বিদ্যমান ক্ষয়িষ্ণু, বিশৃঙ্খল, হাঙ্গামাপূর্ণ এবং পতনোন্মুখ অবস্থায় প্রদর্শনের প্রবণতা দেখা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির একটি কারণ হলো, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকরা ভারতে তাদের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ এবং দখলদারিত্বকে বৈধ হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্য 'সনাতন' (অর্থাৎ প্রাক-বৃটিশ) ভারতকে কথিত বিশৃঙ্খল বা স্থবির দেখানোর বিপরীতে 'আধুনিক (অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্য) ভারতকে কথিত গতিশীল হিসেবে প্রদর্শনের যে ঐতিহ্য চালু করেছিলেন তারই অনুসরণ। এছাড়াও বৃটিশ এবং মোগল উভয় ঘরানার ইতিহাসবিদদের কাছে অষ্টাদশ শতকটি কেন্দ্রীয় প্রভাব থেকে আঞ্চলিক বিশৃঙ্খলতা ও পতনের বিস্তারের কাল হিসেবে অভিহিত হয়ে আসছে। অষ্টাদশ শতকের অধিকাংশ সময়ে দিল্লীর রাজকীয় লালকেল্লার নিরাপদ স্থানে বসে দেখা হচ্ছে: প্রদেশগুলো থেকে রাজস্ব আসছে না, সর্বত্রই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ছে, গভর্নরগণ কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের বাইরে স্বাধীনভাবে কাজ করছেন।[১৪] ভারতের "লালকেল্লা দৃষ্টিভঙ্গিতে নিমজ্জিত সভাসদদের লিখিত সমসাময়িক রাজদরবারগুলোর ঐতিহাসিক বিবরণগুলোতে তাই স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে এবং এর পরের ইতিহাসের রসদও যুগিয়েছে সেগুলো। অবশ্য, প্রাক-আধুনিক বাংলার ইতিহাসের মূল সূত্রগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র প্রকাশ করে। স্থবির কিংবা ক্ষয়িষ্ণু সমাজের স্থানে দেখা যায় আঞ্চলিক সম্প্রসারণ এবং মোগল ও ইসলামী উভয় ভাবধারায় পরিপুষ্ট ধর্মীয় সমগ্রতা সাধন। এখানে অবশ্য, কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তথা দিল্লীর কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বশীভূত থাকতে বাধ্য করার সামর্থ্য হিসেবে সাম্রাজ্য এবং আমলাতান্ত্রিক ও আদর্শগত কাঠামোর মধ্যে সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা হিসেবে সাম্রাজ্যের মধ্যকার পার্থক্যকে উপলব্ধি করতে হবে। এই সমীক্ষায় মোগল সাম্রাজ্যের পরের দৃষ্টিভঙ্গিটিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এমনকি অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে যখন দিল্লীর কেন্দ্রীয় শক্তি হ্রাস পাচ্ছে এবং বাংলা কার্যত স্বাধীন, তখনো মোগল সাম্রাজ্যবাদের আদর্শগত ও আমলাতান্ত্রিক কাঠামো বাংলা বদ্বীপে অব্যাহতভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে।[১৫] সপ্তদশ শতক থেকে শুরু হয়ে ১৭৬০ সালে বৃটিশ

১৪. মোগলদের পতন এবং পাঞ্জাব ও অযোধ্যা এই দুটি প্রদেশ থেকে তা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চমৎকারভাবে উপলব্ধির জন্য দেখুন Muzaffar Alam, *The Crisis of Empire in Mughal North India: Awadh and the Punjab, 1707-48* (Delhi: Oxford University Press, 1986).

১৫. সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় শক্তির পতনের সময় ধরা হয় আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) সাল থেকে, যদিও শাহ আলমের মৃত্যুর (১৭১২) পর থেকে কেন্দ্রীয় শক্তির ছিন্নভিন্ন হওয়াটা সবচেয়ে নাটকীয়ভাবে দেখা যায়, এ সময় একের পর এক প্রাসাদ অভ্যুত্থান, এবং হায়দ্রাবাদ ও লক্ষ্ণৌর মতো স্থানগুলোতে প্রাদেশিক রাজবংশের আত্মপ্রকাশ ঘটে। মোগল কর্তৃত্ব থেকে বাংলার নিজস্ব কার্যকর স্বাধীনতা শুরু হয় মুর্শিদ কুলি খানের সুবেদারির (১৭১৩-২৭) আমল থেকে। দেখুন Jadunath Sarkar, ed., *History of Bengal*, 405-13.

শক্তির আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত, এমনকি ১৭১২ সালে যখন কেন্দ্রীয় রাজকীয় কর্তৃত্ব কার্যত বিদায় নিয়েছে সেই যুগসহ, তখনো বিশাল বনাঞ্চল কেটে সেখানকার ভূমি চাষাবাদের জন্য প্রস্তুত করায় পূর্ববাংলা নজিরবিহীনভাবে বেড়ে চলেছিল। এসব এলাকায় গমনকারী বসতি স্থাপনকারীরা নবপ্রতিষ্ঠিত কৃষিজ সমাজকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা দিচ্ছে, যাতে স্থানীয় মানুষরা আত্মস্থ হচ্ছে, অন্যদিকে প্রাদেশিক কর্মকর্তারা এসব কৃষিজ বসতিকে কেন্দ্র করে নতুন রাজস্ব ইউনিট স্থাপন করছেন, ফলে সেগুলো মোগল আমলাতান্ত্রিক ও আদর্শগত কাঠামোর মধ্যে একীভূত হয়ে যাচ্ছে। তাই বাংলার স্থানীয় ইতিহাস অষ্টাদশ শতকের মোজাফফর আলমের[১৬] সমীক্ষা অনুযায়ী অযোধ্যা ও পাঞ্জাব কিংবা আঁদ্রে উইনকের[১৭] মহারাষ্ট্র সমীক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যাতে রাজকীয় কেন্দ্র দৃশ্যত পতনোন্মুখ হলেও মোগল সাম্রাজ্যবাদী পতাকার আওতায় প্রাদেশিক সমৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ইউরোপীয়ান ঔপনিবেশিকরা দীর্ঘ সময় ধরে গৎবাঁধা ধারণায় ইসলাম প্রচারক তথা উলামাগণকে এমন একটি শ্রেণী হিসেবে চিত্রিত করেছে, যারা 'পরিবর্তন' প্রশ্নে একরোখাভাবে মারমুখি। ইউরোপীয়ান সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের পূর্বে উত্তর আফ্রিকা, ভারত ও ইন্দোনেশিয়া সকল স্থানই ছিল মুসলিম শাসনাধীন এবং ফ্রান্স, বৃটিশ এবং ডাচ ঔপনিবেশিক কর্মকর্তারা এসব অঞ্চলে উদ্বেগের সাথে তাদের শাসনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অসন্তোষের ব্যাপারে সন্দিহান ছিল। ১৮৭১ সালে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার একটি প্রভাব বিস্তারকারী পুস্তক লিখেন যাতে ভারতের উলামাদের স্থবির, প্রতিক্রিয়াশীল, গণমতহরণকারী এবং সম্ভাব্য রাজবৈরী হিসেবে চিত্রিত করেন–এই গৎবাঁধা চিত্রটি ঔপনিবেশিক যুগের সমাপ্তির পরও বহাল থাকে।[১৮] এই সমীক্ষায়, অবশ্য, বাংলার ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মোগল রাজনৈতিক-আদর্শগত পদ্ধতি এবং ইসলামী বিশ্ব উভয় সীমান্ত সম্প্রসারণে গতিশীল ভূমিকা পালনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলামপন্থীদের মধ্যে একটি গৎবাঁধা ধারণা জমাট বেঁধে আছে। তা হলো ইসলামকে বিবেচনা করা হয় আবশ্যিকভাবে 'নাগরিক' ধর্ম হিসেবে: নগর বা শহরের বাজারে কেন্দ্রীভূত দোকানদার ও শিল্পীদের বা মাদরাসা, মসজিদ এবং আইন আদালতে সম্পৃক্ত প্রশাসক ও পণ্ডিতদের ধর্ম হিসেবে। এসবই আসলে আশরাফ শ্রেণীর সদস্যদের প্রস্তুত সহজাত চিত্র, যারা প্রশাসন পরিচালনা এবং শিক্ষা, গ্রন্থ রচনায় সম্পৃক্ত ছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই বাঙালি মুসলমানের পক্ষে কথা

১৬. দেখুন Alam. *The Crisis of Empire.*

১৭. দেখুন Wink, Land and Sovereignty in India.

১৮. William Wilson Hunter. *The Indian Musalmans: Are They Bound in Conscience to Rebel against the Queen?* (London: Trubner, 1871).

বলার দাবিদার হিসেবে গণ্য হতো। খন্দকার ফজলে রাব্বি ও আবু এ. গজনভির মতো ব্যক্তিগণ, ৫ম অধ্যায়ে আলোচিত, সবাই এই সামাজিক শ্রেণীর অবস্থান এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাবের বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু আশরাফ মুসলমানদের ধারণ করা শহুরে সংস্কৃতির সাথে ইসলামকে সম্পর্কিত করায়, বিশেষজ্ঞদের বাংলার বদ্বীপে ইসলামের সার্বিক পল্লী প্রকৃতিকে অবজ্ঞার দিকে চালিত করেছে। এই সমীক্ষায় বাঙালি মুসলমানদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কৃষিজ ভিত্তির নৃতাত্ত্বিক দিকের প্রতি আলোকপাতের মাধ্যমে বিদ্যমান ধারণাকে সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

পরিশেষে, বিশ্ব ইতিহাসের নিরিখে বলা যায়, ধর্মীয় সম্প্রসারণের বাঙালির অভিজ্ঞতা সম্ভবত একমাত্র ঘটনা নয়। অন্তত অন্য একটি ঘটনা আছে– পশ্চিম জাভা– সেখানে ইসলাম সম্প্রসারিত হয়েছে বন কেটে কৃষিজ সম্প্রসারণ এবং রাষ্ট্র কর্তৃক দানকৃত জমিতে ছোট ছোট মসজিদ প্রতিষ্ঠার সমন্বিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।[১৯] আরো পরিচিত সমান্তরাল ঘটনা দেখা যায় উত্তর ইউরোপে খ্রিস্টধর্ম বিকাশের ইতিহাসের মধ্যে। ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে বিশেষ করে একাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বেনেডিক্টিনেস ও সিস্টারসিয়ানদের মতো সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলো সক্রিয়ভাবে জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় মঠ স্থাপন করতো, বন পরিষ্কারে নেতৃত্ব দিত, অবিশ্বাসীদের ধর্মান্তরিত এবং কৃষি সম্প্রসারণ করতো। এই প্রক্রিয়ায় ধর্মীয় বিষয়গুলো ও গুরুত্বপূর্ণ: বন পরিষ্করণ, স্থানীয়দের খ্রিস্টানকরণ এবং পথপ্রদর্শক সন্ন্যাসীদের মর্যাদায় অভিষিক্তকরণ।[২০] "তারা যখন জঙ্গলের ভেতরে প্রবেশ করতো, গাছগুলো কেটে ফেলে দিত," রিচার্ড কোয়েবনার লিখেন, "সন্ন্যাসীরা ঘন বন পরিষ্করণের আগে জার্মানদের মধ্যকার ভীতি দূর করতে ধর্মীয় আবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হতো।" চার্চের কেরামতি প্রদর্শনের ক্ষমতা বনে বসবাসরত সাধু পুরুষদের হস্তান্তরিত হওয়ায়, তা

---

১৯. ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত জাভার পশ্চিম ভাগের বেনটেন সালতানাতের সাবেক বনভূমিতে নতুন ধান-চাষী কৃষিজ সম্প্রদায়ের পথিকৃত হিসেবে হাজিদের নিষ্কর রাষ্ট্র-সমর্থিত ভূমি মঞ্জুরী প্রদানের মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষকতা করা হতো। Sartono Kartodirdjo, *The Peasant's Revolt of Benten in 1888: Its Conditions, Course and Sequel* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1966), 34-61.

২০. এ ব্যাপারে একটি নাটকীয় উদাহরণ দেখা যায় বর্তমান জার্মানি হিসেবে পরিচিত সাবেক বনভূমিতে অষ্টম-শতকের ধর্মপ্রচারক সন্ন্যাসী উইলফ্রেড বনিফেসের তৎপরতার মধ্যে। পৌত্তলিকদের (প্যাগান) বিশাল উপস্থিতির মধ্যে বনিফেস নিজে জার্মান জনগণের কাছে 'জুপিটারের ওক' হিসেবে পরিচিত একটি পবিত্র ও ব্যতিক্রমধর্মী বিশাল ওক গাছ টুকরা টুকরা করে কেটে ফেলেন। এটা দেখে জনতা আনুষ্ঠানিকভাবে খ্রিস্ট ধর্মমত গ্রহণ করে, অন্যদিকে বনিফেস পতিত কাঠ দিয়ে একটি ছোট গির্জা নির্মাণ করেন এবং তা সেন্ট পিটারের প্রতি উৎসর্গ করেন। Wilhelm Levison, *England and the Continent in the English Century* (Oxford: Clarendon Press, 1946), 45-46.

সাধারণ মানুষ তাদের কাছাকাছি এসে বসতি স্থাপন করতে উদ্বুদ্ধ করতো।[২১] যদিও প্রথমদিককার আন্দোলনের সাদামাটা জীবনে অভ্যস্তদের স্থলাভিষিক্ত হয় বিশাল এস্টেটসমূহের মালিক ধনী ভূস্বামীরা, তবুও আমরা উত্তর ইউরোপের বন-জঙ্গলে সভ্যতা বিনির্মাণকারী মঠগুলোর প্রাথমিক ভূমিকা অগ্রাহ্য করতে পারি না।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখলে, সৃষ্ট ধর্মীয় ব্যবস্থা, আরোপিত সাংস্কৃতিক গুণ মানব সমাজের উর্ধ্বে থাকা স্মরণাতীতকালের কোন স্তরীভূত কাঠামো নয়। এগুলো বিশেষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে অব্যাহতভাবে পুনর্ব্যাখ্যা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ফল। এমনকি যদিও এসব ঘটনা ঘটার সময়ে ধর্মীয় ঐতিহ্যগুলো সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ায় সেই পরিবেশকে রূপান্তরিত করে। এখানেই, সম্ভবত, সফল বিশ্ব ধর্মগুলোর নেপথ্য কাহিনী নিবদ্ধ যেসব ধর্ম নমনীয় নয় বা খাপ খাওয়াতে পারে না, সেগুলো শূন্য শক্ত খোলসে আশ্রয় নেয় এবং শুধুমাত্র যাদুঘর কিংবা বিস্মৃত পুস্তকে টিকে থাকে। খ্রিস্ট ধর্ম কখনই বিকশিত হতো না বা টিকে থাকতে পারতো না, যদি না তা রাজকীয় সংস্কৃতি এবং রোমান সাম্রাজ্যের শেষদিকের জার্মান জনপ্রিয় সংস্কৃতি উভয়টিরই একটি বড় অংশ আত্মস্থ করে না নিত।[২২]

এটা ইসলাম এবং বাংলা সীমান্তের জন্যও কম সত্য নয়। বাংলায় ইসলামের ইতিহাস অবশ্যই বিশ্ব ধর্মগুলোর 'সাফল্যের গল্পের' অন্তর্ভুক্ত, যেখানে ধর্মের

---

২১. Richard Koebner, "The Settlement and Colonization of Europe," in *The Cambridge Economic History of Europe*, vol. 1, The Agrarian Life of the Middle Ages, ed. M.M. Postan, 2d ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1966), 45. দ্বাদশ শতকের সিস্টারসিয়ান (খ্রিস্টানদের একটি বিশেষ সম্প্রদায়–অনুবাদক) উত্তর জার্মানিতে যেভাবে তৎপরতা চালাতো তার একটি বর্ণনা নিম্নরূপ: "তারা যখন চাষাবাদের জন্য জমি তৈরির জন্য গাছ কাটা শুরু করতো তখন শ্রমিকদের সাথে সন্ন্যাসী থাকতো। তার এক হাতে থাকতো কাঠের একটি ক্রস এবং অন্য হাতে থাকতো পবিত্র পানির একটি পাত্র। তিনি যখন বনের মাঝখানে উপস্থিত হতেন, তখন তিনি ক্রসটিকে মাটিতে পুততেন, যিশু খ্রিস্টের নামে এই অস্পৃশ্য মাটি তুলে নিতেন, এলাকাটির চারদিকে পবিত্র পানি ছিটিয়ে দিতেন এবং পরিশেষে কিছু ঝোপঝাড় কাটার জন্য শক্ত হাতে কুঠার ধরতেন। শ্রমিকদের একটি দল গাছ কাটতো, দ্বিতীয় দলটি গুড়িগুলো টেনে নিত এবং তৃতীয় দলটি শেকড়বাকড়, ডালপালা ও ঝোপঝাড়ে আগুন লাগাতো। Cited in Clarence J. Glacken, *Traces on the Rhodian Shore: Nature and Culture in Western Thought from Ancient Times to the End of the Eighteenth Century* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1967), 309. গ্লাকেন "পরিবর্তনশীল প্রকৃতিতে প্রকাশ" দেখতে পান ক্যারোলিঙ্গিয়ান গ্রন্থে একটি কথা বারবার এসেছে, horridae quondam solitudines ferarum, nunc ampenissima diversoria hominum" -অর্থাৎ এক সময়ের পশুদের বাসোপযোগী ভীতিজনক জলাভূমি এখন মানুষের বাসযোগ্য সবচেয়ে ভাল স্থানে পরিণত হয়েছে। প্রাগুক্ত, ৩১২।

২২. See Judith Herrin, *The Formation of Christendom* (Oxford: Basil Blackwell, 1987), esp. pt. 1, 19-127; Robin Lane Fox, *Pagans and Christians* (New York: Knopf, 1987).

বিধিবিধান এবং স্থানীয় সামাজিক ব্যবস্থা একে অন্যকে চূড়ান্তভাবে আত্মস্থ করেছে। যদিও তাত্ত্বিকগণ, ধর্মবেত্তাগণ, কিংবা সংস্কারকগণ হয়তো এই দিকটি অস্বীকার করবে, সাধারণ মানুষ তাদের অন্তর্জ্ঞানে তাই উপলব্ধি করবে। একটি বিখ্যাত প্রবাদ, যা বাংলা এবং উত্তর ভারতে ব্যাপকভাবে পরিচিত এবং হাসিমুখে বলা হয়, যা ইসলামে বৈধ পদবির সাথে সামাজিক মর্যাদাকে ফুটিয়ে তোলে:

প্রথম বছর আমি ছিলাম শেখ, দ্বিতীয় বছর খান;
ধানের দাম যদি কমে এই বছর, আমি হব সৈয়দ।[২৩]

বাংলায় ইসলামকে শুধুমাত্র ঐতিহাসিকভাবেই সফল নয়, অব্যাহত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বাস্তবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে বিষয়টি তা হলো এই ভূমির সাথে এবং মানুষের সংস্কৃতির সাথে তার খাপ খাওয়ানোর সামর্থ্য, এমনকি দুটিই যখন রূপান্তরিত হচ্ছিল তখনো।

২৩. ফারসী ভাষায় প্রবাদটি হলো:

শেখ বু সাল-ই আওয়াল; খান মুদাম সাল-ই দিগর।
ঘাল্লা গার আরজান শাভাদ, ইমসাল সাইয়িদ মিশাভাম।

Census of India, 1931, 5, pt. 1, "Bengal and Sikkim" (Calcutta, 1933), 422.

পরিশিষ্ট ১

মুসলমান শাসনকালে (১২০৪-১৭৬০) টাকশাল শহর ও খোদাইলিপির স্থান

নম্বর		টাকশাল শহর (x) বা খোদাইলিপির স্থান (০)	জিলা	রেফারেন্স	স্থানটির প্রাচীনতম তারিখ
গভর্নর, বলবনি শাসক, শামসুদ্দিন ফিরোজ ও উত্তরসুরিগণ (১২০৪-৮১, ১২৮১-১৩০০, ১৩০১-২২, (১৩২২-৪২; দেখুন মানচিত্র ২ ক)					
১.	সিওয়ান	০	বীরভূম	১০	১২২১
২.	নৌহাটা	০	রাজশাহী	১৯:নং৩	১২২৯-৩০
৩.	লক্ষ্ণৌতি (গৌড়)	x	মালদহ	২	১২৩৬
৪.	বিহার	০	পাটনা	১:১	১২৪২
৫.	গঙ্গারামপুর	০	প. দিনাজপুর	১:৪	১২৪৯
৬.	সিতলমট	০	রাজশাহী	১৯:নং৬	১২৫৪
৭.	মহেশ্বর	০	মুঙ্গের	১:১১	১২৯২
৮.	লক্ষীসরাই	০	মুঙ্গের	১:১২	১২৯৭
৯.	দেবীকোট	০	প. দিনাজপুর	১:১৫	১২৯৭
১০.	ত্রিবেনী	০	হুগলি	১:১৮	১২৯৮
১১.	মহাস্থানগড়	০	বগুড়া	১:২১	১৩০০
১২.	বাঙ	x	পূর্ববাংলা স্থান অজ্ঞাত	২	১৩০২
১৩.	সিলেট	০	সিলেট	১:৪	১৩০৩
১৪.	সোনারগাঁও	x	ঢাকা	২	১৩০৫
১৫.	উজিরবেলডাঙ্গা	০	রাজশাহী	১৯:নং১৭	১৩২২
১৬.	গিয়াসপুর	x	মোমেনশাহী	২	১৩২২
১৭.	সাতগাঁও	x	হাওড়া	২	১৩২৮
১৮.	ফৈজাবাদ (পান্ডুয়া)	x	মালদহ	২	১৩৪১

নম্বর		টাকশাল শহর (x) বা খোদাইলিপির স্থান (o)	জিলা	রেফারেন্স	স্থানটির প্রাচীনতম তারিখ
ইলিয়াস শাহি ও রাজা গণেশের রাজবংশসমূহ					
(১৩৪২-১৪১৪; ১৪১৫-৩৩; দেখুন মানচিত্র ২ খ)					
১৯.	কলকাতা	o	চব্বিশ পরগনা	১:৩১	১৩৪২
২০.	কামরু	x	উত্তরবঙ্গ, স্থান অজ্ঞাত	২	১৩৫৭
২১.	মোজাফফরাবাদ	x	ঢাকা	২	১৩৫৮
২২.	পাণ্ডুয়া	o	মালদহ	১:৩৫	১৩৬৯
২৩.	মোল্লা সিমলা	o	হুগলি	১:৩৮	১৩৭৫
২৪.	চট্টগ্রাম	x	চট্টগ্রাম	২	১৪১৫
২৫.	ফতেহবাদ	x	ফতেহবাদ	৬	১৪১৮
২৬.	রোটসপুর সম্ভবত রোহটাস	x	শাহাবাদ	২	১৪২৩
২৭.	মন্দ্রা	o	ঢাকা	১:৪৪	১৪২৭
২৮.	সুলতানগঞ্জ	o	রাজশাহী	১:২৬	১৪৩২
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ইলিয়াস শাহি, আবিসিনীয় রাজাগণ ও হুসাইন শাহি					
(১৪৩৩-৮৬; ১৪৮৬-৯৩; ১৪৯৩-১৫৩৮; দেখুন মানচিত্র ২ গ)					
২৯.	বলাইঘাটা	o	মুর্শিদাবাদ	১:৪৯	১৪৪৩
৩০.	ভাগলপুর	o	ভাগলপুর	১:৫১	১৪৪৬
৩১.	বালানগর	o	বীরভূম	১:৫২	১৪৫০
৩২.	ঘাগরা	o	মোমেনশাহী	১:৫৪	১৪৫২
৩৩.	নবগ্রাম	o	পাবনা	১৫	১৪৫৪
৩৪.	মালদহ	o	মালদহ	১:৫৫	১৪৫৫
৩৫.	ঢাকা	o	ঢাকা	১:৫৭	১৪৫৬
৩৬.	গাজিপুর	o	গাজিপুর, ইউপি	১৯: নং৫৯	১৪৫৯-৭৪
৩৭.	তেজপুর	o	মোমেনশাহী	১৯:নং৪৩	১৪৫৯
৩৮.	বাগেরহাট	o	খুলনা	১:৬৪	১৪৫৯
৩৯.	বারবাকাবাদ (মাহিসন্তোষ)	o	রাজশাহী	১:৭৩	১৩৫৯

নম্বর		টাকশাল শহর (X) বা খোদাইলিপির স্থান (o)	জিলা	রেফারেন্স	স্থানটির প্রাচীনতম
৪০.	দিনাজপুর	o	দিনাজপুর	১:৭৬	১৪৬০
৪১.	বঙ্গ	o	চাচুর	১:৭৬	১৪৬৩
৪২.	দেওতলা	o	মালদহ	১:৭৭	১৪৬৪
৪৩.	পেরিল	o	ঢাকা	১:৭৯	১৪৬৫
৪৪.	মির্জাগঞ্জ	o	বাকেরগঞ্জ	১:৮১	১৪৬৫
৪৫.	বশিরহাট	o	চব্বিশ পরগনা	১:৮৮	১৪৬৬
৪৬.	গড়াই	o	মোমেনশাহী	১:৮৩	১৪৬৭
৪৭.	হাটহাজারি	o	চট্টগ্রাম	১:৯১	১৪৭৪
৪৮.	বিরল	o	দিনাজপুর	১:১২৬	১৪৭৫
৪৯.	ছোট পাণ্ডুয়া	o	হুগলি	১:৯৭	১৪৭৭
৫০.	বন্দর	o	ঢাকা	১:১১৩	১৪৮১
৫১.	মোহাম্মদাবাদ	o	যশোর	৪,৭:৪৪	১৪৮১-৮৬
৫২.	ধামরাই	o	ঢাকা	১:১১৭	১৪৮২
৫৩.	বিক্রমপুর (রামপাল)	o	ঢাকা	১:১১৮	১৪৮৩
৫৪.	মন্দরন	X	হুগলি	৫	১৪৮৩
৫৫.	রোহানপুর	o	রাজশাহী	১৯:নং৮১	১৪৮৬
৫৬.	ঘর জরিপা	o	মোমেনশাহী	১:১৩৪	১৪৮৬-৮৯
৫৭.	কালনা	o	বর্ধমান	১:১৩৮	১৪৮৯
৫৮.	চুনাখালি	o	মুর্শিদাবাদ	১:১৪০	১৪৯০
৫৯.	নওয়াবগঞ্জ	o	মালদহ	১:১৪৭	১৪৯২
৬০.	দেপাড়া	o	হুগলি	৯	১৪৯৪
৬১.	চন্দ্রাবাদ (চাঁদপুর)	X	কুমিল্লা	২	১৪৯৩-১৫১৯
৬২.	রাইখা	o	বর্ধমান	১১	১৪৯৩-১৫১৯
৬৩.	সৌতা	o	বর্ধমান	১১	১৪৯৬
৬৪.	খেরাউল	o	মুর্শিদাবাদ	১:১৫২	১৪৯৫
৬৫.	মুঙ্গের	o	মুঙ্গের	১:১৫৩	১৪৯৭
৬৬.	কুসুম্বা	o	রাজশাহী	১:১৫৫	১৪৯৮
৬৭.	মারগ্রাম	o	মুর্শিদাবাদ	১:১৫৪	১৪৯৯
৬৮.	মহলবাড়ি	o	দিনাজপুর	১৫	১৫০১
৬৯.	বাবাগ্রাম	o	মুর্শিদাবাদ	১:১৫৬	১৪৯৯
৭০.	আরশনগর	o	খুলনা	১৫	১৫০০
৭১.	মাচাইন	o	ঢাকা	১:১৫৯	১৫০১

নম্বর		টাকশাল শহর (x) বা খোদাইলিপির স্থান (o)	জিলা	রেফারেন্স	স্থানটির প্রাচীনতম
৭২.	ইসমাইলপুর	o	সরন	১:১৫৭	১৫০১
৭৩.	হেমতাবাদ	o	প. দিনাজপুর	১৭:৮৪	১৫০১
৭৪.	বোনাহরা	o	ভাগলপুর	১৬:১০৪	১৫০২
৭৫.	সুতি	o	মুর্শিদাবাদ	১:১৬২	১৫০৩
৭৬.	ছিরান্দ	o	সরন	১:১৬৩	১৫০৩
৭৭.	নারহান	o	সরন	১৬:১০৮	১৫০৩
৭৮.	আজিমনগর	o	ঢাকা	১:১৬৭	১৫০৪
৭৯.	জিল্লী	o	মুর্শিদাবাদ	১:১৭১	১৫০৪
৮০.	উলিপুর	o	রংপুর	১২	১৫০৬
৮১.	আতিয়া	o	মোমেনশাহী	১:১৮০	১৫০৭
৮২.	মঙ্গলকোট	o	বর্ধমান	১:১৮৪	১৫১০
৮৩.	নওয়াদা	o	পাটনা	১:১৮৭	১৫১০
৮৪.	পাটনা	o	পাটনা	১৬:১১০	১৫১০
৮৫.	সাকুলিপুর	o	বীরভূম	১১	১৫১০
৮৬.	কাইটাহর	o	বগুড়া	১৩	১৫১০
৮৭.	খেরুর	o	মুর্শিদাবাদ	১:১৯৩	১৫১৫
৮৮.	খলিফাবাদ (বাগেরহাট)	x	খুলনা	২	১৫১৬
৮৯.	সুরি	o	বীরভূম	১১	১৫১৬
৯০.	ভোলাহাট	o	মালদহ	১:১৯৫	১৫১৭
৯১.	নুশরাতবাদ (ঘোড়াঘাট)	x	দিনাজপুর	২	১৫১৮
৯২.	বড়বাজার	o	যশোর	১৪	১৫১৯
৯৩.	কান্তাদাউর	o	রংপুর	১:২০২	১৪৯৩-১৫১৯
৯৪.	ছাকদা	o	নদীয়া	১:২০৫	১৪৯৩-১৫১৯
৯৫.	মতিহানি	o	মুঙ্গের	১৬:১১৪	১৫১৯-৩২
৯৬.	বঘা	o	রাজশাহী	১:২১২	১৫২৩
৯৭.	বান্ডেল	o	হুগলি	১:২১৪	১৫২৪
৯৮.	আশরাফপুর	o	ঢাকা	৩:৬৮	১৫২৪
৯৯.	বনগ্রাম	o	পাবনা	১:২১৮	১৫২৬
১০০.	সিকান্দরপুর	o	আজমগড়	১:২২১	১৫২৭

নম্বর	টাকশাল শহর (x) বা খোদাইলিপির স্থান (o)	জিলা	রেফারেন্স	স্থানটির প্রাচীনতম
১০১. মুর্শিদাবাদ	o	মুর্শিদাবাদ	১:২২৭	১৫২৯
১০২. সন্তোষপুর	o	হুগলি	১:২২৯	১৫৩০
১০৩. ধোরাইল	o	প. দিনাজপুর	১:২৩৬	১৫৩৩
১০৪. জোয়ার	o	মোমেনশাহী	১:২৩৯	১৫৩৪
১০৫. পুর্নিয়া	o	পুর্নিয়া	১৬:১১৬	১৫৩৬
১০৬. শেরপুর	o	মালদহ	১:২৩৯	১৫৩৬

আফগান ও মোগল (১৫৩৮-৭৫, ১৫৭৫-১৭৬০; দেখুন মানচিত্র ২ ঘ)

১০৭. শেরপুর	o	বগুড়া	১:২৪৮	১৫৫২
১০৮. রাজমহল	o	সান্তল পরগনা	১:২৪১	১৫৫৬
১০৯. কুমারপুর	o	রাজশাহী	১:২৪৪	১৫৫৮
১১০. বর্ধমান	o	বর্ধমান	১:২৫৬	১৫৬২
১১১. চাটমোহর	o	পাবনা	১:২৫৯	১৫৮১
১১২. বড়ড় চর	o	কুমিল্লা	১৯:নং২১৮	১৫৯১
১১৩. নয়াবাড়ি	o	ঢাকা	১৯:নং২১৭	১৫৯১-৯২
১১৪. দোহার	o	ঢাকা	১৯:নং২১৯	১৫৯১-৯২
১১৫. ব্রাহ্মণবাড়িয়া	o	কুমিল্লা	১৫	১৬০০
১১৬. করটিয়া	o	মোমেনশাহী	১৯:নং২২৩	১৬১০
১১৭. সরাইল	o	কুমিল্লা	১৫	১৬১৫
১১৮. কেসিয়ারি	o	মোমেনশাহী	৮	১৬২২
১১৯. শেরপুর	o	কুমিল্লা	১:২৭১	১৬৩২
১২০. রাজশাহী	o	রাজশাহী	১:২৭১	১৬৩৪
১২১. নাওদাহ	o	মুর্শিদাবাদ	১:২৭৭	১৬৪২
১২২. এগারসিন্দুর	o	মোমেনশাহী	১:২৭৮	১৬৫২
১২৩. হাজো	o	কামরূপ	১:২৮০	১৬৫৭
১২৪. দুর্গাপুর	o	বগুড়া	১:নং২৫১	১৬৭৫
১২৫. মজিদপুর	o	মোমেনশাহী	১৮:৯৯	১৬৯৯
১২৬. ইঁচলাবাজার	o	বর্ধমান	১:২৯২	১৭০৩
১২৭. শানবান্দি (দিননাথ)	o	হুগলি	১:২৯৬	১৭২৩

উৎস

EIAPS= *Epigraphia Indica, Arabic and Persian Supplement.*
JVRM= *Journal of the Varendra Research Museum.*

1. Shamsud-Din Ahmed, *Inscriptions.'*
2. Karim. *'Corpus of the Muslim Coins'*, Table II
3. Dani, *Bibliography of the Muslim Inscriptions.*
4. M. Mir Jahan, Mint Towns of Medieval Bengal,' *Pakistan History Conference, Proceedings*, 1953 (3rd session): 238.
5. G.S. Farid, 'Madaran, a New Mint of Fath Shah of Bengal, dated, 87/1483,' *Indo-Iranica* 33, nos. 1-4 (March-December 1980): 143-45.
6. Ahmad Hasan Dani, 'The House of Raja Ganesa of Bengal,' *Journal of the Asiatic Society* 18, no. 2 (1952): 145.
7. Habib, *'Atlas of the Mughul Empire.*
8. W.H. Siddiqi, Three Moghal Inscriptions from Kesiari, West Bengal, EIAPS (1961): 69-73.
9. M.F. Khan, 'Three New Inscriptions of Alau'd-Din Huasin Shah,' EIAPS (1965): 23-28.
10. Z.A. Desai, 'An Early Thirteenth Century Inscription from West Bengal,' EIAPS (1975): 6-12.
11. S.S. Sussain, 'Some More New Inscriptions of Hussain Shah from West Bengal,' (EIAPS 1975): 31-38.
12. A.K.M. Yakub Ali, 'An Inscription of Sultan as-Salatin.' JVRM 2 (1973): 67-70.
13. A.K.M. Yakub Ali, 'An Inscription of Sultan as-Salatin.' JVRM 4 (1975): 63-69.
14. Sohrabuddin Ahmed, 'Antiquities of Barabazar,' JVRM 4 (1975-76): 71-80.
15. Habiba Khatun, 'The Tomb of Arifail in Comilla District,' JVRM 7 (1981-82): 183-86.
16. Qeyamuddin Ahmad, *'Corpus'.*
17. Asher, 'Inventory.'
18. Hasan, *'Muslim Monuments'.*
19. Siddiq, 'Arabic and Persian Texts'.

পরিশিষ্ট ২

বাংলার গুরুত্বপূর্ণ শাসকবৃন্দ, ১২০৪-১৭৫৭

মন্তব্য: অনেক সুবেদার/গভর্নর পরবর্তীকালে সুলতান হয়েছেন এবং এই প্রক্রিয়ায় তাঁদের নাম বা পদবীতে পরিবর্তন এসেছে। নিম্নোক্ত টেবিলে এ ধরনের পরিবর্তনগুলো তীরচিহ্নের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

সুবেদার/গভর্নর	সুলতান		তারিখ
দিল্লী সালতানাত (১২০৬-১৫২৬)			
মুহাম্মদ বখতিয়ার			১২০৪-০৬
মুহাম্মদ শিরিন খান		অনুমানিক	১২০৬-৭
হুসামউদ্দিন ইউয়াজ →		অনুমানিক	১২০৭-৮
আলী মর্দান →		অনুমানিক	১২০৮-১০
	আলাউদ্দিন		১২১০-১২১৩
	গিয়াসউদ্দিন ইউয়াজ		১২১৩-২৭
নাসিরউদ্দিন মাহমুদ			১২২৭-২৯
দৌলত শাহ			১২২৯
মালিক আলাউদ্দিন জানি			১২২৯
সাইফউদ্দিন আইবেক			১২২৯-৩৩
ইজাদ্দিন তুগরিল তুগান খান			১২৩৩-৪৪
মালিক কামরুদ্দিন তামার খান			১২৪৪-৪৬
মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন ইউজবুক →			১২৪৬-৫৫
	মুগিসউদ্দিন ইউজবাক		১২৫৫-৫৭
মালিক আলাউদ্দিন মাসুদ জানি			১২৫৭-৫৮
ইয়াজউদ্দিন বলবন			১২৫৮-৬০

সুবেদার/গভর্নর	সুলতান	তারিখ
মোহাম্মদ আরসালান খান		১২৬০-আনু. ১২৬৫
শের খান		অনিশ্চিত
আমিন খান		অনিশ্চিত
মুগিসউদ্দিন তুগরিল		১২৬৮-আনু. ১২৭৫
	মুগিসউদ্দিন তুগরাল	আনু. ১২৭৫-১২৮১
বোগরা খান		১২৮১-৮৭
বলবনি রাজবংশ (১২৮৭-১৩০১)		
	নাসিরউদ্দিন মাহমুদ	১২৮৭-৯১
	রোকনউদ্দিন কায়কাউস	১২৯১-১৩০০
ফিরোজ শাহি রাজবংশ (১৩০১-৪২)		
	শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ	১৩০১-২২
	জালালউদ্দিন মাহমুদ	আনু. ১৩০৪-৯
	শিহাবউদ্দিন বুগদি শাহ	১৩১৭-১৮
	গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর	১৩১০-১২
নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিম		আনু. ১৩২৪-২৬
গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর		১৩২৮-৩৩
কদর খান (লক্ষ্ণৌতি)		অনিশ্চিত
ইজাজউদ্দিন ইয়াহিয়া (সাতগাঁও)		অনিশ্চিত
বাহরাম খান (সোনারগাঁও)		১৩২৮-৩৮
	ফখরউদ্দিন মোবারক শাহ (সোনারগাঁও)	১৩৩৮-৪৯
	ইখতিয়ার উদ্দিন গাজি শাহ (সোনারগাঁও)	১৩৪৯-৫২
	আলাউদ্দিন আলী শাহ (লক্ষ্ণৌতি)	১৩৪১-৪২

সুবেদার/গভর্নর	সুলতান	তারিখ
ইলিয়াস শাহি রাজবংশ (১৩৪২-১৪১৫)		
	শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ	১৩৪২-৫৭
	সিকান্দার শাহ	১৩৫৭-৮৯
	গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ	১৩৮৯-১৪১০
	সাইফ হামজা শাহ	১৪১০-১১
	শিহাউদ্দিন বায়েজিদ শাহ	১৪১১-১৪
	আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ	১৪১৪
রাজা গণেশ রাজবংশ (১৪১৫-৩৩)		
	জালালউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ	১৪১৫-৩২
	শামসউদ্দিন আহমদ শাহ	১৪৩২-৩৩
পুনপ্রতিষ্ঠিত ইলিয়াস শাহি রাজবংশ (১৪৩৩–৮৬)		
	নাসিরউদ্দিন মাহমুদ ১ম	১৪৩৩-৫৯
	রোকনউদ্দিন বারবাক শাহ	১৪৫৯-৭৪
	শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহ	১৪৭৪-৮১
	সিকান্দার	১৪৮১
	জালালউদ্দিন ফাতহ শাহ	১৪৮১-৮৬
আবিসিনীয় (১৪৮৬–৯৩)		
	বারবাক শাহ-জাদা	১৪৮৬
	সাইফউদ্দিন ফিরোজ শাহ	১৪৮৬-৯০
	শামসউদ্দিন মোজাফফর শাহ	১৪৯০-৯৩
হোসেন শাহ রাজবংশ (১৪৯৩–১৫৩৮)		
	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ	১৪৯৩-১৫১৯
	নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহ	১৫১৯-৩২
	আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ	১৫৩২
	গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ	১৫৩২-৩৮

সুবেদার/গভর্নর	সুলতান	তারিখ
শের শাহ সুর ও উত্তরসুরিবৃন্দ (১৫৩৮-৬৪)		
	শের শাহ সুর	১৫৩৮
	(সম্রাট হুমায়ুন)	(১৫৩৮-৩৯)
	শের শাহ সুর	১৫৩৯-৪৫
	ইসলাম শাহ	১৫৪৫-৫৩
	শামসুদ্দিন মাহমুদ শাহ	১৫৫৩-৫৫
	গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ	১৫৫৬-৬০
	গিয়াসউদ্দিন ২য়	১৫৬০-৬৩
	গিয়াসউদ্দিন ৩য়	১৫৬৩-৬৪
কররানি রাজবংশ (১৫৬৪-৭৫)		
	তাজ কররানি	১৫৬৪-৬৫
	সুলায়মান কররানি	১৫৬৫-৭২
	বায়েজিদ কররানি	১৫৭২
	দাউদ কররানি	১৫৭২-৭৫
মোগল রাজবংশ (১৫২৬-১৮৫৮)		
মুনিম খান		১৫৭৪-৭৫
হোসেন কুলি বেগ		১৫৭৫-৭৮
মোজাফফর খান তুরবাতি		১৫৭৯-৮০
মির্জা আজিজ কোকা		১৫৮২-৮৩
শাহবাজ খান		১৫৮৩-৮৫
সাদিক খান		১৫৮৫-৮৬
ওয়াজির খান		১৫৮৬-৮৭
সাইদ খান		১৫৮৭-৯৪
মান সিং		১৫৯৪-১৬০৬
কুতুবউদ্দিন খান কোকা		১৬০৬-৭
জাহাঙ্গীর কুলি বেগ		১৬০৭-৮
ইসলাম খান চিশতি		১৬০৮-১৩

সুবেদার/গভর্নর	সুলতান	তারিখ
কাসিম খান চিশতি		১৬১৩-১৭
ইব্রাহিম খান		১৬১৭-২৪
মাহতাব খান		১৬২৫-২৬
মুকাররম খান		১৬২৬-২৭
ফিদাই খান		১৬২৭-২৮
কাসিম খান জুয়িনি		১৬২৮-৩২
আজম খান মির মোহাম্মদ বাকর		১৬৩২-৩৫
ইসলাম খান মাশহাদি		১৬৩৫-৩৯
শাহজাদা মোহাম্মদ সুজা		১৬৩৯-৬০
মোয়াজ্জম খান (মির জুমলা)		১৬৬০-৬৩
শায়েস্তা খান		১৬৬৪-৭৮
ফিদাই খান		১৬৭৮
শাহজাদা মোহাম্মদ আজম		১৬৭৮-৮৮
খান জাহান বাহাদুর খান		১৬৮৮-৮৯
ইব্রাহিম খান		১৬৮৯-৯৭
শাহজাদা আজিমউদ্দিন (আজিমুশ্বান)		১৬৯৭-১৭১২
মুর্শিদ কুলি খান (জাফর খান)		১৭১৩-২৭
সুজাউদ্দিন মোহাম্মদ খান		১৭২৭-৩৯
সরফরাজ খান		১৭৩৯-৪০
আলীবর্দী খান		১৭৪০-৫৬
সিরাজ উদ্দৌলা		১৭৫৬-৫৭

ইফাবা-(উন্নয়ন) ২০০৮–২০০৯–অস/৪৬৫০-৩২৫০